সামাজিক নীতি
Social Policy

ক বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

নীতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যেসব নিয়মকানুনকে আদর্শ বা পথ নির্দেশক হিসেবে অনুসরণ করা হয় সেগুলোকেই নীতি বলে।

A. J. Kahn এর মতে নীতি কী?

উত্তর : "নীতি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিংবা ইঙ্গিতবাহী মূলসূত্র বিশেষ কর্মসূচি, সামাজিক বিধান ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে।"

সামাজিক নীতি কী?

উত্তর : সামগ্রিক কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে যখন সরকার কর্তৃক কোন নীতি প্রণীত হয় তখন সেই নীতিকে সামাজিক নীতি বলে।

Richard M. Titmass এর মতে সামাজিক নীতি কী?

উত্তর : সামাজিক নীতি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার সমষ্টিগত কৌশল।

"যেসব নীতি জনকল্যাণের পথ নির্দেশক, কেবল সেগুলোকেই সামাজিক নীতি বলা যায়।"–এটি কার উক্তি?

উত্তর : সমাজবিজ্ঞানী Sleck এর উক্তি।

কয়েকটি সামাজিক নীতির নাম লিখ।

উত্তর : স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি, যুব উন্নয়ন নীতি, শিক্ষানীতি, শিশুকল্যাণনীতি, নারী উন্নয়ন নীতি ইত্যাদি।

সামাজিক নীতির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর : ১. সামাজিক নীতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ নির্দেশক এবং

২. এটি বাঞ্ছিত আর্থসামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে।

সামাজিক নীতির কয়েকটি লক্ষ্য উল্লেখ কর।

উত্তর : দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতির পরিধি উল্লেখ কর।

উত্তর : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার প্রসার, পরিবেশ রক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, মানব সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

T.H. Marshall সামাজিক নীতির পরিধির মধ্যে কী কী বিষয়কে দেখিয়েছেন?

উত্তর : শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অপরাধ ও অপরাধ সংশোধন, সমাজকল্যাণ কর্মসূচি, গৃহায়ন, সরকারি সাহায্য ইত্যাদি।

১১. সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ লিখ।

উত্তর : নীতির প্রয়োজন নির্ধারণ, বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কমিটি গঠন, পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি প্রস্তুতকরণ, চূড়ান্ত নীতি অনুমোদন ইত্যাদি।

১২. সামাজিক নীতির নির্ধারক বা উপাদান কী কী?

উত্তর : অর্থনৈতিক উপাদান, রাজনৈতিক উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদান, পরিবার, অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি, জাতীয় প্রতিরক্ষা, ভৌগোলিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক সমস্যা, সাহায্যদাতাদের স্বার্থ, সামাজিক আইন ইত্যাদি।

১৩. বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োজন কেন?

উত্তর : সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা হ্রাস, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের সুষম বন্টন, মৌল চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সামাজিক নীতির প্রয়োজন।

১৪. বাংলাদেশে সামাজিক নীতি প্রণয়নে কয়েকটি সাংবিধানিক সংস্থার নাম লেখ।

উত্তর : জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ, সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি।

১৫. বাংলাদেশে সামাজিক নীতি প্রণয়নে কয়েকটি অসাংবিধানিক সংস্থার নাম লেখ।

উত্তর : রাজনৈতিক দলসমূহ, সংবাদপত্র, পেশাভিত্তিক সমিতি। যেমন– আইনজীবী, শিক্ষক সমিতি, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যেমন– শ্রমিক সংগঠন, বণিক সমিতি ইত্যাদি।

১৬. সমাজকল্যাণ নীতি কী?

উত্তর : সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় যেসব রীতিনীতি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয় সেগুলোই সমাজকল্যাণ নীতি।

১৭. অধ্যাপক আর. এম. টিটমাসের মতে সমাজকল্যাণ নীতি কী?

উত্তর : জনগণের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত কার্যপ্রণালীই সমাজকল্যাণ নীতি।

১৮. বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি সমাজকল্যাণ নীতি লেখ।

উত্তর : জনসংখ্যানীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, শিশুনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, নারী উন্নয়ন নীতি ইত্যাদি।

১৯. সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর : সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

২০. বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য সমাজকল্যাণ নীতিগুলো কী কী?

উত্তর : ক. শ্রম কল্যাণনীতি-১৯৮০ সালে প্রণীত হয়।

খ. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ সালে প্রণীত হয়। সংশোধিত ও অনুমোদিত হয় ২০০৪ সালে।

গ. শিক্ষানীতি – ২০১০ সালে

ঘ. জাতীয় শিশুনীতি– ২০১০ সালে

ঙ. স্বাস্থ্যনীতি – ২০১০ সালে

চ. নারী উন্নয়ন নীতি – ২০১১ সালে প্রণীত হয়।

২১. সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব কী?

উত্তর : সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, জনকল্যাণের পথনির্দেশক, সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে রক্ষা সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

২২. সামাজিক নীতির কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ কর।

উত্তর : নীতি প্রণয়নকারীদের অসহযোগিতা, জটিল সামাজিক সমস্যায় দক্ষ কর্মীর অপর্যাপ্ততা, সরকার ও জনগণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, সঠিক তথ্য ও তত্ত্বের অভাব, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের অভাব ইত্যাদি।

২৩. সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর চারটি ভূমিকা লে

উত্তর : ১. যথাযথ চাহিদা চিহ্নিত করা, ২. প্রয়োজ তথ্য সরবরাহ, ৩. নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ ও ৪. সি গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা।

২৪. সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে পার্থক্য

উত্তর : সামাজিক নীতি প্রণীত হয় সমাজের রীতিনীতি মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। আর সমাজকল্যাণ নী প্রণয়ন করা হয় সমাজকর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে।

২৫. সামাজিক নীতির কয়েকটি আদর্শ উল্লেখ কর।

উত্তর : তথ্য ভিত্তিক, প্রয়োজন ও সমস্যা বিবেচনা, নির্বাহীদের উৎসাহ প্রেরণা। পরিবর্তনে সিদ্ধান্ত, কর্মসূ দিকনির্দেশনা ইত্যাদি।

২৬. সামাজিক নীতি প্রণয়নে অনুসরণীয় দুটি সাধারণ নী নাম লেখ।

উত্তর : ১. অনুভূত প্রয়োজন ও সমস্যাকে গুরুত্ব প্রদ এবং ২. মূল্যবোধের সাথে নীতির সামঞ্জস্য বিধান।

২৭. বাংলাদেশে সামাজিক নীতির দুটি পরিধি লিখ।

উত্তর : ১. জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রণ করা এবং ২. শিক্ষ প্রকার ঘটানো।

খ বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। **সামাজিক নীতি কাকে বলে?**

অথবা, সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর। ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য পথপ্রদর্শক। সত্যিকার অর্থে নীতিবহির্ভূত বিশ্ব ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজে প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক নীতি : সাধারণভাবে সামাজিক নীতি বলতে বুঝায়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যেসব নিয়মকানুন, প্রযুক্তি বা কৌশলকে দিকনির্দেশক বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নীতি বা Social policy বলা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নীতিকে তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সামাজিক নীতির কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

প্রখ্যাত অধ্যাপক টিটমাস এর মতে, "জনগণের কল্যাণ সরকার কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত নীতিকে সামাজিক নী বলে।" (Social policy is a collective strategy t address social problem.)

সমাজকর্ম বিশ্বকোষে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত ক হয়েছে এভাবে, "সামাজিক নীতি হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহী পদক্ষেপ যা নাগরিকদের ন্যূনতম জীবনমান উন্নয়ন; যেমন সামাজিক বীমা, সরকারি সাহায্য, স্বাস্থ্য, মানসিক যত্ন, শিক্ষ গৃহায়ন ও ব্যক্তিগত সেবার ব্যবস্থা করে।" (Social polic can be viewed as attempts by government t guarantee some minimum standards of living fo citizens in domains such as social insurance, publi aid, health and mental care, education, housing an personal social services.)

অধ্যাপক স্লেক তাঁর 'Social Administration & th Citizen' গ্রন্থে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গি বলেছেন, "যেসব নীতি জনকল্যাণের পথ নির্দেশ করে তাকে সামাজিক নীতি বলা হয়।"

উপসংহার : উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সামাজি নীতির সংজ্ঞায় পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, যেসব সুনির্দি নিয়মকানুন বা নির্দেশ যা সরকার বা সমাজ কর্তৃক সুনির্দি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালনা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করে তাকে সামাজি নীতি বলে।

প্রশ্ন॥২॥ সামাজিক নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

অথবা, সামাজিক নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : একটি দেশের সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে সামাজিক নীতি। বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই যে কোন দেশের কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়।

সামাজিক নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : নিম্নে সামাজিক নীতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

২. সমাজে সাম্য ও সমতা বিধান করা।

৩. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে।

৫. সমাজ ও সমাজস্থ সব নাগরিকের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৬. যথাসম্ভব কষ্ট, অকাল মৃত্যু এবং সামাজিক অনিষ্ট থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

৭. বিপদগ্রস্তদের বিপদ থেকে রক্ষা করা যাতে তারা সে সমস্যা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।

৮. সামাজিক সমস্যার উদ্ভব, বিকাশ এবং বিস্তৃতি রোধ করা এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের সব জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়া।

প্রশ্ন॥৩॥ সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

অথবা, সামাজিক নীতির মানদণ্ড কী কী?

অথবা, সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করা। আর সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠে।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য : সামাজিক নীতির কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. সামাজিক নীতি সমাজের বহুবিধ কল্যাণসাধনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

২. সমাজে সাম্য এবং সমতা বিধান করা।

৩. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. সামাজিক সমস্যায় উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তৃতি রোধ করা এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা।

৬. জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য যথাসম্ভব এবং যথোপযুক্ত কল্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

৭. উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি মূলত সমাজের সমস্যা সমাধান সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যই গড়ে উঠে। আর উপরক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক নীতিকে যথোপযুক্তভাবে সমাজ পরিচালনার দিকনির্দেশনা দান করে।

প্রশ্ন॥৪॥ সামাজিক নীতি প্রণয়নের উপাদানগুলো কী কী?

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়নের নির্ধারক আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়। আর যে কোন দেশের সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতকগুলো উপাদান বা বিষয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সামাজিক নীতি প্রণয়নের উপাদান : নিম্নে সামাজিক নীতি প্রণয়নের উপাদানসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতি।

২. আন্তর্জাতিক পরামর্শ।

৩. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা।

৪. দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

৫. সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা।

৬. সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থা। এর মধ্যে আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে–
   - (i) রাজনৈতিক দর্শন,
   - (ii) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা,
   - (iii) রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রক্রিয়া,
   - (iv) রাজনৈতিক অর্থ ব্যবস্থা।

৭. সাংস্কৃতিক অবস্থা। এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে–
   - (i) পরিবার,
   - (ii) ধর্ম,
   - (iii) সামাজিক মূল্যবোধ,
   - (iv) সামাজিক পরিবর্তন ও প্রথা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, একটি সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব উপাদানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়, অন্যথায় তা বাস্তবায়িত হবে না।

প্রশ্ন।৫। **সামাজিক নীতি ও অর্থনৈতিক নীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক নীতি ও অর্থনৈতিক নীতির সাদৃশ্য আলোচনা কর।**

উত্তর।। ভূমিকা : উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পূর্বশর্ত হলো নীতি প্রণয়ন করা। এ নীতির ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক নীতি ও সামাজিক নীতির সম্পর্ক : নিম্নে সামাজিক নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

সামাজিক নীতি অতীতে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও পথ নির্দেশনা হিসেবে আলোচিত হতো। তাতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যভিত্তিক নীতিকে সামনে রেখে। কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় হিসেবে সামাজিক নীতি গৃহীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক নীতির সাথে সামাজিক নীতির একটি সুষ্ঠু পার্থক্য নির্দিষ্টকরণ দরকার হয়।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে উন্নয়নের পরিচয়বাহীরূপে গ্রহণ করলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উন্নয়ন মডেল হিসেবে এমন সব অর্থনৈতিক নীতিসমূহই প্রতিফলিত হয় যা বস্তুগত সম্পদের বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। উন্নয়ন বিষয়ে এ ধরনের দৃষ্টিকোণ বাস্তবে যথাযথ না হয়ে উঠার প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিতে উন্নয়নের নবতর ধারণা সংযোজিত হয়। তাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবর্তনকে বিবেচনায় এনে উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়। এরূপ নীতি প্রকৃতিগতভাবে অর্থনৈতিক নীতি। এসব নীতিমালায় সামাজিক নীতির অনুশীলন প্রয়োগ প্রসঙ্গ সংকীর্ণ পরিসরে ব্যক্ত হয় এবং অব্যাখ্যাত ও গুরুত্বহীন থেকে যায়। বস্তুগত কোন সমাজে বা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রেই আসে উন্নয়ন। কারণ উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ভালো একটি প্রয়োজনীয় বিষয়; পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াগত দিক থেকে অর্থনৈতিক নীতি আয় বৃদ্ধি ও সম্পদের বণ্টনে পরিপূরক বা সম্পূরক পন্থা নির্দেশ করে। অন্যদিকে, সামাজিক নীতি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা করে। ফলে অর্থনৈতিক নীতির কার্যকারিতা ও অর্থবহ ফলদায়কতায় সামাজিক নীতি তাৎপর্যপূর্ণ। আবার সামাজিক নীতিকে বাস্তব সম্পাদনে অর্থনৈতিক নীতি শক্তি যোগাতে পারে, সেজন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উভয়ের সংহতি বিধান দরকার।

আর এটি আসতে পারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করার মধ্য নয়, বরং সংরক্ষণে বিকাশ সাধন এবং বণ্টন ধারণায় সামাজিক বিষয়াদিতে গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে। তাতে মানুষ ও তার সমাজ প্রসঙ্গ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর এতে করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির যৌথ গ্রহণ উন্নয়ন নীতি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক নীতি এবং সামাজিক নীতি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন।৬। **সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির পার্থক্য আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির সমন্বয়হীনতা আলোচনা কর।**

উত্তর।। ভূমিকা : সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

নিম্নে সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

গঠনগত দিক থেকে : সামাজিক নীতি হলো কোন সমাজের ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে পথনির্দেশ দানকারী কার্যক্রম ও বিধিবিধান যা সামাজিক প্রথা মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতি প্রধানত ও পরিবারের নিকট সরকারি সংস্থা; অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রব্যাদি ও সেবাসমূহ স্থানান্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

পরিধিগত দিক থেকে : পরিধিগত দিক থেকে সমাজকল্যাণ নীতি হলো বৃহত্তর সামাজিক নীতির একটি অংশ মাত্র। সামাজিক নীতির পরিধির মধ্যে রয়েছে সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ, সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ, সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদ ও সুযোগের অসমতা নিরসন অন্যতম।

নীতিনির্ধারণী : সামাজিক নীতি প্রণয়নে জড়িত থাকে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও নীতিনির্ধারণ সংস্থা যার লক্ষ্য থাকে সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতি প্রধানত ব্যক্তি ও পরিবারের নিকট সরকারি সংস্থা, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রব্যাদি ও সেবাসমূহ হস্তান্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

সমস্যার পরিধিগত : সামাজিক নীতি হলো সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক একটি বিষয়। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতির সাথে সামাজিক সমস্যার সংশ্লিষ্টতা তুলনামূলকভাবে কম।

প্রণয়নগত : আপেক্ষিক গুরুত্বারোপের দিক থেকে বলা যায়, সামাজিক নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয় হলো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতি সমাজের সেসব জনগোষ্ঠীর জন্য সক্ষমকারী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে যাতে জন্মগত বা সহজাত ও অর্জিত কোন প্রতিবন্ধিত্বের জন্য সাধারণ বা প্রচলিত সুযোগ সুবিধাগুলো গ্রহণে অক্ষম।

পরিবর্তনগত : সামাজিক নীতি প্রণীত হয় সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধের ফলশ্রুতি হিসেবে। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতি প্রণীত হয় সমাজকর্মের আদর্শ মূল্যবোধ ও পেশাগত নীতিমালার নিরিখে।

উপসংহার : উভয়ের মধ্যে উপর্যুক্ত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এ প্রসঙ্গে T. H. Marshall বলেন, সামাজিক নীতিগুলোকে অবশ্যই সমাজকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

প্রশ্ন॥৭॥ সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে অসামঞ্জস্য আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার পার্থক্য : নিম্নে সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

১. পরিধিগত : সামাজিক পরিকল্পনা সামাজিক নীতির আওতায় গৃহীত হয় বলে পরিকল্পনার পরিধি সামাজিক নীতির তুলনায় ক্ষুদ্রতর। ফলে সামাজিক নীতির পরিধি ব্যাপকতর।

২. বিষয়বস্তু : সামাজিক নীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে তত্ত্বগত। অন্যদিকে, সামাজিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ব্যবহারিক বা অনুশীলনধর্মী।

৩. নিয়ন্ত্রণকারী : সামাজিক নীতি সামাজিক পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ সামাজিক নীতি সামাজিক পরিকল্পনাকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট পথে চলতে সহায়তা করে।

৪. নির্দেশনা : সামাজিক নীতিতে নির্দেশনা থাকে বিধিবিধানের। অপরদিকে, সামাজিক পরিকল্পনায় নির্দেশনা থাকে নিয়মমাফিক ও যৌক্তিকভাবে।

৫. প্রণয়নগত : সামাজিক নীতি প্রণয়ন করেন জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, রাষ্ট্রনির্বাহী ও বিশেষজ্ঞগণ। অন্যদিকে, সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

৬. রূপরেখা : সামাজিক নীতি মূলত নীতিগত। অন্যদিকে, সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নগত রূপরেখা মাত্র।

৭. সুষ্ঠতা : সামাজিক নীতি অনেকটাই অসুষ্ঠ ও জ্ঞান দক্ষতাভিত্তিক নয়। অন্যদিকে, সামাজিক পরিকল্পনা সুষ্ঠ ও যুক্তিগত।

৮. দৃষ্টিভঙ্গিগত : সামাজিক নীতিতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে, সামাজিক পরিকল্পনায় সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও এরা একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন॥৮॥ সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

[জা: বি: ২০০৫]

অথবা, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য পথপ্রদর্শন। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। সমাজে প্রকৃত কল্যাণসাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক : সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নিম্নে সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

১. কোন দেশের সামাজিক উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হলো সামাজিক নীতি। সামাজিক উন্নয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ সামাজিক পরিকল্পনা। সামাজিক নীতি ব্যতিরেকে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। প্রথমে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে পরবর্তীতে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২. সামাজিক নীতি হলো কোন কাজ করার নির্দেশিকা। আর সামাজিক পরিকল্পনা হলো সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া।

৩. সামাজিক নীতি হলো ধারণাগত দিক। আর সামাজিক নীতির প্রায়োগিক দিক হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

৪. সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হলো সামাজিক পরিকল্পনা। তাই সামাজিক নীতি কেমন হবে তার উপর সামাজিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নির্ভর করে।

৫. সামাজিক পরিকল্পনা সামাজিক নীতির পরিচয় বহন করে। তাই সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকলের কল্যাণ সাধন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের উন্নয়ন সাধন, গণতন্ত্র সংরক্ষণ, কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন, সামাজিক অক্ষমতা দূরীকরণ ও সামঞ্জস্যবিধান এবং সমাজের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা ইত্যাদি। কোন সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন॥৯॥ বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ নীতিগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ নীতিগুলো কী কী?

অথবা, বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি সমাজকল্যাণ নীতি উল্লেখ কর।

উত্তর : বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দরিদ্র দেশ হওয়ার কারণে এখানে সমস্যাও বেশি। সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণ নীতি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এসব নীতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, যুব, শিশু, নারী, শ্রম, গৃহায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নীতি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ নীতিসমূহ : নিম্নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. শ্রমকল্যাণ নীতি এটি ১৯৮০ সালে প্রণীত হয়। ২. পল্লি উন্নয়ন নীতি ২০০১ সালে প্রণীত হয়। ৩. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী–২০০৫। ৪. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ সালে প্রণীত হয়। পরে ২০০৪ সালে সংশোধিত ও অনুমোদিত হয়। ৫. বস্ত্র নীতি ১৯৯৩ সালে প্রণীত হয়। ৬. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়। ৭. জাতীয় শিশু নীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়। ৮. জাতীয় নারী নীতি ২০১১ সালে খসরা প্রণীত হয়। ৯. গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩ সালে গৃহীত হয়। ১০. স্বাস্থ্যনীতি ২০০০ সালে প্রণীত হয়।

প্রশ্ন॥১০॥ নীতি কী?

অথবা, **নীতি কাকে বলে?**

অথবা, **নীতির সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর॥ ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে প্রশাসন ও পরিকল্পনার অন্যতম বিষয় 'নীতি'। কোনো পরিকল্পনা বা কর্মসূচিকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার মূল শক্তিই হচ্ছে নীতি। কেননা নীতি বিহীন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সমাজ তথা জাতির বৃহত্তম ও দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপক বা কার্য নির্বাহীরা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ নীতি মানে কোনো কাজে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত দিক নির্দেশনা।

নীতি : সাধারণ অর্থে, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে সব নিয়ম-কানুনকে আদর্শ বা পথনির্দেশক হিসেবে অনুসরণ করা হয়, সেগুলোকেই নীতি বলে। 'নীতি' হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বে নির্ধারিত আদর্শ বা চিত্র প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত লক্ষ্যে সুশৃঙ্খল উপায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী 'নীতি' কে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য 'নীতির' কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো :

সমাজকর্মের অভিধান এর সংজ্ঞানুযায়ী, "নীতি হলো প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত স্থায়ী পরিকল্পনা, যা কোনো সংগঠন বা সরকার কর্মসম্পাদনের নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে।"

আ. স. ম নূরুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান 'নীতি' সম্পর্কে বলেন, "নীতি হচ্ছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের সুনির্দিষ্ট পন্থা বা উপায় নির্ধারণের সুপারিশ করা। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কতকগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সে সমস্ত কর্মসূচি প্রণয়নের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে সে পথ নির্দেশিকা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ নির্ধারণে সহায়তা করে তাকে সে প্রতিষ্ঠানের নীতি বলা হয়।"

আমেরিকার মনীষী **A. J. Kahn** তার 'Social Policy and Social Service' গ্রন্থে বলেছেন, "নীতি হলো নির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহ, আইন এবং অগ্রাধিকার প্রদানের পিছনে বিদ্যমান প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।"

মনীষী **Rich and M. Titmass** বলেন, "নীতি শব্দটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গৃহীত মূলনীতিগুলোকে নির্দেশ করতে গ্রহণ করা হয়। নীতি প্রত্যয়টি কোনো কাজের উপায় এবং ফল নির্দেশ করে। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কার্যক্রম পরিচালনার বিধিমালা নির্দেশ করতে নীতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়।"

George R. Terry এর মতে, "নীতি হলো নির্বাহীকে কার্যক্রম গ্রহণের সাধারণ সীমা ও নির্দেশনা নির্ধারণ করার মৌখিক, লিখিত অথবা অপ্রকাশিত সামগ্রিক নির্দেশনা।"

Curties F. Tate and Marilyn L. Taylor এর মতে, "নীতি হচ্ছে পৌনঃপুনিক কাজের পথনির্দেশক কার্যক্রম।"

Dr. D. Paul Chowdhury বলেন, "নীতি হলো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চলমান কর্মসূচির প্রণালি, মূল দর্শন এবং সেবার ভিত্তিস্বরূপ মুখ্য উক্তি।"

সুতরাং নীতি হচ্ছে যে কোনো উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বা কর্মসূচির মূল চালিকাশক্তি। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাকে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রমের সাধারণ পরিকল্পনা হচ্ছে নীতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠান ঘটিত সমরূপ ও পৌনঃপুনিক ঘটনার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তই নীতি। প্রশাসন কোনো কার্যসম্পাদন বা সমস্যা সমাধানে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তারই বাহন নীতি। মূলত নীতির বিকাশ ঘটে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা হতে।

প্রশ্ন॥১১॥ সামাজিক নীতির পরিধি লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতির ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতির পরিধি তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি মূলত জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে তাদের সমস্যার ব্যাপকতা, সমাধানের উপায়, কর্মসূচি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান, সমস্যার ব্যাপকতা, গৃহীত কার্যক্রম ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সামাজিক নীতির পরিধি ও ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। সামাজিক নীতির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সাধারণত সামাজিক নীতির পরিধি নির্ভর করে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর।

সামাজিক নীতির পরিধি : সামাজিক নীতির পরিধি বা কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা জটিল ব্যাপার। T.H. Marshall সামাজিক নীতির পরিধি হিসেবে সামাজিক বিমা, সরকারি সাহায্য, স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সেবাসমূহ, গৃহায়ন, শিক্ষা এবং অপরাধ ও কিশোর অপরাধকে সংশোধনকে দেখিয়েছেন। নিম্নে সামাজিক পরিধি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক নিরাপত্তা : সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় সামাজিক নীতির মাধ্যমে অর্থাৎ সামাজিক নীতির ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

২. শিক্ষা : শিক্ষা সামাজিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শিক্ষার সাথে সমাজ উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য করা হয় শিক্ষানীতি। এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার ধরন, শিক্ষার পর্যায়, পদ্ধতি, শিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশাসন প্রভৃতি।

৩. স্বাস্থ্যনীতি : স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য করা হয় স্বাস্থ্যনীতি। স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, স্বাস্থ্যসেবার ধরন, স্বাস্থ্য ও ঔষধ প্রশাসন, পুষ্টি, সেবাসমূহের মধ্যে শিশু ও মাতৃমৃত্যু, মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিকগুলো এর আওতাভুক্ত।

৪. অপরাধ ও কিশোর অপরাধ : অপরাধকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদান বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাই শাস্তির পরিবর্তে এসেছে সংশোধন। অপরাধ সংশোধনের জন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারণ ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা।

৫. সমাজকল্যাণ : এটি সামাজিক নীতি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সমাজকল্যাণের বিভিন্ন দিক যেমন– শিশুকল্যাণ, নারী কল্যাণ, যুব কল্যাণ, শ্রম কল্যাণ, রোগী কল্যাণ, বৃদ্ধ কল্যাণ, প্রতিবন্ধী কল্যাণ, অসুবিধাগ্রস্তদের কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়গুলো সামাজিক নীতির পরিধিভুক্ত।

৬. সামাজিক সাহায্য : দুর্যোগকালীন সময়ে আর্থসামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ভাতা প্রদান করা হয় সামাজিক সাহায্যের মাধ্যমে।

৭. দারিদ্র্য বিমোচন : দারিদ্র্য একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য শুধু নিজেই সমস্যা নয় বরং অন্যান্য প্রায় সকল সমস্যার প্রধান উৎস। দরিদ্র জনগণ যেমন নিজেরা সুস্থ জীবন থেকে বঞ্চিত থাকে ঠিক তেমনি এরা দেশের উন্নয়নের পথেও প্রতিবন্ধক। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক।

৮. গৃহায়ন : দরিদ্র ও অনুন্নত দেশসমূহে গৃহায়ন সমস্যা প্রকট। তাই গৃহায়ন সামাজিক নীতির অন্যতম ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে গৃহের প্রকৃতি, ধরন, গৃহঋণ, ভূমিসংস্কার, সংস্থান, গ্রাম ও শহর এলাকায় ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতি।

৯. সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন : রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থা একটি দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নিরূপণ হয়। কিন্তু এটি কার্যকর হয় সামাজিক নীতির মাধ্যমে। এটি রাষ্ট্রীয় বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

১০. সামাজিক আইন : বঞ্চিত, অবহেলিত, দারিদ্র্য পীড়িত ও অসুবিধাগ্রস্তদের মৌল চাহিদা পূরণসহ তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সামাজিক আইন প্রয়োজন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জনকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় সামাজিক নীতির আওতাভুক্ত। সামাজিক উন্নয়ন তথা মানুষের কল্যাণ নির্ভর করে সামাজিক নীতির উপর। এজন্যই বলা হয় যে, সমাজস্থ সকল মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সামাজিক নীতির পরিধিভুক্ত।

প্রশ্ন॥১২॥ সামাজিক নীতির গুরুত্ব লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতির গুরুত্ব তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রতিটি দেশই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করে থাকে। সামাজিক নীতি একটি দেশের উন্নয়নের ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে। একটি দেশের উন্নয়ন সেই দেশের সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক নীতির উপর নির্ভর করে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে সামাজিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

সামাজিক নীতির গুরুত্ব : সামাজিক নীতি একটি দেশের সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সমতা আনয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা : সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রতিটি নাগরিকেরই রয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই নীতিতে বিদ্যমান থাকে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন হবে তা সামাজিক নীতি বলে দেয়। তাই দেশের অগ্রগতির স্বার্থে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিহার্য।

২. সামাজিক সমস্যার সমাধান : সমস্যার সুনিশ্চিত ও বাস্তবভিত্তিক সমাধান পাওয়া যায় সামাজিক নীতিতে। উদাহরণস্বরূপ জনসংখ্যা সমস্যায় জনসংখ্যা নীতি, স্বাস্থ্য সমস্যায় স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি প্রভৃতি নীতি সমস্যা সমাধানে প্রণয়ন করা হয়।

৩. ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন : সমাজ পরিবর্তনশীল। কিন্তু সব পরিবর্তন সবসময় কল্যাণ বয়ে আনে না। অথচ গঠনমূলক সামাজিক পরিবর্তন অপরিহার্য। নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব।

৪. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ : সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও অপব্যবহার উন্নয়নের অন্তরায়। তাই উন্নয়নের পূর্বশর্তই হচ্ছে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫. সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টন : সম্পদের বেশির ভাগ ভোগ করে ধনিক শ্রেণি। অন্যদিকে কম অংশ ভোগ করে দরিদ্রশ্রেণি। ফলে দেশের এক বিরাট অংশ মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। একমাত্র সামাজিক নীতিই পারে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন : দেশের এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতির শিকার। তাদের সমস্যার সমাধানে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সমন্বয়সাধন : সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তেমন গতি আসে না। সামাজিক নীতি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করে। ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৮. মূল্যবোধের গঠনমূলক পরিবর্তন : গঠনমূলক মূল্যবোধ সমাজের শক্তি হিসেবে কাজ করে। এর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসে। বৃহত্তর কল্যাণে কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ অত্যাবশ্যক। সামাজিক নীতি প্রণয়নের ফলে মূল্যবোধের গঠনমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়।

৯. সময় ও শ্রম বাঁচায় : সামাজিক নীতি কাজের সময় ও শ্রম হ্রাস করে। ফলে ভুলত্রুটিও কম হয়। কর্মচারীরা একে পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে চলে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। কেননা উন্নয়নের প্রতিটি স্তরেই সামাজিক নীতির ছোঁয়া রয়েছে। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং মানুষের জীবনে সামাজিক নীতির তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন।১৩। সামাজিক নীতি প্রণয়ন ধাপ লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া তুলে ধর।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া উল্লেখ কর।

উত্তর। ভূমিকা : সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। একে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের নীল নকশা বলা হয়। এজন্যই সামাজিক নীতি প্রণয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য বহুমুখী ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে স্বীকৃতি দিয়ে কতকগুলো ধাপের মাধ্যমে সামাজিক নীতি প্রণীত হয়।

সামাজিক নীতির ধাপ : নিম্নে সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ : প্রথম ধাপ হচ্ছে নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা। প্রথমেই দেখা হয় যে সমস্যার উপর নীতি প্রণয়ন করা হবে সে ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা কতটুকু। জনগণের চাহিদা বা আগ্রহের ভিত্তিতে নীতি গ্রহণ ও প্রণয়ন করা হয়। অনুভূত প্রয়োজনের উপর নীতি প্রণয়ন করা হয়।

২. বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পর বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তখন সরকার কর্তৃক স্বীকার করে নেয় যে, নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। জনগণের আগ্রহ ও প্রয়োজন বুঝে কর্তৃপক্ষ নীতি গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।

৩. কার্যকরী কমিটি গঠন : নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে রাখা হয় মন্ত্রী, আমলা, আইনজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী, পরিকল্পনাবিদ প্রমুখ শ্রেণী ব্যক্তিবর্গ। অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

৪. সামাজিক জটিল অবস্থা বিশ্লেষণ : কমিটি গঠন করার পর সেই কমিটি সমাজের সামগ্রিক জটিল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। কমিটি সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষা, সংশোধন, পরিবর্তন নীতি প্রণয়নের স্বার্থে যত্নের সাথে করে থাকে।

৫. পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি প্রস্তুতকরণ : কমিটি পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ করে নীতি তৈরি করার পর সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে থাকে এবং একটি খসড়া নীতি প্রস্তুত করে থাকে। নীতি অনুমোদনের সময় প্রয়োজনে তার সংশোধন ও পরিবর্তনের সুযোগ থাকে।

৬. খসড়া নীতির অনুমোদন : কর্তৃপক্ষের নিকট খসড়া উপস্থাপন করার পর নীতির পরীক্ষানিরীক্ষা, মূল্যায়ন, সংশোধন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে খসড়া নীতি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। তারপর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

৭. জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ : এ পর্যায়ে অনুমোদিত নীতির জনসমর্থন আদায়ের জন্য ব্যাপক জনসমর্থন চালাতে হবে। নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সুফল প্রভৃতি জানাতে হবে তাদের। প্রচারমাধ্যমগুলোর সহায়তা নিতে হবে। পোস্টার, লিফলেট, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নীতির অনুশীলন : সামাজিক নীতির অষ্টম ধাপে নীতির অনুশীলন শুরু করতে হবে। বাস্তব অনুশীলনের সময় নীতিতে কোনো ত্রুটি আছে কি না দেখতে হবে। ত্রুটি থাকলে সংশোধন করতে হবে। জনগণ গ্রহণ করেছে কি না তাও দেখতে হবে।

৯. চূড়ান্ত নীতি অনুমোদন : এটি সামাজিক নীতির সর্বশেষ ধাপ। নীতির ভুলত্রুটি সংশোধন ও অনুশীলনের পর তা চূড়ান্ত ভাবে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করবে। এরপর নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন শুরু হয়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত ধাপগুলোর মাধ্যমে সামাজিক নীতি প্রণীত ও অনুমোদিত হয় এবং কয়েক বছরের জন্য তা চলতে থাকে। বর্তমানকালে নীতিকে অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য Policy study নামে নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন সমাজকল্যাণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন॥১৪॥ সামাজিক নীতি প্রণয়নের নীতিমালা লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়নের মূলনীতি লিখ।
অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়নের নীতিমালা উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। সামাজিক নীতি প্রণয়নকালে সামাজিক বিষয়াদির পাশাপাশি এর কর্ম প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খলতা রক্ষায় মনোযোগী হতে হয়। সামাজিক নীতি প্রণয়নকালে কতিপয় সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়নের নীতিমালা : নিম্নে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে অনুসরণীয় সাধারণ নীতিমালাগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো :

১. অনুভূত প্রয়োজন ও সমস্যাকে গুরুত্ব প্রদান : সামাজিক নীতি প্রণয়নের সময় অনুভূত প্রয়োজন ও সমস্যাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সাহায্যার্থী প্রয়োজনকে অগ্রাধিকারভিত্তিক গুরুত্ব দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করেন।

২. জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন : সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণ যেমন প্রত্যাশা করেন তা বিবেচনায় রেখেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়। ফলে এটি গণমুখী রূপ নেয়।

৩. গণঅংশায়ন : সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। এর ফলে নীতি বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৪. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলেই এর আওতায় পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ সহজ হয়। তাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত।

৫. মূল্যবোধের সাথে নীতির সামঞ্জস্য বিধান : সামাজিক নীতি সমাজস্থ মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়। এর ফলে সামাজিক নীতির গ্রহণযোগ্যতা থাকে। আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়।

৬. জাতীয় আদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ : সামাজিক নীতি জাতীয় আদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক। এর ফলে নীতি সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম। ফলে জাতীয় আদর্শের বাইরে থেকে সামাজিক নীতি প্রণয়ন সম্ভব নয়।

৭. অতীতের মূল্যায়ন করা : সামাজিক নীতি প্রণয়নের সময় অতীত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা উচিত। অতীতের সফলতা ব্যর্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে অধিকতর সামাজিক নীতি গ্রহণ সম্ভব হয়।

৮. তথ্যভিত্তিক নীতি প্রণয়ন : গবেষণাভিত্তিক তথ্যের আলোকে নীতি প্রণয়ন করা হলে নতুন নীতি গ্রহণ সহজতর হয়। ফলে নীতি অধিকতর মানোন্নয়নে সহায়ক হয়। তথ্যভিত্তিক সামাজিক নীতি ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়।

৯. গতিশীল ও পরিবর্তনযোগ্য নীতি : পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সংগতিপূর্ণ ও বাস্তবায়নযোগ্য সামাজিক নীতি হওয়া চাই। তাই সমাজের চাহিদা ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামাজিক নীতির সামঞ্জস্যহীনতা অত্যাবশ্যক।

১০. নীতি প্রণেতার জ্ঞান দক্ষতা : নীতি প্রণয়নে প্রণয়কারীর জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। এটি অত্যাবশ্যক ফলশ্রুতিতে সুষ্ঠু ও কার্যকর সামাজিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবন থাকে। ফলে এক্ষেত্রে প্রণেতার জ্ঞান দক্ষতা অতি জরুরি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বিষয়গু সামাজিক নীতি প্রণয়নের উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এ কোনোটার ব্যতিক্রম হলে সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত নীতি গ্রহণ ও প্রণয় সম্ভব নয়। এসব মূলনীতি সামাজিক নীতিতে অনুসরণ কর কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন॥১৫॥ বাংলাদেশে সামাজিক নীতি প্রয়োজনীয়তা লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব তুলে ধর।
অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োজনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত আমা বাংলাদেশ। সমস্যাসমূহ এদেশের সমাজব্যবস্থাকে জটি করে দিচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সুপরিক সামাজিক নীতি। কেননা সুষ্ঠু সামাজিক নীতি প্রণয়ন ব্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সম বিভিন্নমুখী সমাধানে বাংলাদেশে সামাজিক নী প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশে স্বাধীনতার চার দশক চলছে, সত্যিকারের আর্থসামাজিক উন্নয়ন আজও সম্ভব হয়নি। আর্থসামাজিক উন্নয়নের সবক্ষেত্রে রয়েছে অসংগঠিত পরিবেশ। একমাত্র সামাজিক নীতির সুষ্ঠ প্রণয়নই পারে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে। নিম্নে বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

১. সমাজের সকল শ্রেণির স্বার্থরক্ষা : সমাজের সকল শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য সুষ্ঠু সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এতে সমাজের সকল শ্রেণির বিশেষ করে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হয়। তাই নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধাসহ সকলের অধিকার রক্ষার স্বার্থে এদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২. জনসংখ্যা হ্রাস করা : এদেশে জনসংখ্যার হার উর্ধ্বমুখী। যা নেতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত। জনসংখ্যার উর্ধ্বহার ও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য এদেশে ২০০০ সালে প্রথম জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে।

৩. উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ : এদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা। এর ফলে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে।

৪. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ : অন্যতম সমস্যা হলো মৌল চাহিদা অপূরণ। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই সামাজিক নীতি প্রয়োজন এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। মৌলিক চাহিদার যথাযথ ব্যবহার প্রত্যেকের জন্য সামাজিক নীতিতে থাকবে। এজন্য এদেশে এর প্রয়োজন অত্যধিক।

৫. উন্নয়ন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা : এদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন সুষ্ঠু সামাজিক নীতি। এর ফলে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব।

৬. রাষ্ট্রীয় সেবা নিশ্চিতকরণ : জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের রয়েছে বিভিন্নমুখী সেবামূলক সংস্থা। সমাজসেবা অধিদপ্তর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে রয়েছে অসামঞ্জস্যতা। তবে নীতি কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি যেমন– দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ধক্য, বেকারত্ব, অসুস্থতা, মৃত্যু, বিপদাপদ প্রভৃতিতে জনগণকে অত্যাবশ্যক। নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক নীতি অপরিহার্য। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। ফলে দেশের সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতি সচল হয়।

৯. কুসংস্কার দূরীকরণ : যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। সমাজের কল্যাণার্থে এগুলোর মূলোৎপাটন অপরিহার্য। সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করা যেতে পারে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের সুসম বন্টন, কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন, জাতীয় উন্নয়ন, অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার, আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তবায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এদেশের জনগণের কল্যাণার্থে সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন॥১৬॥ সামাজিক নীতির সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতির সমস্যাসমূহ তুলে ধর।

অথবা, সামাজিক নীতির দুর্বল দিকসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রতিটি দেশেই দেশের উন্নয়নের জন্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এটি ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে। একটি দেশের উন্নয়ন সেই দেশের সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক নীতির উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রণীত নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হলেও এর বাস্তবায়নে রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নীতি বাস্তবায়নে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা।

সামাজিক নীতির বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা : সামাজিক তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশীয় তথা মানুষের উন্নয়ন সম্ভব হয়। কিন্তু সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা প্রকট হয়। নিম্নে সামাজিক নীতির সীমাবদ্ধতা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো :

১. জটিল ও বহুমুখী সমস্যা : সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন যেমন ইতিবাচক হতে পারে ঠিক তেমনি নেতিবাচকও হতে পারে। বরং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জটিল এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সমস্যার আকার ও রূপ উভয়ই বেশ জটিল এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। আর তাই জটিল ও বহুমুখী সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে নীতি বাস্তবায়ন খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

২. জন অংশগ্রহণের অভাব : উন্নত মানুষ উন্নত দেশ গড়ার কারিগর। একটি দেশের মানুষই যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকে তখন উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। আর তাই এসব সমস্যাগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণের জন্যই প্রণয়ন করা হয় সামাজিক নীতি। জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতেই নীতি বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু যাদের জন্য সামাজিক নীতি প্রণীত হয় তারা সরাসরি অংশগ্রহণ না করলে নীতি বাস্তবায়ন দুরূহ ব্যাপার।

৩. আমলা এবং রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ : বিশেষজ্ঞরা, নীতি প্রণয়নকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু যদি এই বিশেষজ্ঞরাই রাজনৈতিক, আমলা বা প্রভাবে নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া বিদেশি বিশেষজ্ঞদের চাপানো মতামতের উপর প্রণীত সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন করা কঠিন ব্যাপার।

৪. দক্ষ কর্মীর ঘাটতি : নীতি বাস্তবায়নে দক্ষ কর্মী প্রয়োজনীয়। একজন কর্মী সমাজের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যাটি খুঁজে বের করতে পারে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু দক্ষ কর্মীর বড্ড অভাব। ফলে নীতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৫. প্রশিক্ষণের অভাব : প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই দক্ষ কর্মী ও বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবং বিশেষজ্ঞরাই পারে নীতি প্রণয়ন করতে এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ঘটাতে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে যার ফলে দক্ষ কর্মী, বিশেষজ্ঞ এবং মানব সম্পদ গড়ে ওঠে না যা কি না নীতি বাস্তবায়নের অন্তরায়।

৬. অর্থনৈতিক দিকে প্রাধান্য : সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক দিকও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে। কিন্তু সামাজিক সমস্যা নিয়ে নীতি প্রণয়নের সময় যদি সামাজিক দিককে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক দিককে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন সহজ ব্যাপার নয়।

৭. ব্যবধান : নীতি প্রণেতা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রশাসন বা সরকার আর যাদের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয় জনগণ এদের মধ্যে যদি ব্যবধান বিস্তর হয় তখন নীতি বাস্তবায়ন সহজতর হয় না।

৮. অর্থের স্বল্পতা : নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে অর্থ একটি বড় সমস্যা। আর তাই অর্থের স্বল্পতা নীতি বাস্তবায়নের পথে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

৯. পরিশ্রমে বিমুখতা : একটি নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মী, বিশেষজ্ঞ, গবেষক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ কাজ করেন। এটি বেশ পরিশ্রমের কাজ। পরিশ্রমে বিমুখতা নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

১০. তথ্যের ও বিশ্লেষণের ঘাটতি : সমাজকর্মীকে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে নীতি প্রণেতাদের সাহায্য করতে হয়। এই তথ্য সঠিক, নির্ভুল ও বিশ্লেষণমূলক হওয়া অত্যাবশ্যক। ভুল তথ্যের কারণে নীতি বাস্তবায়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, তথ্যের অপর্যাপ্ততা, নিরক্ষরতা, বৈষম্য, যোগাযোগের সমস্যা, ঘন ঘন কর্মসূচির পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড, অস্থিতিশীল পরিবেশ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা, মূল্যায়নের অভাব প্রভৃতি সমস্যা সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত।

[illegible] সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজ হলো সমাজকর্মীর কর্মক্ষেত্র। সমাজকর্মীকে সামাজিক উন্নয়নের Change Agent হিসেবে কাজ করতে হয়। সামাজিক উন্নয়নের পরিমণ্ডলে কাজ করতে গিয়ে সামাজিক নীতির কাঠামোর আওতায় সমাজকর্ম অনুশীলন করতে হয়। যেমন– জনসংখ্যা নীতি একটি সামাজিক সমস্যা। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমাজকর্মী অনুশীলন করতে গিয়ে বিদ্যমান জনসংখ্যা নীতির আলোকে কাজ করেন।

সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা : কর্মীরা যেমন সামাজিক নীতি অনুশীলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তেমনি সামাজিক নীতি প্রণয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিম্নে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করা হলো :

১. খসড়া নীতি তৈরিতে : সামাজিক নীতি চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের পূর্বে এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। জনগণের বা রাষ্ট্রের অনুভূত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তথ্য সরবরাহ ও বিশ্লেষণে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্মী খসড়া নীতি তৈরিকালে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের চেষ্টা করেন।

২. যথাযথ চাহিদা চিহ্নিত করা : সামাজিক নীতি মূলত সামাজিক সমস্যা সমাধানে তথা জনগণের চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। সমাজকর্মী জনগণের সর্বাধিক চাহিদা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা জনগণের চাহিদার সাথে জড়িত থাকে সেগুলোকে সমাজকর্মী তুলে ধরে এবং নীতি প্রণয়নে সাহায্য করে। ফলে এটি বাস্তবায়িত হয়।

৩. নীতি বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান : এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীতির যথার্থতা যাচাই করা যায়। নীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়নও করা সম্ভব। সমাজকর্মীরা নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে।

৪. কমিটির সদস্য হিসেবে : কমিটির সদস্য হিসেবে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মী জনগণকে সংগঠিতকরণ, মতামত গ্রহণ, প্রশাসনের সহযোগিতা প্রভৃতি ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. তথ্য সরবরাহ : নীতি প্রণয়নে তথ্য আবশ্যক। সমাজকর্মীরা প্রয়োজন, জনগণ, সমস্যা, চাহিদা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ করে যা নির্ভরযোগ্য ও বাস্তব নীতি প্রণয়নে সাহায্য করে।

৬. নীতির ফলাফল : সমাজকর্মীরা নীতির ফলাফল বিশ্লেষণে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে থাকে। সামাজিক নীতিতে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে সমাজকর্মীর চোখে ধরা পড়ে। সামাজিক নীতির ফলাফল সম্পর্কে সমাজকর্মীরা নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্টদের আগেই সতর্ক করতে পারেন।

৭. চূড়ান্তভাবে নীতি প্রণয়ন : চূড়ান্ত নীতি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত সমাজকর্মীরা বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নীতিকে বাস্তব উপযোগী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সমাজকর্মী একাধারে সংগঠক, বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং জনমত গঠন করা।

৮. পরামর্শদাতা : সমাজকর্মীকে বলা হয় সামাজিক প্রকৌশলী। তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ। নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা পরামর্শ, দাতা হিসেবে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. জনসমর্থন সৃষ্টি : নীতির পক্ষে জনমত সৃষ্টিতেও সমাজকর্মীরা প্রচেষ্টা চালায়। জনমত সৃষ্টিতে তারা নানা কৌশল প্রয়োগ করে। সামষ্টিক ও রেডিক্যাল সমাজকর্মিগণ তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, নীতি প্রণয়নে এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে সমাজকর্মীর ভূমিকা নেই। নীতি প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজকর্মীরা গবেষক, বিশ্লেষক, জনপ্রতিনিধি আবার কখনো নীতি অনুশীলনকারী হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

প্রশ্ন॥১৮॥ সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ লিখ।

অথবা, সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ তুলে ধর।

অথবা, সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যেকোনো সমাজেরই নীতি প্রণয়নের জন্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। উপাদানসমূহই ঠিক করে দেয় কোন সমাজের নীতি কেমন হবে। আর উপাদানগুলো সম্পর্কে সচেতন থেকেই নীতি প্রণয়ন করতে হয়। বিভিন্ন আর্থসামাজিক উপাদান নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ : মনীষী আর্থার লিভিংস্টোন তাঁর 'Social Policy in Developing Countries' গ্রন্থে নীতি প্রণয়নের কতিপয় উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১. অর্থনৈতিক উপাদান, ২. রাজনৈতিক উপাদান, ৩. সাংস্কৃতিক, ৪. আন্তর্জাতিক সাহায্য, ৫. অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি, ৬. পরিবার, ৭. ঐতিহ্য ও পরিবর্তন প্রভৃতি।

নিচে সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. অর্থনৈতিক উপাদান : সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক উপাদান। অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন– ভোগ, বিনিময়, সঞ্চয়, উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি সামাজিক নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে। তবে একেক ধরনের অর্থব্যবস্থায় একেক রকম নীতির ব্যবহার প্রয়োজন হয়। তাই উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নীতি তৈরিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, ধনী ও দরিদ্র দেশের সামাজিক নীতি একরকম হয় না। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকায় এসব ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত সামাজিক নীতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

২. রাজনৈতিক উপাদান : একটি দেশের সামাজিক নীতি অনেকাংশেই রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কারণ দেশের রাজনৈতিক দল ও তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ সামাজিক নীতির নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। প্রশাসনের সাথে রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক সামাজিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩. সাংস্কৃতিক উপাদান : দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিমাপ করা যায়। সাংস্কৃতিক অবস্থা বলতে, ভাষা, সাহিত্য, আদর্শ, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংগীত প্রভৃতিকে বোঝায়। সামাজিক নীতি গ্রহণে এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের উপস্থিতি অপরিহার্য।

৪. আন্তর্জাতিক সাহায্য : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আন্তর্জাতিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সাহায্যের ধরন বা পরিমাপের উপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন করতে হয় বিধায় এটি সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অনেক সময় সাহায্যকারী দেশই বলে দেয় নীতির ধরন কেমন হবে।

৫. অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি : প্রতিটি সমাজেই বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান রয়েছে। মানুষও এগুলো পালন করে থাকে। ঈদ, নবান্ন, বিয়ে অনুষ্ঠান, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মেলা, যাত্রা প্রভৃতি। সামাজিক নীতির উপর এগুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে।

৬. পরিবার : মানুষ পরিবারে বাস করে। এখান থেকেই অধিকার ভোগ করে এবং পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্বও পালন করে। একক পরিবার, যৌথ পরিবার, পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সামাজিক নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক ও ভূমিকার কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়।

৭. ঐতিহ্য ও পরিবর্তন : ঐতিহ্য ও পরিবর্তন সামাজিক নীতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাস, ঐতিহ্যের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে নতুন চিন্তাভাবনাও চলে আসে। মানুষ দুটি ধারাকেই ধরে রাখতে চায়। ফলে সামাজিক নীতি, ঐতিহ্যও পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করতে হয়।

৮. জাতীয় প্রতিরক্ষা : এটি সামাজিক নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। দেশের জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়। প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে এ ব্যয় কম হয়। কিন্তু সম্পর্কের অবনতি ঘটলে জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ এতে ব্যয় করতে হয়। এজন্যই জাতীয় প্রতিরক্ষা সামাজিক নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও আরো কিছু উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। যেমন– জনমত, আন্তর্জাতিক সাহায্য, জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপাদান প্রভৃতি। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য সঠিক ও গ্রহণযোগ্য সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ সামাজিক নীতি বলতে কী বুঝ? সামাজিক নীতির পরিধি বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতির প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য পথপ্রদর্শন করা। বস্তুত সামাজিক নীতিবহির্ভূত বিশ্বব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। তাই সামাজিক নীতির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সামাজিক নীতি : সাধারণভাবে সামাজিক নীতি বলতে বুঝায়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যেসব নিয়মকানুন, প্রযুক্তি বা কৌশলকে দিকনির্দেশক বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নীতি বা Social policy বলা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নীতিকে তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সামাজিক নীতির কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

T. H. Marshal তাঁর 'Social Policy' নামক গ্রন্থে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, সামাজিক নীতি সত্যিকার অর্থে অর্থবোধক প্রয়োগযোগ্য ধারণা নয়। সামাজিক নীতি ধারণাটি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার সমষ্টি যা নাগরিকদের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কল্যাণ নিশ্চিত করে।

প্রখ্যাত **অধ্যাপক টিটমাস** এর মতে, "জনগণের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত নীতিকে সামাজিক নীতি বলে।" (Social policy is a collective strategy to address social problem.)

সমাজকর্ম বিশ্বকোষে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "সামাজিক নীতি হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ যা নাগরিকদের ন্যূনতম জীবনমান উন্নয়ন; যেমন– সামাজিক বীমা, সরকারি সাহায্য, স্বাস্থ্য, মানসিক যত্ন, শিক্ষা, গৃহায়ন ও ব্যক্তিগত সেবার ব্যবস্থা করে।"

অধ্যাপক স্লেক তাঁর 'Social Administration & the Citizen' গ্রন্থে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, "যেসব নীতি জনকল্যাণের পথ নির্দেশ করে তাকেই সামাজিক নীতি বলা হয়।"

সামাজিক নীতির পরিধি : সামাজিক নীতির পরিধি নির্ভর করে এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উপর। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ, সামাজিক সমস্যা এবং জনগণের চাহিদা সামাজিক নীতির ক্ষেত্র নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে বিশেষ লক্ষ্য দল বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণকে কেন্দ্র করে সামাজিক নীতি প্রণীত হয় তাদের সমস্যার পরিধি, ব্যাপকতা, সমস্যা সমাধানের উপায়, গৃহীত কার্যক্রম ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সামাজিক নীতির পরিধি ও ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। নিম্নে সামাজিক নীতির পরিধি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন প্রয়াস : এতে কি ধরনের সমাজ ও সংগঠন গড়ে উঠবে এবং কিভাবে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধন অর্জিত হবে সেসব ব্যাপারে কর্ম প্রয়াসের দিকনির্দেশনা থাকে। যেমন– এক্ষেত্রে যদি গণতান্ত্রিক সমাজ সমাজবাসীর প্রত্যাশিত হয় তবে সে সমাজ গঠনে সামাজিক নীতি-দৃষ্টিভঙ্গি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হবে।

২. সম্পদের সংগঠন ও সদ্ব্যবহারের শৃঙ্খলা বিধান : কিভাবে সমাজ সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিগুলোকে সব বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদ সদ্ব্যবহারে কাঠামোবদ্ধ করা হবে সেক্ষেত্রে উদ্যোগ-আয়োজনের পন্থা গড়ে নেয়া হয়। সামাজিক নীতির এক্ষেত্রে শুধু উন্নয়নের পথ নির্দেশকই হয় না, সাথে সাথে সমাজবাসী মানুষকে তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হওয়ার দিক নির্দেশনাও দেয়।

৩. দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সুবিধার বন্টন : সামাজিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো সমাজবাসীর মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সুবিধার বণ্টনগত অবস্থা নির্ধারণ। একটি দেশে সেবা সুবিধা ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করার ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য দেখা দেয়। এতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। সামাজিক নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে সমাজের প্রতিটি স্তরে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

৪. সমাজকল্যাণ সুবিধা : সামাজিক নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত কল্যাণমূলক সেবা প্রদান। যেমন– মানবীয় প্রয়োজন ও সমস্যা মোকাবিলার সেবা সুবিধা এবং সমাজসেবা। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যেমন– শিশু, নারী, যুবক, দরিদ্র, পঙ্গু, বৃদ্ধ প্রমুখের সেবা সুবিধা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ।

৫. স্বাস্থ্য : সামাজিক নীতির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টিহীনতা মোকাবিলা, রোগব্যাধি প্রতিরোধ, নিরাময় ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার মানোন্নয়নের বিষয়কে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সেবা সুবিধার আয়োজন ও সাহায্য-সমর্থন প্রদানের যথাসম্ভব ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৬. শিক্ষা : সামাজিক নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হলো শিক্ষা। শিক্ষার সাথে সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই শিক্ষা সামাজিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে শিক্ষার ধরন এবং পর্যায়, প্রয়োজনীয় জনশক্তি, শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষানীতির জন্য প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

৭. কর্মসংস্থান : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। কর্মসংস্থানের ধরন, প্রকৃতি, যোগ্যতা, কি ধরনের যোগ্যতাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হবে সাধারণ শিক্ষা, না কি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় সামাজিক নীতির পরিধির আওতাধীন।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, বৃহত্তর পরিধিতে সামাজিক নীতি সামাজিক স্বার্থকে সামাজিকভাবে বিবেচনায় আনে এবং সকল নাগরিক ও জনসমষ্টির কল্যাণবিধানে গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রতর পরিধিতে অবহেলিত অনগ্রসর ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণ সুবিধাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বস্তুগত সমৃদ্ধি লাভের একটি সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। তাই সার্বিকভাবে বলা যায় যে, সামাজিক নীতির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

প্রশ্ন।২। সামাজিক নীতির মূলনীতি আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতির নীতিমালা বর্ণনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য পথপ্রদর্শক। সত্যিকার অর্থে নীতিবহির্ভূত বিশ্ব ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। নীতিমালা বিহীন পরিকল্পনা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর এ সামাজিক নীতির কিছু মূলনীতি রয়েছে যা সামাজিক নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক নীতির মূলনীতি : সামাজিক নীতি সমাজ পরিবর্তনে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হওয়ায় এর প্রণয়নকালে যেমন সামাজিক বিষয়াদি গুরুত্ব পায় তেমনি কর্ম প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খলতা রক্ষায়ও আন্তরিক হতে হয়। সে প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুসরণীয় নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ :

১. সমাজকর্মী মানুষের সর্বাধিক অনুভূত প্রয়োজন ও সমস্যাকে নীতি প্রণয়নের বিষয় হিসেবে বিবেচনায় আনতে হয়। প্রয়োজন ও সমস্যার অগ্রাধিকারভিত্তিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন হয়। এ পর্যায়ে নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী অংশ নিতে গিয়ে তার সাহায্যপ্রার্থীর প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়।

২. সামাজিক নীতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকতে হয়। সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন বিষয়ে জনগণ যেসব আশা করে সেসবকে বিবেচনায় রাখার মাধ্যমেই সামাজিক নীতি গণমুখী রূপ পায়।

৩. নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথাক্রমে জনসমর্থন ও জনগণের অংশগ্রহণ থাকা দরকার। কেননা এ করেই নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়। নীতি প্রণয়নকালে সেজন্য গণঅংশায়নে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ গুরুত্ব দিতে হয়।

৪. নীতি সফলতা নিশ্চিতকরণ ও পরিবীক্ষণ মূল্যায়নের প্রয়োজনে এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সামাজিক নীতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্টরূপ দেয়া হলে এর আওতায় পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ বাস্তবায়ন সহজতর হয় এবং নীতির লক্ষণীয় ফলাফল পাওয়া যায়।

৫. সামাজিক নীতি সমাজে বিরাজমান মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া দরকার। সমাজবাসীর ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সামাজিক নীতি প্রণীত হলে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকে। বাস্তবায়ন সুবিধা পাওয়া যায় এবং আশাব্যঞ্জক ফল লাভ সম্ভব হয়।

৬. জাতীয় আদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা উচিত। এতে নীতি একটি সমন্বিত ও সুসংগৃহীত ধারায় সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

৭. সামাজিক নীতি প্রণয়নকালে অতীত অভিজ্ঞতা যাচাই করা দরকার। তাতে অতীতের সাদৃশ্য ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে অধিক কার্যকর নীতি গ্রহণ সহজতর হয়।

৮. গবেষণাভিত্তিক তথ্যের আলোকে নীতি প্রণয়ন করা আবশ্যক। গবেষণা এক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রেই শুধু তথ্যগত জ্ঞান যোগান দেয় না, এর সাথে বিরাজমান নীতির অধিকতর কার্যোপযোগীকরণ ও মনোন্নয়নেও সহায়তা করে।

৯. গতিশীল ও পরিবর্তনযোগ্য করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা দরকার। কেননা পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদাও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ ও বাস্তবায়নযোগ্য নীতি প্রণীত না হলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

১০. নীতি প্রণেতার জ্ঞান দক্ষতার আবশ্যকতা পূরণ সাপেক্ষে নীতি প্রণয়নে অগ্রসর হওয়া উত্তম। আর এটি সম্ভব হলে সুষ্ঠু ও অধিকতর কার্যকর নীতি প্রণয়ন হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

১১. সামাজিক নীতি প্রণয়নে অনুসরণীয় উপর্যুক্ত সাধারণ নীতিমালা ছাড়াও বর্তমান উন্নয়নশীল বা অনগ্রসর দেশসমূহের পেক্ষাপটে বিশেষভাবে বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করা দরকার।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, একটি ফলপ্রসূ ও কার্যকরী সামাজিক নীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে তথ্যসংগ্রহ, গবেষণা বিকল্প নীতির মধ্য হতে একটি নির্বাচন, নীতির প্রস্তাব উপস্থাপন প্রতিটি সমাজকর্মী সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম পর্যায় থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত গবেষক।

প্রশ্ন সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতির প্রয়োগ উপযোগিতা বর্ণনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমষ্টি মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য পথপ্রদর্শক। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। নীতিবিহীন পরিকল্পনা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মূলত সমাজ সভ্যতার ক্রমধারার নীতিই যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা, সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে করেছে সহায়তা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে দিয়েছে দিকনির্দেশনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজে প্রকৃত কল্যাণসাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক নীতির গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা :

১. সামাজিক নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত : সামাজিক নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম দিকগুলো যেমন- শিল্প শিক্ষা, কৃষির আধুনিকীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি না হলে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে একথা বলা যাবে না। অন্যদিকে, আবার এগুলোর অগ্রগতিকে সামাজিক উন্নতি বলা হয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন। সামাজিক উন্নতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে Green revolation বাস্তবায়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু তা আমাদের দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যে কতখানি সুফল বয়ে আনবে তা চিন্তা করা যায় না।

Green Revolation এর অর্থ হচ্ছে :
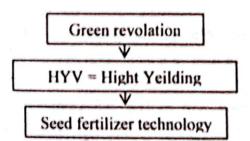
আর উপর্যুক্ত Green revolation অনুযায়ী আধুনিক Agro Alodernization এ যে কৃত্রিম পাঁচটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ তা হলো : i. Seed ii. Fertilizer iii. Irrigation iv. Pesticide এবং v. Weeling. এ পাঁচটি পরিমাপ মাত্রা যদি সামান্যতম কমবেশি হয়, তাহলে উৎপাদন কম হবে।

২. সামাজিক নীতি সমাজকল্যাণের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ : সামাজিক নীতি সমাজকল্যাণের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ নির্দেশ করে। যেমন- ২০২০ সাল নাগাদ আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০% এ কমিয়ে আনতে হবে, এমন লক্ষ্য নিয়ে যদি সরকারের Population policy নির্ধারণ করা হয় তবে তা পুরোপুরি সফল না হলেও কতটুকু সফল হবে তা বুঝা যায়।

৩. আর্থসামাজিক বাধা দূরীকরণ : সামাজিক নীতি নানারকম বাধা ও কুসংস্কার দূর করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করে। সামাজিক কুসংস্কারের জন্য সামাজিক নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যেমন- পরিবার পরিকল্পনার একটি সামাজিক নীতি আছে। কিন্তু নানাবিধ কুসংস্কারের জন্য তা বাস্তবায়ন পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, অসচেতনতা বাধা দিয়ে থাকে। সামাজিক নীতির মাধ্যমে এগুলো দূর করা সম্ভব হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা যায়।

৪. সমাজের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান : সমাজের অসমাঞ্জস্যতা দূর করে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন- জনগণের মধ্যে যদি আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে সরকার সামাজিক নীতির মাধ্যমে অসামঞ্জস্যতা দূরীভূত করার জন্য ধনী শ্রেণীর উপর অধিক কর আরোপ করে দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণে তা ব্যয় করতে পারে। এভাবে সামাজিক নীতির মাধ্যমে সমাজের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

৫. সঠিক দিকনির্দেশনা : সমস্ত সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য সামাজিক নীতির প্রয়োজন হয়ে থাকে।

৬. সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন : কোন কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খল হতে হলে একটি সামাজিক নীতির প্রয়োজন। সমাজ আজ Transition situation এ আছে। আমাদের জানা নেই কোনটি ভালো এবং কোনটি খারাপ। ফলে আমরা কিছু অনুসরণ করতে পারি না। এমতাবস্থায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যদি সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা হয় তবে সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন করা সহজতর হবে।

৭. কর্মসূচি প্রণয়ন : সামাজিক নীতির মাধ্যমে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। কারণ Policy is not a tecture. তাই নীতির মাধ্যমেই কর্মসূচি নিতে হবে।

৮. ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জাতিকে রক্ষা : যেসব উপাদান তথা বিষয়, সামাজিক জীবনে তথা ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন কুফল ডেকে আনে বা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে সেসব কুফল ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ব্যক্তি তথা সমাজকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক নীতির প্রয়োজন।

৯. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যও সামাজিক নীতির প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এদেশের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্ম শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করছে বিধায় সরকার কর্তৃক জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারপর প্রেসিডেন্টকে সভাপতি করে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির উপর এ নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত কমিটি জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক যেমন এ সমস্যার ব্যাপৃতা, পরিণতি, সম্পদের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় সঠিকভাবে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতি প্রণয়ন করে এবং সেটি অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্ট বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে।

প্রশ্ন॥৪॥ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়ন পরিকাঠানো আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণসাধনের পথপ্রদর্শক। সত্যিকার অর্থে নীতিবহির্ভূত বিশ্ব ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। নীতিবিহীন পরিকল্পনা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর এ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে প্রণীত হয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া : সামাজিক নীতি হচ্ছে সমাজের বৈধ ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের নীল নকশা। একটি বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে একটি সুষ্ঠু এবং কার্যকরী সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির সঙ্গে সবরকম সামাজিক উপাদান ও রাজনৈতিক শক্তি জড়িত থাকে। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আইন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিচার বিভাগ প্রদত্ত রায়, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ই সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত থাকে। যার ফলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, বিচার বিভাগের রায় প্রদান প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার আলোকেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়নের কতকগুলো ধাপ অবলম্বন করে প্রণীত হয়। নিম্নে সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপ ছক আকারে প্রদর্শনপূর্বক বিশ্লেষণ করা হলো :
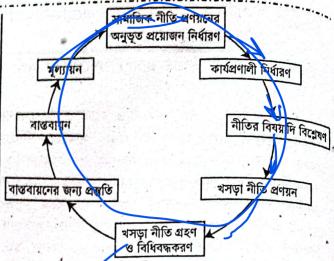
নিম্নে ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক নীতি প্রণয়নে অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণের মাধ্যমে সামাজিক নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। সমাজের যে কোন স্তরের জনসাধারণ কর্তৃক সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া অথবা নীতি প্রণয়নের অনুকূলে জনমত গড়ে উঠতে পারে। যুক্তিসংগত এবং বাস্তবভিত্তিক মতামত এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক নীতি গড়ে উঠে। সামাজিক প্রয়োজন অনুভূত না হলে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় না।

২. কর্মপ্রণালী নির্ধারণ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার পর নীতি তৈরির কার্যপ্রণালী স্থির করা হয়। কার্যপ্রণালী নির্ধারণে এসে সাধারণত সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। যাতে বাস্তবভিত্তিক নীতি প্রণয়নের জন্য নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি খসড়া নীতি উপস্থাপন করা যায়।

৩. নীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের নীতি বিশ্লেষণে দক্ষতা দ্বারা বিকল্প নীতি, নির্দিষ্টকরণ, সেগুলোর সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা, বাস্তবায়ন সম্ভবতা এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণপূর্বক নীতির সব দিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করেই খসড়া সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়।

৪. খসড়া নীতি গ্রহণ ও বিধিবদ্ধকরণ : খসড়া নীতি প্রণয়নের পরবর্তী ধাপ হলো খসড়া নীতি গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর খসড়া জাতি অনুমোদন করা হলে তা গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ করা হয়। খসড়া নীতি গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ পর্যায়ের কাজ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা উভয় প্রক্রিয়াতেই হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক নীতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আইন প্রণেতাদের সম্পৃক্ততায় হয়ে থাকে। আবার অনেক নীতি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গৃহীত এবং বিধিবদ্ধ করা হয়।

৫. খসড়া নীতি প্রণয়ন : সামাজিক নীতির বিষয়াদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার উপর ভিত্তি করে একটি খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত খসড়া নীতি প্রস্তাবকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় নীতি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যাতে এ খসড়া নীতি পর্যালোচনা এবং যোগ্যতা দেখে প্রয়োজনমতো সংশোধন অথবা পরিবর্তন করে অনুমোদন করতে পারে, সেজন্য এতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬. বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি : সামাজিক নীতির খসড়া গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ ধাপের পরবর্তী ধাপ হলো গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। নীতি গ্রহণ অনুমোদন অথবা বিধিবদ্ধ হওয়ার পরই নীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হয়।

৭. বাস্তবায়ন : গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পরবর্তী ধাপ হলো নীতি বাস্তবায়ন করা। আর নীতি বাস্তবায়ন শুরু হয় নীতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। গৃহীত নীতির কার্যকারিতা আনয়ন, বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নের জন্য নীতির বাস্তবায়ন পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নীতি অধিকতর অর্থবহ এবং ফলদায়ক হয়।

৮. মূল্যায়ন : সামাজিক নীতি প্রণয়নের সর্বশেষ ধাপের নাম হলো বাস্তবায়িত নীতির মূল্যায়ন। গৃহীত নীতি বাস্তবায়নকালে কি ধরনের ত্রুটি সীমাবদ্ধতায় তা অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে নি অথবা কোন কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে নি প্রভৃতি বিষয় মূল্যায়ন করে নীতিকে অধিকতর বাস্তবোপযোগী এবং অর্থবহ করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয় মূল্যায়ন স্তরে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি সমাজের দর্পণ। উল্লিখিত ধাপের আলোকেই একটি বাস্তবোপযোগী এবং ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়ন করা যায়। সামাজিক নীতিকে অধিক বাস্তবসম্মত ও কার্যকর করার জন্য Policy study নামক একটি কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে নতুন কোন সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বা উন্নয়ন কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে তার উপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন করা হয়। এটাই সামাজিক নীতি প্রণয়নের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন।৫। **সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **কোন কোন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় তা বর্ণনা কর?**

উত্তর। **ভূমিকা :** সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য পথপ্রদর্শক। সত্যিকার অর্থে নীতিবহির্ভূত বিশ্ব ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। নীতিবিহীন পরিকল্পনা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মূলত সমাজ সভ্যতার ক্রমধারায় নীতিই যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে করেছে সহায়তা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে দিয়েছে দিকনির্দেশনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজে প্রকৃত কল্যাণসাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য : সমাজে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন এবং মানবীয় প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা মোকাবিলায় কল্যাণমূলক সেবা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করা। অধ্যাপক স্লেক তাঁর 'Social Administration and the Citizen' গ্রন্থে সামাজিক নীতির তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। স্লেক বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্য হলো :

১. যথাসম্ভব কষ্ট, অকালমৃত্যু এবং সামাজিক অনিষ্ট থেকে জনগণকে রক্ষা করা;
২. বিপদগ্রস্তদেরকে বিপদ হতে রক্ষা করা যাতে তারা নিজেরাই সে সমস্যা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং
৩. সমাজ ও সমাজস্থ সকল নাগরিকের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

T. H. Marshall তাঁর 'Social Policy' গ্রন্থে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ক. দারিদ্র্য দূরীকরণ : দারিদ্র্য দূরীকরণ মার্শাল বর্ণিত সামাজিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কারণ দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমেই সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। আমাদের দেশের ৬০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। আমাদের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সামাজিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া দারিদ্র্য দূরীকরণ।

খ. সকলের কল্যাণসাধন : সামাজিক নীতির এ উদ্দেশ্যটি শুধু সমাজের দরিদ্র মানুষের জন্যই প্রযোজ্য নয়, বরং সমাজের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এ নীতিটি বিশেষ করে উন্নত দেশে কার্যকর হয়। আমাদের মতো স্বল্প উন্নত দেশে একসাথে সমাজের সকলের জন্য কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে এ নীতি কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গ. বৈষম্য দূরীকরণ : বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস এর দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে দেখা যায়, সমাজে যত রকম সমস্যা রয়েছে তার মূল কারণ আয় বৈষম্য; যা সমাজে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। সামাজিক নীতির বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এসব বৈষম্য দূর করে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমাদের দেশে আয়ের বৈষম্য, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য ইত্যাদি দূরীকরণে এ উদ্দেশ্যকে কাজে লাগানো যায়।

উল্লিখিত মনীষীদের আলোচনা থেকে সার্বিকভাবে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় :

১. সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের বহুবিধ কল্যাণসাধনের পথ নির্দেশ করে।
২. জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য যথাসম্ভব এবং যথোপযুক্ত কল্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।
৩. সমাজবাসীর উন্নয়নে সরকারের যেসব কল্যাণমূলক নীতি রয়েছে, সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা এবং নীতি প্রণয়নের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা।
৪. সামাজিক সমস্যার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তৃতি রোধ করা এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫. সামাজিক পরিবর্তনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
৬. অসুবিধাগ্রস্ত, অসহায়, দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণমূলক, নিরাপত্তামূলক এবং স্বার্থ সংরক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৭. কোন কর্মসূচির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পদ, সময় ও কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রোধ করা।
৮. বিভিন্ন বিকল্প পন্থার মাঝে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করা।
৯. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
১০. মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা।
১১. সমাজে সাম্য ও সমতা বিধান করা।
১২. জনসংখ্যা ও সম্পদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা।
১৩. উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
১৪. সমাজসেবা প্রদান ব্যবস্থাকে (সরকারি বেসরকারি অথবা পেশাদার অপেশাদার যাহোক না কেন) অর্থবহ, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকলের কল্যাণসাধন, সকল এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অসমবন্টন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের উন্নয়ন সাধন, সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন, গণতন্ত্র সংরক্ষণ, কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন, সামাজিক অক্ষমতা দূরীকরণ ও সামঞ্জস্যবিধান এবং সমাজের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তবে সমাজভেদে সামাজিক নীতির ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়। তাই কোন সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন।০৩। **সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরু[ত্ব] আলোচনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির তাৎপ[র্য] বর্ণনা কর।**

উত্তর।। ভূমিকা : সাধারণত সমাজজীবনের কল্যাণ[ে] গৃহীত নীতি সামাজিক নীতি হিসেবে পরিচিত। আর সমাজকল্[যাণ] ধারণা ব্যাপক এবং বহুমুখী হলে সামাজিক নীতিও ব্যাপক [ও] বহুমুখী দিকনির্দেশক হয়। বৃহত্তর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বলা [যায়] সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা এবং বহুমুখী বলে সামাজিক নীতি [এর] আওতাধীন একটি বিষয়। সামাজিক নীতি সমাজের প্রচ[লিত] বিশ্বাস, প্রথা ও মূল্যবোধের সমষ্টিগত প্রকাশ। আর সমাজকল্[যাণ] সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের নীতিতে বিশ্বাস করে। যে [কোন] সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে গেলে ঐ সমাজের প্রচ[লিত] সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সামাজিক নীতি স[মাজ] সম্পর্কে আমাদের জানতে সাহায্য করে।

সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব : আধু[নিক] সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্[যাণে] সামাজিক নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গেলে প্রথ[মে] আমাদেরকে সমাজকল্যাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ কর[তে] হবে। সমাজকল্যাণ বলতে আইন, কর্মসূচি, সুবিধা এবং সে[বা] দান কার্যক্রমের একটি ব্যবস্থাকে বুঝানো হয় যা জনগ[ণের] সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে স্বীকৃত সামা[জিক] প্রয়োজনসমূহ পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ও সুযোগ সৃ[ষ্টি] জোরদারকরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার কার্যকারিতা র[ক্ষায়] নিয়োজিত। অপরদিকে, সামাজিক নীতি বলতে সমাজ জীব[নের] নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি [ও] নির্দেশনাকে বুঝায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজকল্যাণকে অ[ধিক] কার্যকরী করে তোলার জন্য সামাজিক নীতির জ্ঞান অপরিহা[র্য।] সুপরিকল্পিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করার [জন্য] সামাজিক নীতির গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নিচে আধু[নিক] সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনায় সামাজিক নীতির গুর[ুত্ব] আলোচনা করা হলো :

১. সমাজকল্যাণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ : সমাজে শ[ৃঙ্খলা] শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সামাজিক নীতির গুর[ুত্ব] অপরিসীম। যদি কোন রকম সামাজিক নীতি না থাকে, তাহ[লে] সমাজে অশান্তি, নৈরাজ্য, অসংহতি এবং বিশৃঙ্খলা হাঁটুগে[ড়ে] বসবে। ফলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার আর দুর্[নীতি] বাসা বাঁধে। অফিস আদালত, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এ[বং] বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাজ করবে ফলে চেইন অব কমান্ড ভে[ঙে] পড়বে এবং এসব প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণে তাদের স্ব-স্ব ভূমি[কা] পালন করতে পারবে না।

২. সামাজিক সমস্যা সমাধান করে যথাযথ সমাজকল্[যাণ] নিশ্চিতকরণ : সমাজে বিরাজিত সামাজিক সমস্যা সমাধা[নের] উপরই প্রকৃত সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। আর সামা[জিক] নীতি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা সমাধানের একটি যৌথ কৌ[শল]

(Multi-approach)। সামাজিক নীতির লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানের মধ্যমে প্রত্যাশিত ও সন্তোষজনক মানবকল্যাণ এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের মাঝে মানব সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা। সামাজিক নীতির লক্ষ্যই হলো সমাজ এবং সমাজের মানুষের কল্যাণসাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। সামাজিক নীতিই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা এবং সমাজকল্যাণ কর্মসূচিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে থাকে। সামাজিক নীতি হচ্ছে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির অন্তর্নিহিত সুপ্ত চালিকাশক্তি। সামাজিক নীতি সমাজে নাগরিকদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত।

৩. সামাজিক নীতি মানবকল্যাণের পথপ্রদর্শক : সমাজকল্যাণের দর্শন হলো সর্বোচ্চমাত্রায় মানবকল্যাণ সাধন করা। আর সামাজিক নীতি মানবকল্যাণের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Stack এ প্রসঙ্গ তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর 'Administration and the Citizen' গ্রন্থে বলেছেন, "যেসব নীতি মানবকল্যাণের পথপ্রদর্শক, কেবল সেসব নীতিকেই সামাজিক নীতি বলা যায়। সামাজিক দিক নিয়ে ব্যাপৃত হলেই তাকে সামাজিক নীতি বলা যায় না।" মূলত সামাজিক নীতি হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনে গৃহীত পথ নির্দেশিকা, যা সমাজকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সব রকম সংস্কার কর্মসূচিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজকল্যাণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পূর্ব নির্ধারিত যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সেগুলোই সামাজিক নীতি নামে পরিচিত।

৪. সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দানে : সমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণসাধনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। এ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সামাজিক নীতি নির্দেশনা দান করে। সাধারণত সামাজিক নীতি সমাজসেবায় রূপান্তরিতকরণ এবং প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে সর্বোচ্চ কল্যাণসাধন করার লক্ষ্যেই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

আধুনিক সমাজকল্যাণের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করাই হচ্ছে সামাজিক নীতির কাজ। অপরদিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার কাজ হলো কল্যাণমূলক সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করার কর্মসূচি প্রবর্তন করা। সমাজকল্যাণ পরিকল্পনাই হলো সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, সমস্যা, সমাধান, মানবকল্যাণ সাধন এবং সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং আলোচনায় একথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে যে, সমাজকল্যাণার্থে সামাজিক নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন॥৭॥ সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়নে কোন কোন নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করে থাকে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য পথপ্রদর্শক। সত্যিকার অর্থে নীতিবহির্ভূত বিশ্ব ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। নীতিবিহীন পরিকল্পনা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রকৃতি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মূলত সমাজ সভ্যতার ক্রমধারায় নীতিই যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা, সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে করেছে সহায়তা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে দিয়েছে দিকনির্দেশনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজে প্রকৃত কল্যাণসাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক নীতি প্রণয়নের নির্ধারক বা উপাদান : সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সুষ্ঠু সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়। আর যে কোন দেশের সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতকগুলো উপাদান বা বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. অর্থনৈতিক অবস্থা : একটি দেশের সামাজিক নীতি প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থনৈতিক উপাদান। কোন দেশের অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে সেদেশের সামাজিক নীতি কি রকম হবে। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়ন কালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন– প্রাকৃতিক সম্পদ কি রকম রয়েছে, আত্মনির্ভরশীল কি না, খাদ্যঘাটতি আছে কি না, বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে কি না, কি কি সম্পদ রয়েছে, বস্তুগত সম্পদ কতটুকু আছে ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

২. রাজনৈতিক অবস্থা : সামাজিক নীতিনির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে নীতিনির্ধারণেও পার্থক্য হবে। এ উপাদানকে রাষ্ট্রের অবস্থানগত দিকের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন–

ক. রাজনৈতিক দর্শন : দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শনকে উপেক্ষা করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা যায় না। কারণ দেশের সমাজব্যবস্থা বা সমাজকাঠামোর ফলশ্রুতি হচ্ছে সেদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র। বুর্জোয়া ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সরকার সবসময় শিল্পপতিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আবার যে সরকারের উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক দর্শন থাকে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়ন করা সে সরকারের কর্মসূচির প্রধান দিকই হলো এদের উন্নয়ন সাধন করা এবং তারা সেভাবেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে চাবে। মূলত যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের স্বার্থে ও তাদের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিধানকল্পে দেশীয় আইন ও নীতি প্রণীত হয়।

খ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : একটি দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেশি হলে সরকার তার ক্ষমতা রক্ষার্থে সামরিক বাহিনীকে সন্তুষ্ট রেখে নীতি প্রণয়ন করে। তখন জনগণের কল্যাণের জন্য কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে না। ফলে দেশে উন্নয়ন হয় না। বৈদেশিক বিনিয়োগ বেশি হয় না। তাই সামাজিক নীতির উপর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রভাব বিদ্যামন।

৩. সাংস্কৃতিক অবস্থা : কোন দেশের সংস্কৃতি সেদেশের জীবনসত্তাকে আলাদাভাবে প্রকাশ করে। এজন্যই একটি দেশের সামাজিক নীতি প্রণয়নকালে সেদেশের ভাষা, আদর্শ, মূল্যবোধ, চালচলন, রীতিনীতি, ধর্মীয় প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি প্রণয়ন করতে হয়। কারণ সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে নীতি বাস্তবায়িত হবে না। যেমন— আমাদের দেশে যদি নেপালি সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে নীতি প্রণয়ন করা হয় তবে তা বাস্তবায়িত হবে না। সাংস্কৃতিক উপাদানকে আমরা নিম্নোক্ত দিক থেকে দেখতে পারি :

ক. পরিবার : একটি দেশের পরিবার ব্যবস্থার ধরন, কাঠামো ইত্যাদি বিবেচনা করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যেমন— পূর্বে যৌথ পরিবারের আধিক্য ছিল বেশি তাই তখন পরিবারের নির্ভরশীলদের জন্য আলাদাভাবে কোন সামাজিক নীতি গ্রহণ না করলেও চলত। কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার সৃষ্টি হওয়ায় এখানে শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়ায় তাদের জন্য আলাদা সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে Day care centre, প্রধান হিতৈষী সংঘ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

খ. ধর্ম : কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক স্বীকৃত ধর্মীয় ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় তা বাস্তবায়িত হবে না। যেমন— বাংলাদেশে ৮৫% লোক মুসলমান। কাজেই শুক্রবারে সরকারি ছুটি বাতিলের সরকারি চিন্তাভাবনা কখনো বাস্তবায়িত হবে না।

গ. সামাজিক মূল্যবোধ : Social values হলো এমন একটি মানদণ্ড যা সমাজের অধিকাংশ লোকের আচরণকে ইতিবাচক দিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সমাজকে সকল আচার আচরণ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রচলিত আছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৪. প্রতিরক্ষা : একটি দেশের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার উপর সামাজিক নীতি নির্ভর করে। কোন দেশের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার হলে দেশে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করলে সেদেশের সম্পদ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় না করে তা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার জন্য নীতি প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হলে অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেদেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সেদেশকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রেখে নীতি প্রণয়ন করতে হয়। আমাদের দেশে সামরিক খাতে জাতীয় আয়ের ৬০% ব্যয় করা হয়, যেখানে চাকরিজীবীদের জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ১০%।

৫. আন্তর্জাতিক সাহায্য : তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দে[শে] সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্য গুরু[ত্বপূর্ণ] ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্পদের স্বল্পতার কারণে সামা[জিক] উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। উন্নয়নশীল দেশগুলো মূলত বৈদে[শিক] সাহায্য গ্রহণ করে তিনটি কারণে :

ক. অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন সাধন।

খ. বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বি[ভিন্ন] রাজনৈতিক দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক সা[হায্য] গ্রহণ করে থাকে।

গ. বিভিন্ন কারণ যেমন— প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে।

৬. আন্তর্জাতিক পরামর্শক : অনেক সময় দেশে নতুন [নীতি] প্রণয়ন করার সময় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানা[নো] হয়। তারা এসে সার্বিক দিক বিচারবিবেচনা করে দিকনির্দে[শনা] দিয়ে থাকেন। যেমন— ১৯৭২-৭৩ সালে যুদ্ধ পরবর্তী তৎকালী[ন] সরকার দেশে কি রকম সামাজিক নীতি দরকার সে ব্যাপা[রে] পরামর্শ দানের জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের আম[ন্ত্রণ] জানিয়েছিলেন। তখন তারা এসে UCD (Urb[an] Community Development) এবং Hospital Soci[al] Services ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ দেয়। কিন্তু ত[খন] দরকার ছিল দারিদ্র্য দূর করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

৭. সামাজিক পরিস্থিতি : নীতি প্রণয়নের সময় সামাজি[ক] পরিস্থিতি কেমন তা বুঝতে হবে। সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সামাজিক অবস্থার বিপ[রীতে] কোন নীতি প্রণয়ন করলে বাস্তবায়িত হবে না।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, একটি সুষ্ঠু ও ফলপ্র[সূ] সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদান গুরুত্ব[পূর্ণ] প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব উপাদানের সাথে সামঞ্জ[স্য] রেখেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়, অন্যথায় [তা] বাস্তবায়িত হবে না।

প্রশ্ন॥৮॥ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি প্রণয়নের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশে[র] সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বা পন্থা। সামাজিক নীতি[র] উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণসাধনের পথপ্রদর্শ[ক]। সত্যিকার অর্থে নীতিবহির্ভূত বিশ্ব ব্যবস্থা অকল্পনীয়। বর্তমা[নে] বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য

সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমেই একটি দেশের যে কোন কল্যাণকর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। নীতিবিহীন পরিকল্পনা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর এ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে প্রণীত হয়ে থাকে।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া : সামাজিক নীতি হচ্ছে সমাজের বৈধ ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের নীল নকশা। একটি বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে একটি সুষ্ঠু এবং কার্যকরী সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির সাথে সব রকম সামাজিক উপাদান ও রাজনৈতিক শক্তি জড়িত থাকে। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আইন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিচার বিভাগ প্রদত্ত রায়, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার ফলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, বিচার বিভাগের রায় প্রদান প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার আলোকেই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক নীতি প্রণয়নের অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণের মাধ্যমে সামাজিক নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। সমাজের যে কোন স্তরের জনসাধারণের কর্তৃক সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া অথবা নীতি প্রণয়নের অনুকূলে জনমত গড়ে উঠতে পারে। যুক্তিসংগত এবং বাস্তবভিত্তিক মতামত এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক নীতি গড়ে উঠে।

২. কার্যপ্রণালী নির্ধারণ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার পর নীতি তৈরির কার্যপ্রণালী স্থির করা হয়। কার্যপ্রণালী নির্ধারণে এসে সাধারণত সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়, যাতে বাস্তবভিত্তিক নীতি প্রণয়নের জন্য নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি খসড়া নীতি উপস্থাপন করা যায়।

৩. নীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের নীতি বিশ্লেষণ দক্ষতা দ্বারা বিকল্প নীতি, নির্দিষ্টকরণ, সেগুলোর সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা, বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণপূর্বক নীতির সবদিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করেই খসড়া সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য সামাজিক নীতির বিষয়াবলি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।

৪. খসড়া নীতি প্রণয়ন : সামাজিক নীতির বিষয়াবলি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার উপর ভিত্তি করে একটি খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত খসড়া নীতি প্রস্তাবাকারে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। নীতি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যাতে এ খসড়া নীতির পর্যালোচনা এবং যোগ্যতা দেখে প্রয়োজনমতো সংশোধন অথবা পরিবর্ধন করে অনুমোদন করতে পারে সেজন্য এতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫. খসড়া নীতি গ্রহণ ও বিধিবদ্ধকরণ : খসড়া নীতি প্রণয়ন করার পরবর্তী ধাপ হলো খসড়া নীতি গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর খসড়া নীতি অনুমোদন করা হলে তা গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধ করা হয়। খসড়া নীতি গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ পর্যায়ের কাজ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা উভয় প্রক্রিয়াতেই হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক নীতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আইন প্রণেতাদের সম্পৃক্ততায় হয়ে থাকে, আবার অনেক নীতি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গৃহীত এবং বিধিবদ্ধ করা হয়।

৬. বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি : সামাজিক নীতির খসড়া গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধকরণ ধাপের পরবর্তী ধাপ হলো গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। নীতি গ্রহণ অনুমোদন অথবা বিধিবদ্ধ হওয়ার পরই নীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হয়। এক্ষেত্রে নীতি বাস্তবায়নের পূর্বে নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ, কর্মকৌশল এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গৃহীত নীতিতে জনসমর্থন লাভ করার জন্য প্রচারণা, উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথাযথ সন্নিবেশিতকরণ, প্রশাসনিক আয়োজন নিশ্চিতকরণ এবং সম্পদ সংগ্রহ ও এর ব্যবহার করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়।

৭. বাস্তবায়ন : গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পরবর্তী ধাপ হলো নীতিটি বাস্তবায়ন করা। আর নীতির বাস্তবায়ন শুরু হয় নীতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। গৃহীত নীতির কার্যকারিতা আনয়ন, বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নের জন্য নীতির বাস্তবায়ন পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নীতি অধিকতর অর্থবহ এবং ফলদায়ক হয়। নীতির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নীতি গ্রহণের সার্থকতা অর্জিত হয়।

৮. মূল্যায়ন : সামাজিক নীতি প্রণয়নের সর্বশেষ ধাপের নাম হলো বাস্তবায়িত নীতির মূল্যায়ন। গৃহীত নীতি বাস্তবায়নকালে কি ধরনের ত্রুটি সীমাবদ্ধতায় তা অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠতে পারে নি অথবা কোন কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে নি প্রভৃতি বিষয় মূল্যায়ন করে নীতিকে অধিকতর বাস্তবোপযোগী এবং অর্থবহ করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয় এ মূল্যায়ন স্তরে। ফলে গৃহীত নীতির আশানুরূপ ফল লাভ সহজ হয় এবং পরবর্তীকালে অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য এবং ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, সামাজিক নীতি সমাজের দর্পণ। উল্লিখিত ধাপের আলোকেই একটি বাস্তব উপযোগী এবং ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়ন করা যায়। সামাজিক নীতিকে অধিক বাস্তবসম্মত ও কার্যকর করার জন্য 'Policy study' নামক একটি কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে নতুন কোন সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বা উন্নয়ন কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে তার উপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন করা হয়। এটাই সামাজিক নীতি প্রণয়নের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত।

প্রশ্ন।৮। সামাজিক নীতি কাকে বলে? বাংলাদেশে সামাজিক নীতির পরিধি আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি ব্যাখ্যা প্রদান কর। বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি প্রয়োগ করা হয়।

উত্তর। ভূমিকা : সামাজিক নীতি যে কোন সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নীতি যে কোন সমাজের সামাজিক সমস্যা ও অনাচার দূর করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত ও সমস্যাবহুল দেশ। এদেশের আর্থসামাজিক সমস্যা এত বেশি যে উপযুক্ত সামাজিক নীতি ছাড়া এসব সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যা দূর করতে না পারলে সমাজের মানুষের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োগক্ষেত্রও অনেক বেশি।

সামাজিক নীতি : সাধারণভাবে সামাজিক নীতি বলতে বুঝায়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যেসব নিয়মকানুন, প্রযুক্তি বা কৌশলকে দিকনির্দেশক বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নীতি বা Social policy বলা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নীতিকে তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সামাজিক নীতির কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

T. H. Marshal তাঁর 'Social Policy' নামক গ্রন্থে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, সামাজিক নীতি সত্যিকার অর্থে অর্থবোধক প্রয়োগযোগ্য ধারণা নয়। সামাজিক নীতি ধারণাটি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার সমষ্টি যা নাগরিকদের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কল্যাণ নিশ্চিত করে।

প্রখ্যাত অধ্যাপক টিটমাস এর মতে, "জনগণের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত নীতিকে সামাজিক নীতি বলে।" (Social policy is a collective strategy to address social problem.)

সমাজকর্ম বিশ্বকোষে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "সামাজিক নীতি হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ যা নাগরিকদের ন্যূনতম জীবনমান উন্নয়ন; যেমন- সামাজিক বীমা, সরকারি সাহায্য, স্বাস্থ্য, মানসিক যত্ন, শিক্ষা, গৃহায়ন ও ব্যক্তিগত সেবার ব্যবস্থা করে।"

অধ্যাপক ব্রেক তাঁর 'Social Administration & the Citizen' গ্রন্থে সামাজিক নীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, "যেসব নীতি জনকল্যাণের পথ নির্দেশ করে তাকে সামাজিক নীতি বলা হয়।"

বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োগক্ষেত্র : বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা অনেক বেশি। তাই এদেশে সামাজিক নীতির পরিধি বা প্রয়োগক্ষেত্রও অনেক বেশি। নিম্নে বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োগক্ষেত্র আলোচনা করা হলো :

১. শিক্ষা : বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হলো শিক্ষা। এদেশে বিভিন্ন রকমের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। যেমন- প্রাথমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, বেসরকারি শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি। তাছাড়াও এদেশে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। ফলে কোন সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন সম্ভব হচ্ছে না। সমন্বয়ের এবং আধুনিক শিক্ষার অভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। তাই উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত এ অস্থিরতা দূর করা সম্ভব।

২. স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তেমন কোন নীতিমালা না থাকার কারণে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন। এছাড়াও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় অনেক বেশি যা সাধারণ মানুষ বহন করতে পারে না। তাই বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি প্রয়োগ করে এ অস্থিরতা দূর করা যাবে।

৩. কর্মসংস্থান : বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু দেশে শিল্পায়নের অভাবে কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকার কোন নীতিমালাও গ্রহণ করে নি। ফলে এদেশে বেকারত্ব এমনকি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি প্রয়োগ করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। তাহলে দেশের বেকারত্ব কমবে এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে।

৪. গৃহায়ন : বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। কিন্তু বাংলাদেশে এ চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে না নীতিমালার অভাবে। প্রতি বছর বাংলাদেশে ৬ লক্ষ নতুন গৃহের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ৬ লক্ষ গৃহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। গৃহায়ন ক্ষেত্রেও সামাজিক নীতিমালা প্রয়োগ করে গৃহায়ন সমস্যা সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব।

৫. সমাজকল্যাণ : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও সামাজিক নীতি প্রয়োগ করা যায়। সামাজিক নীতির অভাবে এদেশে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উপযুক্ত সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, প্রবীণ কল্যাণ, নারী কল্যাণ করা সম্ভব।

৬. সামাজিক আইন : বাংলাদেশের সমাজে অনেক সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় শ্রেণী রয়েছে। যেমন– বৃদ্ধ, দুস্থ, ভিক্ষুক, এতিম, বিধবা ইত্যাদি। এসব বিশেষ শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্য বিশেষ সামাজিক নীতি প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের কোন নীতিমালা নেই। যার কারণে এ ধরনের বিশেষ শ্রেণী সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সামাজিক নীতির মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণীর জন্য নতুন নতুন সামাজিক আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৭. দারিদ্র্য দূরীকরণ : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু কৃষিব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। ফলে এদেশের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র। এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ৪৮২ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সরকারের নীতিমালার অভাব রয়েছে। তাই আমি মনে করি সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

৮. অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধন : বাংলাদেশে আর্থসামাজিক সমস্যা এত জটিল যে, বাংলাদেশে অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। বিশেষ করে সহিংস অপরাধ ও কিশোর অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে। শুধু শাস্তিদানের মাধ্যমে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। উপযুক্ত সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধন করা সম্ভব।

৯. সামাজিক বীমা : সামাজিক বীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক বীমার ক্ষেত্র খুব সীমিত। এক্ষেত্রে সরকারের কোন নীতিমালা নেই। আমি মনে করি, সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে সামাজিক বীমা পরিপূর্ণভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব। এর ফলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণে দেশের দুর্যোগকালীন কাউকে বেশি সহায়তা দেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়া হয় না। সামাজিক নীতিমালা প্রণয়ন করে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা সম্ভব।

১১. সম্পদের সুষম বণ্টন : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সম্পদের অসম বণ্টন। এদেশের মোট সম্পদের শতকরা ৯০ ভাগ রয়েছে মাত্র ১০ ভাগ লোকের হাতে। অন্যদিকে, বাকি ৯০ ভাগ লোকের হাতে রয়েছে মাত্র ১০ ভাগ সম্পদ। ফলে দেশে সম্পদ বণ্টনে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ভূমিহীনের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সরকারি সাহায্য : বাংলাদেশে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কিন্তু কোন নীতিমালা না থাকার কারণে দেশের সব মানুষ সরকারি সাহায্য পায় না। অথচ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে সরকারি সাহায্য সঠিকভাবে বণ্টন করা সম্ভব।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক নীতি প্রয়োগ করা যায়। বাংলাদেশে আর্থসামাজিক সমস্যা অনেক বেশি। এসব সমস্যা সমাধান করতে হলে কার্যকর সামাজিক নীতি প্রয়োজন। তাই আমি মনে করি, এদেশে সামাজিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেক বেশি।

প্রশ্ন॥১০॥ বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : কোন সমাজে যেসব সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কার প্রচলিত থাকে তা দূর করার জন্য যে নীতি প্রণয়ন করা হয় তাকে সামাজিক নীতি বলে। অর্থাৎ সমাজের সকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সমাজের মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্যই সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতি যে কোন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অনেক সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধান করতে হলে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সামাজিক নীতি ছাড়া বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যার সমাধান না করলে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

বাংলাদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. সামাজিক সমস্যা সমাধান : প্রত্যেক সমাজেই সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। সামাজিক সমস্যা সমাজ উন্নয়নের অন্তরায়। বাংলাদেশে অনেক সামাজিক সমস্যা রয়েছে। যেমন– জনসংখ্যা, দারিদ্র্যতা, অজ্ঞতা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারীনির্যাতন ইত্যাদি। সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যেমন– ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। এজন্য বলা হয়, "A collective strategy to address social problems."

২. ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন : সব সমাজেরই লক্ষ্য হলো সামাজিক পরিবর্তন। সমাজ সবসময় পরিবর্তনশীল। কিন্তু ইতিবাচক পরিবর্তন সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। সামাজিক নীতি সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাংলাদেশের সমাজের ইতিবাচক ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনার জন্য সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন : বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক নীতির অভাবের কারণে বাংলাদেশে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া যে কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। উপযুক্ত সামাজিক নীতিই বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন– শিক্ষানীতির মাধ্যমে এদেশের জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

৪. সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টন : সামাজিক নীতি সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের মোট সম্পদের ৯০ ভাগ রয়েছে মাত্র ১০ ভাগ ধনী শ্রেণীর হাতে। আবার মাত্র ১০ ভাগ সম্পদ রয়েছে বাকি ৯০ ভাগ দরিদ্র লোকের হাতে। ফলে এদেশে সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টন সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টনের জন্য সামাজিক নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক নীতি ছাড়া সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব নয়। আর সম্পদের সুষম বণ্টন না হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না।

৫. সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার : বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ। এদেশের সম্পদের চাহিদা ব্যাপক, কিন্তু সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার না করার কারণে সম্পদ অপচয় হচ্ছে। সম্পদ অপচয়ের প্রধান কারণ নীতিমালা না থাকা। তাই বাংলাদেশের সীমিত সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৬. দারিদ্র্য দূরীকরণ : বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের বেশিরভাগ মানুষের আয় অত্যন্ত সীমিত এবং সে কারণে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। কিন্তু উপযুক্ত নীতিমালার অভাবে এদেশের দারিদ্র্য মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি উপযুক্ত সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় তাহলে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে। তাই বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রেও সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

৭. সুশৃঙ্খল সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা : সুশৃঙ্খল সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক সম্পর্ক তেমন জোরালো নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কের শিথিলতার জন্য আমাদের দেশে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে সুশৃঙ্খল সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

৮. সমন্বয়সাধন : বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ২৮,০০০ এনজিও রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবে সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের মধ্যে কোন সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। সমন্বয়ের অভাবে দেশের সার্বিক উন্নতিও হচ্ছে না। তাই সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যও বাংলাদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

৯. পরিকল্পনা প্রণয়ন : যে কোন দেশের উন্নয়নের জ পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের উন্নয়নে জন্যও পরিকল্পনা খুবই দরকারি। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণীত হ সামাজিক নীতির আলোকে। সামাজিক নীতি ছাড়া সুষ্ঠু পরিকল্প প্রণয়ন সম্ভব নয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যই বাংলাদেশে সামাজিক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : সামাজিক নিরাপত্তার জ সামাজিক নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সামাজি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন একটা নেই। এ কারণে বাংলাদেশে অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণী বিশেষ প্রয়োজনে সামাজি নিরাপত্তা পায় না। যদি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হয়, তাহ সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা সম্ভব।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে সামাজিক নীতি হলো এমন একটি নির্দেশনা যার দ্বারা কো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনে আর্থসামাজিক সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সঠিকভা সমাধানের মাধ্যমে দেশের মানুষের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব। তা একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, বাংলাদেশে সামাজিক নীতি গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক।

প্রশ্ন॥১১॥ সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি কাকে বলে? সামাজিক নীতি বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। সামাজিক নীতি বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করে দেখাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : নীতি মানে কোনো কাজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর দিক নির্দেশনা। সমাজ ও মানুষের সমস্যা নিয়ে গৃহীত নীতি হলো সামাজিক নীতি। সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশে সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সামাজিক নীতি : সাধারণ অর্থে, সামাজিক নীতি বলতে সামাজিক সমস্যা ও মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লি বিষয়াবলিকে বুঝায়। এটি এক প্রকার কর্মসূচি, যা কোনো সং বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পিত উপায়ে সম্পন্ন হয়। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক নীতি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা সামাজিক নীতির ধারণা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

The Social Work Dictionary তে সামাজিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সামাজিক নীতি হলো কোনো সমাজের ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে পথনির্দেশ দানকারী কার্যক্রম ও বিধিবিধান, যা সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি।"

Encyclopedia of Social Work in India তে বলা হয়েছে, "সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় সামাজিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ ও তার বিনিয়োগের প্রকৃতি বা ধরন নির্ধারণের জন্য।"

T. H. Marshall এর মতে, "এটা সরকারি নীতির যেসব কার্যক্রমকে বোঝায় যার জনগণের কল্যাণের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান এবং যা তাদের সেবা ও আয়ের ব্যবস্থা করে।"

সামাজিক নীতির বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইংরেজ সামাজিক নীতিবিদ **রিচার্ড টিটমাস** তিনি বলেন, "সামাজিক নীতি সমস্যা মোকাবিলার সমষ্টিগত বা যৌথ কৌশল হলো সামাজিক নীতি।"

সমাজবিজ্ঞানী **স্ল্যাক** বলেছেন, "শুধু সামাজিক দিক দিয়ে ব্যাপৃত হলেই তাকে সামাজিক নীতি বলা যায় না, যেসব নীতি জনকল্যাণের পথ নির্দেশ করে কেবল সেগুলোকেই সামাজিক নীতি বলা যেতে পারে।"

Bruce S.Jansson এর মতে, "সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার যৌথ প্রয়াস হলো সামাজিক নীতি।"

আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির ভাষায় "সামাজিক নীতি হলো আইন, প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং এজেন্সির বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেসব মূলনীতি, কার্যপ্রণালি ও কর্মসম্পাদনের উপায়, যেগুলো মানুষের কল্যাণকে প্রভাবিত করে।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি একটি কর্মসূচি, নিয়মনীতি বা আদর্শ স্বরূপ। যা জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করা ও বাস্তবায়ন করার কর্মপদ্ধতি।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ : সামাজিক নীতির সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। যাতে সমাজ তথা মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ প্রদর্শক : সামাজিক নীতি সবসময় সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অর্থাৎ এটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত। এটি সামাজিক নীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. উত্তম কর্মপন্থা নির্ধারণ : আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি অনেকগুলো বিকল্প কর্মপন্থা থেকে কোনটি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। ফলে উত্তম কর্মপন্থা গ্রহণ করার সুযোগ পাওয়া যায় কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়।

৩. কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক পরিবর্তন : কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে সামাজিক নীতি। সামাজিক নীতি মানুষের জন্য ইতিবাচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন চায়। এর ফলে সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

৪. সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি : সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য অনেক সময় আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। সামাজিক নীতি এ জন্যই সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে। এর ফলে সামাজিক সমস্যাও সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয়।

৫. জীবনমান উন্নয়ন : সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক নীতি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ সামাজিক নীতি সবসময় সামাজিক সমস্যা দূর করতে বদ্ধপরিকর। এর ফলে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হয় এবং সামাজিক বাধাও হ্রাস পায়।

৬. উন্নয়নের মাইলফলক : সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়নের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এটি জনগণের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ফলে সামাজিক উন্নতি দ্রুত হয়।

৭. লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন : সামাজিক নীতি এমন ভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়। এজন্য সামাজিক নীতি সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং তথ্য প্রদানেও সহায়তা করে থাকে। এটি তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৮. গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা : সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটির গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। অর্থাৎ সবসময় সামাজিক নীতি একরকম থাকে না। পরিস্থিতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতির ও পরিবর্তন হয়।

৯. সামাজিক নীতি একটি সরকারি ব্যবস্থা : সামাজিক নীতি সরকারি ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ একটি দেশের সামাজিক নীতি প্রণয়ন হয় সে দেশের সরকারের ব্যবস্থাধীনে। এর ফলে সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। এর মাধ্যমে জনগণের উন্নয়ন সাধিত হয়।

১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা : সুষ্ঠ নীতি সুষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করা সামাজিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়।

১১. জনকল্যাণ সাধন : সামাজিক নীতি প্রণয়নের মূলে রয়েছে জনকল্যাণ সাধন করা। সামাজিক নীতির বাস্তবায়নের ফলে মানবিক চাহিদা পূরণ হয় এবং সামাজিক সমস্যাদির সমাধান হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ফলপ্রসূ হয়।

১২. সুস্পষ্ট ও সহজ সরল : সুস্পষ্ট, বোধগম্য ও সহজ সরল হওয়া সামাজিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ নীতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হলেও সকলের সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়িত হয়। সরকার সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ধারক ও বাহক।

১৩. যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত : সামাজিক নীতি হবে যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত। এটি সৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত হবে। অর্থাৎ সামাজিক নীতি হবে ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত।

১৪. সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা : সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে স্থিরতা ফিরে আসে। সমতা বজায় থাকে। নমনীয়তা ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এর ফলে সমাজে পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিক থাকে।

১৫. প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ : সামাজিক নীতি সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে বাস্তবায়িত হয়। এতে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় য, উপর্যুক্ত দিকগুলো থাকলেই তাকে সামাজিক নীতি বলা যাবে। এসব বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করেই সামাজিক নীতি প্রণীত হয়। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় নীতির। এটি সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন॥১২॥ সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতির মডেলগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও? সামাজিক নীতির মডেলসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি কাকে বলে? সামাজিক নীতির মডেলগুলো ব্যাখ্যা করে দেখাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : নীতি মানে কাজের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য একটি দিকনির্দেশনা। সমাজ ও মানুষের সমস্যা নিয়ে গৃহীত নীতি হলো সামাজিক নীতি। সামাজিক নীতি হলো একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সামাজিক নীতি : সাধারণ অর্থে, সামাজিক নীতি বলতে সামাজিক সমস্যা ও মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে বোঝায়। এটি একপ্রকার কর্মসূচি যা কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পিত উপায়ে সম্পন্ন হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, বিশ্লেষক, বিশেষজ্ঞরা সামাজিক নীতির ধারণা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

'The Social Work Dictionary' তে সামাজিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সামাজিক নীতি হলো কোনো সমাজের ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে পথনির্দেশ দানকারী কার্যক্রম ও বিধি-বিধান, যা সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি।

Encyclopedia of Social Work in India তে বলা হয়েছে, সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় সামাজিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সম্পদ সংগ্রহ ও তার বিনিয়োগের প্রকৃতি বা ধরন নির্ধারণের জন্য।

T. H. Marshall এর মতে, এটা সরকারি নীতির সেসব কার্যক্রমকে বুঝায় যা জনগণের কল্যাণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান এবং যা তাদের সেবা ও আয়ের ব্যবস্থা করে।

সামাজিক নীতির ব্যবহারিক দিকের প্রথম প্রবক্তা ইংরেজ সামাজিক নীতিবিদ রিচার্ড টিটমাস। তিনি বলেন, "সামাজিক নীতি সমস্যা মোকাবিলায় সর্বাত্মক বা মৌল কৌশল হলো সামাজিক নীতি।

Bruce S. Jansson এর মতে, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার যৌথ প্রয়াস হলো সামাজিক নীতি।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক বলেছেন, "শুধু সামাজিক দিক দিয়ে ব্যাপৃত হলেই তাকে সামাজিক নীতি বলা যায় না, বরং যেসব নীতি জনকল্যাণের পথনির্দেশ করে কেবল সেগুলোকেই সামাজিক নীতি বলা যেতে পারে।"

আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির ভাষায়, সামাজিক নীতি হলো আইন, প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং এজেন্সির বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেসব মূলনীতি, কার্যপ্রণালি ও কর্মসম্পাদনের উপায়, যেগুলো মানুষের কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সমন্বিত কৌশল ও পদক্ষেপই হলো সামাজিক নীতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি একটি কার্যকর নিয়ম নীতি বা আদর্শস্বরূপ। যা জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করে ও বাস্তবায়ন করার কর্মপদ্ধতি।

• **সামাজিক নীতির মডেল :** সামাজিক নীতির মডেল মূলত সামাজিক নীতির মানদণ্ড স্বরূপ। সামাজিক নীতির মডেল হচ্ছে এমন একগুচ্ছ ধারণা যা সামাজিক নীতির সারবস্তু ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিনিধিত্ব ও সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করে। মডেলসমূহ নীতির মধ্যে ব্যবহৃত যুক্তিসম্মত ও মূল ধারণাগুলোকে পরিস্ফুটন করে। সুতরাং সামাজিক নীতির মডেলগুলো সামাজিক নীতিকে চিত্রায়িত ও সাধারণীকরণ করে।

সামাজিক নীতি বিশেষজ্ঞ Richard M. Titmuss ৩ ধরনের মডেলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। যথা–

১. সামাজিক নীতির অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত মডেল।

২. সামাজিক নীতির শিল্পায়িত অর্জন সম্পাদন মডেল।

৩. সামাজিক নীতির প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস মডেল।

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক নীতির উদ্বৃত্ত মডেল : "উদ্বৃত্ত সামাজিক নীতি মডেল" প্রথমত ব্যক্তিমুখী মডেল। এতে অনুমান করা হয় যে অধিকাংশ মানুষ কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক সেবা ব্যক্তিগত বাজার থেকে ক্রয় করে এবং পরিবার থেকে সাহায্য ও সেবা যত্ন

থাকে। স্বল্পমেয়াদি ও সাময়িক এ মডেল ব্যক্তি স্বাধীনতা বা অর্থনীতির অবাধ নীতিতে বিশ্বাসী উদ্বৃত্ত সামাজিক নীতি মডেলের দুটি দার্শনিক ভিত্তি অর্থাৎ ব্যক্তির চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের দুটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান উৎস হচ্ছে পরিবার ও ব্যক্তিগত বাজার।

২. সামাজিক নীতির শিল্পায়িত অর্জন সম্পাদন মডেল : অর্জন সম্পাদন মডেলের মূলভিত্তি হচ্ছে মানুষ নিজস্ব যোগ্যতা, দক্ষতা, কার্যসম্পাদনের কৃতিত্ব ও উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এ মডেলটির পূর্বানুমান হচ্ছে– "কৃতিত্ব পূর্ণ কাজ ও উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে সামাজিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ হবে।" এটি মনোবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, প্রেষণা প্রভৃতি ধারণা ভিত্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। আর এগুলোর ভিত্তিতেই সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে গুরুত্বারোপিত হয়েছে।

৩. সামাজিক নীতির প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস মডেল : সামাজিক নীতির প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস মডেল হচ্ছে এমন এক মডেল যেখানে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয় অন্যতম প্রদান সমন্বিত প্রতিষ্ঠান রূপে। আলোচ্য মডেলটির মূলনীতি হচ্ছে নৈতিকতা ও সামাজিক সাম্য। এটি সামাজিক পরিবর্তনের বহুমুখী প্রভাব সংক্রান্ত তত্ত্ব, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয়েছে।

সামাজিক নীতি প্রণয়নে **ডব্লিউ. জি. ব্রুয়েগমান** তার The practice of Macro Social Work গ্রন্থে ৭টি মডেলের কথা উল্লেখ করেন। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

১. এলিট মডেল : এই মডেলটি সমাজের অভিজাত শ্রেণিকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। এলিট বলতে সমাজের ক্ষমতাধরদের বোঝানো হয়। যখন কোন নীতি প্রণয়নে ও উন্নয়নে অভিজাত শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে তখন তাকে এলিট মডেল বলে। এ মডেলের মূলবক্তব্য হলো সব সরকারি প্রতিষ্ঠান অভিজাত শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত হবে। সমাজে কোনো নীতি গ্রহণে এলিটদের ভূমিকা থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, যা কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর তা দেশের জনগণের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনবে। এক্ষেত্রে এলিট শ্রেণি সবধরনের মত বিরোধের উর্ধ্বে থেকে কাজ করে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক মডেল : এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণেতারা নীতিমালা তৈরির কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কর্তৃপক্ষদের মতামতের ভিত্তিতে দেশের প্রয়োজনে নীতি প্রবর্তন করা হয়। থমাস ডাই এ নীতির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যেমন–

ক. সরকারই নীতি প্রয়োগকারী,

খ. জনগণের জন্য নীতি গ্রহণের ক্ষমতা এবং

গ. জনগণের জন্য নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানের।

৩. স্বার্থকেন্দ্রিক দল মডেল : যে কোনো দেশেই বিভিন্ন ধরনের স্বার্থকেন্দ্রিক দল থাকে। এসব দলের সাথে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য আনয়নে অনেক সময় সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিভক্ত করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এ মডেল অনুসারে আইনগত প্রক্রিয়ায় নীতিকে সরকারিভাবে বৈধ করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানকেই স্বার্থকেন্দ্রিক দলের স্বাধীনতার বিষয়টি দেখতে হয়। এ ধরনের স্বাধীনতার মধ্যেই নীতিমালা তৈরি বা গ্রহণ করা হয়। সরকার ও স্বার্থকেন্দ্রিক দলের মধ্যকার ক্ষমতার পারস্পরিক ভারসাম্যতায় নীতি প্রণীত হলে তা হয় আদর্শ নীতি।

৪. যুক্তিবাদী অভিনেতা মডেল : যখন কোনো সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত উপায় অনুসরণ করা হয় তখন তাকে যুক্তিবাদী অভিনেতা মডেল বলা হয়। যৌক্তিক নীতি প্রক্রিয়া ৫টি ধারাবাহিক তৎপরতায় নির্ধারিত হয়।

ক. সমস্যা নির্বাচন,

খ. লক্ষ্য ব্যাখ্যাকরণ ও ক্রমবিন্যাস,

গ. লক্ষ্য অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংগ্রহ,

ঘ. জটিলতা নির্ধারণ এবং

ঙ. সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিকল্প নির্বাচন।

৫. প্রশাসনিক অভিনেতা মডেল : প্রশাসনিক অভিনেতা মডেল নীতি প্রণয়নের একটি আদর্শ মডেল। সাধারণত আইন প্রণয়নকারীরা নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। আর এসব নীতি বাস্তবায়নে সাহায্য করে থাকে সরকারি সংগঠন সংস্থার কর্মীরা। বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয় সরকারি সংগঠন কর্তৃক সেগুলোর সমাধান পূর্বক সেবা সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে। এ মডেলের সুবিধা হলো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে সরকারি কর্তৃপক্ষরা জড়িত থাকার কারণে আমলাদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে।

৬. দরকষাকষি মডেল ও সমঝোতা মডেল : বিভিন্ন দল ও সংস্থার মাঝে দরকষাকষি, মতামত গ্রহণ ও সমঝোতার মাধ্যমে নীতি তৈরি হলো এ মডেলের বিশেষত্ব। এক্ষেত্রে সংস্থার স্বার্থ ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে দরকষাকষির ভিত্তিতে নীতি প্রণীত হয়। দরকষাকষি ও সমঝোতার ভিত্তিতে আদর্শ কল্যাণধর্মী ও বাস্তবায়ন যোগ্য নীতি প্রণীত হয়ে থাকে।

৭. ব্যবস্থা মডেল : ব্যবস্থা মডেল একটি ব্যাপক ও সহজলভ্য নীতি। এতে বিভিন্ন মডেল আওতাভুক্ত থাকে। এ মডেল অনুযায়ী নীতি প্রক্রিয়াকে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। এখানে নীতি প্রণয়নের সময় আইন প্রণেতা, প্রশাসনিক সংস্থা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থকেন্দ্রিক দল ও সাধারণ নাগরিক ভূমিকা রাখে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতির মডেলগুলো পর্যালোচনা করে এ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, এগুলোর মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মডেল হলো "উদ্বৃত্ত নীতি মডেল"। কারণ এতে ব্যক্তির স্বাবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। যা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। সামাজিক নীতির এ মডেলের অনুশীলন সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ১৩। সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি কাকে বলে? সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : নীতি মানে কোনো কাজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি দিকনির্দেশনা। সমাজ ও মানুষের সমস্যা নিয়ে গৃহীত নীতি হলো সামাজিক নীতি। সামাজিক নীতি হলো একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সামাজিক নীতি : সাধারণ অর্থে, সামাজিক নীতি বলতে সামাজিক সমস্যা ও মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে বোঝায়। এটি একপ্রকার কর্মসূচি। যা কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পিত উপায়ে সম্পন্ন হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, বিশ্লেষক, বিশেষজ্ঞরা সামাজিক নীতির ধারণা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

'The Social Work Dictionary' তে সামাজিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সামাজিক নীতি হলো কোনো সমাজের ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে পথনির্দেশ দানকারী কার্যক্রম ও বিধি-বিধান, যা সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি।

Encyclopedia of Social Work in India তে বলা হয়েছে, সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় সামাজিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ ও তার বিনিয়োগের প্রকৃতি বা ধরন নির্ধারণের জন্য।

T. H. Marshall-এর মতে, এটা সরকারি নীতির সেই কার্যক্রমকে বুঝায় যার জনগণের কল্যাণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান এবং যা তাদের সেবা ও আয়ের ব্যবস্থা করে।

সামাজিক নীতির বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইংরেজ সামাজিক নীতিবিদ রিচার্ড টিটমাস।

তিনি বলেন, "সামাজিক নীতি সমস্যা মোকাবিলায় সমষ্টিগত বা যৌথ কৌশল হলো সামাজিক নীতি।

Bruce S. Jansson এর মতে, সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার যৌথ প্রয়াস হলো সামাজিক নীতি।

সমাজবিজ্ঞানী স্ল্যাক বলেছেন, "শুধু সামাজিক দিক দিয়ে ব্যাপৃত হলেই তাকে সামাজিক নীতি বলে না, বরং যেসব নীতি জনকল্যাণের পথনির্দেশ করে কেবল সেগুলোকেই সামাজিক নীতি বলা যেতে পারে।"

আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির ভাষায়, সামাজিক নীতি হলো আইন, প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং এজেন্সির বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেসব মূলনীতি, কার্যপ্রণালি ও কর্মসম্পাদনের উপায়, যেগুলো মানুষের কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সমষ্টিগত কৌশল বা পদক্ষেপই হলো সামাজিক নীতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি একটি কর্মসূচি, নিয়মনীতি বা আদর্শস্বরূপ। যা জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করা ও বাস্তবায়ন করার কর্মপদ্ধতি।

সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ : সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. অর্থনৈতিক উপাদান : সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক উপাদান। অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন– ভোগ, বিনিময়, সঞ্চয়, উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি সামাজিক নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে। তবে একেক ধরনের অর্থব্যবস্থায় একেক রকম নীতির ব্যবহার প্রয়োজন হয়। তাই উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নীতি তৈরিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, ধনী ও দরিদ্র দেশের সামাজিক নীতি একরকম হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকায় এসব ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত সামাজিক নীতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

২. রাজনৈতিক উপাদান : একটি দেশের সামাজিক নীতি অনেকাংশেই রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কারণ দেশের রাজনৈতিক দল ও তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ সামাজিক নীতির নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। প্রশাসনের সাথে রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক সামাজিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩. সাংস্কৃতিক উপাদান : দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিমাপ করা যায়। সাংস্কৃতিক অবস্থা বলতে ভাষা, সাহিত্য, আদর্শ, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংগীতকে বুঝায়। সামাজিক নীতি গ্রহণে এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের উপস্থিতি অপরিহার্য।

৪. পরিবার : মানুষরা পরিবার এ বাস করে। এখান থেকেই অধিকার ভোগ করে এবং পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্বও পালন করে। পরিবার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সামাজিক নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক ও ভূমিকায় কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়।

৫. ঐতিহ্য ও পরিবর্তন : ঐতিহ্য ও পরিবর্তন সামাজিক নীতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাস ঐতিহ্যের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনাও চলে আসে। মানুষ দুটি ধারণাকেই ধরে রাখতে চায়। ফলে সামাজিক নীতি, ঐতিহ্য ও পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই প্রণয়ন করতে হয়।

৬. **অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি :** প্রতিটি সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান রয়েছে। মানুষও এগুলো পালন করে থাকে। ঈদ, নবান্ন, বিয়ে অনুষ্ঠান, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মেলা, যাত্রা প্রভৃতি। সামাজিক নীতির উপর এগুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে।

৭. **আন্তর্জাতিক সাহায্য :** পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আন্তর্জাতিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সাহায্যের ধরন বা পরিমাপের উপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন করতে হয় বিধায় এটি সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অনেক সময় সাহায্যকারী দেশই বলে দেয় নীতির ধরন কেমন হবে।

৮. **জাতীয় প্রতিরক্ষা :** এটি সামাজিক নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। দেশের জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়। প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে এ ব্যয় কম হয়। কিন্তু সম্পর্কের অবনতি ঘটলে জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ এতে ব্যয় করতে হয়। এজন্যই জাতীয় প্রতিরক্ষা সামাজিক নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

৯. **ভৌগোলিক অবস্থা :** দেশের আর্থসামাজিক নীতির উপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থা ভালো থাকলে দেশ বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়। কিন্তু প্রতিকূল থাকলে পুনর্গঠন কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে সামাজিক নীতি ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করতে হয়।

১০. **সামাজিক আইন :** দেশের প্রচলিত সামাজিক আইন সামাজিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সামাজিক আইন নির্ধারণ করে দেয় সামাজিক নীতির ধরন কেমন হবে। কিন্তু আইনের পরিবর্তন করলে নীতির পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক সময় নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়েও সামাজিক আইনের দরকার হয়।

১১. **আন্তর্জাতিক পরামর্শক :** আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক দ্বারা দেশের সামাজিক নীতি প্রভাবিত হয়। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞের বড়ই অভাব রয়েছে। ফলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দান করতে হয়। অনেক সময় দাতাদেরও এসব বিষয়ে চাপ থাকে। নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শ সামাজিক নীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

১২. **সাহায্যদাতাদের স্বার্থ :** দাতাদের সাহায্য বা অনুদান দেয়ার পিছনে থাকে স্বার্থ। তাছাড়া আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অনেক সময় স্বার্থ ব্যতীত সাহায্য দেয়াও সম্ভব হয়ে উঠে না। সাহায্য দেয়া হয় অর্থ, ঋণ বা প্রযুক্তির মাধ্যমে। স্বার্থের মধ্যে রয়েছে পণ্যের বাজার তৈরি বা সুসম্পর্ক স্থাপন। দেশের সামাজিক নীতিতে এসব সাহায্য প্রভাব বিস্তার করে।

১৩. **সেবাগ্রহীতাদের স্বার্থ :** যাদের জন্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নীতি প্রণয়ন করতে হয়। অর্থাৎ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সামাজিক নীতিতে থাকতে হবে। যেসব নীতি লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে তাকায় না সেসব নীতি বাস্তবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে সামাজিক নীতিতে দেশের মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

১৪. **অভিজাত শ্রেণি :** সামাজিক নীতি প্রণয়নে দেশের অভিজাত শ্রেণিরও প্রভাব রয়েছে। কেননা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ধরন অভিজাত শ্রেণির সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গঠিত হতে পারে। এছাড়া ঔপনিবেশিক দেশের নির্ভরযোগ্য সমর্থক হতে পারে অভিজাত শ্রেণি।

১৫. **সামাজিক পরিস্থিতি :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন কালে দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে বিচারবিশ্লেষণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যৌতুক প্রথা নিরোধ করতে হলে দেশের সামাজিক পরিস্থিতি অবগত হওয়ার মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষিত বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, এগুলো ছাড়াও আরো কিছু উপাদান সামাজিক নীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলো হলো– জনমত, ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপাদান প্রভৃতি। এসব উপাদানের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করলে তা হবে বাস্তবসম্মত। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য সঠিক ও গ্রহণযোগ্য সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

প্রশ্ন।১৪। সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : নীতি মানে কোনো কাজের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য একটি দিকনির্দেশনা। সমাজ ও মানুষের সমস্যা নিয়ে গৃহীত নীতি-হলো সামাজিক নীতি। সামাজিক নীতি বৃহত্তর পরিধির একটি অংশ হচ্ছে সমাজকল্যাণ নীতি। উভয়ই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় হচ্ছে সামাজিক নীতি। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির সম্পর্ক : সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং একই লক্ষ্য নিয়ে গঠিত। সামাজিক নীতি হলো সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সামাজিক নীতি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নিম্নে সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

১. অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধান করে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজকল্যাণ নীতিরও লক্ষ্য হলো অনগ্রসর মানুষের সুবিধাদি প্রদান করে তাদের স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা। তাই লক্ষ্যগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে।

২. পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা : সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্থাৎ পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। ঠিক তেমনি সমাজকল্যাণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা ছাড়া নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৩. জনঅংশগ্রহণ : মানুষের অনুভূত চাহিদার প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। আর তাই সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ অপরিহার্য। সমাজের মানুষের জন্য মূলত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গৃহীত হয়। তাই এতেও জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন : সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতি উভয়েরই মূল লক্ষ্য হলো সমাজের তথা মানুষের কল্যাণ করা। দক্ষ মানবসম্পদ দ্বারাই অন্যান্য বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। তাই এদের উভয়ের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে সম্পদে পরিণত করা।

৫. সমাজকল্যাণ নীতি সামাজিক নীতির পরিধিভুক্ত : সামাজিক নীতির বৃহত্তর পরিধির মধ্যে সমাজকল্যাণ নীতির কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালিত হয়। কেননা সামাজিক নীতির কল্যাণমূলক দিকটি সমাজকল্যাণ নীতির পরিচয় বহন করে। সামাজিক নীতির মধ্যে সমাজকল্যাণ নীতির পন্থা বা পদ্ধতি এবং বাস্তবায়ন কৌশল সবকিছুই লিপিবদ্ধ থাকে।

৬. সমাজকল্যাণ নীতি সামাজিক নীতির বিকাশে সহায়ক : সমাজকল্যাণ নীতি সামাজিক নীতির পূর্ণতায় সহায়তা করে। আবার সামাজিক নীতিতে সমাজকল্যাণ নীতির বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এভাবে সামাজিক নীতির বিকাশে সমাজকল্যাণ নীতি সহায়তা করে।

৭. একে অপরের উপর নির্ভরশীল : সমাজকল্যাণ নীতি ব্যতীত সামাজিক নীতির পূর্ণতা আনয়ন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, সামাজিক নীতি ব্যতীত সমাজকল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। এভাবে উভয়ে একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

৮. মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নে : সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতি সমাজের দুর্বল, অনগ্রসর ও অবহেলিত অংশের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এদের মৌল চাহিদা পূরণ, বঞ্চনা ও অসুবিধা দূরীকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণে উভয় নীতি তৎপর। সমাজকল্যাণ নীতি এদের জন্য সক্ষমকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

৯. সামাজিক অবদানের ক্ষেত্রে : সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অসাম্য দূরীকরণ বা সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উন্নয়নে ভারসাম্য বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে সমাজকল্যাণ নীতিও এসবক্ষেত্রে অবদান রাখে। সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক অবদান রক্ষার ক্ষেত্রে উভয়েরই ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১০. সম্পদের সদ্ব্যবহার : অসীম সমস্যাসমূহ রোধে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতি উভয়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সমাজকল্যাণ নীতি সামাজিক উন্নয়ন সাধন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক নীতির সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করে। ফলে সম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ নীতি বৃহত্তর সামাজিক নীতির সমাজকল্যাণমূলক সেবাসমূহের বাস্তবায়নে গৃহীত পন্থা পদ্ধতির নির্দেশনামূলক কার্যক্রম কৌশল। উভয় নীতির মাঝে বহুদিক থেকে সাদৃশ রয়েছে।

সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির পার্থক্যসমূহ : সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। নিচে ছক আকারে উভয়ের পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

১. সংজ্ঞাগত পার্থক্য : সামাজিক নীতি বলতে সামাজিক সমস্যা ও মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে বোঝায়। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতি বলতে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সিদ্ধান্তকে বুঝায়। এটি সমাজের মানুষের বহুবিধ কল্যাণসাধনে পথ নির্দেশ করে থাকে।

২. পরিধিগত : সামাজিক নীতির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। যেমন– উন্নয়ন, কল্যাণ, বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সমস্যা সমাধান, সমাজকল্যাণ নীতি প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, সমাজকল্যাণ নীতির পরিধি সীমিত। এটি মূলত মৌল চাহিদা পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. লক্ষ্যগত : সামাজিক নীতির লক্ষ্য হলো সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধন। বৃহত্তম সমাজে ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও সংস্থার মঙ্গলবিধানে পথনির্দেশ দানকারী বিধি বিধানের সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক নীতি। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতি মানবীয় সেবা ও প্রয়োজন পূরণের উপায় নির্ধারণের প্রক্রিয়া।

৪. প্রণয়নগত : প্রণয়নগত দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন– সামাজিক নীতি প্রণীত হয় সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ নীতি প্রণীত হয় সমাজকর্মের নীতিমালা অনুসরণে।

৫. নীতিনির্ধারণী : সামাজিক নীতি প্রণীত হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। এতে জনপ্রতিনিধি ও সরকার সংশ্লিষ্ট থাকে।

অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতিতে নীতি নির্ধারণী হিসেবে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ থাকে।

৬. অধিক গুরুত্ব প্রদান : সামাজিক নীতিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর।

অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ নীতিতে এগুলোর উপর কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ নীতিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় সুবিধা-বঞ্চিতদের।

৭. পরিবর্তন : সামাজিক নীতি পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করে। কিন্তু সমাজকল্যাণ নীতি পরিবর্তন নয়। বরং এটি সেবামূলক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন হয়।

৮. প্রাধান্যে ভিন্নতা : উভয়ের মাঝে প্রাধান্যের দিক থেকেও ভিন্নতা বিরাজমান। সামাজিক নীতিতে সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, রীতি প্রভৃতি প্রাধান্য পায়। কিন্তু সমাজকল্যাণ নীতিতে সমাজকর্মের মূল্যবোধ, আদর্শ, নীতি প্রভৃতির উপর জোর দেয়া হয়।

৯. সমাজকর্মীর ভূমিকা : সামাজিক নীতিতে সমাজকর্মীর ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, সমাজকল্যাণ নীতিতে সমাজকর্মী কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে এক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা মুখ্য।

১০. কার্যক্রম : সামাজিক নীতির মূল কাজ হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সৃষ্ট ভোগান্তির অবসান। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ নীতির মূল কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা সুবিধা প্রদান করা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি ও সমাজকল্যাণ নীতির মধ্যে বহুদিক থেকে অমিল রয়েছে তথাপি তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে। উভয়েই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। T.H. Marshall এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "সামাজিক নীতিসমূহকে অবশ্যই সমাজকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।"

প্রশ্ন॥১৫॥ সামাজিক নীতি কাকে বলে? সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, **সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারসমূহ ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : নীতি মানে কোনো কাজের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য একটি দিকনির্দেশনা। সমাজ ও মানুষের সমস্যা নিয়ে গৃহীত নীতি হলো সামাজিক নীতি। এটা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির প্রভাবসমূহকে যদি যথার্থভাবে গুরুত্ব দিয়ে নীতি প্রণয়ন করা হয় তাহলে কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ নীতি সহায়তা করে।

সামাজিক নীতি : সাধারণ অর্থে, সামাজিক নীতি বলতে সামাজিক সমস্যা ও মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে বোঝায়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, বিশ্লেষক, বিশেষজ্ঞরা সামাজিক নীতির ধারণা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

'The Social Work Dictionary' তে সামাজিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সামাজিক নীতি হলো কোনো সমাজের ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে পথনির্দেশ দানকারী কার্যক্রম ও বিধি-বিধান, যা সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি।

Encyclopedia of Social Work in India তে বলা হয়েছে, সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় সামাজিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ ও তার বিনিয়োগের প্রকৃতি বা ধরন নির্ধারণের জন্য।

T. H. Marshall এর মতে, এটা সরকারি নীতির সেই কার্যক্রমকে বুঝায় যার জনগণের কল্যাণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান এবং যা তাদের সেবা ও আয়ের ব্যবস্থা করে।

সামাজিক নীতির বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইংরেজ সামাজিক নীতিবিদ রিচার্ড টিটমাস। তিনি বলেন, "সামাজিক নীতি সমস্যা মোকাবিলায় সমষ্টিগত বা যৌথ কৌশল হলো সামাজিক নীতি।"

Bruce S. Jansson এর মতে, "সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার যৌথ প্রয়াস হলো সামাজিক নীতি।"

সমাজবিজ্ঞানী স্ল্যাক বলেছেন, "শুধু সামাজিক দিক দিয়ে ব্যাপৃত হলেই তাকে সামাজিক নীতি বলে না, বরং যেসব নীতি জনকল্যাণের পথনির্দেশ করে কেবল সেগুলোকেই সামাজিক নীতি বলা যেতে পারে।"

আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির ভাষায়, সামাজিক নীতি হলো আইন, প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং এজেন্সির বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেসব মূলনীতি, কার্যপ্রণালি ও কর্মসম্পাদনের উপায়, যেগুলো মানুষের কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সমষ্টিগত কৌশল বা পদক্ষেপই হলো সামাজিক নীতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি একটি কর্মসূচি, নিয়মনীতি বা আদর্শস্বরূপ। যা জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করা ও বাস্তবায়ন করার কর্মপদ্ধতি।

সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারসমূহ : সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। সমাজ সভ্যতার ক্রমধারায় নীতিই যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা, সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন করেছে সহায়তা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে দিয়েছে দিকনির্দেশনা। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে অনেক বিষয় ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বা হাতিয়ারগুলো আলোচনা করা হলো :

১. রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইন : যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান ও প্রবর্তিত আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান ও আইনের ভিত্তিতেই যে কোনো রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। তাই সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কোনো দেশের সংবিধান, আইন ও আইন সভায় সে দেশের জনকল্যাণমূলক দিক নির্দেশনা থাকে। সেজন্য সংবিধান ও আইন সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এমনকি নীতি বাস্তবায়নে আইনও প্রণয়ন করা হয়।

২. প্রশাসন : প্রশাসনের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নে দেশের জনগণ সুফল ভোগ করে। তাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। প্রশাসনের অনুমোদন ও সহযোগিতায় নীতি বাস্তবায়িত হয়। প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই জনপ্রশাসন হচ্ছে এমন এক হাতিয়ার যার মাধ্যমে সরকার জনগণের ইচ্ছা ও চাহিদাসমূহ পূরণ করে।

৩. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা : সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয় জাতীয় উন্নয়নের জন্য। জাতীয় পরিকল্পনার আলোকেই নীতি প্রণীত হয়ে থাকে। নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচি সফলতার মাধ্যমেই নীতি বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণীত হয়। তাই জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারস্বরূপ। কেননা, উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারের জনকল্যাণ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়। সুশৃঙ্খল উপায়ে সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

৪. সহজ ও স্পষ্ট নীতি : জনগণের জন্য, জনগণের সেবায় সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। বিশেষ করে সমাজের নিম্নশ্রেণির জন্য নীতি প্রণীত হয়। তাই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সহজ, স্পষ্ট ও বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সহজ, স্পষ্ট ও সাবলীল নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার।

৫. গবেষণা : গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক নীতিকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রদ করা যায়। গবেষণার জন্য সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক তথ্য অপরিহার্য। গবেষণার মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের পথে বাধা ও সমস্যাসমূহ অনুধাবন করা যায়। এতে বাধাসমূহ দূর করে কার্যকর সমাধান আনয়ন করা যায় এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হয়।

৬. প্রশিক্ষণ : নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডে যেসব কর্মী নিযুক্ত থাকে তাদের দক্ষ, কুশলী, পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ করে তুলতে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এসব কর্মী ও কর্মকর্তাগণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথ প্রদর্শন করে থাকেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ,অভিজ্ঞতা, সমস্যা সমাধানে যোগ্যতা, পারস্পরিক ও মানবীয় সম্পর্ক অনুধাবনে দক্ষতা, যোগাযোগ, কার্যকারণ, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

৭. প্রযুক্তি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিকে সুচারুরূপে সম্পাদনে সাহায্য করে। প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই নীতির প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব জনসমক্ষে প্রচার করা সহজ হয়। যা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন : সামাজিক নীতিকে অর্থবহ ও কার্যকর করে তোলার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। জনগণকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ, প্রশিক্ষণ দান, কারিগরি শিক্ষা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য সচেতনতা প্রদান প্রভৃতি মানব উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

৯. সমন্বয় সাধন : বিভিন্ন কর্মসূচি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করা হয়। এতে কাজের দ্বৈততা হ্রাস পায়, সময়, শ্রম ও অর্থ বাঁচে।

১০. দৃষ্টিভঙ্গি : নীতি প্রণয়ন করতে হয় প্রচলিত মূল্যবোধের ও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে। কেননা একটি দেশের ও সমাজের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা ও আদর্শ থাকে। এগুলোর পরিপন্থি কোনো নীতি বাস্তবায়িত হয় না। তাই সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি আচার, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, ধ্যানধারণা প্রভৃতি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত। নীতি বাস্তবমুখীতা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক নীতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। সামাজিক নীতিসমূহ প্রণয়ন করা হয় জনগণের এবং দেশের কল্যাণের নিমিত্তে বিচারবিশ্লেষণ, গবেষণা এবং দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এক একটি সমাজ কল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এসব নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। দেশী ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সদ্ব্যবহারের উপরও নীতি বাস্তবায়ন নির্ভর করে।

অধ্যায় ২

বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক নীতিসমূহ
Different Social Policies in Bangladesh

খ বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশে প্রণীত কয়েকটি সামাজিক নীতির নাম লেখ।

উত্তর : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় পল্লী উন্নয়ননীতি ২০০১, বাংলাদেশ জনসংখ্যানীতি ২০০৪, শ্রম কল্যাণ নীতি ১৯৮০, জাতীয় বস্ত্রনীতি-১৯৯৩, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১১, জাতীয় নারীনীতি-২০১১, গৃহায়ন নীতি-১৯৯৩, স্বাস্থ্যনীতি ২০০০, যুবনীতি ২০০৩ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রণীত সর্বশেষ (২০১১ সালে) দুটি নীতির নাম উল্লেখ কর।

উত্তর : ১. জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও ২. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষানীতি কত সালে প্রণয়ন করা হয়?

উত্তর : ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : শিক্ষানীতি ২০১০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশ প্রেমিক, কুসংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, নীতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে দক্ষ করে তোলা।

শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত শিক্ষার স্তরসমূহ কী কী?

উত্তর : প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, ক্রিড়া শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বয়স কত?

উত্তর : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বয়স ৬ বছর।

বাংলাদেশে কোন স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক।

প্রাথমিক শিক্ষা কোন শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে?

উত্তর : প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৯. বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে স্বাক্ষর, লেখাপড়া ও হিসাবনিকাশ এবং মানবিক গুণাবলি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পেশাগত ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলা।

১০. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কী?

উত্তর : যে সকল শিশু কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় তাদেরকে মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে।

১১. প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার সময় কোন সাল পর্যন্ত?

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার সময় ২০১৪ সাল পর্যন্ত।

১২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তির বয়স সীমা কত?

উত্তর : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তির বয়স সীমা ৮–১৪ বছর।

১৩. মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নতুন শিক্ষা কাঠামো অনুযায়ী নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্তরকে বুঝায়। এ স্তর শেষে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষায় গমন করবে।

১৪. মাধ্যমিক স্তরে কয়টি ধারা রয়েছে এবং কী কী?

উত্তর : ৩টি, যথা : সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা।

১৫. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কিভাবে হবে?

উত্তর : মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ২টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যথা : ১. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (S.S.C) : ১০ম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার নাম মাধ্যমিক পরীক্ষা ২. উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (H.S.C): দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার নাম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে ও পরীক্ষার মুল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

১৬. মাদ্রাসা স্তরে কোন ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়?

উত্তর : মাদ্রাসা স্তরে শিক্ষার্থীদের ইসলামে জ্ঞানের পাশাপাশি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৮. উচ্চ শিক্ষা বলতে কোন ধরনের শিক্ষাকে বুঝায়?

উত্তর : উচ্চ শিক্ষা বলতে দ্বাদশ শ্রেণীর পরবর্তী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝায়।

১৯. প্রকৌশল শিক্ষা বলতে কোন ধরনের শিক্ষাকে বুঝায়?

উত্তর : প্রকৌশল শিক্ষা বলতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পন্ন শিক্ষাকে বুঝায়।

২০. প্রকৌশল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী?

উত্তর : সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

২১. চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, সেবক, সেবিকা ও বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা।

২২. শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা কোন কোন স্তরে চালু রাখার বিধান রাখা হয়েছে?

উত্তর : শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে চালু রাখার বিধান রাখা হয়েছে।

২৩. কারুকলা ও সুকুমার বৃত্তি শিক্ষা কী?

উত্তর : কারুকলা ও সুকুমার বৃত্তি শিক্ষা বলতে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি শিল্প সংস্কৃতির শিক্ষাকে বুঝায়।

২৪. আইন শিক্ষার কয়টি দিক রয়েছে এবং কী কী?

উত্তর : আইন শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে। যথা : পেশাগত ও ব্যবহারিক।

২৫. নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী?

উত্তর : নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, দেশ পরিচালনার অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ করা ও দক্ষ করা, আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২৬. BANBEIS কী ও পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা, বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পরিসংখ্যান ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি সরকারি কেন্দ্র হচ্ছে ব্যানবেইজ। ৩টি ঢাকার নীলক্ষেতে অবস্থিত। এর পূর্ণরূপ Bangladesh Bureau of Education Information and Statistics (বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো।)

২৭. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সর্বশেষ কত সালে প্রণীত হয়?

উত্তর : জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সর্বশেষ ২০০০ সালে প্রণীত হয়।

২৮. স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর : সর্বস্তরের মানুষের কাছে চিকিৎসার সে[illegible] উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং জনগণের পুষ্টির উন্ন[illegible] জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন।

২৯. স্বাস্থ্যনীতি-২০০০ এর মূলনীতি কী?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে স্বাস্থ্য, পু[illegible] প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের স[illegible] সচেতন ও সক্ষম করে তোলা।

৩০. স্বাস্থ্যনীতি ২০০০ এর একটি কর্মকৌশল লিখ।

উত্তর : স্বাস্থ্যনীতির সঠিক বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের [illegible] রাজনৈতিক সমর্থনসহ সবার সম্মতি ও সদিচ্ছা প্রয়ো[illegible] যা আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নসাধনে স[illegible] ভূমিকা পালন করবে।

৩১. বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতি সর্বশেষ কত স[illegible] প্রণীত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতি সর্বশেষ ২০০৪ স[illegible] প্রণীত হয়।

৩২. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০০৪ উল্লিখিত তথ্যানু[illegible] ২০০১ সালে এদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০০৪ এ উল্লি[illegible] তথ্যানুসারে ২০০১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ১২ [illegible] ৯৩ লক্ষ ছিল।

৩৩. বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতি ২০০৪ এ উল্লি[illegible] তথ্যানুসারে ২০২০ সালে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি [illegible] কত হবে?

উত্তর : বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতি ২০০৪ এ উল্লি[illegible] তথ্যানুসারে ২০২০ সালে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি [illegible] ১৭ কোটি ২০ লক্ষে পৌঁছবে।

৩৪. জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরি[illegible] প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং অন্তর্বর্তীকালীন দা[illegible] বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে জনসংখ্যা ও উন্ন[illegible] মধ্যে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সমতাবিধানের মাধ্যমে জন[illegible] সার্বিক জীবনমান উন্নত করা।

৩৫. জাতীয় জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়ন কৌশলগুলো[illegible] ধরনের?

উত্তর : জাতীয় জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়ন কৌশল[illegible] সেবামুখী কল্যাণধর্মী, নারী-পুরুষের সমান অংশী[illegible] নারী ক্ষমতায়ন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন প্র[illegible] সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

৩৬. জনসংখ্যা নীতির বর্তমান শ্লোগান কী?

উত্তর : "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি [illegible] ভালো হয়।"

৩৭. জনসংখ্যানীতি বাস্তবায়নে চিকিৎসকদের মুখ্য ভূমিকা কী?
উত্তর : জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে চিকিৎসকগণ সম্পৃক্ত থেকে পরিবার পরিকল্পনার সেবার মান বৃদ্ধি এবং মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৩৮. জনসংখ্যা কার্যক্রমে কোন কোন মন্ত্রণালয় ভূমিকা পালন করেন?
উত্তর : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মহিলা, শিশু, যুব, ক্রীড়া সংস্কৃতি, ধর্ম বিষয়ক, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রভৃতি মন্ত্রণালয়।

৩৯. জাতীয় জনসংখ্যা নীতির বিভিন্ন কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও সমম্বয় প্রধান ভূমিকা পালন করে কোন অধিদপ্তর?
উত্তর : পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

৪০. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি কেন প্রয়োজন?
উত্তর : বাংলাদেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণসহ পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রমের উপর ইতিবাচক প্রভাব ও গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজন রয়েছে।

৪১. শিশুনীতি ২০১১ কী?
উত্তর : শিশুনীতি ২০১১ হচ্ছে বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। এটি জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিশু নীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে একটি সময়োযোগী ও আধুনিক শিশু নীতি।

৪২. জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশু কারা?
উত্তর : জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল মানুষকে বুঝাবে।

৪৩. আমাদের দেশে কত সালে শিশু আইন প্রণীত হয়?
উত্তর : আমাদের দেশে শিশু আইন প্রণীত ১৯৭৪ সালে।

৪৪. জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের নাম কী?
উত্তর : জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের নাম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪৫. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন মন্ত্রণালয় সরাসরি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে?
উত্তর : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪৬. সংবিধানে কত অনুচ্ছেদে শিশুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪৭. বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরী কারা?
উত্তর : ১০ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সি বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েরা কিশোর কিশোরী হিসেবে বিবেচিত।

৪৮. শিশুনীতির মূল নীতি কী?
উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিশু দারিদ্র্য বিমোচন, কন্যাশিশুসহ সব শিশুদের নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণসহ শিশুর সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৪৯. জাতীয় শিশুনীতির মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর : শিশুর সুরক্ষা, শিশুর সর্বোত্তম উন্নয়ন, শিশু সমতা বিধান, শিশুর মতামতের প্রতিফলন, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৫০. শিশুর অধিকারসমূহ কী কী?
উত্তর : শিশুর নিরাপদ জন্ম ও বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুর সুরক্ষা, জন্ম নিবন্ধন, শিশুর অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ বিনোদন ইত্যাদি।

৫১. শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী?
উত্তর : বাংলাদেশ শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা UN Millennium A ward 2010 দেয়া হয়।

৫২. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা এ এমডিজি-এ অর্জিত হয়েছে কী?
উত্তর : শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে যা সহস্রাব্দের লক্ষ্য মাত্রা (MDG-3) পূরণ করেছে।

৫৩. প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে বাংলাদেশ কবে স্বাক্ষর করে?
উত্তর : প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে বাংলাদেশ ২০০৬ সালে স্বাক্ষর করে।

৫৪. প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম কী কী?
উত্তর : স্বীকৃতি ও সম্মান, সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন, প্রতিপালন, বিকাশ, সুবিধা ও সেবায় প্রবেশগম্য করা ইত্যাদি।

৫৫. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয় কত সালে?
উত্তর : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয় ১৯৯৪ সালে।

৫৬. অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম কী কী?
উত্তর : সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা, শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট শিক্ষা, পুনর্বিকাশে পরিবারকে প্রশিক্ষণ শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি।

৫৭. সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের জন্য শিশু নীতিতে কী বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে?

উত্তর : সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করা।

৫৮. শিশুনীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ কী?

উত্তর : প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয়, উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু নীতির প্রাধান্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, গবেষণা, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি।

৫৯. NCWCD এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : National Council for Women and Children Development.

৬০. যুব নীতি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ প্রণয়ন করা হয় কত সালে?

উত্তর : সর্বপ্রথম ১৯৮০ সালে এবং সর্বশেষ ২০০৩ সালে।

৬১. যুব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সরকারি সম্পৃক্ত অধিদপ্তরের নাম কী?

উত্তর : যুব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সরকারি সম্পৃক্ত অধিদপ্তরের নাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

৬২. জাতীয় যুব নীতিতে ২০০৩ সালে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তর : যুব সমস্যা, যুব অধিকার, যুব দায়িত্ব, যুব কর্মসূচি, বাস্তবায়ন কৌশল, পর্যালোচনা ইত্যাদি।

৬৩. যুব নীতি অনুযায়ী যুব কারা?

উত্তর : যুব নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক যুব হিসেবে গণ্য হবে।

৬৪. বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় কত অংশ যুব শ্রেণীভুক্ত?

উত্তর : বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব শ্রেণীভুক্ত।

৬৫. বাংলাদেশের কোন কোন দিকে যুবকদের অবদান সবচেয়ে বেশি?

উত্তর : বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনোত্তর কালে সব ক্রান্তি লগ্নেই যুবকদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

৬৬. যুব নীতির মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : যুবকদের মাঝে সচেতনতা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৬৭. যুবসমাজের সমস্যাবলি কী কী?

উত্তর : নৈতিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলার অভাব, বাস্তবমুখী শিক্ষার অপ্রতুলতা, শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপ আউট, দুর্নীতিগ্রস্ত বেকারত্ব, এইডস ও মাদকাসক্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি।

৬৮. যুব অধিকার কী?

উত্তর : মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান, সুস্থ বিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুবকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

৬৯. যুবকদের দায়িত্ব কী?

উত্তর : আইনশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সুনাগরিক হিসেবে গড়া, সেবার মনোভাব তৈরি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা, সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি।

৭০. যুব নীতিতে যুবকদের কর্মসূচিগুলো কী কী?

উত্তর : কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান, যুব নিবন্ধন, এইডস ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশ বিদেশে যুব প্রতিনিধি বিনিময়, আইনি সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

৭১. বর্তমান যুব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কোন মন্ত্রণালয় সরাসরি সম্পৃক্ত?

উত্তর : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৭২. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত যুবকল্যাণ নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য কী?

উত্তর : উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের গতিশীল ও সংগঠিত করা।

৭৩. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কখন নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়?

উত্তর : ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম নারী উন্নয়ননীতি প্রণয়ন করা হয়।

৭৪. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সর্বশেষ কত সালে প্রণীত হয়?

উত্তর : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সর্বশেষ ২০১১ সালে প্রণীত হয়।

৭৫. নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে বেগম রোকেয়াকে কিভাবে চিত্রিত/অভিহিত করা হয় এবং নারী জাগরণে তাঁর কোন আহ্বানকে উদ্বৃত করা হয়েছে?

উত্তর : নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে বেগম রোকেয়াকে নারী আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে চিত্রিত/অভিহিত করা হয়েছে। নারী জাগরণে তাঁর যে আহ্বান উদ্বৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে– "তোমাদের কন্যাগুলোকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়ে দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক।"

৭৬. **বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় কত ভাগ নারী?**

উত্তর : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী।

৭৭. **বাংলাদেশের কোন যুদ্ধে নারীরা অবদান রাখে?**

উত্তর : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে।

৭৮. **নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোন মন্ত্রণালয়?**

উত্তর : নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭৯. **১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদেরকে কী উপাধিতে ভূষিত করা হয়?**

উত্তর : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদেরকে বিরঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৮০. **বাংলাদেশে নারীদের অবদান কী?**

উত্তর : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলন নারীর অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ।

৮১. **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কী?**

উত্তর : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমুল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সমাজকল্যাণ, স্বাবলম্বন প্রভৃতিতে গুরুত্ব ও অর্থ বরাদ্ধ দেয়া হয়।

৮২. **দেশে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠিত কত সালে?**

উত্তর : দেশে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠিত ১৯৭২ সালে।

৮৩. **প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়।

৮৪. **নারী পুনর্বাসন বোর্ড এর কার্যক্রম কী?**

উত্তর : ১. স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর তথ্য আহরণে জরিপ করা ও পুনর্বাসন ও ২. যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮৫. **নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন কী?**

উত্তর : ১৯৭২ সালে গঠিত নারী পুনর্বাসনে গঠিত বোর্ডের পুর্নগঠিত রূপ। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্ম পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে বোর্ডকে বৃহত্তর কলেজে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে
রূপান্তরিত করা হয়।

৮৬. **নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডের বর্তমান নাম কী?**

উত্তর : নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডের বর্তমান নাম "দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল।"

৮৭. **জাতিসংঘ কর্তৃক নারী বর্ষ ও নারী দশক কখন ঘোষণা করা হয়?**

উত্তর : জাতি সংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে নারী বর্ষ এবং ১৯৭৬ – ১৯৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা করা হয়।

৮৮. **জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ কত সালে গৃহীত হয়?**

উত্তর : জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয়।

৮৯. **৪র্থ নারী সম্মেলন কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে ৪-১৫ সেপ্টেম্বর চীনের রাজধানী বেইজিং-এ। এতে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৯০. **বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদ কী?**

উত্তর : রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষেরা সমান অধিকার লাভ করবেন।

৯১. **নারীদের জন্য বাংলাদেশে কী কী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করেছেন?**

উত্তর : বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃকালীন ভাতা, ভিজিডি কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণপ্রদান কর্মসূচি ইত্যাদি।

৯২. **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মুল লক্ষ্য কী?**

উত্তর : বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর নিরপত্তা নিশ্চিত করা।

৯৩. **বাংলাদেশে নারী নীতির প্রয়োজন কেন?**

উত্তর : বাংলাদেশে নারী নীতির প্রয়োজনীয়তা–নারী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সহিংসতা দূরীকরণ, বৈষম্য দূর করা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নারীনির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি।

৯৪. **বাংলাদেশে নারীদের নিরাপত্তার প্রচলিত আইনসমুহ কী কী?**

উত্তর : নারীদের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যমান আইন হচ্ছে– যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, বাল্য বিবাহ রোধ আইন, নারীনির্যাতন দমন আইন ১৯৮৩, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ ইত্যাদি।

(খ) বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিক্ষা মানবজীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের সংবিধানেও শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তথাপি শিক্ষাকে দেশের সকলের মাঝে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই সরকার শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নীতি গঠনের জন্য ১৯৯৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর ১৯৯৮ সালে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে খসড়া নীতি প্রণয়ন করার জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২০০০ সালে ২৮টি অধ্যায়ের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এ ২৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ২ নং অধ্যায়ে প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বিস্তারের কৌশল সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাক প্রাথমিক : বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। এদেশের মানুষের ঐতিহ্যবাহী ধ্যানধারণা এবং আর্থসামাজিক পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই এদেশের একটা বিশাল অংশের ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভকে এদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠে নি। এদেশের বৃহদাংশ শিশুই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ তাদের জন্য সীমিত। তাই এসব শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা দরকার। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয় এসব শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করার। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলত শিশুদেরকে শিক্ষার প্রতি এবং বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয় যে, ২০০৫ সালের মধ্যে ৫+ বছরের শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম হাতে নেওয়া। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এর খরচ বহন ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রমকে অধিক ফলপ্রসূ এবং কার্যকরী করে তোলার জন্য প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, দেশের সকল মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একইমানের শিক্ষা। আর এ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে উল্লিখিত কৌশলগুলো অবলম্বন করে তাকে সর্বোত্তম মাত্রায় কার্যকরী করে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন॥২॥ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিক্ষা মানবজীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। শিক্ষা মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তথাপি শিক্ষাকে দেশের সকলের মাঝে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই সরকার শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নীতি গঠনের জন্য ১৯৯৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর ১৯৯৮ সালে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে খসড়া নীতি প্রণয়ন করার জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২০০০ সালে ২৮টি অধ্যায়ের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এ ২৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ২ নং অধ্যায়ে প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বিস্তারের কৌশল সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা : মানবজীবনের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে তোলার প্রথম ধাপ ও প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণের জন্য একই মানের। প্রাথমিক শিক্ষার কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক. শিশুর মানসম্পন্ন ব্যবহারিক স্বাক্ষরতা নিশ্চিত : শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো মানসম্মত ব্যবহারিক স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশুকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা লাভে উৎসাহী ও আকৃষ্ট করা এবং তদানুযায়ী গড়ে তোলা।

খ. শিশুর জীবনযাপনের জন্য মৌলিক শিক্ষণ চাহিদা পূরণ : শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক সচেতনতা লাভের মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষণ চাহিদা পূরণে সক্ষম করা ও পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

গ. জীবনযাপনের সমস্যা মোকাবিলায় যোগ্য করে তোলা : শিশুর সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং অর্থবহ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে শিশুকে তার জীবনযাপনের সমস্যা মোকাবিলার যোগ্য করে গড়ে তোলা।

ঘ. নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা : শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার, জীবনধারণের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ, অধ্যবসায় প্রভৃতি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনের সহায়তা করা।

ঙ. শিশুকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনা করে তোলা : শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিশুকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলা।

চ. দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা : শিশুকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা ও দেশ গঠনমূলক কাজে আগ্রহী করে তোলা।

উপসংহার : একটি জাতীয় উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা আর এই শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। উপরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ ছোট দেশটিতে ১৪ কোটিরও বেশি লোক বসবাস করে। বাংলাদেশের এ বিশাল জনসংখ্যা এ দেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং পাশাপাশি আরো অসংখ্য সমস্যার জন্মদাতা। তাই স্বাধীনতা লাভের পর হতে এ দেশে যতগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার প্রতিটিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পরিবার পরিকল্পনাকে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়।

এসব অবস্থা পর্যালোচনা করেই ১% জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় শিশু নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় নীতি জনসংখ্যা নীতি ২০০০ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ অসংখ্য সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ একটি বিপুল জনসংখ্যার দেশ। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি, যা এ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাবলির সমাধান করার জন্য প্রজনন হার ও মা এবং শিশুর উচ্চ মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জন্য একটি বাস্তব উপযোগী, সুষ্ঠু নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের দরকার হয়। এ জনসংখ্যা নীতির আওতায় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারীর অবস্থার উন্নয়ন, গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার সেবা জনসাধারণের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ সার্বিক কর্মকাণ্ডে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের সার্বিক অবকাঠামোগত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তারপর ১৯৭৮ সালে দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৮০ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সালে ১৯৮৫ সালে প্রণীত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৯০ সালে প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৯৭ সালে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতিটিতেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিটি পরিকল্পনাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, জনমিতিক এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশে দ্রুত স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশের উচ্চ জন্মহার কমানো, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি এবং এর সাথে সাথে মা ও শিশু মৃত্যুর উচ্চহার হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত পরিকল্পনা এবং পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সাথে সাথে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে জাতীয় শিশু নীতি -২০০০ প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বে ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা বজায় রাখা এবং উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার রোধ করার কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য ১৯৭৪ সালে বুখারেস্টে এবং এরপর ১৯৮৪ সালে মেক্সিকো সিটিতে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনগুলোর সুপারিশের আলোকে জনসংখ্যার উপর বাংলাদেশের কর্মকৌশল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হয়। পরবর্তীকালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে ১৯৯৪ সালে 'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন' এবং চীনের বেজিং - এ ১৯৯৫ সালে 'বিশ্ব নারী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনগুলোর সুপারিশমালায় উন্নত প্রজনন, স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদেরকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করার অঙ্গীকার করা হয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক জনমিতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর সুপারিশমালা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি- ২০০০ অনুসারে প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে বুঝায় পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের একটি অবস্থা; কেবল প্রজনন সম্পর্কিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং এ প্রক্রিয়ায় কোন রোগের অভাব বা অক্ষমতা নয়। আর এ প্রজনন স্বাস্থ্যের আওতায় পড়ে; জনগণের সন্তোষজনক ও নিরাপদ যৌন জীবন, সন্ত্রাস উৎপাদনের ক্ষমতা এবং উৎপাদনে ব্যক্তি স্বাধীনতা। এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নারী ও পুরুষের জেনে নেওয়ার অধিকার ও পছন্দানুযায়ী নিরাপদ, কার্যকরী এবং পূর্ণমাত্রায় নির্ভরযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার অধিকার। এ অধিকারের মাঝে আরো রয়েছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্য যে কোন পদ্ধতির ব্যবহার, যা দেশের আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এবং নিরাপদ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের জন্য নারীর স্বাস্থ্য সেবা লাভের অধিকার।

দম্পতির উপর্যুক্ত অধিকারগুলো নিশ্চিত করার জন্য এবং দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের জনমিতিক গতি-প্রকৃতি পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্যই এ নীতি গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার : বর্তমানে বাংলাদেশে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যা অন্যতম। এই সমস্যাকে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিতে জনসংখ্যা কিভাবে হ্রাস করা যায় এবং জনগণকে কিভাবে মানবসম্পদে পরিণত করা যায় তা জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ এ উল্লেখ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥৪॥ জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের কৌশল আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের পদ্ধতি লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশের শিশুরা বরাবরই অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার। স্বাধীনতার পর এদেশে অনেকগুলো শিশু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হলেও আইনগুলোর কতিপয় সীমাবদ্ধতা বাস্তবায়িত না হওয়ার প্রেক্ষিতে শিশুকে সার্বিকভাবে সুরক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই শিশুদের কল্যাণ করার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু নীতি প্রণয়ন করা জরুরি হয়ে পড়ে। এরই আলোকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নির্ধারণ করে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল : বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে কতকগুলো কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ব্যবস্থাপনা : শিশুরা যে পরিবেশে জন্মলাভ করে সে পরিবেশকে উন্নত, সুন্দর ও প্রগতিশীল করে গড়ে তুলে শিশুদের সার্বিক কল্যাণের জন্য পরিবার, গোষ্ঠী তথা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে।

২. সরকারি ব্যবস্থাপনা : শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসহ গ্রাম পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। বিশেষত আশ্রয়হীন, অসহায়, অবহেলিত, পরিত্যাক্ত, অসুবিধাগ্রস্ত, প্রতিবন্ধী শিশুদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদেরকে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে লালনপালনের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

৩. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান : সরকারি ব্যবস্থাপনার সম্পূরক হিসেবে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সহায়তা নেয়া হবে এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে এরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আজকের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই উক্ত সেবা বাস্তবায়নের জন্য শিশুনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥৫॥ জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নে কর্মপদ্ধতি লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : আজকের শিশু আগামীদিনের অথচ বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে হতাশাজনক পরিস্থিতি ফুটে উঠে। বাংলাদেশ বিশ্বের শিশু মৃত্যুর দেশগুলোর অন্যতম। এছাড়াও অপুষ্টি স্বাস্থ্যহীনতা এবং আশ্রয়হীনতাসহ নানা রকমের সমস্যায় আমাদের দেশের শিশু। এই শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করে। ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ নীতি প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় শিশু নীতির লক্ষ্যসমূহ : বাংলাদেশে শিশু পরিস্থিতির আলোকে শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছয়টি প্রধান নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা :

১. শিশুর জন্ম ও বেঁচে থাকা : শিশুর জন্ম ও বেঁচে অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা জাতীয় শিশু নীতির প্রধান লক্ষ্য।

২. শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ : শিশুর শিক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা।

৩. পারিবারিক পরিবেশ : শিশুর সার্বিক উন্নয়নের পারিবারিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় শিশু নীতিতে পারিবারিক পরিবেশের উন্নয়নে গৃহীত হয়েছে।

৪. বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুর সাহায্য করা : অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের বিশেষ সাহায্য নিশ্চিত করা জাতীয় নীতির প্রধান লক্ষ্য। যেমন– প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

৫. শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ : শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ করার লক্ষ্যে জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের নীতি অবলম্বন করা।

৬. আইনগত অধিকার : জাতীয় শিশু নীতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক শিশুর আইনগত অধিকার রক্ষা করা।

উপসংহার : বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করলেও এর সঠিক বাস্তবায়ন আজো লক্ষ্য না। উপর্যুক্ত তথ্য লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন জরুরি।

প্রশ্ন।৬। **শিশু কল্যাণ কাকে বলে?**

অথবা, শিশু কল্যাণের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, শিশু কল্যাণ কী?

অথবা, শিশু কল্যাণ বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। সুতরাং, শিশুদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের উপরই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নির্ভর করে। তাই দেশ এবং জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই শিশু কল্যাণ অপরিহার্য। শিশুর সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশসহ সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শিশু কল্যাণের আওতাভুক্ত।

শিশু কল্যাণের সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে শিশুর কল্যাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি শিশু কল্যাণ নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশু কল্যাণ প্রত্যয়টি অতীতের তুলনায় ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ব্যাপক অর্থে শিশু কল্যাণ বলতে সেসব কর্মসূচিকেই বুঝায় যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত এবং এটা জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশু কল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

শিশু কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে **Md. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Child welfare refers to care and protection best owed on the child before and after birth, during in fancy and from pre-school age to adolesence."

এলিজাবেথ ডব্লিউ ডিউএল এর মতে, "শিশু কল্যাণ বলতে ব্যাপক অর্থে সমাজের সদস্য হিসেবে সকল শিশুর কল্যাণ সাধনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও তাঁর লক্ষ্য বুঝায়। এ কার্যাবলির উদ্দেশ্য **প্রথমত,** শিশুর পরিবারের সামর্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজস্ব ও পারিবারিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যাতে শিশুর বাল্যে ও কৈশোরে পুষ্টিসাধন হতে পারে, **দ্বিতীয়ত,** শিশুর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিশুর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।"

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শিশু কল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঐসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যাবলির সমষ্টিকে বুঝায় যেগুলো সকল শিশুর শারীরিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, শিক্ষাগত প্রভৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিবারের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে থেকে শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে কৈশোর পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন।৭। **শিশু কল্যাণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।**

অথবা, শিশু কল্যাণের বিবেচ্য বিষয় কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশুরা ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। তাদের হাতের পরশে মানব সভ্যতা নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। তাই শিশুদের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদেরকে সৃজনশীল এবং দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা দেশ এবং জাতির পবিত্র কর্তব্য। আর এ জন্যই প্রতিটি সমাজেই শিশু কল্যাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ কর্মসূচি হিসেবে স্বীকৃত। আর এ শিশু কল্যাণ কর্মসূচিকে অধিক বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য এর মধ্যে কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিশু কল্যাণের বৈশিষ্ট্য : নিম্নে শিশু কল্যাণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. শিশু কল্যাণ কর্মসূচি শিশু জন্মের পূর্ব অর্থাৎ, মাতৃমঙ্গল থেকে শুরু করে কৈশোর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।
২. শিশু কল্যাণ কর্মসূচি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ধনী, দরিদ্র, দুঃস্থ, সুস্থ, অসুস্থ সকল শিশুর সামগ্রিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।
৩. শিশুর দৈহিক মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিকের সুষ্ঠু ও সুসংহত বিকাশে শিশু কল্যাণ নিয়োজিত।
৪. শিশু কল্যাণ মাতৃমঙ্গলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ গর্ভাবস্থায় মায়ের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে শিশুর কল্যাণ সাধন সম্ভব।
৫. শিশু কল্যাণ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সকল শিশুর কল্যাণে নিয়োজিত।
৬. শিশুর চরিত্র গঠন ও নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিশু কল্যাণ কর্মসূচি।
৭. শিশু কল্যাণ কর্মসূচি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে হতে পারে।
৮. অবহেলা, প্রবঞ্চনা, নির্যাতন ও অপব্যবহারের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করা।
৯. গঠনমূলক পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিশুর সামাজিকীকরণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা।
১০. শিশুর সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে ও প্রতিভার বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করা।
১১. শিশু কল্যাণ কর্মসূচি প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবা প্রদান করতে পারে।

অর্থাৎ, শিশু কল্যাণ কর্মসূচিকে অধিক বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য উক্ত বৈশিষ্টগুলোর সমাবেশ ঘটানো আবশ্যক।

উপসংহার : বাংলাদেশ শিশুদের কল্যাণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমগুলো দেখলে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো শিশু কল্যাণের সঠিক চিত্র তুলে ধরে।

প্রশ্ন॥৮॥ যুব কল্যাণ নীতি কী?

অথবা, জাতীয় যুব কল্যাণ নীতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সমাজবাসী মানুষের স্বার্থরক্ষা, নিরাপত্তা লাভ ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে জাতীয়ভাবে নীতি গ্রহণ করা হয়। এসব নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সামাজিক নীতিগুলো এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে অর্থপূর্ণভাবে উন্নয়ন সাধন করতে ত্বরান্বিত করে। এ নীতিগুলোর মধ্যে জাতীয় যুব কল্যাণ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুব কল্যাণ নীতি : বর্তমান আর্থসামাজিক ক্রান্তিলগ্নে যুব বেকারত্ব, যুব অস্থিরতা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চাঁদাবাজি, মাদকাসক্তি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। অথচ এ সংকট মোচনের সবচেয়ে সক্রিয় হাতিয়ার হচ্ছে দেশের সক্রিয় যুবকর্মী বাহিনী। দেশের যে কোন সংকট মোচনে অনুকূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে যুব শক্তির বিকল্প অকল্পনীয়। এমন অপরাজেয় যুব শক্তিতে সম্পদশালী হয়েও একান্ত পরিচর্চার অভাবে আমাদের জাতীয় জীবন যেমন গতিহীন, যুব শক্তি তেমনি নিষ্প্রভ, উদভ্রান্ত এবং শতধা বিভক্ত। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ বড় প্রয়োজন বহুমাত্রিক উৎপাদনমুখী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশের বিশাল যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা। জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারার সাথে অবদান রাখার নিমিত্ত তাদের মাঝে গঠনমূলক মানসিকতা তৈরি করা। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করে ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে এদেরকে তৎপর করা। মূল্যবোধসহ কঠোর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে এদেরকে সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী হিসেবে দেশের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করা। আর এজন্য প্রয়োজন এদেশের যুব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। তাই এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় যুব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপসংহার : উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে যুবকদের বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার যুবকদের উন্নয়নের জন্য যুবকল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছেন যা যুবকদের ভবিষ্যৎ সম্পদরূপে গঠন করবে।

প্রশ্ন॥৯॥ যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

অথবা, কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে যুব কল্যাণ কাজ করে।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধাণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়, যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যমান। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হলো যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই এ বিশেষ সময়ে তদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এবং গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে না পারলে এ সম্প্রদায় স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের প্রতি চরম হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যুবকল্যাণ কার্যক্রম, যুব সম্প্রদায়কে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত রেখে তাদের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। নিম্নে যুবকল্যাণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

ক. বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা।

খ. দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের সহায়তা করা।

গ. যুব সম্প্রদায়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচক্ষণ ও পরিণত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গঠনমূলক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

ঘ. অসামাজিক কার্যক্রম থেকে যুব সম্প্রদায়কে বিরত রাখা ও দূরে রাখা এবং জনকল্যাণমুখী কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ. যুবকদের মাঝে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা সৃষ্টি ও গুণাবলির বিকাশ সাধন করা।

চ. বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা।

ছ. যুবকদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, দলীয় চেতনা ও মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, পাস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক চেতনাবোধ, সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলির বিশেষ সাধন করা।

উপসংহার : বাংলাদেশে প্রচলিত যুবকল্যাণমূলক কার্যক্রম কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রচলিত হচ্ছে। উপরে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥১০॥ জাতীয় যুব নীতিমালা আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় যুব নীতিমালা কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধাণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়, যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যমান। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হলো যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই এ

বিশেষ সময়ে তদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এবং গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে না পারলে এ সম্প্রদায় স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের প্রতি চরম হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

জাতীয় যুব নীতিমালা : যুবকল্যাণ তথা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূলভিত্তি হচ্ছে জাতীয় যুব নীতিমালা। যার আলোকে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক জাতীয় যুব নীতিমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত। জাতীয় যুব নীতিমালার মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. যুব শক্তির আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
২. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুবকদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করা।
৩. শ্রমের মর্যাদা অনুধাবনে যুবকদের উৎসাহিত করা।
৪. যুবক-যুবতীদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।
৫. যুবসমাজের মধ্যে যথাযথ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং
৬. থানা পর্যায়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করা।

প্রশ্ন॥১১॥ নারী কল্যাণ কী?

অথবা, নারী কল্যাণ বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বের সকল সমাজেই নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। নারীকে এ সমস্যা থেকে উত্তোরণ ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের দিক থেকে নারী কল্যাণ বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, শিশুর প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ, সৃজনশীল, আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নৈতিক ও মানসিক বিকাশ সাধন, সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো পুরুষদের তুলনায় নারীরাই ভালোভাবে করতে পারে। অর্থাৎ, সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নারী কল্যাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

নারী কল্যাণের সংজ্ঞা : নারী কল্যাণের সংজ্ঞায় সাধারণভাবে বলা যায়, নারীদের সার্বিক বিকাশ, উন্নয়ন, ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য যাবতীয় কর্ম প্রণালীই হলো নারী কল্যাণ। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে নারীদের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য সকল সমস্যা সমাধানে কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি চালু ও প্রণয়ন করাকেই বলা হয় নারী কল্যাণ। নারী কল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **Dr. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "By women welfare we understand those socio-economic activities which are designed to solve the problems of women so that they may play their proper role in the family as well as in the society." অর্থাৎ, নারী কল্যাণ বলতে আমরা ঐসব আর্থসামাজিক পদক্ষেপকে বুঝি, যা একটি প্রক্রিয়ায় নারীদের সমস্যাবলি সমাধানের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার ও সামাজিক ভূমিকা পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, মানসিকসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে তাদের দৈহিক উন্নতি সাধন করে বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করাকেই বলা হয় নারী কল্যাণ।

প্রশ্ন॥১২॥ বাংলাদেশে নারী কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাংলাদেশে নারী কল্যাণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বের সকল সমাজেই নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। নারীকে এ সমস্যা থেকে উত্তোরণ ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের দিক থেকে নারী কল্যাণ বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, শিশুর প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ, সৃজনশীল, আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নৈতিক ও মানসিক বিকাশ সাধন, সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো পুরুষদের তুলনায় নারীরাই ভালোভাবে করতে পারে। অর্থাৎ, সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নারী কল্যাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

বাংলাদেশে নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। জনসংখ্যার এ বিশাল অংশ তথা নারীসমাজ অশিক্ষা, কুসংস্কার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। নারীদের এ ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করে দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা পালনে সমান করে তোলার জন্য নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেসব কারণে বাংলাদেশে নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

ক. দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য নারী কল্যাণের গুরুত্ব অপরিসীম।
খ. বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার সংরক্ষণে নারী কল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গ. নারীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের উপরই সুসন্তান লাভ এবং সুখী সমাজ গঠন নির্ভর করে। আর নারী কল্যাণই নারীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।

ঘ. একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন মায়েদের আশ্রয়ে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে উঠে। নারী কল্যাণ মায়েদের দায়িত্বশীল এবং সচেতন হতে সহায়তা করে।

ঙ. বাংলাদেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করার জন্য নারী কল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চ. বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্ব নিরসন এবং জাতীয় উৎপাদনকল্পে নারীসমাজের ব্যাপক সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ছ. বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সুখী পরিবার গঠন, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে নারী কল্যাণের কোন বিকল্প নেই।

জ. বাংলাদেশের ব্যাপক হারে নারী নির্যাতন একটি ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যা। আর এ নারী নির্যাতন বন্ধ করতে গেলে প্রথমেই নারী কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নারীরা সমাজে, পরিবারে নানা কারণে অবহেলা, অবজ্ঞা, নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হয়। আর এ সার্বিক পরিস্থিতির হাত থেকে নারীসমাজকে উদ্ধার করে দেশের উন্নয়নের ধারায় তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য নারী কল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন॥১৩॥ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। তবুও স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতকে সে রকম প্রয়োজনমতো গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। স্বাস্থ্য সেবায় যেসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল অপূর্ণাঙ্গ এবং অপ্রতুল। ফলে এ দেশের মানুষ বরাবরই উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা রকম রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করে। আর এরই প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ (National Health Policy-2000) প্রণয়ন করা হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. সর্বস্তরের জনগণের কাছে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া ও স্বাস্থ্য মানের উন্নয়ন সাধন : বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) সমাজের সকল স্তরের মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্যের মানের উন্নতি সাধন করা।

২. সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা : নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার উপায় উদ্ভাবন করা।

৩. চিকিৎসা ব্যবস্থার মান, গ্রহণযোগ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা : প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি চিকিৎসা সেবার মান, গ্রহণযোগ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ এর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. সর্বশ্রেণীর মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধির ব্যবস্থা : সমাজে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মাঝে বিশেষ করে শিশু ও মায়েদের অপুষ্টির হার হ্রাস করা এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৫. শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস : দেশে বিদ্যমান শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ মৃত্যুর হারকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করার যথোপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয় এবং এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য উপরে বর্ণিত মূল নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা হলে দেশের প্রতিটি নাগরিক সে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা লাভ করতে সক্ষম হবে তা জোর দিয়েই বলা যায়।

প্রশ্ন॥১৪॥ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যগুলো লিখ।

অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : ২০১১ সালে প্রকাশিত আদমশুমারির প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ১৫ কোটি ২৩ লাখ। এই জনসংখ্যা প্রতিবছর প্রায় ১৮-২০ লাখ করে বাড়ছে। প্রতি বর্গকিমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৫০। ফলে মৌলিক চাহিদাসহ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির কৌশলসমূহকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ : ১% জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। নিচে উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. উত্তম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ : সমাজ তথা সারা দেশে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে উত্তম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা দেওয়াকে বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যই সম্পদ। যেকোনো দেশের মানুষেরা যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তাহলে তারা দেশের উন্নয়নে সম্পদ হিসেবে কাজ করে। তাই সর্বস্তরের জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে ও শহরের দরিদ্র শ্রেণির মাঝে সহজলভ্য পরিবার পরিকল্পনা ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এই নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. কার্যকর প্রযুক্তি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি : বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা আরো জোরদার ও গতিশীল করা প্রয়োজন। তাই কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কারণ উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস : বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অত্যধিক। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান না থাকার কারণে মা ও শিশুর মৃত্যু এদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্যই জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

৪. স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করা : জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা মানুষের জন্য সহজলভ্য করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই নীতির লক্ষ্য হলো পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। দরিদ্র ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ ও HIV বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এর অন্তর্ভুক্ত। এ নীতিতে কাউন্সেলিং সেবাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৫. মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি : মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা এ নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য। কেননা, মা সুস্থ হলেই একটি সুস্থ শিশুর জন্ম সম্ভব। তাই এ নীতিতে যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন সন্তান প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা উল্লেখ ছিল। প্রতিটি থানা কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সহযোগী কর্মকর্তা কর্মচারীর উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এ নীতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

৬. হাসপাতাল চিকিৎসা : সাধারণ মানুষ যেন অসুস্থতার সময় তাদের জটিলতার মুহূর্তে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে সে নিশ্চয়তা বিধান করা এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেবার মান উন্নয়ন করা, বিশেষ করে, জীবন রক্ষাকারী তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য।

৭. জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান বিতরণ, সচেতনতা বিস্তার, স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে পৃথক করা হয়। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৮. জনসংখ্যা বন্টন নিশ্চিত করা : সুস্থ দেশ গঠন করার জন্য সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা নীতি অপরিহার্য। দেশের যেকোনো সমস্যা, জটিলতা মোকাবিলা করার জন্য সমন্বিত উপায়ে ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা বন্টন নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা বন্টন নিশ্চিত করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সুস্থ, ভারসাম্যপূর্ণ জাতি গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের মান নিশ্চিতকরণে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বদ্ধপরিকর। ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা গঠনের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়ন সাধনই জাতীয় জনসংখ্যানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন॥১৫॥ বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জাতি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। মেধা মননে, আধুনিক সৃজনশীলতার বিকাশ, চিন্তা-চেতনা উন্নত একটি সুশিক্ষিত জাতিই পারে কোনো দেশকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছে দিতে। তাই সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ : ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক। নিচে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা : শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর আগে তার অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশে এবং প্রয়োজনীয় ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে ১ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা : জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের জন্য শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল হলো প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বিধায় যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। এটি এ নীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৩. বিভিন্ন ধারার সমন্বয় : শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীদের সহজ, সাবলীল ও বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষিত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক এবং অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৪. বিদ্যালয়ের পরিবেশ : শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাঁছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষানীতিতে। কেননা শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক। সেই লক্ষ্যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিধান রাখা হয়েছে।

৫. শিক্ষা সামগ্রী : শিক্ষা সামগ্রী কোনো বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বস্তু। তাই প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬. বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এ শিক্ষানীতিতে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। এ নীতিতে বয়স্ক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা বিদ্যালয়ে যায় না তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা : জাতীয় শিক্ষানীতিতে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে যেন তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির অধীনে কারিগরি ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে।

৮. ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান : বাংলাদেশের দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের প্রায় অধিকাংশ শিশুই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরই বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়ে দেয়। এদের ঝরে পড়া শিশু বলে। এই সমস্যা দূরীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য দুপুরের খাবার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের উপবৃত্তি ব্যবস্থা করা হয়েছে এ নীতির মাধ্যমে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো নানাবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, ক্রীড়া শিক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ দান পর্ব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ, আইন শিক্ষা, চারু ও কারুকলা শিক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এ নীতি শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

প্রশ্ন॥১৬॥ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো লিখ।

অথবা, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা... তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা... উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ সেবা। স্বাস্থ্য সেবা মানুষের জন্য মৌলিক অধিকার। তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ... অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও অঙ্গীকার। বাংলাদেশ সরকারও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) এর মাধ্যমে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা এবং ১৮ (১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং সকল জনগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০... প্রণয়ন করে।

স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা : স্বাস্থ্যনীতি ... হলেও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্তি এবং তা ভোগের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। ... স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো।

১. শিশুমৃত্যু হার : শহরের বস্তি এলাকা, পাহাড়ি ... উপকূলবর্তী অঞ্চল, পরিবেশগত সংকটাপন্ন স্থানে শিশুমৃত্যুর হার অধিক। এসব জায়গায় সরকারি সেবাগুলো পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাছাড়াও শিশুদের অন্যান্য রোগ-ব্যাধি, যেমন– নিউমোনিয়া, অপুষ্টি, কুসংস্কার, ডায়রিয়া, পানিতে ডুবে মারা প্রভৃতি কারণে শিশুমৃত্যুর হার সঠিকভাবে কমানো যাচ্ছে না। নীতি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

২. মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার : পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমলেও তা আশানুরূপভাবে হ্রাস পায়নি। এ অনুপাতে এখনো অনেক বেশি। প্রজননকালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই নবজাতক মৃত্যু উচ্চহারের মূল কারণ। তাছাড়া প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সচেতনতার অভাব স্বাস্থ্য সেবার অনুপস্থিতি, দক্ষ ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের অন্তরায়।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। কেননা, হঠাৎ দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে। যেমন– শ্বাস সংক্রামক ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, পরজীবীবাহিত রোগ, যেমন– ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু। এছাড়াও নতুন নতুন ভাইরাসজনিত রোগ ইত্যাদি।

৪. অসংক্রামক রোগসমূহ : প্রচলিত অসংক্রামক রোগসমূহ যেমন– উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এখনো ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, এইডস প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ফলে এসমস্ত রোগের জন্য রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। এটি নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা।

৫. চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা : চিকিৎসা পেশায় প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালনা ব্যয় এবং আইনি সহায়তার অভাবে নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর নয়। ফলে চিকিৎসা চর্চা, শিক্ষা এবং গবেষণার আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিচ্যুতি ঘটছে। চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতার অবক্ষয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা।

৬. খাদ্য ও পুষ্টি : বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার দিন দিনই কমছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আরো নতুন ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ। যা কিনা একটি স্বাস্থ্যকর জাতিকে নির্দেশ করে না।

৭. গুণগত মান : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই অসন্তুষ্টি স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে। সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব, হাতুরে ডাক্তার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধ পত্রের ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা, ডাক্তার ও রোগীর মাঝে সুসম্পর্কের অভাব প্রভৃতি কারণ স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের পথে সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায়।

৮. নগর স্বাস্থ্য সেবা : শহরের স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি খাতে উচ্চমূল্যের দরুন শহরের গরিব জনগণ, বিশেষত বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ আরো বেশি সমস্যা সৃষ্টি করছে স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে। দ্রুত পরিবর্তনশীল নগরবাসীর স্বাস্থ্যচাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা : আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়ে অবনতি হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ মানুষের নিকট পৌছতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার অবনতির জন্য।

১০. জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব : বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষিত জনসংখ্যা ৬০ শতাংশের কম। জনগণ বিভিন্ন ব্যাধি, অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট অসচেতন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আজও সম্ভব হয়নি। অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এদেশের বেশিরভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয় এ কারণে স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে অনেক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। তবে একটি সুস্থ-সবল, উন্নত জাতি গঠনে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন অতি জরুরি।

প্রশ্ন॥১৭॥ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সকল নাগরিকের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাংলাদেশের অন্যতম অঙ্গীকার। সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের এসব সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে আসছে। এ নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সরকার ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং জনসংখ্যা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ নীতি সরকারের সবচেয়ে সফল নীতিসমূহের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়।

জনসংখ্যা নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি পর্যালোচনা করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেসব বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যা নীতিকে অনন্য করে তুলছে নিচে সেসব বর্ণনা করা হলো :

১. জনসংখ্যা উন্নয়ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিন্যাস উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। একইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিন্যাস উন্নয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনসংখ্যা উন্নয়ন। এটি স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২. বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণসমূহ সেবা : বিশেষ অংশ বলতে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বয়স্ক ও গরিবদের বোঝানো হয়েছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত কৌশলসমূহ এ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিম্নোক্ত কৌশলগুলো জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে গ্রহণ করা হয়।

৩. নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ : নগরমুখিতা নিরুৎসাহিতকরণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার মাধ্যমে পরিকল্পিত নগর সৃষ্টি করা জনসংখ্যা নীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিকভাবে নাগরিক সুবিধা ও বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। তাই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার উল্লেখ আছে।

৪. সমন্বিত তথ্যসংগ্রহ ও ব্যবহার : আদমশুমারি, জনমিতিক জরিপ ও বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল জনসংখ্যা তথ্যের মূল উৎস। তবে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না। তাই এক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এর পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৫. পরিকল্পিত পরিবার গঠন : বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ অনেক কম। তাই জনসংখ্যা নীতিতে দেশের সীমিত সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়' এ শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জনসংখ্যা নীতির আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. পরিবেশগত উন্নয়ন : শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শহরে ও নগরে যানবাহন চলাচল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবাসন স্বল্পতা, স্বল্প পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ এবং বায়ুদূষণ প্রতিনিয়ত পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও অপরিকল্পিতভাবে কৃষিজমিতে আবাসন নির্মাণও পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এজন্য জনসংখ্যা নীতিতে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণের উল্লেখ আছে। যেমন– কৃষিজমিতে বসতবাড়ি নির্মাণ নিরুৎসাহিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বনায়ন কর্মসূচি শক্তিশালী করা, আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানির উৎস চিহ্নিত করা, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যানবাহন সৃষ্ট দূষণ কমিয়ে আনা, ভূমিক্ষয় ও নদী ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া জনসংখ্যা নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৭. চিকিৎসকদের ভূমিকা : জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে চিকিৎসকদের ভূমিকা অপরিহার্য। এ নীতির আওতায় পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসকদের ভূমিকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। চিকিৎসকগণ পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান বৃদ্ধি এবং মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. আইনগত ব্যবস্থা : জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন– অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসংখ্যা নীতি কার্যকরকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন– জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিচ্ছেদ নিবন্ধনকরণ, কাজের দ্বৈততা পরিহারকরণ, জন্ম নিবন্ধনকে সকল কাজে প্রয়োগ করা প্রভৃতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জনসংখ্যা নীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও এর আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো এ নীতিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। যেমন– মানব সম্পদের বিকাশ, কর্মসূচি বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ প্রভৃতি। বাংলাদেশের 'জনসংখ্যা নীতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হলেও এটি এদেশের সার্বিক উন্নয়নের একটি দলিল। এ নীতিতে প্রণীত বিভিন্ন মেয়াদে কর্মকৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলেই এর বৈশিষ্ট্যসমূহের সার্বিক দিক সার্থকভাবে প্রতিফলিত হবে।

প্রশ্ন॥১৮॥ শিশুকল্যাণ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, শিশুকল্যাণ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

অথবা, শিশুকল্যাণ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশু জাতি গঠনের মূলভিত্তি। সুখী, সমৃদ্ধ, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সকল শিশুকে পূর্ণ মর্যাদাবান মানুষ রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এদেশে শিশুরা বিভিন্ন আর্থসামাজিক, দৈহিক, মানসিক নানা সমস্যায় জর্জরিত। এজন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করে।

শিশু কল্যাণ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ : শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, তাদের সুরক্ষা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিশু নীতির উদ্দেশ্য। নিচে শিশু নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. আইন প্রণয়ন : শিশুদের অধিকার এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য চাই প্রয়োজনীয় আইন। কেননা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই শিশুসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। তাই শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা শিশুকল্যাণ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. শিশুর সুরক্ষা : শিশু অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এ নীতিতে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিধান রয়েছে। শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধের কৌশল এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৩. সুস্থভাবে জন্ম ও বেঁচে থাকা : শিশুর সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ এবং বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা শিশুকল্যাণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের শিশুরা নানাভাবে তাদের অধিকার এবং মৌল মানবিক চাহিদা হতে বঞ্চিত হয়। শিশু কল্যাণ নীতিতে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিধান রয়েছে। এ নীতির অধীনে শিশুকল্যাণ যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

৪. শিশুর সর্বোত্তম উন্নয়ন : শিশুর সর্বোত্তম উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এই শিশু কল্যাণ নীতি প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিনোদন শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুদের অধিকারের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গগত, ধর্মীয়, জাতিগত, পেশাগত, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সর্বোত্তম উন্নয়ন নিশ্চিত করা শিশু কল্যাণ নীতির উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫. শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ : শিশুকল্যাণ নীতিতে শিশুর শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশই ভবিষ্যতে দেশের কল্যাণ বয়ে আনবে। এজন্য শিশুর সুষ্ঠু ও মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের নৈতিকতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এ নীতির অধীনে।

৬. শিশুর মতামতের প্রতিফলন : শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশুর মতামত গুরুত্ব দিতে হবে। এর ফলে শিশুর নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হবে। তাই শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা শিশুকল্যাণ নীতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৭. পারিবারিক পরিবেশ : শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো পরিবার। কেননা, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিবার থেকেই। তাই পারিবারিক পরিবেশ সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই শিশু কল্যাণ নীতি শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য পারিবারিক পরিবেশের উন্নতিকে বিশেষ উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছে।

৮. দায়িত্বশীল নাগরিক : উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের দেশ সম্পর্কে আরো আগ্রহী এবং সচেতন করে তুলতে হবে। যাতে তারা সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে। তাই শিশুদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা শিশু কল্যাণ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমেই জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব। তাই শিশু কল্যাণ নীতি শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব উদ্দেশ্যের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে শিশুদের সুন্দর ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন-১১। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যসমূহ কী?

[জা. বি. ২০১৮]

অথবা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ হলো নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম প্রণীত হয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি। পরবর্তীতে ২০০৪, ২০০৮ সালে এবং সর্বশেষ ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ আত্মপ্রকাশ করে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ : নারীদের অবস্থার উত্তরণ এবং তার সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। নিচে এর উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা মূলত পুরুষতান্ত্রিক। কিন্তু এদেশে নারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তাই তাদের পুরুষদের সমান অধিকার ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সবচেয়ে আগে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরি। তাই বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

২. নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা : নারীরা সামাজিক এমনকি পারিবারিকভাবে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। যার ফলে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বিশেষ করে স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, সন্তানহীন নারীরা সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হয়। এসব নারীদের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্য নিয়েই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নারী উন্নয়ন নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা : প্রতিটি মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব অধিকার অত্যাবশ্যক সেগুলোই হচ্ছে মানবাধিকার। পুরুষের সাথে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য, অবহেলা, নির্যাতন দূর করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এ নীতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৪. নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ : আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এ নীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। কেননা, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ব্যতীত আর্থসামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব। তাই নারীদের পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ জাতীয় নারী নীতিতে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. বৈষম্য নিরসন : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা। ছেলেমেয়ে সকলেই সমান এই-মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. স্বীকৃতি দান : আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কাজের, তাদের অবদানের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এমনকি মূল্যায়নও করা হয় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের উল্লেখ আছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে।

৭. সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ : একজন সুস্থ মা-ই পারেন একটি সুস্থ সবল জাতি উপহার দিতে। নারীরা অনেক বেশি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। লিঙ্গ বৈষম্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা নারীর পুষ্টিহীনতার ক্ষেত্রে অধিক নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। তাই ভবিষ্যৎ জাতির কল্যাণে রাষ্ট্রে সুস্থ মা অপরিহার্য। নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৮. পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা : ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এ নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এ নীতির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়াও নারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির কথাও এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ : শিক্ষা, মেধা, প্রজ্ঞার মাধ্যমে নারীর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন করার উদ্দেশ্যে এ নীতি প্রণয়ন করা হয়। নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদানের উল্লেখ করা আছে এ নীতিতে। মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১০. প্রয়োজনীয় আইন বাস্তবায়ন : নারীদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উল্লেখ রয়েছে এ নীতিতে। তাছাড়াও নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়নের কথা আছে এ নীতিতে। আইনের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ নারীদের সার্বিক কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ নীতিতে নারীদের সার্বিক কল্যাণের চিত্র ফুটে উঠেছে। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও এ নীতির আরো নানাবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন– নারীর মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সুযোগ সম্প্রসারিত করা, নারীস্বার্থ বিরুধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি। এসব নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই নারী কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব। সবশেষে বলা যায় যে, নারীর সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের ধারণা সামনে রেখেই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন।২০। অপরাধ কী?

অথবা, অপরাধের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, অপরাধ কাকে বলে?

উত্তর। ভূমিকা : যে সব আচার-আচরণ প্রচলিত দেশ রীতিনীতির বহির্ভূত, সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি এবং সমাজে মানুষের ক্ষতিসাধন করে তাই হচ্ছে অপরাধ। বর্তমানে বাংলাদে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। দ্রুত অপরিকল্পি পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, হতাশা, দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যা সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অপরাধমূলক কর্মক যেকোনো দেশ, মানুষ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এবং হুমকিস্বরূপ তাই সমাজে অপরাধ দমন করা জরুরি।

অপরাধ : সাধারণ ভাষায় অপরাধ বলতে এমন এ অস্বাভাবিক আচরণকে বুঝায় যা প্রচলিত আইন, সামাজি রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি। এজন্য অস্বাভা আচরণকারী বা অপরাধীকে বিচার ও দণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো

স্বনামধন্য সমাজবিজ্ঞানী জে. এল. গিলিন ও জে. পি. গিলি মত পোষণ করেছেন, "সমাজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের বিশ্ব মতে, যারা ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত, সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞানু তারাই অপরাধী বা কিশোর অপরাধী বলে বিবেচিত।

অপরাধ বিজ্ঞানী Garofato অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা বলেন, "মানুষের আবেগ অনুভূতিকে আহত করে এবং সমাজে জন্য যা ক্ষতিকর তাই অপরাধ।"

অধ্যাপক **F R Khan** এর ভাষায়, "যে সব আচরণ সমা ও নৈতিক বিরোধী তাকে অপরাধ বলে।"

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "অপরাধ হচ্ছে যেকো ধরনের আচরণ যা আইন লঙ্ঘন করে।"

মনীষী অ্যাচলার এর মতে, "আইন ও নৈতিকরা বিরো কাজই হচ্ছে অপরাধ।"

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ **ডুব** এর ভাষায়, "প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বা সংঘটিত কোনো কাজ যদি প্রচলিত প্রথানুযায়ী নির্ধারিত আইনে আওতায় আসে তবে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।"

সমাজবিজ্ঞানী **বার্নস ও টিটারস** এর মতে, "অপরাধ হ এমন এক ধরনের সমাজবিরোধী আচরণ, যা জনগণের স্বাভাবি অনুভূতির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং যা দেশের সংবিধান কর্তৃক নি ঘোষিত।"

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষ কর্তৃক যেসব আচার আচরণ মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও স্বার্থকে আ করে ও সমাজের জন্য ধ্বাংসত্মক হিসেবে বিবেচিত হয় ত হচ্ছে অপরাধ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আইন লঙ্ঘনই হ অপরাধ। সমাজে এবং মানুষের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড বাঞ্ছিত মঙ্গলজনক লে বিবেচিত, সেগুলোর বিপরীত বা বিরো কর্মকাণ্ডই হচ্ছে অপরাধ। যা নিরসনের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজ বিধিবিধান প্রয়োগ করে এবং তাদের সংশোধনের জন্য শাস্তিমূ ব্যবস্থার আয়োজন করে। অপরাধীকে আইনের আওতায় এ তাকে শাস্তি ও সংশোধনের ব্যবস্থা করে থাকে রাষ্ট্র যা অপর দমনের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন।২১। **শিশুদের মৌল চাহিদাসমূহ তুলে ধর।**

অথবা, শিশুদের মৌল চাহিদাসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, শিশুদের মৌল চাহিদাগুলো লিখ।

উত্তর।। ভূমিকা : শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এরা একটি পরিবারের ক্ষুদ্র সম্রাট হিসেবে বিবেচিত। এজন্য শিশুদের যথাযথ যত্ন ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। জন্মপূর্ব কাল থেকেই শিশুদের যত্নের প্রয়োজন।

শিশুদের মৌল চাহিদাসমূহ : সুস্থ, স্বাভাবিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যেসব প্রয়োজন পূরণ করা অত্যাবশ্যক সেগুলোকেই শিশুদের মৌল প্রয়োজন বলে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি শিশুদের আরো কিছু অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. শিশুর জন্মপূর্ব ও পরবর্তী চিকিৎসা ও সেবাযত্ন : জন্মপূর্ব যত্ন যখন শিশু মায়ের গর্ভে থাকে, পরবর্তী চিকিৎসা, সেবাযত্ন শিশুর অব্যক্ত মৌলিক চাহিদা। জন্মের পূর্বে মায়ের সুচিকিৎসা ও সেবাযত্ন পরোক্ষভাবে শিশুরই সেবাযত্ন। কেননা মায়ের গর্ভে থেকেই শিশুর বিকাশ শুরু হয়। এরপর জন্মগ্রহণ এবং জন্মের পরবর্তী সেবা ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিশু সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। এটি শিশুর গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা।

২. স্নেহ ভালোবাসা : জন্মের পর বেড়ে ওঠার পথে বাবা-মা, পরিবার, প্রতিবেশীদের স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া শিশুদের অন্যতম মৌল চাহিদা। যথোপযুক্ত স্নেহ-ভালোবাসা, বিশ্বাস শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। প্রতিটি পরিবারের কর্তব্য শিশুদের ভালোবাসা।

৩. সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য : খাদ্য প্রত্যেকটি মানুষেরই মৌলিক অধিকার। শিশুর জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য। সুষম খাদ্য শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে ভূমিকা রাখে। তাই এটি তাদের মৌলিক অধিকার।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচিতি : পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকর্তৃক শিশুর লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচিতি শিশুর অন্যতম অধিকার। এগুলো শিশুর স্বতন্ত্র পরিচয় বিকাশে সহায়তা করে। সকলের এ বিষয়ে সচেতনতা অপরিহার্য।

৫. সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ : সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ শিশুর অন্যতম প্রধান মৌল চাহিদা। পরিবার, বিদ্যালয়, ভালো খেলার সাথী ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ সামাজিকীকরণ শিশুর সারা জীবনের শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. শিক্ষা : প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গণ চাহিদা শিশুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশু অবস্থায় যে শিক্ষা তারা গ্রহণ করে তাই পরবর্তী জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। সেজন্য শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

৭. নিরাপত্তা : শিশুদের সর্বাবস্থায় উপযুক্ত নিরাপত্তা বিধান করা অপরিহার্য। পরিবার এক্ষেত্রে শিশুর নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। রাষ্ট্রকর্তৃক শিশুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাওয়া শিশুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা।

৮. প্রতিরক্ষা : সকল ধরনের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্যাতিত শিশু নিজের ও দেশের কল্যাণ আনতে পারে না। তাই নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া শিশুর আরেকটি মূল চাহিদা।

৯. উপযুক্ত পরিবেশ : শিশুর বিকাশে সুষ্ঠু পরিবেশ অপরিহার্য। শিশুর জন্য উপযুক্ত নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিশুকে সকল ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ও পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে।

১০. সামাজিক চাহিদা : শিশু সমাজে জন্ম নেয় এবং সমাজেই বেড়ে উঠে। সমাজ থেকে অনেক কিছুই শিশু আশা করে। যেমন– উপযুক্ত বন্ধু পাওয়া, পরিবেশ পাওয়া, প্রশংসা, উপযুক্ত সুযোগ, সমঅধিকার, সুষ্ঠু আচরণ, বিশ্বস্ততা অর্জন, সম্মান প্রভৃতি। এই সামাজিক চাহিদাগুলো শিশুকে সুষ্ঠু, ন্যায়বান মানুষ হতে সাহায্য করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে উপরিউক্ত চাহিদা বা প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা আবশ্যক। এগুলো ছাড়াও শিশুর বিকাশে আরো নানাবিধ উপাদান অপরিহার্য। যেমন– চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, মানসিক চাহিদা, চরিত্র গঠন, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান ও পরিধান, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। শিশুকল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

প্রশ্ন।২২। **বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিখ।**

অথবা, বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক অধিকারসমূহ তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক অধিকারসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর।। ভূমিকা : শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এরা একটি পরিবারের ক্ষুদ্র সম্রাট হিসেবে বিবেচিত। এজন্য শিশুদের যথাযথ যত্ন ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। শিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই শিশুদের যত্নের প্রয়োজন হয়। শিশুদের যথাযথ বিকাশের জন্য শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক অধিকারসমূহ : যেসব অধিকার ব্যতীত শিশুরা সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না সেগুলোকে শিশুর মৌলিক অধিকার বলে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, সুষ্ঠু পরিবেশ ও যত্ন শিশুর মৌলিক অধিকার। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. যত্ন : শিশুর জন্মের পূর্বে ও পরে সেবা, যত্ন, স্নেহ, ভালোবাসা পাবার অধিকার হচ্ছে মৌলিক অধিকার। মাতৃগর্ভে থেকে চিকিৎসা, সেবাযত্ন পরোক্ষভাবে শিশুরই যত্ন। যত্ন প্রতিটি শিশুর জন্যই অপরিহার্য। কেননা মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর বিকাশ শুরু হয় এবং পরবর্তী সেবাযত্ন ভালোবাসা শিশুর বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। তাই সর্ব অবস্থায় যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়া শিশুর মৌলিক অধিকার।

২. খাদ্য : সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। কেননা খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম খাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য। শিশুর জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা প্রথমত পরিবার কিংবা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৩. বস্ত্র : বস্ত্র শিশুর অন্যতম মৌলিক অধিকার। বস্ত্র শুধু লজ্জা নিবারণই করে না। এটি সংস্কৃতিরও ধারক এবং বাহক। বস্ত্রের চাহিদা পূরণ হওয়া শিশুর মৌলিক অধিকার। পরিবার সক্ষম না হলে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক এ অধিকার নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

৪. বাসস্থান : গৃহ মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। একটি পরিবারের জন্য বাসস্থান অপরিহার্য অধিকার। নিরাপদে ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বাসস্থান অত্যাবশ্যকীয়। তাই প্রতিটি শিশুর জন্য বাসস্থানের অধিকার পূরণ হওয়া অপরিহার্য।

৫. চিকিৎসা : সুচিকিৎসা পাওয়া শিশুর মৌলিক অধিকার। রোগ, অসুখ মানুষের জীবনে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অসুখে যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মানুষের জীবনধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রেও তাই। সেজন্য নীরোগ জাতিগঠন করতে প্রতিটি শিশুর জন্য সুচিকিৎসা পাওয়া একটি প্রধান মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত।

৬. শিক্ষা : শিক্ষা ব্যতীত মানুষ নিজেকে এবং দেশকে উন্নত করতে পারে না। মানুষের ভেতরে অজ্ঞতা দূর করতে ভালোমন্দ নির্ণয় করার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তাই একটি দেশের প্রতিটি মানুষের শিক্ষা অপরিহার্য মৌলিক অধিকার। প্রতিটি শিশুর সুষ্ঠু দৈহিক, মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু শিক্ষা শিশুর অধিকার।

৭. নিরাপত্তা : নিরাপত্তা শিশুর মৌলিক অধিকার। পরিবারের দায়িত্ব শিশুকে নিরাপদ রাখা। কিন্তু সেটা সম্ভব না হলে রাষ্ট্র এবং সমাজ দ্বারা নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে প্রতিটি শিশুর। তাছাড়াও অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুর নিরাপত্তা অপরিহার্য।

৮. সুষ্ঠু পরিবেশ : সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া শিশুর বিকাশ সম্ভব নয়। তাই এটি শিশুর অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিশুর জন্য উপযুক্ত নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিশুকে সকল ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ও পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত চাহিদাগুলো শিশুর মৌলিক অধিকার। যে অধিকারগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না সেগুলোই মৌলিক অধিকার। শিশুর জীবনের জন্য এই অধিকারগুলো অপরিহার্য। এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়। তার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত হয়। শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়ে সে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য মৌলিক অধিকার পূরণ নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন॥২৩॥ জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তরগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিক্ষা মানবজীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। শিক্ষা মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে। বাংলাদেশের সংবিধানেও শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তথাপি শিক্ষাকে দেশের সকলের মাঝে বিস্তার ঘটানোর সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই সরকার শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নীতি গঠনের জন্য ১৯৯৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর ১৯৯৮ সালে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে খসড়া নীতি প্রণয়ন করার জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২০০০ সালে ২৮টি অধ্যায়ের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তর : নিম্নে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা।
২. বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা।
৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা।
৫. মাদ্রাসা শিক্ষা।
৬. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা।
৭. উচ্চশিক্ষা।
৮. প্রকৌশল শিক্ষা।
৯. চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা।
১০. বিজ্ঞান শিক্ষা।
১১. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা।
১২. ব্যবসায় শিক্ষা।
১৩. কৃষি শিক্ষা।
১৪. আইন শিক্ষা।
১৫. নারী শিক্ষা।
১৬. কারুকলা ও সুকুমার বৃত্তি শিক্ষা।
১৭. বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী।
১৮. ক্রীড়া শিক্ষা।
১৯. গ্রন্থাগার শিক্ষা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শিক্ষানীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ নীতি জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োগ হয়। সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিলে শিক্ষানীতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশলগুলো আলোচনা কর।

অথবা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিক্ষা মানবজীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। শিক্ষা মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে। বাংলাদেশের সংবিধানেও শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তথাপি শিক্ষাকে দেশের সকলের মাঝে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই সরকার শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নীতি গঠনের জন্য ১৯৯৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর ১৯৯৮ সালে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে খসড়া নীতি প্রণয়ন করার জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২০০০ সালে ২৮টি অধ্যায়ের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এ ২৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ২ নং অধ্যায়ে প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বিস্তারের কৌশল সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল : যে কোন নীতি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গেলেই কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তেমনি প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়নেও কতকগুলো কৌশল প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এ কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. মেয়াদ : প্রাথমিক শিক্ষা লাভের মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর মেয়াদি করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সমন্বয় : বাংলাদেশের সংবিধানে একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে। তাই সংবিধানের তাগিদেই বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক এবং অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তবে যেসব কিন্ডারগার্টেন, 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেলসহ ইংরেজি মাধ্যমভিত্তিক পরবর্তী পর্যায়ের কিন্ডার স্কুলরূপে শিক্ষা দান করবে সেগুলো সরকারি অনুমতি লাভের মাধ্যমে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার মান এবং ছাত্রদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহ আট বছর ব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু : প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা লাভের বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এবং বিজ্ঞান। তাছাড়া থাকবে চারুকলা ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত প্রভৃতি। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরক জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যেসব শিক্ষার্থী আর বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে না তারা এ বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রাথমিক স্তরে ভর্তির বয়স : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ অনুসারে ৬+ বছরের বয়স্ক প্রতিটি শিশুর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৪০।

৫. শিক্ষা সামগ্রী : প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলির ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম কাঠামো অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের জন্য বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা : পাঠ্যপুস্তক ও প্রয়োজন হলে সহায়ক পুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি প্রকাশ করবে।

৬. শিক্ষণ পদ্ধতি : শিশুর সৃজনশীল চিন্তা এবং দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে এককভাবে বা দলভিত্তিক কার্যসম্পাদনের সুযোগ প্রদান করা হবে। কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা দান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ এবং বাস্তবায়নের জন্য গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭. শিক্ষার্থী মূল্যায়ন : প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রতিটি শ্রেণীতে সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৮. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সমাজের সম্পৃক্ততা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। তবে ক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের পদোন্নতি : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সাধারণ যোগ্যতা হবে প্রাথমিক পর্যায়ের ১-৫ শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচ.এস.সি অথবা এস.এস.সি (যখন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষের পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে গণ্য হবে) পাস এবং ৬-৮ শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রীধারী পুরুষ বা মহিলা। প্রধান শিক্ষক হিসেবে সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সি.ইন.এড. বা বি.এড. (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে।

১০. **শিক্ষক নির্বাচন :** দেশের সকল সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন ও সাহায্য লাভকারী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য মেধাভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এ কমিশন শিক্ষা এবং প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। যথাযথ লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, দেশের সকল মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা এবং এ প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের শিক্ষা। আর এ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে উল্লিখিত কৌশলগুলো অবলম্বন করে তাকে সর্বোত্তমমাত্রায় কার্যকরী করে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন॥২॥ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। তবুও স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতকে সে রকম প্রয়োজনমতো গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। স্বাস্থ্য সেবায় যেসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল অপূর্ণাঙ্গ এবং অপ্রতুল। ফলে এ দেশের মানুষ বরাবরই উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা রকম রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করে। আর এরই প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ (National Health Policy-2000) প্রণয়ন করা হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. **সর্বস্তরের জনগণের কাছে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া ও স্বাস্থ্য মানের উন্নয়ন সাধন :** বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) সমাজের সকল স্তরের মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্যের মানের উন্নতি সাধন করা।

২. **সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা :** নিম্ন ... জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের দরিদ্র ও ... জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ... উদ্ভাবন করা।

৩. **চিকিৎসা ব্যবস্থার মান, গ্রহণযোগ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা :** প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং উপজেলা ও ইউনি... পর্যায়ে সরকারি চিকিৎসা সেবার মান, গ্রহণযোগ্যতা ... সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ এর ... অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. **সর্বশ্রেণীর মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধির ব্যবস্থা :** সমাজে ... সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মাঝে বিশেষ করে শিশু ও মায়ের ... অপুষ্টির হার হ্রাস করা এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধির ... কার্যকর ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৫. **শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস :** দেশে বিদ্যমান শিশু ... মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ মৃ... হারকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করার যথোপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৬. **মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন :** দেশের ইউনি... পর্যায় পর্যন্ত মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের ... সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ... গ্রামে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন সন্তান প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ সু... প্রদান করা।

৭. **মা ও শিশুর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ সু... বৃদ্ধি :** মা ও শিশুর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ সু... বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা।

৮. **সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যব...** দেশের প্রতিটি উপজেলা বা থানা হেলথ কমপ্লেক্স এবং ইউনি... স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ... অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীর উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় চিকি... সামগ্রীর ব্যবস্থা করা।

৯. **সরকারি হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা স... সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা :** দেশের সর্বস্... জনসাধারণ যাতে সরকারি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা স... সুযোগ সুবিধার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে ... উপায় উদ্ভাবন করা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালসমূ... ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রদত্ত সেবার ... সন্তোষজনক পর্যায়ে আনীত করার ব্যবস্থা করা।

১০. **মেডিকেল কলেজ ও প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর ... সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন :** মেডিকেল কলেজ ও প্রাই... ক্লিনিকগুলোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং ... প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও সেবার মান সম্পর্কে য... আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১১. **রিপ্লেসমেন্ট লেভেল অব ফার্টিলিটি অর্জন করা :** আ... ২০০৫ সালের মধ্যে 'Replacement Level of Ferti... অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে আ... গতিশীল ও জোরদার করার ব্যবস্থা করা।

১২. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলা : গ্রাম ও শহর এলাকার অতি দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, সহজলভ্য এবং কার্যকর করে তোলার কৌশল উদ্ভাবন করা।

১৩. প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা : দেশের মানসিক প্রতিবন্ধী এবং শারীরিক বিকলাঙ্গদের সাথে সাথে বরং বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

১৪. পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনা করা : পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে আরো দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে জবাবদিহিমূলক এবং ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনা করার কৌশল উদ্ভাবন করা।

১৫. জটিল রোগের সন্তোষজনক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও বিদেশ গমনকে সীমিত করা : দেশের ভিতরে সব রকমের জটিল ও কঠিন রোগের সন্তোষজনক চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলন এবং চিকিৎসার জন্য অতিমাত্রায় বিদেশ গমনের প্রয়োজনীয়তাকে সীমিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয় এবং এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য উপরে বর্ণিত মূল নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা হলে দেশের প্রতিটি নাগরিক সে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা লাভ করতে সক্ষম হবে তা জোর দিয়েই বলা যায়।

প্রশ্ন।৩। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূলনীতি আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। তবুও স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতকে সে রকম প্রয়োজনমতো গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। স্বাস্থ্য সেবায় যেসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল অপূর্ণাঙ্গ এবং অপ্রতুল। ফলে এ দেশের মানুষ বরাবরই উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা রকম রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করে। আর এরই প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ (National Health Policy-2000) প্রণয়ন করা হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূলনীতি : জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য কতিপয় মূলনীতি (Policy Principles) চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চিহ্নিত মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে সহায়তা : বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, মহিলা-পুরুষ এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও যোগ্য করে তোলা।

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলো প্রত্যেক নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়া : বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের যে কোন ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যবধানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলো প্রত্যেক নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়া।

৩. গুরুত্বসম্পন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা : বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত, গরিব ও বেকারত্বপীড়িত জনগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান সম্পদের সুষম বণ্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা : স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের ও জনগণের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে, ব্যবস্থাপনায়, স্থানীয় তহবিল গঠনে, মনিটরিং এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদ্ধতি পর্যালোচনায় প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা।

৫. সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা : সমাজের সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

৬. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সমন্বিত, সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ : পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সমন্বিত, সম্প্রসারণ ও জোরদার করার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৭. স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগতমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন : স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য যথার্থ, সঠিক ও গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবাদান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং তাগিদ মাফিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করা।

৮. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাগুলোকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ এবং গবেষণা করা : দেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলোকে আরো গতিশীল, জোরদার এবং সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার, পদ্ধতি উন্নয়ন এবং গবেষণা কর্মসূচিকে উৎসাহ প্রদান করা।

৯. স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত আইনের কার্যকারিতা : স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহীতাসহ দেশের সর্বস্তরের নাগরিকের অধিকার, সুযোগ সুবিধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিধিনিষেধের ব্যাপারে আইনের আশ্রয় লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন : দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা পূরণের সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং অতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্নিহিত মূলনীতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয় এবং এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য উপরে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০০০ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা হলে দেশের প্রতিটি নাগরিক যে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা লাভ করতে সক্ষম হবে, তা জোর দিয়েই বলা যায়।

প্রশ্ন।৪। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, জনসংখ্যা নীতি কি? জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যসমূহের বিবরণ দাও।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ ছোট দেশটিতে ১৪ কোটিরও বেশি লোক বসবাস করে। বাংলাদেশের এ বিশাল জনসংখ্যা এ দেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং পাশাপাশি আরো অসংখ্য সমস্যার জন্মদাতা। তাই স্বাধীনতা লাভের পর হতে এ দেশে যতগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার প্রতিটিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পরিবার পরিকল্পনাকে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়।

এসব অবস্থা পর্যালোচনা করেই ১% জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় শিশু নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : বাংলাদেশের গতি-প্রকৃতি পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনমান উন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে জাতীয় শিশু নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়। দেশের অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও উৎকর্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্য নিয়ে এটা প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে জাতীয় শিশু নীতি-২০০০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. সর্বস্তরের মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা : যথাযথ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের উপরই নির্ভর করে একজন মানুষের সার্বিক কল্যাণ। তাই জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ এর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল এবং শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য পরিবার পরিকল্পনা ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

২. উপযুক্ত প্রযুক্তি সরবরাহ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি : বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী, জোরদার ও গতিশীল করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি সরবরাহ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কারণ ফলপ্রসূভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি সরবরাহ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৩. দেশের মা ও শিশু মৃত্যুর উচ্চ হার হ্রাস করা : বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার খুবই বেশি। জনসাধারণের মাঝে বিশেষ করে মা ও শিশুদের অপুষ্টির হার হ্রাস করা; তাদের কাছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য কার্যকর ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করার লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি-২০০০ প্রবর্তন করা হয়। দেশে বিদ্যমান মা ও শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ এর মাত্রা থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে অর্ধেক এবং ২০১৫ সালের মধ্যে পুরো মাত্রায় অর্জন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

৪. স্থিতিশীল জনসংখ্যা গঠন করা : যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি স্থিতিশীল ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা অপরিহার্য। আর তাই ২০০৫ সালের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট লেভেল অর্জন এবং বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি একটি স্থায়ী ও স্থিতিশীল জনসংখ্যা গঠন করার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

৫. প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা : দেশের পরিবার পরিকল্পনা সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সন্তোষজনকভাবে নিশ্চিত করা। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার দ্বারা যথাযথ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দেয়া প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব রকম সুযোগ সুবিধা, তথ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার সর্বোত্তম উন্নয়ন সাধন করাই জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য।

৬. দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা : বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পন্থা উদ্ভাবন করা।

৭. জনসংখ্যার ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা : জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। দেশের নগরায়ণের আশঙ্কাজনক অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সমন্বিত উপায়ে ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা বণ্টন নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা বণ্টন নিশ্চিত করা জাতীয় জনসংখ্যা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। দেশের সার্বিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং জনসংখ্যার মাঝে স্থানগত ভারসাম্য অর্জনের জন্য অব্যাহত আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং শহরের অবকাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জোরদার ও শক্তিশালী করার কৌশল গ্রহণ করার নীতিও এর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার সুবাদে বলা যায় যে, দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের মান নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে দেশে ভারসাম্যপূর্ণ জনসংখ্যা গঠন করার লক্ষ্যেই জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন।৫। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মৌলিক কর্মকৌশলসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় জনসংখ্যা নীতির পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দাও।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ ছোট দেশটিতে ১৪ কোটিরও বেশি লোক বসবাস করে। বাংলাদেশের এ বিশাল জনসংখ্যা এ দেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং পাশাপাশি আরো অসংখ্য সমস্যার জন্মদাতা। তাই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যতগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার প্রতিটিতেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার ধারণাকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মৌলিক কর্মকৌশল : বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য সন্তোষজনক স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করা এবং জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির হার দ্রুত কমিয়ে আনাই জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ এর প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং সেবা দানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে দারিদ্র্য এবং স্বল্প সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা এবং শিশুদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেবাদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ব্যয়-সাশ্রয়ী এবং টেকসই কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করা। যেসব কর্মকৌশলের আলোকে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. কার্যক্রমের ব্যাপ্তি : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সামগ্রিকভাবে সুবিধা লাভকারী প্রার্থী পদ্ধতি সৃষ্টি করে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ সকল অত্যাবশ্যক সেবা দান নিশ্চিত করা দরকার। এ রকম সেবার অন্তর্ভুক্ত সেবা কার্যক্রমগুলো হলো : ১. প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ২. শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ৩. সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সেবা, ৪. সীমিত উপশমমূলক সেবা কার্যক্রম, ৫. যোগাযোগের মাধ্যমে আচার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা।

২. কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা : সমাজের সর্বস্তরের জনগণের নিকট সেবা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পুনর্গঠন পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। প্রাইমারি পর্যায়ে উপজেলা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি সমন্বিত করে একক কাঠামোর আওতায় থাকা হবে। যেভাবে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে, তা হলো : ১. একক ব্যবস্থাপনা, ২. কমিউনিটি ক্লিনিক, ৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে একক ব্যবস্থাপনার স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা করা, ৪. থানা এবং উপজেলা ব্যবস্থাপক পদ সৃষ্টি, ৫. সম্পদের সর্বাধিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

৩. কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ : দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য সেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। স্থানীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করে কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা হবে।

৪. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ : পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হয় এবং এ খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব থেকে এ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়।

৫. পরিবার পরিকল্পনা সেবার খরচের অংশদারিত্ব : ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ফি আদায়, স্থানীয় সরকার কর্তৃক অর্থায়ন, স্থানীয় সমাজের বা জনগোষ্ঠীর দ্বারা অর্থায়নের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থসংগ্রহের দ্বারা যথাযথ সেবার মান নিশ্চিত করতে হবে।

৬. উপকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সিস্টেমস্ কমানো : স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের আর একটি উপায় হলো সিস্টেমস্ কমানো। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে প্রচলিত উপকরণসমূহ কার্যকর ব্যবহার বাড়ানো এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭. প্রয়োজনীয় জনবল নির্ধারণ : সময় এবং প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে নিয়োজিত জনবলের চাহিদা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করতে হবে।

৮. মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন : কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য চাহিদামাফিক তৃণমূল পর্যায়কে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মানবসম্পদের জ্ঞান এবং দক্ষতার সর্বোত্তম সুফল অর্জনের জন্য একটি সঠিক ও চাহিদামাফিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল গড়ে তুলতে হবে।

৯. তথ্য ব্যবস্থাপনা : পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি এবং অবস্থা নিরূপণের জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। তাই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মনিটরিং এর জন্য একীভূত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরো জোরদার এবং বিস্তৃত ও কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে বিস্তার করা হবে।

১০. গবেষণা ও মূল্যায়ন : স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদার ও তাতে সম্পৃক্ত মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। তাই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে গবেষণা ও মূল্যায়নলব্ধ জ্ঞান সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

১১. মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং পুরুষদের অংশগ্রহণ : পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ কর্মসূচিতে পুরুষদের সমভাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা হবে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ প্রণয়ন করা হবে। আর জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০ উপর্যুক্ত কর্মকৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়াসী হয়।

প্রশ্ন॥৬॥ জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় শিশু নীতির মূল বিষয়গুলো লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। অথচ বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক। বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিশু মৃত্যুর দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া অপুষ্টি, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা এবং আশ্রয়হীনতাসহ নানা রকমের সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশের শিশু। এই শিশুদের উন্নয়ন যে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করে; উক্ত শিশু নীতিতে কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : ১৯৪৪ সালে গৃহীত জাতীয় শিশু নীতিতে গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. শিশুর জন্ম ও বেঁচে থাকা : শিশুর জন্ম ও বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়। যথা :

ক. সকল শিশুর সুস্থ জন্মগ্রহণ ও বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে গর্ভবর্তী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবস্থা করা। এছাড়া কর্মজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, যাতে শিশুর জন্ম ও বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত হয়।

খ. শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং অফিস আদালতে কর্মজীবী মহিলারা যাতে তাদের শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

গ. শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু লালনপালনকারীদের পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। যেমন– অন্ধত্ব নিবারণে শিশুদেরকে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ. ইপিআই টিকাদান কর্মসূচির আওতায় শিশুর জীবননাশকারী ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করা। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া, আমাশয়, শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

২. শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ : জাতীয় শিশু নীতিতে শিশুর শিক্ষা ও মানসিক বিকাশত নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়। যথা :

ক. সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

খ. মেয়ে শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

গ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ. স্কুল ত্যাগী শিশুদের বিশেষত মেয়ে শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের (মাদ্রাসার) ব্যবস্থা করা।

৩. মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ : জাতীয় শিশু নীতিতে শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. সকল শিশুর মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

খ. শিশুকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

গ. শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঘ. শিশুর মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা।

৪. পারিবারিক পরিবেশ : জাতীয় শিশু নীতিতে বর্ণিত পারিবারিক পরিবেশে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. শিশুর শিক্ষা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধানে পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব সুনিশ্চিত করা।

খ. সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় মানবজাতির পক্ষে বিশ্ব শান্তি, সংগতি ও ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়।

গ. কর্মজীবী মহিলাদের সন্তান লালনপালনের জন্য দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রস্থাপন।

৫. আইনগত অধিকার : শিশুর আইনগত অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শিশু নীতিতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান রাখা হয় সেগুলো হলো :

ক. প্রচলিত আইনগুলোর প্রয়োগ বা সংশোধনের সময়ে শিশুর স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।

খ. অপরাধের জন্য শিশুর দৈহিক বা মানসিক গঠন পরিহার করা।

গ. অপরাধী শিশুর প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন এবং তার মর্যাদার প্রতি যত্নবান হওয়া।

ঘ. প্রচলিত বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে বিপথগামী শিশুকে সংশোধন করা।

৬. বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশু : দেশের বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো :

ক. অবহেলিত, পরিত্যক্ত, দুস্থ, অনাথ ও আশ্রয়হীন শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা, ভরণপোষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

খ. প্রতিকূল ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী ও সাহায্য প্রদান।

গ. দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সকল শিশুকে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

ঘ. সকল শিশুকেই মানব সৃষ্ট সংকট বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে রক্ষা করা।

৭. প্রতিবন্ধী শিশু : জাতীয় শিশু নীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক. যেসব শিশু শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে প্রতিবন্ধী তাদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সুযোগ নিশ্চিত করা।

খ. শৈশবকালীন প্রতিবন্ধীত্ব দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন– টিকাদান, ভিটামিন সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৮. মেয়ে শিশু : জাতীয় শিশু নীতিতে মেয়ে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. সবার আগে শিশু : শিশু ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সবার আগে শিশুর অধিকার রক্ষা করা জাতীয় শিশু নীতির প্রধান লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো :

ক. সকল ক্ষেত্রে শিশুর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

খ. শিশুদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা নিশ্চিত করা।

গ. বছরান্তে শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন বা অবনয়ন সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঘ. বিশ্বসংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত দিনে জাতীয় শিশু দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দেশের শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কতকগুলো সুস্পষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং এ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য সুনির্দিষ্ট কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান সংযোজন করার মাধ্যমে জাতীয় শিশুনীতি ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন॥৭॥ শিশু কল্যাণ কাকে বলে? শিশু কল্যাণের উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, শিশু কল্যাণ কী? শিশু কল্যাণের মানদণ্ড লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। সুতরাং, শিশুদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের উপরই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নির্ভর করে। তাই দেশ এবং জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই শিশু কল্যাণ অপরিহার্য। শিশুর সুষ্ঠ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশসহ সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শিশু কল্যাণের আওতাভুক্ত।

শিশু কল্যাণের সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে শিশুর কল্যাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি শিশু কল্যাণ নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশু কল্যাণ প্রত্যয়টি অতীতের তুলনায় ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ব্যাপক অর্থে শিশু কল্যাণ বলতে সেসব কর্মসূচিকেই বুঝায় যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত এবং এটা জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশু কল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

শিশু কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে **Md. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Child welfare refers to care and protection best owed on the child before and after birth, during in fancy and from pre-school age to adolesence."

এলিজাবেথ ডব্লিউ ডিউএল এর মতে, "শিশু কল্যাণ বলতে ব্যাপক অর্থে সমাজের সদস্য হিসেবে সকল শিশুর কল্যাণ সাধনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও তাঁর লক্ষ্য বুঝায়। এ কার্যাবলির উদ্দেশ্য প্রথমত, শিশুর পরিবারের সামর্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজস্ব ও পারিবারিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যাতে শিশুর বাল্যে ও কৈশোরে পুষ্টিসাধন হতে পারে, দ্বিতীয়ত, শিশুর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিশুর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।"

অতএব, শিশু কল্যাণের সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, শিশু কল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঐসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যাবলির সমষ্টিকে বুঝায় যেগুলো সকল শিশুর শারীরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত প্রভৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিবারের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে থেকে শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে কৈশোর পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

শিশু কল্যাণের উপাদানসমূহ : শিশুর উন্নতির জন্য গৃহীত সবরকম ব্যবস্থাই শিশু কল্যাণ। শিশু জন্মের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুর সামগ্রিক বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল শিশুই শিশু কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, শিশু কল্যাণ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর এ জন্যই শিশু কল্যাণ বহুমুখী উপাদানে গঠিত। শিশু কল্যাণের প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচনা কর হলো :

১. জন্মের পূর্বে সেবা : শিশুর জন্মের পূর্বে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক অবস্থা যাতে সুন্দর, স্বাভাবিক এবং গঠনমূলক থাকে সেজন্য Pre-matal service শিশু কল্যাণের অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। কেননা, মায়ের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থা নবজাতক শিশুর উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

২. মায়ের পরিচর্যা এবং বাবা-মার শিক্ষা : মায়ের যথাযথ পরিচর্যার উপরই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে। শিশু কল্যাণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিশু যত্ন ও শিশু পালন বিষয়ক জ্ঞান। শিশুকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাসহ পরিবারের সকল সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং, পিতামাতাসহ পরিবারের সফল সদস্যকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা আবশ্যক।

৩. সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশ : শিশু কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশ। কারণ জন্ম থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত মানব সন্তানের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক তার পরিবারের সাথে। পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ, স্বাভাবিক এবং শান্ত না হলে শিশু কিশোরদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠন, মানসিক বিকাশ এবং যথাযথ সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় না। কাজেই শিশুর জন্য পারিবারিক পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. শিশুর প্রতি ভালোবাসা এবং স্নেহ : পিতামাতার ভালোবাসা, স্নেহ এবং সাহচর্যে শিশুর যথাযথ বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এ জন্যই শিশু কল্যাণ পিতামাতার স্নেহ, ভালোবাসা এবং সাহচর্যকে একটি অন্যতম বিশেষ উপাদান হিসেবে স্বীকার করে এ বিষয়ে পিতামাতাকে সচেতন করে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৫. মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা : এটা শিশু কল্যাণের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মায়ের এবং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা এবং চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। বিশেষ করে শিশু সন্তানের স্বার্থেই মায়ের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ঠিক রাখা প্রয়োজন। মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হলে স্বাভাবিকভাবে শিশু পরিচর্যার ব্যাঘাত হবে এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হবে।

৬. শিশুর চাহিদা পূরণ : শিশুর চাহিদা পূরণ করাও শিশু কল্যাণের একটি তাৎপর্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। কারণ শিশুর কোন চাহিদা অপূর্ণ থাকলে তা তার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

৭. শিশু শিক্ষা : শিশুদের জন্য একঘেয়ে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই শিক্ষাকেই তাদের নিকট উপভোগ্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলা আবশ্যক। শিশু শিক্ষার উপাদান এবং উপায় এমন হওয়া উচিত যা সহজেই শিশুর সুপ্ত প্রতিভা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়।

৮. শিশু পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা : শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশু পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা অপরিহার্য। আর এ জন্যই শিশু কল্যাণ এ ধরনের সেবাকে অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৯. শিশু নির্যাতন রোধ করা : শিশুদের উপর সবপ্রকারের নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, উৎপীড়ন, ভয়ভীতি থেকে রক্ষা করে তাদেরকে স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার উপর শিশু কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, শিশু কল্যাণ জন্মের পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং শিশুসহ পরিবারের সকল সদস্য, পারিবারিক পরিবেশ বিদ্যালয় পরিবেশ, প্রভৃতি এর আওতায় আসে। শিশু কল্যাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রশ্ন।৮। **বাংলাদেশে সরকারি শিশু কল্যাণ কার্যক্রমসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, বাংলাদেশ সরকার শিশুদের কল্যাণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমগুলো আলোচনা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** সাধারণ অর্থে শিশু কল্যাণ বলতে ঐসব কার্যক্রমকে বুঝায় যা শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পিতামাতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়। যে কোন সমাজে শিশু কল্যাণ কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং গুণগতমান সাধারণত নির্ভর করে সে সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিশুদের সামাজিকভাবে কিরূপ মূল্যায়ন করা হয় তার উপর। বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তাই বাংলাদেশে সরকারি শিশু কল্যাণ কার্যক্রম তেমনভাবে বিস্তৃত হয় নি।

বাংলাদেশে সরকারি শিশু কল্যাণ কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে শিশু কল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালে, তবে স্বাধীনতার পর এ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে অধিক বিস্তার লাভ করে। নিম্নে বাংলাদেশের সরকারি শিশু কল্যাণ কার্যক্রমগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সরকারি শিশু সদন : মাতাপিতা যেসব শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্বভার নেয়ার মতো সমাজে কেউ নেই সেসব শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নামই হলো সরকারি শিশু সদন। বাংলাদেশে মোট ৭৩টি সরকারি শিশু সদন রয়েছে। এসব শিশু সদনে মোট ৯,৫০০ জন এতিম শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত ৫ থেকে ১৮ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদেরকে শিশু সদনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। এ সময়ে শিশুদের মধ্যে ছেলেমেদেরকে সাধারণ শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি ও ব্যবসায় ইত্যাদির মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে, মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়ার দ্বারা পুনর্বাসিত করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ১২,০০০ এতিমকে সমাজে পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে মোট ৭৮টি সরকারি শিশু সদন রয়েছে যেখানে মোট ৯,২৯০ জন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ রয়েছে।

২. শিশু পরিবার : বর্তমানে এতিমদেরকে পারিবারিক পরিবেশে লালনপালনের উদ্দেশ্যে দেশের ২৩টি শিশু সদনকে SOS শিশু পল্লির আঙ্গিকে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২,৮০০ জনের জন্য ১১২টি পরিবার গঠন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫০টি শিশু সদনে শিশুদের জন্য শিশু পরিবার গঠন করা হবে। শিশু পরিবার ব্যবস্থায় দেশে দু'রকম শিশু সদন থাকবে। যেমন– শূন্য বয়স থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের সদন। সেখানে প্রতি ১৫ জন শিশুর জন্য একটি পরিবার থাকবে। প্রতি পরিবারের জন্য একজন 'মা' থাকবেন যিনি শিশুদের সর্বময় দায়িত্বে নিয়োজিত। আবার ১১-১৮ বছর বয়সের শিশুদের ২৫ জনের একটি পরিবার থাকবে। প্রতিটি পরিবারের জন্য যথাক্রমে একজন 'বড় ভাই' ও 'বড় আপা' থাকবেন। প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা রান্নাঘর, খাবার ঘর ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. বেবী হোম, শিশু নিবাস বা ছোটমনি নিবাস : বেবী হোমে সাধারণত মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুদের পাঁচ বছর বয়স রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদের বয়স পাঁচ বছর অতিক্রম করলে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকার আজিমপুরে ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি শিশু নিবাস স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০-৮১ সালে চট্টগ্রামে ও রাজশাহীতে ১০০ আসন বিশিষ্ট আরো দুটি বেবী হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেবী হোমগুলোতে খেলাধুলার মাধ্যমে নিবাসী শিশুদের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. দিবাযত্ন কেন্দ্র : দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রধানত কর্মজীবী মায়েদের কর্মকালীন সময়ে তাদের শিশু সন্তানদের সেবা যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সাপ্তাহিক কাজের দিনগুলোতে মায়েরা সকাল সাড়ে ৭টায় শিশুদের এখানে রেখে যান এবং বিকাল সাড়ে ৫ টায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যান। দিবাযত্ন কেন্দ্রে ঐ সময় শিশুদের জন্য আহার, বিশ্রাম, লেখাপড়া, ছবি আঁকা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়। দিবাযত্ন কেন্দ্র একজন পেশাদার সমাজকর্মীর অধীনে পরিচালিত হয়। শিশু কল্যাণের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৩৩৮ জন শিশু উপকৃত হয়েছে। এখানে শিশুর ভরণপোষণ ব্যয় নেয়া হয় ৩৭০ টাকা মাসিক। প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে সরকার সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে আরো ৪০টি Day Care Centre স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

৫. দুস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের ৫৬টি কেন্দ্র দেশব্যাপী চালু করা হয়। মহিলাদের পুনর্বাসিত করার জন্য ১৯৮১ সালে এসব কেন্দ্রকে সরকারি শিশু সদনে রূপান্তরিত করা হয়। এসব শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৮৪ সালে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার এ রকম আরও কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে যথাযথভাবে পুনর্বাসিত করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। তাছাড়া শিশুদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উৎকর্ষতা সাধন এবং মানসিক গুণাবলি ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানো।

৬. প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এতিম শিশুদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এতিম খানায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো চাঁদপুর, তেজগাঁও, বাগেরহাট, রাজশাহী এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানায় অবস্থিত। এখানে বয়স্ক এতিমদের বিভিন্ন কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এখানে ১৯৭২-৯৬ সাল পর্যন্ত ৬৩৪ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৭. প্রতিবন্ধী শিশু কল্যাণ কার্যক্রম : বাংলাদেশের শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনায় ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ৫টি অন্ধ স্কুল, ৭টি মূক ও বধির স্কুল, ৫টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। এছাড়া অন্ধ শিশু কিশোরদের জন্য সারা দেশে ৪৭টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্প আছে।

৮. কিশোর অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম : বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। অপরাধ প্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধনের জন্য সারা দেশে ২২টি প্রবেশন কেন্দ্র চালু রয়েছে। এছাড়া ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে একটি কিশোর অপরাধ সংশোধন ইনস্টিটিউট কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন এবং পুনর্বাসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৯. মাতৃমঙ্গল এবং শিশু কল্যাণ কেন্দ্র : বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে মাতৃমঙ্গল এবং শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রসূতির জন্য পৃথক শয্যায় মা ও শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং শিশু হাসপাতাল, পুষ্টি ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কেন্দ্রেও এক রকম ব্যবস্থা চালু আছে।

১০. দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের কল্যাণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম : বাংলাদেশের ১৫টি শহরে সুবিধাবঞ্চিত এবং ভাসমান শিশু ও রাস্তায় বসবাসরত দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় শিশুর কল্যাণের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম মৌল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদেরকে উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালানো হয়।

১১. ক্যাপিটেশন গ্রান্ট : বাংলাদেশে মোট ১,২৭৬টি নিবন্ধীকৃত এতিমখানার মধ্যে ১,১৪৩টি ক্যাপিটেশন গ্রান্টের আওতাভুক্ত। বেসরকারি এতিমখানার শিশুদের খাদ্য এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় মিটানোর জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। দেশের ১,১৪৩টি এতিমখানার ১৭,৫০১ জনের মাথাপিছু মাসিক ৪০০ টাকা হারে অনুদান দেয়া হয়। অন্যান্য এতিমখানায় এককালীন ২,০০০-১০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, শিশু কল্যাণ বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু কল্যাণের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রশ্ন॥৭॥ বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে যুবকদের প্রতিবন্ধকতাগুলো লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধাণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়, যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যমান। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হলো যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই এ বিশেষ সময়ে তদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এবং গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে না পারলে এ সম্প্রাদায় স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের প্রতি চরম হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যা : বাংলাদেশের যুবসমাজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য ও অস্থিতিশীল সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায় আজ দিশেহারা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শের অভাবে যুবসমাজ স্বীয় ভূমিকা নির্ধারণে ব্যয় হয়ে নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, তেমনি সৃষ্টি করছে অসংখ্য সমস্যার। বাংলাদেশের যুবসমাজের প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. বেকারত্ব : আমাদের দেশের এক তৃতীয়াংশ যুবক বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। কথায় বলে, শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। কর্মহীন যুব সম্প্রদায় তাই তাদের মূল্যবান সময় বিভিন্ন অসামাজিক কাজে ব্যয় করে। নেতিকবাচক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদের ক্ষোভ।

২. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা : ডায়গ্যানিসেস বলেছেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিত হলো সে দেশের শিক্ষিত যুবসমাজ।" **এলিজা কুকের** মতে, "যুবসমাজের সঠিক শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মজবুত ভিত্তি।" কিন্তু আমাদের যুবসমাজের ব্যাপক অংশ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বলে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ বা ভূমিকা আশা করা মূল্যহীন।

৩. মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ : যুবসমাজ তাদের ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে পারে না। ফলে তাদের ক্ষোভ খুব অসন্তোষে রূপ নেয়।

৪. হতাশা ও নৈরাশ্য : হতাশা ও নৈরাশ্য জীবনযুদ্ধে ক্ষয়িষ্ণু মানুষকে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। গোটা সমাজের ন্যায় যুবকরাও নৈরাশ্য ও হতাশার আঘাতে মুহ্যমান। তাদের নেই শিক্ষা ও পর্যাপ্ত সুযোগ। ভালো চাকরি ও সুস্থ পরিবেশে চাওয়া পাওয়ার মধ্যে বিরাট গরমিল এ অনিশ্চয়তা স্বভাবতই তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

৫. স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা : বাংলাদেশের মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় না। ফলে অপুষ্টিজনিত কারণে যুব সম্প্রদায়ের শারীরিক ও মানসিক গঠন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীন মানুষ স্বভাবত শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে থাকে। ফলে এ অসুস্থতা তাদের কাজ কর্মে ও আচরণে প্রকাশ পায়।

৬. নেতৃত্বের অভাব : যুবকদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও যোগ্য নেতৃত্বের। এ ধরনের আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের বড়ই অভাব। ফলে লক্ষ্যহীন, দাঁড়হীন নৌকার মত অথবা নেতৃত্ব পেলেও আদর্শবর্জিত, অযোগ্য, নীতিহীন যা তাদের বিপদগামী হতে বাধ্য করছে।

৭. বৈষম্য : আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট। দেশের ৯০ ভাগ সম্পদ যার ১০ ভাগ লোক ভোগ করে। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। বলা যেতে পারে দেশের ৯০ ভাগ যুবকই এ ধরনের বৈষম্যের শিকার। ফলে সংগত কারণেই তাদের এ হয়ে উঠে বিদ্রোহী। প্রকারান্তরে যা যুব অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

৮. আদর্শ শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব : এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবা-মা এর পরেই শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতা রাজনৈতিক অস্থিতি, অস্থিরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা পালনে বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। এ ব্যর্থতাই সৃষ্টি করছে যুব বিশৃঙ্খলা।

৯. রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার : স্বাধীনতার উত্তরকালে যুবসমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করার প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যত রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আছে তার সবই রাজনৈতিক নেতারা তাদের দিয়ে করাচ্ছে। ফলে যুবকদের চরিত্র ও চেতনা কলুষিত হয়ে পড়ছে। চরিত্রের এ কলুষতাই তাদের অপরাধ প্রবণ করে তুলছে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের যুবক শ্রেণী অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত যা তাদের জীবনী শক্তিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ করে দিচ্ছে। অথচ একটি দেশের যুব শ্রেণীই হলো সকল আশা ভরসার কেন্দ্র স্থল। তাই দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে যুবকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ যুবকল্যাণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন॥১০॥ বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধারণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয় যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যমান। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হলো যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই এ বিশেষ সময়ে তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এ সম্প্রদায় স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের প্রতি চরম হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে যুবকল্যাণ কর্মসূচিগুলো আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে যুবকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এ কার্যক্রম গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত সীমিত ছিল। স্বাধীনতার পর যুবসমাজের কল্যাণের জন্য একদিকে যেমন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় অন্যদিকে, পুরাতন কার্যক্রমের উন্নতি ও সম্প্রসারণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার যুবকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য যে কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : যুব সম্প্রদায়ের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৯-৮০ সালে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। এর মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য মোট ৮২টি কেন্দ্র চালু আছে।

২. থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প : গ্রামীণ, দরিদ্র-দুঃস্থ যুবক-যুবতীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩২টি থানায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্র যুবসমাজকে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান।

৩. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প : কর্মক্ষম বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে ১০টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক. গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস। হাঁসমুরগি পালন, গরু মোটাজাতাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ২৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ মাস। চিংড়ি চাষ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৪. যুবকল্যাণ তহবিল : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান কাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সরকারি সাহায্যে একটি যুবকল্যাণ তহবিল গঠিত হয়েছে। যুবকদের বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার প্রেক্ষিতে এ টাকার প্রাপ্ত আয় থেকে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়া এ তহবিল থেকে যুবকল্যাণ সংগঠনগুলোকে অনুদান দেওয়া হয়।

৫. বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প : এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫টি জেলায় কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিপি, রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রভৃতি বিষয়ে যুব পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ মাস। এখানে যুবকদের কারিগরি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ. দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। অফিস আদালতে দপ্তরি কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গ. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। টাইপ, ফটোকপি, কম্পিউটার প্রোগ্রামস্ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঘ. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। পোশাক তৈরি, সেলাই, বোতাম লাগানো প্রভৃতি বিষয়ে যুব মহিলা পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এসব কেন্দ্র থেকে।

ঙ. উলবুনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। উলের সোয়েটার, চাদর প্রভৃতি তৈরি ও বুনন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৬. জাতীয় যুব কেন্দ্র : এটা মূলত একটি সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। জাতীয় যুব কেন্দ্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠান ছাড়াও দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পুস্তক, চলচ্চিত্র, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭. JICA and KOICA : জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা এবং কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে জাইকার ৪ জন এবং কোইকার ৪ জন স্বেচ্ছাসেবী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে জড়িত আছে।

৮. কমনওয়েলথ Youth প্রোগ্রাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ Youth প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি যেমন– সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ Youth প্রোগ্রাম এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবত ১৪২ জন কর্মকর্তা ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

৯. লোকবল, উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প : এ প্রকল্পের অধীনে থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ যাবত ৮২৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গবেষণার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

১০. জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন : বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে,

ক. নীতিনির্ধারণ ও জনসাধারণের মাঝে যুবসমাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। তাদের অধিকার ও কর্ম উদ্দীপনার স্বীকৃতি প্রদান।

খ. শান্তিশৃঙ্খলা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের যুব সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. যুব শক্তিকে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রবর্তন।

ঘ. যুব কর্মসূচি ও যুব নীতির মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন সাধন এবং

ঙ. শান্তি, শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সমঝোতার আদর্শে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ।

যেসব যুব সংগঠক আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প বা সমাজসেবায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে 'জাতীয় যুব পদক' প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৪০ জন সফল যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পদক প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যুবকল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের মৌলিক সমস্যার সমাধান ব্যতীত দেশের জন্য অপরিহার্য। যুবক সম্প্রদায় দেশের প্রাণশক্তি। এ শক্তিকে টিকিয়ে রেখে কাজে লাগাতে হলে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

প্রশ্ন॥১১॥ বাংলাদেশে সরকারি নারী কল্যাণ কর্মসূচিগুলো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সরকারি নারী কল্যাণ কার্যক্রমগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বের সকল সমাজেই নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। নারীকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের দিক থেকে নারী কল্যাণ বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, শিশুর প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ, সৃজনশীল আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নৈতিক ও মানসিক বিকাশ সাধন, সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো পুরুষদের তুলনায় নারীরাই ভালোভাবে করতে পারে। অর্থাৎ, সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নারী কল্যাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

বাংলাদেশে সরকারি নারী কল্যাণ কর্মসূচি : বাংলাদেশের নারীসমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অধিকাংশই মানবেতর জীবনযাপন করছে। অথচ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই তাদের বঞ্চিত ও নির্যাতিত রেখে কখনও দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। তাই দেশের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অগ্রগতি সাধনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী কল্যাণ কর্মসূচিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ : বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারী কল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং দেশের ২৩৬টি উপজেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদের দ্বারা বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তার প্রকল্পের মাধ্যমে নারী কল্যাণমূলক যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে, তা হলো :

১. মহিলাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান,

২. নারীদের সাথে ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণ করা,

৩. অল্প শিক্ষিত নারীদের হাতে কলমে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান,

৪. চাকরিজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল এর ব্যবস্থা করা,

৫. দেশের অসহায় এবং নির্যাতিত মহিলাদের জন্য সাময়িক আশ্রয় প্রদান,

৬. নারীদেরকে আইনগত সহায়তা (Legal Aid) প্রদান,

৭. নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য নারীদের মাঝে সমতা আনয়ন করা এবং

৮. বাংলাদেশে জাতীয় নারী নীতি বাস্তবায়ন করা।

উল্লিখিত কার্যক্রমগুলোর মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

খ. বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নারী কল্যাণ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ : বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নারী কল্যাণ সম্পর্কিত প্রায় সকল কর্মসূচিই সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হতো। বর্তমানে নারী কল্যাণ বিষয়ক বেশিরভাগ কর্মসূচিই মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। মহিলা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ছাড়া নারী কল্যাণ বিষয়ক সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. সোসিও ইকোনোমিক সেন্টার (মহিলা) : উক্ত কর্মসূচি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এসব কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে এলাকার গৃহবধূ ও অন্যান্য যেসব নারীরা রয়েছেন তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন– এমব্রয়ডারি, পোশাক তৈরি, উল বুনন, বাঁশ ও বেতের কাজ, পুতুল তৈরি, ফুল তৈরি, চামড়াজাত দ্রব্যের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয় উপার্জনকারী কার্যাবলির সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে সহায়তা করতে পারে। এর একটি ঢাকার মীরপুরে এবং অন্যটি রংপুরে অবস্থিত। এসব কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে রয়েছে ক. দর্জি বিজ্ঞান খ. উল বুনন গ. বাটিক প্রিন্টিং ঘ. ফুল তৈরির ক্লাশ ঙ. চামড়া দ্বারা তৈরি জিনিসপত্র চ. পুতুল তৈরি ইত্যাদি।

২. মাতৃকেন্দ্র : নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে Mother Club সারা বাংলাদেশেই একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচি। বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৬০০ টি। গ্রামীণ সমাজসেবার আওতায় এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে নারীরা আয় উপার্জনের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা, শিশু পরিচর্যা, সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সামাজিক শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করে রোজগার করার সুযোগ পায়। ১৯৭৪ সালে পল্লি সমাজসেবা (RSS) কর্মসূচি চালু করার পরই গ্রামীণ মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পটি চালু হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত প্রতিটি 'পল্লি সমাজসেবা' প্রকল্পের সাথে রয়েছে কিছু সংখ্যক মাতৃকেন্দ্র। গ্রামীণ নারীদের সংগঠিত করে গ্রামীণ মাতৃকেন্দ্র নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে :

ক. নানা রকমের কুটির শিল্প, সবজি বাগান, হাঁস মুরগি পালন এবং অন্যান্য অর্থকরী কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা,

খ. নারীদের অক্ষর জ্ঞান, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানদান করা।

এসব কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা করার মাধ্যমে মাতৃকেন্দ্র গ্রামের নারীদের নিজ নিজ পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. দুস্থ মহিলা ও শিশু রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের ৫৬টি কেন্দ্র চালু করা হয়। তবে এসব নারীদের পুনর্বাসনের পর ১৯৮১ সালে এসব কেন্দ্রকে সরকারি শিশু সদনে রূপান্তরিত করা হয়।

৪. দুস্থ মহিলাদের তাঁত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : বাংলাদেশের বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীর দত্তপাড়ায় এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে অসহায় ও দুস্থ নারীদের ছয় মাস মেয়াদি তাঁত শিল্প প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে করে তারা তাদের দুরাবস্থা লাঘব করার জন্য কর্মে নিয়োজিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এ কেন্দ্রে ২২৫ জন দুস্থ ও অসহায় নারী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে ২৫ জন বিভিন্ন শিল্পকারখানার কর্মে নিযুক্ত আছেন।

৫. পরোক্ষ নারী কল্যাণ কর্মসূচি : উপরের বর্ণিত প্রত্যক্ষ নারী কল্যাণ কর্মসূচি ছাড়াও সমাজসেবা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত নারী কল্যাণ সম্পর্কিত কতিপয় পরোক্ষ কর্মসূচি হলো : শহর সমাজ উন্নয়ন, গ্রামীণ সমাজসেবা, যুবকল্যাণ, শিশু কল্যাণ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে ও পরোক্ষভাবে নারীদের কল্যাণ সাধন করা হয়। এসব কর্মসূচিতে নারীদের সংগঠিত করা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য নারী সমাজকর্মী নিয়োগ করা।

৬. অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান : নারী কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য যেসব বেসরকারি ও স্বেচ্ছামূলক সংস্থা নারীদের কল্যাণে নিয়োজিত সেসব সংস্থাকে রেজিস্ট্রেশন, অর্থনৈতিক অনুদান, পরামর্শদান, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক যেখানে নারী সেখানে বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে নারী কল্যাণ কার্যক্রম তাদের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল এবং সীমিত। অথচ নারীসমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে তাদেরকে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে না পারলে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি কখনও আশা করা যাবে না। কাজেই সরকারকে নারীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপক ভিত্তিক নারী কল্যাণ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

প্রশ্ন॥১২॥ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত নারী কল্যাণ বিষয়ক কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী কী নারী কল্যাণ কর্মসূচিগ্রহণ করা হয়েছিল আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই দেশের এ বিশাল জনসমষ্টিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কখনও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীসমাজের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা এবং জাতিসংঘ নারী দশকের শ্লোগান 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এর চূড়ান্ত অর্জন করতে বাংলাদেশ কেবল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধই নয় বরং সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও সমর্থন সূচকে নীতিমালাও গ্রহণ করেছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত নারী কল্যাণ বিষয়ক কর্মসূচিসমূহ : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাপক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে নির্ধারিত করে ব্যাপক আকারে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ পরিকল্পনায় নারী কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিম্নে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত নারী কল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি : দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। এ কর্মসূচির অধীনে সারাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১ লাখ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২. সমন্বিত কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং BJMS এর কর্মীদের সামর্থ্য জোরদারকরণে সমন্বিত কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নীতি ও পরামর্শ দান শাখা : বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশু উন্নয়নে এর নীতি ও পরামর্শদানকারী ভূমিকা জোরদার করার জন্য একটি নীতি ও পরামর্শদান শাখা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৪. নারীদের জন্য ঋণ কর্মসূচি : প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ১ লাখ নারীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হবে।

৫. নারীদের জন্য ভিজিডি কার্যক্রম : ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় সীমিত রাখা হবে এবং এ কার্যক্রমের আওতায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দরিদ্র মহিলাকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৬. কর্মরত নারীদের বাসস্থান সহায়তা : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্ন ও মাঝারি শ্রেণীর কর্মরত নারীদের বাসস্থান সুবিধা সম্প্রসারণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

৭. কর্মরত মায়েদের শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্ন ও মাঝারি শ্রেণীর কর্মরত মায়ের শিশুদের জন্য বিদ্যমান ডে-কেয়ার সেবা সম্প্রসারিত করা হবে।

৮. নারী প্রশিক্ষণ সম্পদ কেন্দ্র : বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে এ সম্পদ কেন্দ্রে একটি তথ্য সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৯. মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত ও প্রশিক্ষণের জন্য উত্তম মানের একাধিক কেন্দ্র স্থাপন : শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা, পরামর্শ সেবা, গবেষণা এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে গণ এবং ব্যক্তি খাতের সংগঠনসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উত্তম মানের একাধিক কেন্দ্র স্থাপনের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে।

১০. নারীদের বিশেষ বিষয় ও স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ কর্মসূচি : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের বিশেষ বিষয় ও স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, যেমন– নারী পাচার রোধ কর্মসূচি, পতিতাবৃত্তি রোধ কর্মসূচি ইত্যাদি।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার যেখানে অর্ধেকেই নারী সেখানে নারীর কল্যাণ ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা দরকার। কারণ জনসংখ্যার এ বিরাট অংশকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না করে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাইতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত গৃহীত প্রতিটি পরিকল্পনায় নারী কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥১৩॥ পরিকল্পনার সংজ্ঞা লিখ। পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

অথবা, পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও হতে পারে। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয়। পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অগ্রিম চিন্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিজাত প্রক্রিয়া।

পরিকল্পনা : সাধারণভাবে পরিকল্পনা বলতে কোনো বিষয়ে কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কাকে দিয়ে করতে হবে প্রভৃতির রূপরেখাকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার নিমিত্তে এবং আওতাধীন সম্পদের সমবণ্টনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ হচ্ছে পরিকল্পনা। দেশ ও সমাজভেদে পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন–

Robert L. Barker এর সংজ্ঞানুযায়ী, "পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, যেগুলো অর্জনের বিভিন্ন পন্থার মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কার্যক্রমের বাছাই প্রক্রিয়া।"

আর্থার ডানহাম এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা, করার পূর্বে চিন্তা করা, অনুমানের পরিবর্তে তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিক প্রবণতা।"

New Man এর মতে, "অগ্রগতির জন্য কী করণীয় তা পরিকল্পনায় গৃহীত হয় এবং পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত হয়।"

আলবার্ট ওয়াটারসন বলেন, "পরিকল্পনা হলো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের সর্বোত্তম নির্বাচনের সচেতন ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা।"

অর্থনীতিবিদ ডিকিনসন এর ভাষায়, "পরিকল্পনা বলতে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বুঝায়।"

সিকলার হাওম্যান এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কোনো কার্যক্রমের ভিত্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া।"

বিভারস এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে যেমন কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন এবং কিভাবে সেগুলো সম্পাদন করা হবে তার কর্মপদ্ধতির পূর্ণ খসড়া চিত্র।"

Waltur-এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে চিন্তা, অভ্যন্তরীণ চিন্তা, বাহ্যিক চিন্তা এবং সামাজিক চিন্তা।"

পরিকল্পনার বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন **H.B.Trecker** তার মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা যায়।"

পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে পৌঁছানোর সুচিন্তিত কাজের বিবরণ নির্দেশ করাকে পরিকল্পনা বলে। এটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করে থাকে।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ : পরিকল্পনার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। Sharma and Shastri তাঁদের **Social planning: Concept Techniques** গ্রন্থে পরিকল্পনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে পরিকল্পনার সার্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ : পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনো কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ হয়। এটি কোনো প্রতিষ্ঠানকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনুমোদন দেয়। আবার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পুরো ব্যবস্থাও পরিকল্পনাতে উল্লেখ থাকে। তাই এগুলো পরিকল্পনা, অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

২. সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা : পরিকল্পনা মাত্রই সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কর্ম প্রচেষ্টার সমন্বয়। কোনো কাজ কেন করবে? কিভাবে করবে? কখন করবে? কি দিয়ে করবে? সবকিছুই পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকে। তাই পরিকল্পনা মানেই যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত।

৩. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক : জাতীয় পরিকল্পনা অবশ্যই রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হবে। অর্থাৎ পরিকল্পনা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। যেমন– প্রথম পঞ্চবার্ষিকী থেকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সকল পরিকল্পনাই রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত।

৪. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : প্রতিটি পরিকল্পনারই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনায় অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যও থাকে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন পরিকল্পনা কখনো প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এতে পরিকল্পনায় সুফল পাওয়া যায় না।

৫. জটিল ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া : পরিকল্পনা কোনো সহজ জিনিস নয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সমস্যা, সম্পদ সমাধান সবকিছুই ভেবে চিন্তে করতে হয়। শুধু প্রণয়ন করলেই হবে না, পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরও উপযোগী হতে হবে। এজন্যই বলা হয় পরিকল্পনা একটি জটিল প্রক্রিয়া।

৬. তথ্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন : পরিকল্পনা হতে হয় তথ্যভিত্তিক। এটি অবশ্যই দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ দ্বারা প্রণয়ন করতে হবে। তথ্যগুলো হতে হয় বাস্তবসম্মত।

৭. কাজের পূর্ব প্রস্তুতি : পরিকল্পনা শুরু করতে হয় কাজ শুরু করার পূর্বে। এটি ভবিষ্যৎ কাজের পূর্ব ধারণাও বলা হয়। এজন্যই পরিকল্পনাকে বলা হয় কাজের পূর্বচিন্তা। এছাড়া পরিকল্পনা হতে হয় বাস্তবসম্মত।

৮. জনগণের জন্য কল্যাণকর : পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণের দিকটি গুরুত্ব পায়। এজন্য অবশ্যই লক্ষ্যভুক্ত দলকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাই জনগণের ক্ষতি হবে এমন কোনো পরিকল্পনা স্থান পায় না।

৯. ধারাবাহিক প্রক্রিয়া : পরিকল্পনায় ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে কতিপয় পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়। এর ফলে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

১০. কর্মসূচির রূপরেখা : পরিকল্পনাকে কর্মসূচির রূপরেখা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কর্মসূচির পুরোচিত্র পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকে। কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই পরিকল্পনায় বিদ্যমান থাকে। তাই পরিকল্পনাকে কর্মসূচির চিত্র প্রক্রিয়াও বলা হয়।

১১. সময় নির্ধারণ : পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। এছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যও সময়ের উল্লেখ থাকে। একেক পরিকল্পনা একেক সময়ের জন্য করা হয়। যেমন– বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতি।

১২. পরিধি বিস্তৃত : পরিকল্পনার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তর থেকে উর্ধ্বস্তর পর্যন্ত সবকিছুই পরিকল্পনার আওতাধীন থাকে। তাই পরিকল্পনার বাইরে কিছু থাকেই। এটি জলের মতো বিস্তৃত।

১৩. সর্বোত্তম উপায় নির্বাচন : অনেকগুলো পন্থা থেকে সর্বোত্তম উপায়টি পরিকল্পনার জন্য নির্বাচন করা হয়। তাই বহুসংখ্যক প্রস্তাবনা থেকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থাটি পরিকল্পনায় স্থান পায়।

১৪. সমস্যা চিহ্নিতকরণ : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন বাধা বিপত্তি চিহ্নিত করা হয়। এগুলো সমাধানের দিকনির্দেশনা পরিকল্পনায় থাকে। তাই সমস্যা চিহ্নিতকরণ পরিকল্পনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য।

১৫. দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ : পরিকল্পনায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে কখন কি দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হয় তা নির্দিষ্ট করা থাকে। এজন্য পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ থাকে। সকলের সংঘবদ্ধ দায়িত্বশীল প্রচেষ্টাতেই একটি পরিকল্পনা সফলতার মুখ দেখতে পায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলেই তাকে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা বলা যাবে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিকল্পনাকে স্বতন্ত্র সত্তা দান করে। পরিকল্পনা যত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে এটি তত শক্তিশালী হবে। তাই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ এর স্বরূপ বলে দেয়।

প্রশ্ন।১৪। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করে দেখাও।

উত্তর। ভূমিকা : কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয়। পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অগ্রিম চিন্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিজাত প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়নের ফলে সকলেই উপকৃত হয়।

পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা নানা বিষয়ে নানা ধরনের হয়ে থাকে। তবে পরিকল্পনা যে ধরনেরই হোক না কেন এর কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে। নিম্নে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **আর্থসামাজিক উন্নয়ন :** পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এলক্ষ্যে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত।

২. **কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা :** পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যাতে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের উপর আর্থসামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। এজন্যই পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৩. **কৃষি উন্নয়ন :** কৃষির উপর দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য এটি ধ্রুব সত্য। তাই কৃষি প্রধান দেশে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। পরিকল্পনায় কৃষি আধুনিকীকরণ, বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি দিকগুলো উল্লেখ থাকে।

৪. **দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ :** দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা পরিকল্পনার আরেকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ... দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মূল্যের স্থিতিশীলতা না থাকলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এজন্যই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রাস্ফীতিরোধ করা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

৫. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। দেশের ভিতরে ও ... পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। এ লক্ষ্যার্জনের ... পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। এ লক্ষ্যার্জনের জন্য পরিকল্পনায় বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকে।

৬. **খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা :** খাদ্য সমস্যার সমাধান ব্যতীত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্যই দেশ কিভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তার নির্দেশনা থাকে পরিকল্পনায়। এর ফলে বৈদেশিক নির্ভরশীলতাও হ্রাস পায়।

৭. **ভারসাম্য রক্ষা করা :** দেশের সম্পদ ও সুযোগের সমবণ্টনের মাধ্যমে সকল মানুষের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা পরিকল্পনার আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সকল জেলা সমান ... পরিকল্পনায় সময় খেয়াল রাখতে হবে দেশের সকল ক্ষেত্রে মানুষ সমভাবে উপকৃত হচ্ছে কিনা।

৮. **শিল্পের অনগ্রসরতা :** শিল্পের দিক থেকে দেশকে অগ্রসর করা পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা শিল্প উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর মাধ্যমেই দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। তাই পরিকল্পনায় শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়।

৯. **বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস :** বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস করা এবং দেশীয় নির্ভরতা বাড়ানো পরিকল্পনার অপর একটি লক্ষ্য। এজন্য স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ খুঁজে বের করা দরকার। তাই বৈদেশিক নির্ভরতা কমানো পরিকল্পনার অন্যতম দিক।

১০. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** জনসংখ্যা হ্রাস করা অপর একটি লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪% এ নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪২%। এসবই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

১১. **শিক্ষার প্রসার :** অবৈতনিক শিক্ষা, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে বই বিতরণ প্রভৃতি পরিকল্পনার বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এজন্যই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য দেশে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমেই শিক্ষার হার বাড়ানো।

১২. **সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :** সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা পরিকল্পনা একটি অন্যতম দিক। এ লক্ষ্যেই পরিকল্পনা প্রণীত হয়। সমাজের সকল ক্ষেত্রে সাম্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকে। কোনো দেশে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা না গেলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

১৩. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ : এদেশের বেশিরভাগ ... মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে ... পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌল মানবিক ... চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দেওয়া। মৌল মানবিক চাহিদার ... পূরণ থেকে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা। এজন্যই ... পরিকল্পনায় এ দিকটি উল্লেখ থাকে।

১৪. আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা : বহির্বিশ্বের সাথে ... ভারসাম্য রক্ষা করা বর্তমানে পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ... বিবেচিত। কেননা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা উন্নয়ন ... কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশ।

১৫. মানবাধিকার সংরক্ষণ : মানবাধিকারের সংরক্ষণ করা ... পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘন ... করে কোনো দেশের পক্ষে উন্নয়নের শিখরে আরোহণ করা সম্ভব ... নয়। তাই পরিকল্পনায় মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়টি লক্ষ্য ... হিসেবে বিবেচিত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও ... উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশের পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এসব ... লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পরিকল্পনা বাস্তবে ... সফলতা অর্জন করে। বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় উক্ত ... লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য।

প্রশ্ন।১৫। উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করে দেখাও।

উত্তর॥ **ভূমিকা :** কোনো কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করার ... জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতি বলা ... হয়। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার নিমিত্তে এর আওতাধীন ... সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল ... রূপরেখা হচ্ছে পরিকল্পনা। এটি কাজের অগ্রিম চিন্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবায়ন যোগ্য ... হতে হবে। এজন্যই প্রয়োজন উত্তম পরিকল্পনা।

উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ : পরিকল্পনা শুধুমাত্র ... গ্রহণ করলে চলবে না। এর বাস্তবরূপ দিতে হবে। এজন্য উত্তম ... পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। উত্তম পরিকল্পনার কতিপয় ... বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিম্নের বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থিত থাকলে তাকে ... উত্তম পরিকল্পনা বলা যায়। এগুলোকে পরিকল্পনার পূর্বশর্তও বলা ... হয়। নিম্নে উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ বা পূর্বশর্তসমূহ ... আলোচনা করা হলো :

১. **সারল্য ও স্পষ্টতা :** পরিকল্পনা মাত্রই সরল ও স্পষ্ট হতে ... হবে। অর্থাৎ এমন হওয়া উচিত নয় যা কঠিন ও অস্পষ্ট হবে। যে ... প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হবে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ... কাছে এটি সহজ ও বোধগম্য হতে হবে। এর অন্যথা ঘটলে বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সারল্য ও স্পষ্টতা ... পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

২. **তথ্য ভিত্তিক :** উত্তম পরিকল্পনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি তথ্যভিত্তিক। আর্থসামাজিক অবস্থা, সম্পদ, শক্তি প্রভৃতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের পরিকল্পনায় তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। তথ্যাবলি সংগ্রহ করার পর এগুলো যাচাই করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৩. **সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য :** উত্তম পরিকল্পনার অবশ্যই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে পরিকল্পনা সংগতিপূর্ণ হতে হবে। লক্ষ্যবিহীন কোনো কাজই সফল হয় না। তাই উত্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য থাকা অপরিহার্য।

৪. **নিরবচ্ছিন্নতা :** পরিকল্পনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি অবিরাম চলতে থাকবে। একটি বাস্তবায়নের সাথে সাথে আরেকটি পরিকল্পনার কাজ শুরু করতে হবে। ফলে পরিকল্পনা কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হবে না।

৫. **ঐক্য ও সমন্বয় :** পরিকল্পনায় ঐক্য ও সমঝোতা থাকবে। সামগ্রিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা থাকতে পারে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সফলতা নির্ভর করে। তাই উত্তম পরিকল্পনা মানেই ঐক্য, যোগাযোগ ও সমন্বয় থাকবে।

৬. **নির্ভুলতা :** নির্ভুলতা উত্তম পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পনা যত নির্ভুল হবে এর ফল তত ভালো হবে। তাই পরিকল্পনা পূর্বানুমান, পূর্বঅভিজ্ঞতা, পূর্বঘটনা প্রভৃতির ভিত্তিতে প্রণীত হলে তা ত্রুটিমুক্ত হবে।

৭. **নমনীয়তা :** এটি পরিকল্পনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যৎ-এ পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে। তাই এটি যে কোনো সময় পরিবর্তন করতে হয় বিধায় একে নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে, পরিকল্পনা তার কার্যকারিতা হারায়।

৮. **বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণয়ন :** পরিকল্পনায় তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করা একটি বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। আর এটি সম্পন্ন করা হয় অভিজ্ঞ ও যোগ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। বয়স্ক, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষজ্ঞ হিসেবে অভিহিত হয়। তাই এটি উত্তম পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. **আধুনিক কলা কৌশলের ব্যবহার :** উত্তম পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আধুনিক কলা কৌশলের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কলা কৌশল ও প্রযুক্তির অনুপস্থিতিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।

১০. **সময় উল্লেখ :** উত্তম বা ভালো পরিকল্পনার আরেক বৈশিষ্ট্য হলো এতে সময়ের কথা উল্লেখ থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ কখন শুরু ও শেষ হবে তা এতে নির্দিষ্ট করা থাকে। যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১১. **সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার :** একটি আদর্শ পরিকল্পনার অন্যতম দিক হলো এতে সম্পদ ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত থাকে। এজন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা রচিত হলে সম্পদের অপব্যয় পরিকল্পনায় নিষিদ্ধ।

১২. বাস্তবমুখী পরিকল্পনা : উত্তম পরিকল্পনা মানেই বাস্তবমুখী হবে। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, কলা-কৌশল, নীতি ... সবকিছুই হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী। তাই ...সম্মত হলেই এটি উত্তম পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩. পরিকল্পনার পটভূমি শনাক্তকরণ : এটি চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য পটভূমির উপকরণাদি সনাক্ত করে তা বিচারবিশ্লেষণ করা উত্তম পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

১৪. অর্থনৈতিক সংগঠন : পরিকল্পনাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক সংগঠন থাকবে। এ সংগঠন হবে জাতীয় ভিত্তিক সংস্থা। এটি পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। এটি উত্তম পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য।

১৫. অঙ্গীকারের সৃষ্টি : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ অর্থাৎ নির্বাহী ও কর্মীদের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে অঙ্গীকার থাকতে হবে। তাই পরিকল্পনার ব্যাপারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি উত্তম পরিকল্পনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১৬. বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি : পরিকল্পনায় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরতে হবে। উত্তম পরিকল্পনা প্রণীত হয় বর্তমানে এবং বাস্তবায়িত হয় ভবিষ্যৎ-এ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১৭. গ্রহণ যোগ্যতা : ভালো পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণীত হবে এবং তা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যাতে প্রতিষ্ঠানের উঁচুস্তর থেকে কার্যক্রম ভালোভাবে অনুধাবন ও অবলোকন করা যায়। এজন্য এর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে শুরু করতে হবে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উত্তম পরিকল্পনা অপরিহার্য। এগুলো উত্তম পরিকল্পনায় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক উন্নয়নের জন্য উত্তম পরিকল্পনার বিকল্প নেই। তাই এসব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পরিকল্পনাকে উত্তম পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন॥১৬॥ পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, পরিকল্পনা কাকে বলে? পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয়। পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অগ্রিম চিন্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিজাত প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়নের ফলে সকলেই উপকৃত হয়।

পরিকল্পনা : সাধারণভাবে পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো নির্দি... লক্ষ্যে পৌছার নিমিত্তে এর আওতাধীন সম্পদের সমন্বয়... মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা... সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপ... করা হলো :

Robert L. Barker-এর মতে, "পরিকল্পনা হ... ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, যেগুলো অর্জনের বিভিন্ন পন্থার মূল্যায়... এবং উপযুক্ত কার্যক্রমের বাছাই প্রক্রিয়া।"

আর্থার ডানহামের মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে মৌলি... বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা, করার পূর্বে চি... করা, অনুমানের পরিবর্তে তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করার মানসি... পূর্বাবস্থা।"

New Man-এর মতে, "অগ্রগতির জন্য কী করণীয় ... পরিকল্পনায় গৃহীত হয় এবং পরিকল্পনায় পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত।"

আলবার্ট ওয়াটারসন বলেন, "পরিকল্পনা হলো বিশেষ লক্ষ্য... অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের সর্বোত্তম নির্বাচনের সচেতন ... ক্রমাগত প্রচেষ্টা।"

অর্থনীতিবিদ ডিকিনসন এর মতে, "পরিকল্পনা বলতে... সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বোঝায়।"

সিকলার হার্ডসন এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্য... কোনো কার্যক্রমের ভিত্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া।"

বিভারসনের মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে যেসব কাজ সম্পাদ... করা প্রয়োজন এবং কিভাবে সেগুলো সম্পাদন করা হবে তার ক... পদ্ধতির পূর্ণ খসড়া চিত্র।"

Waltur-এর মতে, "পরিকল্পনা প্রাক চিন্তা, অভ্যন্তরী... চিন্তা, বাহ্যিক চিন্তা এবং সামগ্রিক চিন্তা।"

H.B. Trecker-এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে সচেতন... সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভি... সৃষ্টি করা যায়।"

পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূ... উপায়ে পৌছানোর সুচিন্তিত কাজের বিবরণ নির্দেশ করা... পরিকল্পনা বলে। এতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে লক্ষ্য নির্ধারণ... সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়াদি লিপিবদ্ধ ক... থাকে।

পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ : পরিক... প্রণয়নে কিছু বিষয়ের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। অনুকূল পরিবেশ... সম্পদসহ কতিপয় সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন হ... এসব বিষয়ের উপস্থিতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়... গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো পরিকল্পনার বিবেচ্য বি... বা প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে প্র... বিস্তারকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. সমস্যা : সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ক... হয়। সমস্যা বলতে সেক্ষেত্রে আর্থসামাজিক সমস্যা বুঝা... সমস্যা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি এর সমাধানেরও নির্দেশ... থাকে পরিকল্পনায়। তাই সমস্যা ও সমাধান পরিকল্পনার অন্য... বিবেচ্য বিষয়।

২. চাহিদা : পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে চাহিদা বা প্রয়োজন। কেননা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অবশ্যই অনুভূত চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অপরিহার্য।

৩. উপাত্ত : পরিকল্পনা প্রণয়নে উপাত্ত বা তথ্য সরবরাহ ও তার বিশ্লেষণ করা অতি জরুরি। প্রয়োজনীয় তথ্যাবলির সহজলভ্যতা অত্যাবশ্যকীয়। পরিকল্পনায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, লক্ষ্য স্থির করা, সম্পদ আহরণ ইত্যাদি সবকিছুই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে।

৪. দক্ষতা ও নৈপুণ্য : পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথেষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী হতে হয়। নতুবা পরিকল্পনা তৈরিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই দক্ষতা ও নৈপুণ্য পরিকল্পনার অপরিহার্য বিষয়।

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : পরিকল্পনা প্রণীত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। লক্ষ্যবিহীন পরিকল্পনা মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই প্রতিটি পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত।

৬. দক্ষকর্মী : পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। দক্ষ কর্মীরা সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। তাই এটি পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান।

৭. নীতিমালা : পরিকল্পনা মাত্রই কতিপয় নীতি থাকবে। নীতির উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনাবিদরা নীতিসমূহকে অনুসরণ করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। তাই কতিপয় নীতি এর বিবেচ্য বিষয়।

৮. সম্পদ : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বস্তুগত ও অবস্তুগত অনেক সম্পদের প্রয়োজন হয়। তথ্য, গবেষণা, তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন প্রভৃতি কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পদের গুরুত্ব অপরিহার্য।

৯. প্রক্রিয়া ও ধাপ : পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছু প্রক্রিয়া ও ধাপ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। এগুলো অনুসরণের মাধ্যমে পরিকল্পনা সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। এজন্য বাস্তবায়ন ও সহজ হয়।

১০. সময় : পরিকল্পনার কাজ শুরু করার সময় নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিকল্পনার কাজ শেষ করতে হয়। তবে পরিকল্পনা প্রণয়নে পর্যাপ্ত সময় থাকা অত্যাবশ্যক।

১১. পদ্ধতি : পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়। প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তেই পদ্ধতি বা কৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই এটি তার অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়।

১২. প্রশাসন : পরিকল্পনা প্রস্তুত হবে একটি দক্ষ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে। কেননা সুষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থা পরিকল্পনার জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই প্রশাসন ব্যবস্থা পরিকল্পনার একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

১৩. যুগোপযোগিতা : পরিকল্পনা হতে হবে যুক্তিসংগত এবং যুগোপযোগী। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার সাথে মিল রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তা না হলে পরিকল্পনার সুফল পাওয়া যাবে না।

১৪. নেতৃত্ব : দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। কেননা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যোগ্য নেতার নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা হয় বাস্তব উপযোগী এবং তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়।

১৫. মানসিকতা : উত্তম পরিকল্পনা তৈরিতে পরিকল্পনাবিদদের মানসিকতা একটি অপরিহার্য বিষয়। তাদের ইতিবাচক মনোভাব পরিকল্পনা প্রণয়ন যেমন সহজ করে তোলে, তেমনি তাদের নেতিবাচক মনোভাব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে। তাই পরিকল্পনাবিদদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা পরিকল্পনার একটি অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো পরিকল্পনার উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এসব বিষয়ের উপস্থিতি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যেমন সহজ হয়, আবার, এসবের অনুপস্থিতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন করে তোলে। তাই এসব বিবেচ্য বিষয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন।১৭। পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

অথবা, পরিকল্পনা কী? সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয়। পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অগ্রিম চিন্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকজাত প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়নের ফলে সকলেই উপকৃত হয়।

পরিকল্পনা : সাধারণভাবে, পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার নিমিত্তে এর আওতাধীন সম্পদের সমবণ্টনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল কার্যক্রম।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়টি উপস্থাপন করা হলো :

Robert L. Barker এর মতে, "পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, যেগুলো অর্জনের বিভিন্ন পন্থার মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কার্যক্রমের বাছাই প্রক্রিয়া।"

আর্থার ডানহামের মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা, কাজ করার পূর্বে চিন্তা করা, অনুমানের পরিবর্তে তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিক পূর্বাবস্থা।"

New Man এর মতে, "অগ্রগতির জন্য কী করণীয় তা পরিকল্পনায় গৃহীত হয় এবং পরিকল্পনায় পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত।"

আলবার্ট ওয়াটারসন বলেন, "পরিকল্পনা হলো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের সর্বোত্তম নির্বাচনের সচেতন ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা।"

সিকলার হাডসন এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কোনো কার্যক্রমের ভিত্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া।"

বিভারসনের মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে যেসব কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন এবং কিভাবে সেগুলো সম্পাদন করা হবে তার কর্মপদ্ধতির পূর্ণ খসড়া চিত্র।"

Waltur এর মতে, "পরিকল্পনা প্রাক চিন্তা, অভ্যন্তরীণ চিন্তা, বাহ্যিক চিন্তা এবং সামগ্রিক চিন্তা।"

H. B. Trecker এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা যায়।

পরিবেশে বলা যায় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে পৌছানোর সুচিন্তিত কাজের বিবরণ নির্দেশ করাকে পরিকল্পনা বলে। এটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করে থাকে।

সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনার গুরুত্ব : সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে। পরিকল্পনা সর্বত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্মে এটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

১. বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন : সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা দেশে বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে। অনুন্নত দেশকে দরিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। পরিকল্পনা ঠিক করে দেয় কিভাবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব।

২. সমন্বয় সাধন : পরিকল্পনা বিভিন্ন কর্মসূচির মাঝে সমন্বয় সাধন করে থাকে। ফলে জনগণের অনুভূতি, প্রয়োজন, পরিকল্পনার মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যে কোনো দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে পরিকল্পনার বিকল্প নেই।

৩. সম্পদের সুসম বণ্টন : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করা যায়। একদিকে দেশের সম্পদ সীমিত, অন্যদিকে যদি সম্পদের সমঅধিকার নিশ্চিত না হয় তাহলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। তাই দেশের সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন।

৪. জনকল্যাণ সাধন : পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য থাকে এর মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করা। অপরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। এছাড়া পরিকল্পিত অর্থনীতি, উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য।

৫. গতিশীল সমাজব্যবস্থা : পরিকল্পনা সমাজব্যবস্থাকে গতিশীল রাখে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে সমাজের গতিধারা স্বাভাবিক থাকে। উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি পায়। মানুষের জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে।

৬. দায়িত্ব কর্তব্য বণ্টন : বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব কর্তব্য বণ্টন এবং তা পালনের মধ্য দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে দায়িত্ব ও কর্তব্য সার্বিকভাবে বণ্টন ও পালন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

৭. সমাজকল্যাণের লক্ষ্য অর্জন : সমাজকল্যাণের লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা সহায়তা করে। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো সমস্যা গ্রস্ত মানুষকে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে সে সক্ষমকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালন সমাজকল্যাণের এ লক্ষ্যার্জনে পরিকল্পনা সহায়তা করে থাকে।

৮. বেকারত্ব দূরীকরণ : এক্ষেত্রে পরিকল্পনার বড়ই ভূমিকা রয়েছে। দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়ার ব্যাপারটি পরিকল্পনায় গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে পরিকল্পনার মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

৯. সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার : পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সীমিত সম্পদ ও সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সম্পদের অপচয় রোধ, এর সর্বাধিক ব্যবহার ও অনাবিষ্কৃত সম্পদ আহরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পদকে কাজে লাগানো যায়। আর এসব সম্ভব হয় সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

১০. মানব সম্পদের উন্নয়ন : মানব সম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নত, দক্ষ ও শক্তিশালী মানব সম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। কেননা অজ্ঞ ও নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সংকীর্ণ মানসিকতার জনগোষ্ঠী নিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য তাদের শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যধিক।

১১. সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয়রোধ : একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই যে কোনো কর্মসূচির সফলতার ক্ষেত্রে সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয়রোধ করা সম্ভব হয়। ফলে কম সময়ে অল্প শ্রম ও অর্থে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এজন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

১২. পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ : কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে দেশকে ক্ষতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা যায়, কোন কর্মসূচি গ্রহণ করলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে তা একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই জানা যায়। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে উপযোগী পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৩. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন :** অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা আনয়ন করে পরিকল্পনা। উৎপাদন হ্রাস, ঘনঘন সরকার পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে দেশে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এসব সমস্যা দূর করা সম্ভব, যদি অর্থব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। তাই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণে পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যধিক।

১৪. **অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিহ্রাস :** পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে দেশ বা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো ব্যাপারে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি কমে যায়। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। এসব বিষয়ে পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা থাকে।

১৫. **কর্মদক্ষতা ও উৎসাহ সৃষ্টি :** পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। তাদের কর্ম দক্ষতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পনা কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। এর ফলে সমাজকর্মীগণ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। পরিকল্পনা সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত তাই সমাজকর্ম অনুশীলনে এর গুরুত্ব অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন১৮॥ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কী কী? পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

অথবা, **পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধর। পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনা কর।**

অথবা, **পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ। পরিকল্পনা কত প্রকার ও কী কী আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনার সূচনা ও বিকাশ। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। কোনো কাজের পূর্ব প্রস্তুতি হচ্ছে পরিকল্পনা। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে পৌছানোর সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজের বিবরণ নির্দেশ করাকে পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনার কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ : পরিকল্পনার সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া Sharma and Shastri তাঁদের 'Social planning Concept Techniques' গ্রন্থে পরিকল্পনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গ্রন্থে ও পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী তা উল্লেখ করা হলো :

১. **ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ :** পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনো কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ হয়। এটি কোনো প্রতিষ্ঠানকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনুমোদন দেয়। আবার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পুরো ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনাতে উল্লেখ থাকে। তাই এগুলো পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

২. **সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা :** পরিকল্পনা মানেই সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কর্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়। কোনো কাজ কেন করবে? কিভাবে করবে? কখন করবে? কি দিয়ে করবে? সবকিছুই পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকে। তাই পরিকল্পনা মানেই যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত।

৩. **রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক :** জাতীয় পরিকল্পনা অবশ্যই রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হবে। অর্থাৎ পরিকল্পনা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। যেমন– প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত সকল পরিকল্পনাই রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪. **সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** প্রতিটি পরিকল্পনারই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনার অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যও থাকে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন পরিকল্পনা কখনো প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এতে পরিকল্পনার সুফল পাওয়া যায় না।

৫. **সামঞ্জস্য বিধান :** পরিকল্পনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি সম্পদের সাথে কর্মসূচির সামঞ্জস্য বিধান করে। সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে কর্মসূচিকে সফল করা যায় তার বিবরণ পরিকল্পনার থাকে। পরিকল্পনা সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

৬. **জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া :** পরিকল্পনা কোনো সহজ জিনিস নয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সমস্যা, সম্পদ, সমাধান সবকিছুই ভেবে চিন্তে করতে হয়। শুধু প্রণয়ন করলেই হবে না, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ও উপযোগী হতে হবে। এজন্যই বলা হয় পরিকল্পনা একটি জটিল প্রক্রিয়া।

৭. **তথ্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন :** পরিকল্পনা হতে হয় তথ্যভিত্তিক। এটি অবশ্যই দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ দ্বারা প্রণয়ন করতে হয়। তথ্যগুলো হতে হয় বাস্তব সম্মত। তাই অভিজ্ঞতা ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

৮. **কাজের পূর্ব প্রস্তুতি :** পরিকল্পনা করতে হয় কাজ শুরুর পূর্বে। এটিকে ভবিষ্যৎ কাজের পূর্ব ধারণা ও বলা হয়। এজন্য পরিকল্পনাকে বলা হয় কাজের পূর্বচিন্তা। এছাড়া পরিকল্পনা হতে হয় বাস্তবসম্মত।

৯. **কৌশল অবলম্বন :** নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য পরিকল্পনার কৌশল অবলম্বন করা হয়। এটি যুক্তিপূর্ণ উপায়ে কৌশল অবলম্বন করে সমস্যা সমাধানে বা চাহিদা পূরণে বদ্ধপরিকর। তাই কৌশল বা পদ্ধতি গ্রহণ করা পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১০. **জনগণের জন্য কল্যাণকর :** পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণের দিকটি গুরুত্ব পায়। এজন্য অবশ্যই লক্ষ্যভুক্তদলকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাই জনগণের ক্ষতি হবে এমন কিছু পরিকল্পনায় স্থান পায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় থাকলেই তাকে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা বলা যাবে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিকল্পনাকে স্বতন্ত্র সত্তা দান করে। পরিকল্পনা যত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে এটি তত শক্তিশালী হবে। তাই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ এর স্বরূপ বলে দেয়।

পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ : পরিকল্পনা একটি ব্যাপকভিত্তিক, দীর্ঘমেয়াদি, ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এজন্য বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার প্রয়োজন হয়। এজন্যই পরিকল্পনাবিদরা বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতাও থাকা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন লেখক ও মনীষীদের মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে।

নিম্নে পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করা হলো :

ক. প্রায়োগিকতার ব্যাপকতার ভিত্তিতে : প্রায়োগিকতার ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. ব্যষ্টিক পরিকল্পনা : যে পরিকল্পনা জাতীয় ভিত্তিতে সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক পরিসরে একটি মাত্র পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থেকে প্রণীত হয় তাকে সামষ্টিক পরিকল্পনা বলে।

২. সামষ্টিক পরিকল্পনা : যেসব পরিকল্পনা ব্যক্তি পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রণীত হয় তাকে ব্যষ্টিক পরিকল্পনা বলে।

খ. অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে : এতে পরিকল্পনাকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

১. বস্তুগত পরিকল্পনা : বস্তুগত পরিকল্পনা অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের পরে তা অর্জনের জন্য উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রাপ্যতা ও সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর প্রেক্ষিতে প্রণয়ন করা হয়।

২. আর্থিক পরিকল্পনা : অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

গ. লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে : পরিকল্পনাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. স্থায়ী পরিকল্পনা : এ ধরনের পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিস্তৃত পরিসরে এটি প্রণয়ন করা হয়।

২. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা : এ ধরনের পরিকল্পনা হবে ৩ রকমের। প্রথমটি ১ বছর, দ্বিতীয়টি কয়েক বছর আর তৃতীয়টি ১৫-২০ বছরের জন্য।

ঘ. পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ভিত্তিতে : এ ধরনের পরিকল্পনাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা : যে পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায় তাকে নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা বলে।

২. উৎসাহমূলক পরিকল্পনা : যে পরিকল্পনায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোগে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চেষ্টা করা হয় তাকে উৎসাহমূলক পরিকল্পনা বলে।

ঙ. পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে : এ শ্রেণির পরিকল্পনাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিকল্পনা প্রণীত হলে তাকে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা বলে।

২. বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা : দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককের সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে তাকে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা বলে।

চ. পরিকল্পনায় কর্তৃত্ব ও বাস্তবায়নের ধরনের ভিত্তিতে : প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. সর্বাত্মক পরিকল্পনা : এ ধরনের পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হয় এবং এটি অপরিবর্তনীয় এবং অনমনীয়।

২. নমনীয় পরিকল্পনা : এ ধরনের পরিকল্পনায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি জড়িত থাকে এবং এটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়।

ছ. দেশের উন্নয়নের স্তরের ভিত্তিতে : এ রকমের পরিকল্পনাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. সংরক্ষিত পরিকল্পনা : শিল্পোন্নত দেশের শিল্প ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনা : উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি সচল রাখা ও বাধা দূর করার জন্য এ রকম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

জ. পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে : এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. খাতভিত্তিক পরিকল্পনা : এ ধরনের পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাত নির্বাচন করে সম্পদ বিনিয়োগ ও ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

২. প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা : এ ধরনের পরিকল্পনায় প্রকল্পভিত্তিক রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ঝ. সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে : সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে প্রকল্পকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১. স্বল্পমেয়াদি বার্ষিক পরিকল্পনা : ১ থেকে ৩ বছরের জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা : সাধারণত ৩-১০ বছর মেয়াদি এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা : সাধারণত ১০-১৫ বছর মেয়াদি এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

ঞ. আঞ্চলিক প্রসারতার ভিত্তিতে : পরিকল্পনাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আঞ্চলিক পরিকল্পনা : একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হলে তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলে।

২. জাতীয় পরিকল্পনা : সমগ্র দেশের উন্নয়নের জন্য যখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে জাতীয় পরিকল্পনা বলে।

৩. আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাকে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বলে।

ট. পরিধির ভিত্তিতে : পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সমন্বিত পরিকল্পনা : সমন্বিতভাবে যখন কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে সমন্বিত পরিকল্পনা বলে।

২. আংশিক পরিকল্পনা : যখন আংশিকভাবে কোনো কিছুর পরিকল্পনা করা হয় তখন তাকে আংশিক পরিকল্পনা বলে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা একটি ব্যাপক, দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময়, পরিধি, প্রায়োগিকতা, উপযোগিতা প্রভৃতি মূলত একটি দেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও জনগণের জীবনমানের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা। বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন।১১। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে দেখাও।

অথবা, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতির বিভিন্ন দিকের বিবরণ দাও।

অথবা, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০০০ এর মূলনীতি ও কর্মকৌশল আলোচনা কর। [জা. বি. ২০১৬]

উত্তর। ভূমিকা : যে কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতকে প্রয়োজনমতো গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। স্বাস্থ্য সেবায় যেসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ফলে এদেশের মানুষ বরাবরই উপর্যুক্ত স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চিত হয়ে নানারকম রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি- ২০০০ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এ নীতির পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এ নীতি স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

স্বাস্থ্যনীতির বিভিন্ন দিক : জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এদেশের সকল জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত এবং পুষ্টির স্তর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ নীতিতে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হলো :

স্বাস্থ্য নীতির প্রস্তাবনা : স্বাস্থ্য একটি পরিপূর্ণ, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা। শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অধিকার। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য, সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫ (ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮ (১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১), আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলনের অনুচ্ছেদ ১২, শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ২৪, নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২ এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের রূপকল্প (ভিশন-২০২১) অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্যের সংস্থান, সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূলকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোটায় উন্নীতকরণ, শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে হাজার ৫৪ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫ এ হ্রাসকরণ, মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে ১.৫ শতাংশে হ্রাসকরণ এবং ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ এ সার্বিক জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন : জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ এর মূল লক্ষ্য হিসেবে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়াও সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতি সাধন করা এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত।

২. মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা : বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক দরিদ্র এবং গ্রামে বাস করে। তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই এ নীতির অপর একটি লক্ষ্য হলো গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা : সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এ নীতির অপর একটি লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

৪. শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস : জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির চতুর্থ লক্ষ্য হচ্ছে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা। বিশেষ করে ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ : ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা অর্জন এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এর জন্য পরিবার পরিকল্পনা প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে জোরদার ও গতিশীল করার উল্লেখ রয়েছে। পর্যাপ্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও সচেতন করার মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়।

৬. প্রসূতি সেবা নিশ্চিতকরণ : মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা এ নীতির অপর একটি লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রামে প্রসূতি মায়ের সেবা ও চিকিৎসার জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হ্রাস করা সম্ভব।

৭. সামগ্রী সহজলভ্য করা : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা অপরিহার্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এইজন্য দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

৮. সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা : জনগণের মাঝে চিকিৎসা সেবা বিস্তৃত করা এবং সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা অপর একটি লক্ষ্য। এজন্য সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করার উল্লেখ করা হয়েছে এ নীতিতে তাছাড়াও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন ও লক্ষ্যপূরণের জন্য অপরিহার্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূলনীতি ও কর্মকৌশল : জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য কতিপয় মূলনীতি ও কর্মকৌশলসমূহ অর্জন করার জন্য কতিপয় মূলনীতি ও কর্মকৌশলসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূলনীতি ও কর্মকৌশলসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে সহায়তা : জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা। বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধান। এজন্য প্রচার মাধ্যমে সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলাও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জীবনযাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া।

২. স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়া : জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অপর একটি মূলনীতি হলো সকলের নিকট স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়া। এতে উল্লেখ আছে যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের যে কোনো ভৌগোলিক অবস্থানের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌছে দেয়া। এটা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অন্যতম কর্মকৌশল হিসেবে বিবেচিত।

৩. সম্পদের সুসম বন্টন ও সদ্ব্যবহার : জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অপর একটি মূলনীতি হলো স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত, গরিব, প্রান্তিক, বয়স্ক ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগণদের অধিক গুরুত্ব প্রদান। তাদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া। এ লক্ষ্যে বিরাজমান সম্পদের প্রাধিকার। পূর্ণবণ্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা এ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ : জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অন্যতম মূলনীতি ও কর্মকৌশল হলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং এতে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্তকরণ। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় তহবিল গঠন, বায়, পরিবীক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান পদ্ধতি পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

৫. কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা : অপর একটি মূলনীতি হলো সকলের জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসে সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং এর অংশীদারিত্বে সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহে উচ্চ মূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বেসরকারি অংশীদারিত্বে স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করা কর্মকৌশল হিসেবে বিবেচিত হয় নীতিতে।

৬. স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধি : জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অপর একটি মূলনীতি হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সেবা সকলের নিকট পৌছে দেয়া। এজন্য সঠিক ও গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবাদান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়ন কে কর্মকৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৭. স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা : স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলোকে আরো জোরদার ও শক্তিশালী করা এ নীতির অন্যতম মূলনীতি। মূলনীতি নিশ্চিত করার জন্য কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়। যেমন– কার্যকর ফলপ্রসূ ও সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার পদ্ধতি উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা প্রভৃতি।

৮. স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত আইনের কার্যকারিতা : স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সেবা গ্রহীতাসহ দেশের সর্বস্তরের নাগরিকের অধিকার, সুযোগ সুবিধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিধিনিষেধের ব্যাপারে আইনের আশ্রয় লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন : জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্নিহিত মূলনীতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করা।

১০. সমন্বয় সাধন : জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যের সাথে কার্যকর সমন্বয় করা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। তাছাড়াও পুষ্টি কার্যক্রমকেও স্বাস্থ্য সেবার সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করারও উল্লেখ রয়েছে এ নীতিতে। এজন্য যথোপযুক্ত কর্মকৌশল স্বাস্থ্য নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য উপরে বর্ণিত মূলনীতি ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা হলে দেশের প্রতিটি নাগরিক যে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা লাভ করতে সক্ষম হবে তা জোর দিয়ে বলা যায়।

প্রশ্ন।২০। পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনার ধাপসমূহ লিখ।

অথবা, পরিকল্পনা কাকে বলে? পরিকল্পনার স্তরসমূহের বিবরণ দাও।

অথবা, পরিকল্পনার সংজ্ঞা? পরিকল্পনার ধাপসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর।। ভূমিকা : পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা বা সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ। আধুনিককালের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পরিকল্পনা। কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। এটি কোনো কার্যসম্পাদনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সুচিন্তিত কর্মপ্রক্রিয়ার নীল নকশা। কতকগুলো ধাপ অতিক্রম করেই এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতিও বলা হয়।

পরিকল্পনা : সাধারণভাবে পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার নিমিত্তে এর আওতাধীন সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন মনীষী, সমাজ বিশ্লেষক, সংস্কারকগণ বিভিন্নভাবে পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

Robert. L. Barker এর মতে, "পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ। যেগুলো অর্জনের বিভিন্ন পন্থার মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কার্যক্রমের বাছাই প্রক্রিয়া।"

আর্থার ডানহামের মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা, করার পূর্বে চিন্তা করা, অনুমানের পরিবর্তে তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিক পূর্বাবস্থা।"

মনীষী **Otto Hoiberg** পরিকল্পনায় সংজ্ঞায় বলেন, "পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্ব চিন্তার ধারাবাহিক প্রয়োগ।"

New Man এর মতে, "অগ্রগতির জন্য কী করণীয় তা পরিকল্পনায় গৃহীত হয় এবং পরিকল্পনায় পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত।"

আলবার্ট ওয়াটার সন বলেন, "পরিকল্পনা হলো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের সর্বোত্তম নির্বাচনের সচেতন ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা।"

অর্থনীতিবিদ ডিকিনসন এর মতে, "পরিকল্পনা বলতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বোঝায়।"

সিকিলার হাডসন এর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কোনো কার্যক্রমের ভিত্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া।"

বিভারসনের মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে যেসব কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন এবং কিভাবে সেগুলো সম্পাদন করা হবে তার কর্ম পদ্ধতির পূর্ণ খসড়া চিত্র।"

Waltur এর মতে, "পরিকল্পনা প্রাকচিন্তা, অভ্যন্তরীণ চিন্তা, বাহ্যিক চিন্তা এবং সামগ্রিক চিন্তা।"

পরিকল্পনার বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন **H. B. Trecker** তাঁর মতে, "পরিকল্পনা হচ্ছে সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাকে ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা যায়।"

Social Work Dictionary এর সংজ্ঞানুযায়ী, পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, যেগুলো অর্জনের উপায়সমূহ মূল্যায়ন এবং যথাযথ কার্যধারা চয়নের সুচিন্তিত প্রক্রিয়া।

জর্জ আরটেরি পরিকল্পনাকে সুগভীরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, "পরস্পর সম্পর্কিত তথ্য নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ক অনুমান প্রণয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে কাম্য ফল লাভের আদর্শে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবিত কার্যাবলির ধারণা করা ও প্রণয়ন করাই হচ্ছে পরিকল্পনা।"

মনীষী **Otto Hoiberg** পরিকল্পনার সংজ্ঞায় বলেন, পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্বচিন্তার ধারাবাহিক প্রয়োগ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পরিকল্পনা হচ্ছে একটি সচেতন ও সুচিন্তিত কর্মনির্দেশনা। ভবিষ্যৎ অবস্থার অনুমান, লক্ষ্য স্থিরকরণ, নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনের সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো কাজ করার পূর্বে চিন্তা, চিন্তা করা, চিন্তা করে উদ্ভাবন, চিন্তার ফসল ও চিন্তা করে বলা। কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে পৌছানোর সুচিন্তিত কাজের বিবরণ নির্দেশ করাকে পরিকল্পনা বলে। এতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা থাকে।

পরিকল্পনার ধাপসমূহ : পরিকল্পনা প্রক্রিয়া হচ্ছে একাধিক ধাপ বা স্তরের সমন্বয়। যার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে কতকগুলো ধাপের সমষ্টি। নিম্নে পরিকল্পনার ধাপ বা স্তরসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ : পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এর ১ম ধাপ বা স্তর। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির কথা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২. কর্তৃপক্ষ গঠন : এটি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া কোনো পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে তা কিভাবে প্রণয়ন করা হবে এর সার্বিক দায়িত্ব সুদক্ষ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করতে হবে।

৩. লক্ষ্য নির্ধারণ : পরিকল্পনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ও তথ্যবহুল লক্ষ্য নির্ধারণ। দেশের উন্নয়নের জন্য কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে এবং এ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কী কী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হবে তা এ ধাপে নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্য একাধিক এবং কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় হতে পারে।

৪. সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ : লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণের পর বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য লক্ষ্যার্জনের পথে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন, শনাক্তকরণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একে পরিকল্পনার পটভূমি বলা হয়।

৫. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ : পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ ও সমস্যাবলি চিহ্নিত করার পর এ সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্পদ ও উপাদান সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। কেননা পর্যাপ্ত তথ্য কর্তৃপক্ষের নিকট না থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অসম্ভব।

৬. সময় ও কার্যধারা : পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সময় তালিকা ও কার্যধারা নিরূপণ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতিটি কাজের শুরু এবং সমাপ্তির সময় অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে কোন কাজ কখন, কতটুকু সময়ের মধ্যে এবং কার দ্বারা কার্য সম্পন্ন করা হবে তার নির্দেশনা প্রস্তুত করা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয়। মূলত সময় নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু কার্যধারার উপরই পরিকল্পনার ফলপ্রসূতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৭. সম্পদ বরাদ্দ : পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্পদ অত্যাবশ্যকীয়। মূলত পরিকল্পিত বাজেট ও সম্পদ বরাদ্দের উপরই পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করে। নিজস্ব সম্পদ ও সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য বাজেট প্রণয়নকালে অর্থসংস্থান, ব্যয়, জনশক্তি, সরবরাহ প্রশিক্ষণ, সময় নির্ধারণ প্রভৃতি নিরূপণ করতে হয়। নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার বাজেট প্রণয়ন করলে তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৮. বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া : সময় ও বাজেট নির্ধারণের পরবর্তী ধাপ হলো বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়, লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহ স্ববিস্তারে উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়াও পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন প্রশাসনিক কাঠামো জড়িত থাকবে তা বিভাজন করতে হবে এবং নীতিমালা উল্লেখ করতে হবে। সাধারণত, জাতীয় পর্যায়, ক্ষেত্র পর্যায়, উপজাতীয় পর্যায় ও উপক্ষেত্র পর্যায় এই ৪টি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

৯. পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন : পরিকল্পনার সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হচ্ছে যাচাইয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির সফলতা ও বিফলতা নির্ণয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা ও সম্ভাব্য সমাধানের পথ নির্দেশ করাই পরিবীক্ষণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত ধাপসমূহ যে কোনো দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্যসংগ্রহ থেকে শুরু করে মূল্যায়নের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। দেশের ও মানুষের স্বার্থে যেমন- পরিকল্পনা অত্যাবশ্যকীয় ঠিক তেমনি পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নও অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন॥২১॥ উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বা পূর্বশর্তসমূহ বর্ণনা কর। [জা. বি. ২০১৫]

অথবা, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বা পূর্বশর্তসমূহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বা পূর্বশর্তসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা বা সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ। আধুনিক কালের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পরিকল্পনা। যে কোনো সমাজে বা রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি ও পূর্বশর্ত হচ্ছে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিকল্পনা ব্যতিরেকে লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতিও বলা হয়।

উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বা পূর্বশর্তসমূহ : পরিকল্পনা শুধুমাত্র কল্পনা করলে চলবে না, বরং বাস্তবে রূপদিতে হবে। এজন্যই উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। উত্তম পরিকল্পনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা পূর্বশর্ত বিদ্যমান। পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে কোনো পরিকল্পনায় উপস্থিত থাকলে তাকে উত্তম পরিকল্পনা বলা হয়। এগুলোকে পরিকল্পনার পূর্বশর্তও বলা হয়। নিম্নে উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্তসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. সারল্য ও স্পষ্টতা : পরিকল্পনা মাত্রই সরল ও স্পষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ এমন হওয়া উচিত নয় যা কঠিন ও অস্পষ্ট হবে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হবে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিকট এটি সহজ ও বোধগম্য হতে হবে। এর অন্যথা ঘটলে বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সারল্য ও স্পষ্টতা উত্তম পরিকল্পনার অন্যতম পূর্বশর্ত।

২. তথ্যভিত্তিক : উত্তম পরিকল্পনার আরেকটি পূর্বশর্ত হলো এটিকে তথ্যভিত্তিক হতে হবে। আর্থসামাজিক অবস্থা, সম্পদ, শক্তি প্রভৃতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের পরিকল্পনায় তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। তথ্যাবলি সংগ্রহ করার পর এগুলো যাচাই করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৩. সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য : উত্তম পরিকল্পনার অবশ্যই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে পরিকল্পনা সংগতিপূর্ণ হতে হবে। লক্ষ্যহীন কোনো কাজই সফল হয় না। তাই উত্তম পরিকল্পনার লক্ষ্যে উদ্দেশ্য থাকা অপরিহার্য।

৪. নিরবচ্ছিন্নতা : পরিকল্পনার অপর একটি পূর্বশর্ত হলো এটি অবিরাম চলতে থাকবে। একটি বাস্তবায়নের সাথে সাথে আরেকটি পরিকল্পনার কাজ শুরু করতে হবে। ফলে পরিকল্পনায় কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হবে না।

৫. ঐক্য ও সমন্বয় : পরিকল্পনায় ঐক্য ও সমঝোতা থাকবে। সামগ্রিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা থাকতে পারে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সফলতা নির্ভর করে। তাই উত্তম পরিকল্পনা মানেই ঐক্য, যোগাযোগ ও সমন্বয় থাকবে।

৬. নির্ভুলতা : নির্ভুলতা উত্তম পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা পূর্বশর্ত। পরিকল্পনা যত নির্ভুল হবে এর ফল তত ভালো হবে। তাই পরিকল্পনা পূর্বানুমান। পূর্ব অভিজ্ঞতা, পূর্ব ঘটনা প্রভৃতির ভিত্তিতে প্রণীত হলে তা ত্রুটিমুক্ত হবে।

৭. নমনীয়তা : এটি পরিকল্পনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যৎ এ পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে। তাই এটি যে কোনো সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে একে নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে পরিকল্পনা তার কার্যকারিতা হারায়।

৮. বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণয়ন : পরিকল্পনায় তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করা একটি বুদ্ধি বৃত্তির কাজ। আর এটি সম্পন্ন করা হয় অভিজ্ঞ ও যোগ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। বয়স্ক, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষজ্ঞ হিসেবে অভিহিত হয়। তাই এটি উত্তমপরিকল্পনার অন্যতম পূর্বশর্ত।

৯. আধুনিক কলাকৌশলের ব্যবহার : উত্তম পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আধুনিক কলাকৌশলের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কলাকৌশল ও প্রযুক্তির অনুপস্থিতিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।

১০. সময় উল্লেখ : উত্তম বা ভালো পরিকল্পনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সময়ের কথা উল্লেখ থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ কখন শুরু ও শেষ হবে তা এতে নির্দিষ্ট করা থাকে। যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১১. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার : একটি আদর্শ পরিকল্পনার অন্যতম দিক হলো এতে সম্পদ ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত থাকে। এজন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা রচিত হলে সম্পদের অপব্যয় পরিকল্পনায় নিষিদ্ধ।

১২. বাস্তবমুখী পরিকল্পনা : উত্তম পরিকল্পনা মানেই বাস্তবমুখী হবে। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি কলাকৌশল, নীতি প্রভৃতি সবকিছুই হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী। তাই বাস্তবসম্মত হলেই এটি উত্তম পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৩. পরিকল্পনার পটভূমি শনাক্তকরণ : এটি চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য পটভূমির উপকরণাদি শনাক্ত করে তা বিচারবিশ্লেষণ করা উত্তম পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

১৪. অর্থনৈতিক সংগঠন : পরিকল্পনাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক সংগঠন থাকবে। এ সংগঠন হবে জাতীয় ভিত্তিক সংস্থা। এটি পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। এটি উত্তম পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য।

১৫. অঙ্গীকার সৃষ্টি : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ অর্থাৎ নির্বাহী ও কর্মীদের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে অঙ্গীকার থাকতে হবে। তাই পরিকল্পনার ব্যাপারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি উত্তম পরিকল্পনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১৬. বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি : পরিকল্পনায় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরতে হবে। উত্তম পরিকল্পনা প্রণীত হয় বর্তমানে এবং বাস্তবায়িত হয় ভবিষ্যতে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১৭. গ্রহণযোগ্যতা : ভালো পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণীত হবে এবং তা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যাতে প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তর থেকে কার্যক্রম ভালোভাবে অনুধাবন ও অবলোকন করা যায়। এজন্য এর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে শুরু করতে হবে।

১৮. মূল্যায়নের সুযোগ : পরিকল্পনার সফলতা, ব্যর্থতা মূল্যায়নের সুযোগ থাকা উত্তম পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পনায় মূল্যায়নের সুযোগ থাকলে, পরিবর্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ ও কম ত্রুটিযুক্ত হয়। ফলে পরিকল্পনা গতিশীল ও ধারাবাহিক হয়।

১৯. কার্যক্রম ভিত্তিক : সুষ্ঠু কার্যক্রম থাকবে উত্তম পরিকল্পনায়। পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে কর্মসূচির বাস্তবায়ন। কর্মমুখী পরিকল্পনা হলো উত্তম পরিকল্পনা।

২০. দক্ষ প্রশাসন : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত প্রশাসন থাকবে। কেননা ভালো প্রশাসনের অভাবে পরিকল্পনা লাগামহীন হয়ে যায়। তাই তো W. A. Lewis দুর্নীতিমুক্ত দক্ষ প্রশাসনকে পরিকল্পনার সাফল্য অর্জনের শর্তরূপে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এটি উত্তম পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

২১. সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক : পরিকল্পনার অপর একটি পূর্বশর্ত হলো এটি সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক হবে। ধারাবাহিক ও গঠনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যার্জনের দিকে পৌছে দেয়। এমনকি পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টতা থাকলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সহজতর হয়।

২২. অন্যান্য : এছাড়া অন্যান্য পূর্বশর্ত হচ্ছে মৌলিক চাহিদা পূরণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মিতব্যয়ীতা, ভারসাম্যতা প্রভৃতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উত্তম পরিকল্পনা অপরিহার্য। এগুলো উত্তম পরিকল্পনার আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক উন্নয়নের জন্য উত্তম পরিকল্পনার বিকল্প নেই। তাই এসব বৈশিষ্ট সম্পন্ন পরিকল্পনাকে উত্তম পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন।২২। **বাংলাদেশে প্রণীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।**

[জা. বি. ২০১৫]

উত্তর। **ভূমিকা :** বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ ছোট দেশটিতে প্রায় ১৬ কোটি মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশের এ বিশাল জনসংখ্যা এ দেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং পাশাপাশি আরো অসংখ্য সমস্যার জন্মদাতা। তাই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যতগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তার প্রতিটিতেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার ধারণাকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রণীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে, সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার হলো স্বাস্থ্য। দেশের মানুষের স্বাস্থ্যগত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়েছে। এজন্য রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। এদেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে জনসংখ্যা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা নীতির ফলেই বাংলাদেশের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের ফলেই এদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল জনসংখ্যা নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০ অনুযায়ী এদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩২। এছাড়া মহিলা প্রতি উর্বরতা হার ২.৩। এসবই জনসংখ্যা নীতির অন্তর্ভুক্ত। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জনসংখ্যা নীতির গুরুত্ব অত্যধিক।

২. স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম : এদেশে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) ২০.৯, স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে) ৬., শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে এবং এক বছরের কম), ৪১ স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি স্তরেই জনসংখ্যা নীতির কারণে উন্নয়ন ঘটেছে।

৩. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ : এদেশের জনসংখ্যা নীতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এর সাথে জনসংখ্যার উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা হয়।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করা : জাতীয় জনসংখ্যা নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা। দেশের আর্থসামাজিক সমস্যার সাথে জনসংখ্যা নীতির সমন্বয় ঘটিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বি[illegible]তি লাভ করে।

৫. টেকসই উন্নয়ন সাধন : জাতীয় জনসংখ্যা নীতির আরেকটি অন্যতম দিক হলো শিশু, মহিলা, বয়স্ক প্রভৃতি শ্রেণির স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার টেকসই উন্নয়ন সাধন করা। জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে এদিকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৬. শিশু মৃত্যুর হার কমানো : জাতীয় জনসংখ্যা নীতির ফলে দেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯[illegible] সালে ৮৭,২০০৪ এ ৬৫ এবং ২০১০ সালে তা কমে ৪১ জনে এসে দাঁড়িয়েছে (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে এবং এক বছরের কম)।

৭. শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা : এদেশের শিশুরা সাংবিধানিক দিক থেকেই স্বাস্থ্য পরিচর্যা পাওয়ার অধিকার রাখে। জনসংখ্যা নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য সুবিধা ও পরিচর্যার দিকটি স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। ফলে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় এ নীতির গুরুত্ব অত্যধিক।

৮. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা : জনসংখ্যা নীতির তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদান করা। জনসংখ্যা নীতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার কথা উল্লেখ থাকায় দেশের আপামর জনগণ এ সুবিধা ভোগ করবে।

৯. প্রজনন স্বাস্থ্য : দেশের প্রজনন স্বাস্থ্যকে জনসংখ্যা নীতির আওতায় আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে সুস্থতাসহ যৌন জীবনের সার্বিক সক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে প্রজনন স্বাস্থ্য সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকায় জনগণের সুস্থতা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক।

১০. জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান : এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান। এদেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও এর সাফল্য জাতীয় নীতির জন্যই সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং এর উন্নয়নে জনসংখ্যা নীতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মানব সম্পদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, জনসংখ্যা বিকাশ, পরিবার কল্যাণ।
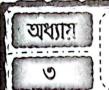
পরিকল্পনা ও পরিকল্পনায়ন
Plan and Planning

ক বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. পরিকল্পনা কী?

উত্তর : পরিকল্পনা অর্থ পূর্ব কল্পনা বা চিন্তা অথবা পূর্ব থেকে কোন কাজ করার সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মূলত পরিকল্পনা হচ্ছে কোন কাজ করার পূর্ব চিন্তা, চিন্তা করে উদ্ভাবন, চিন্তার ফসল ও চিন্তা করে বলা।

২. সর্বপ্রথম কখন কোথায় পরিকল্পনা ধারণাটির সন্ধান পাওয়া যায়?

উত্তর : সর্বপ্রথম প্রায় ২৪০০ বছর পূর্বে প্লেটোর 'Republic' গ্রন্থে পরিকল্পনা ধারাণাটির সন্ধান পাওয়া যায়।

৩. পরিকল্পনার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?

উত্তর : পরিকল্পনার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন H.B. Trecker.

৪. H.B. Trecker এর পরিকল্পনার সংজ্ঞাটি কী?

উত্তর : পরিকল্পনা হচ্ছে চিন্তাভাবনার সচেতন ও সুবিবেচিত নির্দেশনা যাতে স্বীকৃত লক্ষ্য অর্জনে যৌক্তিক উপায় সৃষ্টি করা হয়।

৫. আধুনিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণাটি সর্বপ্রথম কখন কোথায় উদ্ভব হয়?

উত্তর : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সর্বপ্রথম রাশিয়াতে উদ্ভব হয়।

৬. কবে, কোথায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়?

উত্তর : ১৯২৮ সালে রাশিয়ায়-প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

৭. কলম্বো পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত কখন গৃহীত হয়?

উত্তর : ১৯৫০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে কলম্বো পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮. কোন সভ্যতায় পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপিত হয়?

উত্তর : সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতায় এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। চৈনিক, গ্রিক, রোমান, ভারতীয় প্রভৃতি সভ্যতায়ও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯. বাংলাদেশ কখন পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হয়?

উত্তর : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কলম্বো পরিকল্পনার সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হয়।

১০. এককথায় পরিকল্পনা কিভাবে কতিপয় WH প্রশ্নের জবাব?

উত্তর : এককথায় কোন কাজ (What actions), কেন (Why), কার দ্বারা (By whom), কখন (When), কোথায় (Where), কিভাবে (How) সম্পাদিত হবে তার উত্তর বা সিদ্ধান্তই পরিকল্পনা।

১১. পরিকল্পনার উপর যে গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাদের তিন জনের নাম লেখ।

উত্তর : হেনরি ফ্যাওল, ডেভিড ইয়ং, প্রিস্টন লি ইত্যাদি।

১২. পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর : দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসাধন করা, এছাড়া কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প, শিক্ষা, মানব সম্পদ ইত্যাদির উন্নয়নসাধন করাও এর অন্যতম কাজ।

১৩. উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার কী?

উত্তর : উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার পরিকল্পনা।

১৪. উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্ত কী?

উত্তর : তারল্য ও স্পষ্টতা, তথ্য ভিত্তি, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, নিরবচ্ছিন্নতা, ঐক্য ও সমন্বয় নির্ভুলতা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি।

১৫. পরিকল্পনা কিসের বা কোন প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য?

উত্তর : পরিকল্পনা প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ কার্য। এটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা।

১৬. ভারতীয় উপমহাদেশে কবে পরিকল্পনা প্রণীত হয়?

উত্তর : ১৯৪৩ সালে উপমহাদেশে পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালে কলম্বো পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

১৭. কে পরিকল্পনার কতকগুলো নীতিমালার কথা উল্লেখ করেন?

উত্তর : এইচ. বি. ট্রেকার।

১৮. কখন ও কোথায় সর্বপ্রথম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়?

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে এটিকে বাস্তব রূপে দেয়া হয়। তখন এটি যুদ্ধ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এতুদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেনেও পরিকল্পনা ধারণাটি গৃহীত হয়।

১৯. মার্শাল পরিকল্পনা কী?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইউরোপের দেশগুলোকে সাহায্য দানের পরিকল্পনা, যার আওতায় সাহায্য পাবার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র ঐ দেশসমূহকে তাদের সব অর্থনৈতিক বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নে জোর দেয়।

২০. পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ থেকে কী কী সমস্যা দূর করা যায়?

উত্তর : আয়ের বৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ইত্যাদি দূর করা যায়।

২১. পরিকল্পনার কয়েকটি নীতিমালা উল্লেখ কর।

উত্তর : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণনীতি, অনুভূত প্রয়োজ পূরণনীতি, জনগণের অংশগ্রহণ নীতি, সম্পদের ম... নীতি, বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নীতি।

২২. পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ কী কী?

উত্তর : সমস্যা, চাহিদা, উপাত্ত, দক্ষতা ও নৈপু... নীতিমালা, সম্পদ, সময় প্রশাসন, নেতৃত্ব ইত্যাদি।

২৩. বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা কী?

উত্তর : মূলধনের স্বল্পতা, দুর্বল প্রশাসন ব্যব... তথ্যের স্বল্পতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অদক্ষ... প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

২৪. বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের বাধা দূরীকরণে উপায় লিখ।

উত্তর : প্রাচুর্যতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল... অনুকূল পরিবেশ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদি

খ বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন।১। পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।

অথবা, পরিকল্পনা কী?

অথবা, পরিকল্পনা ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

অথবা, পরিকল্পনা ধারণাটি কাকে বলে।

অথবা, পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

উত্তর। ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন ছোঁয়াচ ছিল না। সে যুগ Fatalism বা অদৃষ্টবাদী ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় মূলত তা ঠিক করার জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্পনার উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দিয়ে কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বিরল। কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

পরিকল্পনার সংজ্ঞা : পরিকল্পনা বলতে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আওতাধীন সম্পদের সুষম বন্টনের নিমিত্তে ভবিষ্যৎ কার্যাবলির সুশৃঙ্খল পদক্ষেপই হচ্ছে পরিকল্পনা।

অন্যকথায় বলা যায়, কোন দেশের সামাজিক সমস্যা, অনাচার দূর করার জন্য দেশীয় সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা নিরসনকল্পে পূর্বতর চিন্তাভাবনা করে যে নীল নকশা প্রণয়ন করা হয় তাই পরিকল্পনা।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ Walter এর মতে, "Planning is pre-thinking, thingking out, thinking up and thinking through."

Encyclopaedia of Britanica গ্রন্থে Planning ইংরেজি শব্দটিতে ব্যবহৃত সবগুলো বর্ণের ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। নিচে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হলো :

P– Process of work.

L– Limite of time, money and manpower.

A– Analysis of work and result.

N– Network or management.

N– Normally accepted.

I– Implimentable.

N– National focus.

G– Govern by the executive body or council.

মনীষী এইচ.ডি. ডিকিনসন এর মতে, "পরিকল্পনা হলো সার্বিক অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে, যথার্থ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচেতনভাবে গৃহীত প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যেমন– কি উৎপাদিত হবে, কতখানি উৎপাদিত হবে, কখন, কোথায় ও কিভাবে সেগুলো উৎপন্ন হবে এবং কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, পরিকল্পনা হলো কোন কাজের উদ্দেশ্য, নীতি, প্রক্রিয়া এবং কর্তব্য সম্পর্কিত পূর্ব চিন্তা বা পূর্ব প্রস্তুতি, যার মাধ্যমে কর্মসংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সম্ভব। অর্থাৎ, Planning is pre-thinking What to do, How to do, Why to do, Who will do, When to do and Why want to do?

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বহুসংখ্যক অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় লক্ষ্যসমূহ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট সকল বিকল্পসমূহ, যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং লক্ষ্যার্জনে সীমিত সম্পদের যুক্তিগত বিভাজনই পরিকল্পনা।

প্রশ্ন॥২॥ পরিকল্পনার শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ কর।

অথবা, **পরিকল্পনার ধরনগুলো আলোচনা কর।**

অথবা, **পরিকল্পনার প্রকারভেদগুলো উল্লেখ কর।**

অথবা, **পরিকল্পনার প্রকৃতি বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : কোন দেশের পরিকল্পনা গড়ে উঠে মূলত সেদেশের সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো, জনগণের জীবনযাত্রার মান, পরিবেশগত অবস্থা, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির উপর। আর এজন্য পরিকল্পনাও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ : Professor Benjamin Higgnis পরিকল্পনার চারটি ভাগ উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. জটিলতা নিক্ষেপ,
২. প্রকল্প পরিকল্পনা,
৩. খাতওয়ারি পরিকল্পনা এবং
৪. লক্ষ্যভুক্ত পরিকল্পনা।

অন্যদিকে, **M.L. Seth** দু'ধরনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

ক. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিকল্পনা এবং
খ. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনা।

অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে **M.L. Seth** আরো কতকগুলো পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. অনাবর্তনশীল বনাম উন্নয়ন পরিকল্পনা,
২. সমন্বিত বনাম আংশিক পরিকল্পনা,
৩. স্থায়ী বনাম জরুরি পরিকল্পনা,
৪. সাধারণ বনাম বিস্তারিত পরিকল্পনা,
৫. কেন্দ্রীভূত বনাম বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা,
৬. অত্যাবশ্যক বনাম কাঠামোগত পরিকল্পনা এবং
৭. আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বিভিন্ন মনীষী তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিকল্পনাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে পরিকল্পনা যেভাবেই হোক না কেন তার বাস্তবায়ন নির্ভর করে সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার উপর।

প্রশ্ন॥৩॥ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

অথবা, **উন্নয়ন পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।**

অথবা, **উন্নয়ন পরিকল্পনা কী?**

উত্তর॥ ভূমিকা : সাধারণভাবে 'উন্নয়ন' বলতে উন্নত হওয়ার কার্যক্রমকে বুঝায়। আর এ উন্নয়ন অবশ্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। কোন দেশের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা : স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের গতিকে বৃদ্ধি করা এবং প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা।

Albert Waterstone বলেন, "বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের সর্বোত্তম নির্বাচনের সচেতন এবং ক্রমাগত প্রক্রিয়াই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা।"

M.L. Seth বলেন, "Development planning in the under developed countries....... seeks to achieve increased incomes and employment by breaking the structural obstacles which hinder growth."

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা যেখানে কোন দেশের সামগ্রিক সম্পদকে বিবেচনায় এনে দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করার সুপরিকল্পিত কর্মপন্থাই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সুপরিকল্পিত কর্মপন্থাই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

প্রশ্ন॥৪॥ একটি উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

অথবা, **উত্তম পরিকল্পনার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।**

অথবা, **উত্তম পরিকল্পনার প্রকৃতি লিখ।**

উত্তর॥ ভূমিকা : কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য দেশীয় সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যাবলির সুশৃঙ্খল পদক্ষেপই হচ্ছে পরিকল্পনা। আর এজন্য একটি উত্তম পরিকল্পনায় রয়েছে কতকগুলো স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য।

একটি উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য : একটি উত্তম পরিকল্পনার যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় সেগুলো হলো :

১. পরিকল্পনায় অবশ্যই সুচিন্তিত কর্মপ্রক্রিয়া থাকতে হবে।
২. এটি অবশ্যই উদ্দেশ্যভিত্তিক হতে হবে।
৩. পরিকল্পনা অবশ্যই অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং তথ্যভিত্তিক হতে হবে।
৪. পরিকল্পনা অবশ্যই কাজের পূর্বপ্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ কাজের পূর্ব ধারণা।
৫. পরিকল্পনা অবশ্যই যুক্তিনির্ভর এবং গতিশীল হতে হবে।

৮. পরিকল্পনাটি অবশ্যই রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৯. পরিকল্পনায় অবশ্যই দেশের সমগ্র জনগণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে বাস্তবায়নের উপর, আর এজন্য পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবায়ন উপযোগী হতে হবে তবেই সেটি একটি ভালো পরিকল্পনা হিসেবে গৃহীত হবে।

প্রশ্ন।৫। **পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।**

অথবা, **পরিকল্পনার মানদণ্ডগুলো উল্লেখ কর।**

অথবা, **পরিকল্পনার বিষয়বস্তু উল্লেখ কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : অর্থনীতিতে পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যত কার্য সম্পাদনের একটি সুচিন্তিত ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে পরিকল্পনা। সব ধরনের পরিকল্পনার কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেগুলো পরিকল্পনার গঠন, বাস্তবায়ন, কার্যক্রম প্রভৃতি বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে থাকে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য : বহুসংখ্যক অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যেগুলো সেসব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শনাক্ত করে তা অর্জনের জন্য সম্পদের যুক্তিগ্রাহ্য বিভাজনই পরিকল্পনার প্রধান ক্রিয়াকলাপ। তবে এ ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. পরিকল্পনা একটি সুচিন্তিত কর্মপ্রক্রিয়া, অর্থাৎ কোন কাজ সুস্পষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সচেতন ও সুচিন্তিতভাবে ঠিক করে নিতে হয়।

২. পরিকল্পনা সবসময় উদ্দেশ্যভিত্তিক। তাই বলা যায়, "It is a deliberate attempt to creat a logical measure for the achievement of the objectives."

৩. পরিকল্পনা অবশ্যই কাজের পূর্ব প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ কাজের পূর্বধারণা।

৪. পরিকল্পনা একটি যুক্তি নির্ভর ও গতিশীল প্রচেষ্টা তাই বলা যায়, "It can be mobilize local mutative energies and resources for local development."

৫. এটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যুক্তিপূর্ণ উপায় নির্ভর করে থাকে।

৬. পরিকল্পনা সম্পদ ও জনগণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে, যেমন- "It achieve a better distribution of population, wealth and human activities and self meanest through a balanced urban-rural, relationship.

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পরিকল্পনা অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্যেক পরিকল্পনার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উপরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন।৬। **পরিকল্পনার শর্তসমূহ কী কী?**

অথবা, **পরিকল্পনা প্রণয়নে কী কী শর্ত বিবেচনা** [illegible] **হয় উল্লেখ কর।**

অথবা, **পরিকল্পনার নির্ধারকগুলো লিখ।**

অথবা, **পরিকল্পনার নির্দেশকগুলো লিখ।**

উত্তর॥ ভূমিকা : বহুবিধ অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে সর্ব প্রয়োজনীয়তাগুলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শনাক্ত করে তা অর্জ জন্য সম্পদের যুক্তিগ্রাহ্য বিভাজনের মাধ্যমেই বিস্তৃ পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট। একটি ভালো পরিকল্পনার শর্তসমূহ উল্লেখ করা হলো :

পরিকল্পনার শর্তসমূহ : একটি ভালো পরিকল্প শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাস্তব তথ্যভিত্তিক।

২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

৩. সেটি অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য হবে।

৪. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

৫. পরিকল্পনা নমনীয় হতে হবে।

৬. পরিকল্পনা সুসমন্বিত হতে হবে।

৭. পরিকল্পনা দেশীয় সম্পদভিত্তিক হতে হবে।

৮. সরকারের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে।

৯. দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা।

১০. কর্মীদের ইতিবাচক মনমানসিকতা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যে, পরিকল্পনা ভালো হওয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র একটি মুখ্য উপাদ কারণ কোন দেশে কি ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হবে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক্ষমতাসীনদে চরিত্র ও ক্ষমতার উৎসের উপর।

প্রশ্ন।৭। **পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচ কর।**

অথবা, **কী কী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্প প্রণয়ন করা হয় উল্লেখ কর।**

অথবা, **কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ক হয়?**

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন ছোঁয় ছিল না। সে যুগ Fatalism বা অদৃষ্টবাদী ছিল। বি শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় মূলত তা দ করার জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্প উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দি কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ক হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্ব বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বির কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য : পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ...র আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কি উৎপন্ন হবে, কেমন উৎপন্ন হবে এবং কার জন্য উৎপন্ন হবে যে কোন ...নৈতিক অবস্থায় এ তিন মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস ...। ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যও তাই। তবে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পটভূমিকায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের ...র্জন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১. আর্থসামাজিক উন্নয়ন। জাতীয় অর্থগতির প্রবৃদ্ধির হার ...এর মূল লক্ষ্য।

২. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এ লক্ষ্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৩. কর্মহীন লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৪. আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা।

৫. কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষিখাতের আধুনিকীকরণ।

৬. বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য ...রক্ষণ।

৭. জীবনের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ।

৮. দেশকে শিল্পায়নের পথে অগ্রসরকরণ।

৯. অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ।

১০. সমাজের অসমতা দূরীকরণ।

১১. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা খুঁজে বের করা এবং তা ...ধানের যথাযথ ব্যবস্থা করা।

এ সম্পর্কে শর্মা ও শাস্ত্রীর 'Social Planning' গ্রন্থে বলা ...ছে "Planning is to undertake a diagnosis of the ...ticular situation creating social problem on ...ich action in needed."

উপসংহার : অতএব পরিকল্পনা হলো একটি ব্যাপক ...ক বিষয়। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক। ...আলোচনার মাধ্যমে আরও বিস্তারিত ফুটে উঠে।

প্রশ্ন।৮। সামাজিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।

অথবা, সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দাও।

অথবা, সামাজিক পরিকল্পনা কাকে বলে।

অথবা, সামাজিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ।

উত্তর। ভূমিকা : যে কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে ...পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের ...বহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের ...দ সীমিত কিন্তু চাহিদা অপরিসীম। তাই উপযুক্ত পরিকল্পনার ...মে সকল কাজ করতে হবে। সামাজিক সমস্যাবলি ...কাবিলা করে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যও চাই ...জিক পরিকল্পনা। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়নের জন্য ...নৈতিক উন্নয়নও জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ...নৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ...কল্পনার বেশকিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক পরিকল্পনা : কোন কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করার পূর্বসিদ্ধান্তই হলো পরিকল্পনা। সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজে বিদ্যমান সমস্যাবলি সমাধানের জন্য যে পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই সামাজিক পরিকল্পনা। সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তাই সামাজিক পরিকল্পনা।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

'Social Work' Dictionary' অনুযায়ী, "সামাজিক পরিকল্পনা হলো যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া যেখানে পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থসামাজিক কাঠামো গঠিত হয়। [Social planning is systematic procedures to achieve predetermined types of socio-economic structures and to manage social change rationally.]

সমাজবিজ্ঞানী **Sumner** এবং **Keller** সামাজিক পরিকল্পনাকে সহজাত বহির্ভূত দূরদৃষ্টির উন্নয়ন বলেছেন, যা মানুষকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। তিনি বলেছেন, [Social planning is the development of non-instinctive forsight that distinguishes.]

উপসংহার : উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, সমাজে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাবলি সঠিকভাবে সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক অগ্রগতি আনয়নের জন্য যে পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই সামাজিক পরিকল্পনা। সামাজিক পরিকল্পনা সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।

প্রশ্ন।৯। সামাজিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক পরিকল্পনার প্রকৃতি আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : যে কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অপরিসীম। তাই উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল কাজ করতে হবে। সামাজিক সমস্যাবলি মোকাবিলা করে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যও চাই সামাজিক পরিকল্পনা। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নও জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের

সামাজিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু : সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বেশকিছু বিষয়বস্তু খেয়াল রাখতে হয়। নিম্নে সামাজিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা : সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়বস্তু হলো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা। সমাজে বিদ্যমান সমস্যাবলি কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া থাকে সামাজিক পরিকল্পনায়। সামাজিক পরিকল্পনাকে তাই সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার হাতিয়ার বলা যায়। এ সম্পর্কে W. F. Ogburn বলেছেন, "Planning is likely to be more effective where it is most needed at the level of social problems."

২. সম্পদের সুষম বণ্টন : বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ হলো সম্পদের অসম বণ্টন। বাংলাদেশের বেশিরভাগ সম্পদ গুটিকয়েক ধনী লোকের হাতে গচ্ছিত। অন্যদিকে, বেশিরভাগ লোকের সম্পদ সীমিত। তাই সামাজিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু হতে হবে কিভাবে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা যায়।

৩. সমাজ সংস্কার : সমাজে অনেক কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত থাকে। এসব কুসংস্কার ও কুপ্রথা সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। সমাজসংস্কারের মাধ্যমে এ ধরনের কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করতে হয়। সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়বস্তু হলো সমাজসংস্কার।

৪. সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়ন : সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়ন। সরকার দেশের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ইত্যাদি নীতি প্রণয়ন করে থাকে। এসব নীতি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে সামাজিক পরিকল্পনায়। তাই সরকারি নীতিমালার বাস্তবায়নও সামাজিক পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়বস্তু।

৫. বেকার সমস্যা সমাধান : সামাজিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো বেকার সমস্যার সমাধান করা। দেশে প্রচলিত সামাজিক সমস্যার মধ্যে বেকার সমস্যা অন্যতম।

৬. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন : পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করলে একটি দেশ সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। কারণ পরিকল্পনা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত। তাই সামাজিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা জরুরী।

৭. ভবিষ্যৎ নীতি : সামাজিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করা। নীতি নির্ধারণ ছাড়া কোন কাজ সঠিকভাবে করা যায় না।

উপসংহার : পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো সামাজিক ক্ষেত্র। এ খাতকে সুষ্ঠু সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য দরকার সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ। আর এই সামাজিক পরিকল্পনার কিছু বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যায় তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন।১০। সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্যগুলো লিখ।

উত্তর। ভূমিকা : যে কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অপরিসীম। তাই উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল কাজ করতে হবে। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য চাই সামাজিক পরিকল্পনা। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নও জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করা হলো।

সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্ক : পূর্বে ধারণা করা হতো শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে উন্নয়ন হয়। কিন্তু বর্তমানে বলা হচ্ছে একটি দেশের সুষম উন্নয়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন হতে হবে। সামাজিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। তাই সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। নিম্নে সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে অর্থবহ করে তোলে : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন হবে এমনটি আশা করা যায় না। কেননা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক খাতেরও উন্নয়ন করতে হবে। সামাজিক খাতের উন্নয়নের জন্য চাই সামাজিক পরিকল্পনা। তাই এ কথা বলা যায় যে, সামাজিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে অর্থবহ করে তোলে।

২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একে অন্যের পরিপূরক : সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে তা সামাজিক উন্নয়নকে সহায়তা করে। আবার সামাজিক উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অর্থবহ করে তোলে। তাই বলা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান : একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বলতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুই খাতের উন্নয়নকে বুঝায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও সামাজিক খাতের

উন্নয়ন নাও হতে পারে। অন্যদিকে, সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করা হয়। তাই দেখা যায় সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

৪. **উভয়ের লক্ষ্য এক :** সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়, যার লক্ষ্য জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। অন্যদিকে, সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা হয়, যার লক্ষ্য হলো জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্তমান যুগে সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের অসীম চাহিদা মিটাতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একই সাথে হলে তবেই তাকে প্রকৃত উন্নয়ন বলে। তাই সামাজিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন॥১১॥ বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় উল্লেখ কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দার ব ঘটে তা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্পনার উন্মেষ ঘটে। কোন শের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পনা। কিন্তু পরিকল্পনা য়নের পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত ।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো : পরিকল্পনা বাস্ত নের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো রূপ :

১. দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা অনুধাবনে উদাসীনতা, অক্ষমতা এবং পরিকল্পনার অবাস্তব উদ্দেশ্য।
২. দেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন উপযোগী প্রকল্প প্রণয়নে ব্যর্থতা।
৩. বাংলাদেশে পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে দক্ষতার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
৪. পরিকল্পনার সুষ্ঠু ও নিয়মিত গবেষণা ও মূল্যায়নের অভাব।
৫. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অভাব।
৬. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অধিকমাত্রায় পরনির্ভরশীলতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ যেহেতু উন্নয়নশীল দেশ সেহেতু দেশের সার্বিক অবস্থা অনুধাবন করে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা বাস্তবায়ন করা অনেকাংশে সহজ হবে।

প্রশ্ন॥১২॥ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মানদণ্ডগুলো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি বর্ণনা কর।

অথবা, উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তু লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৭ বার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ বার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর একবার দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করলে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. বাজার প্রক্রিয়া অনুসরণ।
২. পরনির্ভরশীলতা।
৩. উপরভিত্তিক পরিকল্পনা।
৪. সহ সমীকরণ পদ্ধতি।
৫. বেসরকারি খাতের প্রতি গুরুত্বারোপ।
৬. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
৭. মিশ্র পরিকল্পনা।
৮. পরিকল্পনা কৌশল।
৯. স্থানীয় পরিকল্পনা।
১০. বিশেষ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ।
১১. প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ।
১২. শক্তি ও সম্পদের বিনিয়োগ।
১৩. আর্থসামাজিক উদ্দেশ্যাবলি এবং লক্ষ্য বিবেচনা।
১৪. প্রতিটি খাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
১৫. আর্থিক সম্পদ সংগ্রহকরণ।
১৬. পরিকল্পনা মডেল।

উপসংহার : উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গ্রীহিত পরিকল্পনাকে বুঝায়। দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এ পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ পরিকল্পনার কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায় উপরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥১৩॥ বাংলাদেশে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার তাৎপর্য আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানো যাবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের দারিদ্র্যতা দূর হবে। এসব বিষয় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নিম্নে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো :

১. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
২. মূলধন গঠন।
৩. সীমাবদ্ধ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।
৪. আয় বৈষম্য দূরীকরণ।
৫. বেকার সমস্যা সমাধান।
৬. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।
৭. উৎপাদন বৃদ্ধি।
৮. দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন।
৯. আর্থসামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন।
১০. সঞ্চয় বিনিয়োগের ব্যবধান হ্রাস।
১১. আমদানি রপ্তানির ব্যবধান কমানো।
১২. খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন।
১৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
১৪. গণ দারিদ্র্য প্রতিরোধ করা।
১৫. নারী শিক্ষার উন্নয়ন।
১৬. নারী পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ।
১৭. বাজেট উদ্বৃত্তকরণের ক্ষেত্রে।

উপসংহার : উপরোক্ত বিষয়াবলীর আলোকে বলা যায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বাধিক উন্নয়ন দ্রুততর করা যায়।

প্রশ্ন॥১৪॥ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনার গুরুত্ব লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : বর্তমান যুগে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মাধ্যমেই দেশের সমস্যার সমাধান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। পরিকল্পনা ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে এবং কাজে সফলতা অর্জনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে। এটি উন্নয়নের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি।

পরিকল্পনার গুরুত্ব : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সমাজ কাঠামো, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়। নিম্নে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো :

১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জন : সকল কাজেরই লক্ষ্য থাকে। পরিকল্পনা সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। পরিকল্পনাবিহীন কাজ নাবিকহীন জাহাজের মতো। এজন্যই দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনার সাহায্য নিতে হয়। এর কোনো বিকল্প নেই।

২. বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন : সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা দেশে বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে যথাযথ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। পরিকল্পনাই ঠিক করে দেয় কোন পথ অবলম্বন করলে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সম্ভব।

৩. সমন্বয়সাধন : পরিকল্পনা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে দেয়। জনগণের চাহিদা এর মাধ্যমে পূরণ হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৪. সম্পদের সুসম বণ্টন : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করা যায়। একদিকে দেশের সীমিত সম্পদ, অন্যদিকে যদি সম্পদের সমঅধিকার নিশ্চিত না হয় তবে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ : কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে দেশকে ক্ষতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা যাবে, কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে তা একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই জানা যায়।

৬. জনকল্যাণ সাধন : পরিকল্পিত অর্থনীতি, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য।

৭. দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন : বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন এবং তা পালনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। আর এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

৮. বেকারত্ব দূরীকরণ : দেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যাপারটি পরিকল্পনায় গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। এজন্য ব্যাপক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. জরুরি অবস্থা মোকাবিলা : প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মসূচি থাকে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, নদীভাঙন প্রভৃতি জাতীয় জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা যায় পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে।

১০. সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ : একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই যে কোনো কর্মসূচির সফলতার ক্ষেত্রে সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয়রোধ করা সম্ভব নয়। ফলে কম সময়ে, স্বল্প শ্রম ও অর্থে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এজন্যই কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনার বিকল্প নেই। দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উত্তম পরিকল্পনা। সমাজকল্যাণে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়নের গতিধারা বেগবান করার জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন॥১৫॥ পরিকল্পনার ধাপ/ স্তরসমূহ লিখ।

অথবা, পরিকল্পনার ধাপ/ স্তরসমূহ তুলে ধর।

অথবা, পরিকল্পনার ধাপ/ স্তরসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা বা সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ। আধুনিক কালের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পরিকল্পনা। কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। এটি কোনো কার্যসম্পাদনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সুচিন্তিত কর্ম প্রক্রিয়ার নীলনকশা। কতকগুলো ধাপ অতিক্রম করেই পরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনাকে কাজের পূর্ব প্রস্তুতিও বলা হয়।

পরিকল্পনার ধাপসমূহ : পরিকল্পনা প্রক্রিয়া একাধিক ধাপ বা স্তরের সমন্বয়। যার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে কতকগুলো ধাপের সমষ্টি। নিচে পরিকল্পনার ধাপ বা স্তরসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ : পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এর ১ম ধাপ। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির কথা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২. কর্তৃপক্ষ গঠন : এটি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া কোনো পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে তা কীভাবে প্রণয়ন করা হবে এর সার্বিক দায়িত্ব সুদক্ষ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করতে হবে।

৩. লক্ষ্য নির্ধারণ : পরিকল্পনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও তথ্যবহুল লক্ষ্য নির্ধারণ। দেশের উন্নয়নের জন্য কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে এবং এ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কী কী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হবে তা এ ধাপে নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্য একাধিক এবং কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় হতে পারে।

৪. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ : লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য লক্ষ্যার্জনের পথে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন, শনাক্তকরণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটাকে পরিকল্পনার পটভূমি বলা হয়।

৫. তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ : পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ ও সমস্যাবলি চিহ্নিত করার পর এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্পদ ও উপাদান সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। কেননা, পর্যাপ্ত তথ্য কর্তৃপক্ষের নিকট না থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অসম্ভব।

৬. সময় ও কার্যধারা : পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সময় তালিকা ও কার্যধারা নিরূপণ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতিটি কাজের শুরু এবং সমাপ্তির সময় অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে কোন কাজ কখন, কতটুকু সময়ের মধ্যে এবং কার দ্বারা কার্যসম্পন্ন করা হবে তার নির্দেশনা প্রস্তুত করা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয়। মূলত সময় নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু কার্যধারার উপরই পরিকল্পনার ফলপ্রসূতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৭. সম্পদ বরাদ্দ : পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ অত্যাবশ্যক। মূলত পরিকল্পিত বাজেট ও সম্পদ বরাদ্দের উপরই পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করে। নিজস্ব সম্পদ ও সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য বাজেট প্রণয়নকালে অর্থসংস্থান, ব্যয়, জনশক্তি, সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, সময় নির্ধারণ প্রভৃতি নিরূপণ করতে হয়। নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার বাজেট প্রণয়ন করলে তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৮. বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া : সময় ও বাজেট নির্ধারণের পর পরবর্তী ধাপ হলো বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়, লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহ স্ববিস্তারে উল্লেখ করতে হয়। তাছাড়াও পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন প্রশাসনিক কাঠামো জড়িত থাকবে তা বিভাজন করতে হবে এবং নীতিমালা উল্লেখ করতে হবে। সাধারণত, জাতীয় পর্যায়, ক্ষেত্র পর্যায়, উপপর্যায় ও উপক্ষেত্র পর্যায় এই ৪টি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

৯. পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন : পরিকল্পনার সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হচ্ছে যাচাইয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির সফলতা ও বিফলতা নির্ণয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হচ্ছে কি না, কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখা ও সম্ভাব্য সমাধানের পথনির্দেশ করাই পরিবীক্ষণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত ধাপসমূহ যেকোনো দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্যসংগ্রহ থেকে শুরু করে মূল্যায়নের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। দেশের ও মানুষের স্বার্থে যেমন পরিকল্পনা অত্যাবশ্যকীয় ঠিক তেমনি পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নও অত্যন্ত জরুরি। উপর্যুক্ত ধাপসমূহ অবলম্বন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে তা সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য পরিকল্পনা হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন।১৬। **অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা বর্ণনা কর।**

অথবা, **অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকাসমূহ ব্যাখ্যা কর।**

অথবা, **অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : কোনো কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমেই দেশের সমস্যার সমাধান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। পরিকল্পনা ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে এবং কাজে সফলতা অর্জনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে। পরিকল্পনা যত যুগোপযোগী ও গঠনমূলক হবে তত তার সুফল পাওয়া যাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়ন সাধিত হয়। এছাড়া সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আয়ের বৈষম্য হ্রাস, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায়। নিচে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা বর্ণনা করা হলো :

১. সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত উন্নয়ন : কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন মূলত সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। কেননা, কোন ক্ষেত্রে কতটুকু লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে, কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে, আবার কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ স্থির রাখা প্রয়োজন, কীভাবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব তা সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। তাই বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

২. সম্পদের সুসম বন্টন : সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত করা যায়। দেশের সীমিত সম্পদের সুসম বন্টনের জন্য সামাজিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কেননা, সম্পদের সুসম বন্টনের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল।

৫. বেকারত্ব দূরীকরণ : অপরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থায় জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বেকার অবস্থায় জীবনযাপন করে। যুবসমাজ যেকোনো দেশের উন্নয়নের হাতিয়ার। তাই বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। সামাজিক পরিকল্পনায় বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্প্রসারণ, একচেটিয়ে কারবার নিয়ন্ত্রণ, আয় বন্টনে কাম্য পরিবর্তন আনয়ন, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৩. মূলধন গঠন : অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধন বৃদ্ধি একটি অন্যতম বিষয়। মূলধনের বৃদ্ধি ঘটাতে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। মূলধন গঠনের জন্য জনগণের সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি থাকতে হবে। মূলধন থাকলেই তা বিনিয়োগ করা যায়। আর বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে। এজন্য প্রয়োজন জনগণকে সচেতনকরণ যা সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব।

৪. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণ : সামাজিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অস্থিতিশীলতা অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন– আয়ের বৈষম্য হ্রাসমূলক কর্মসূচি, উপার্জনমূলক পদ্ধতি আবিষ্কার, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি। দেশের সম্পদ যেন পুঁজিপতিদের নিকট কুক্ষিগত না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সামাজিক পরিকল্পনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. সমন্বয় সাধন : সমন্বয় সাধন যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিকল্পনাতেও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে সামাজিক পরিকল্পনা। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণ : রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য ও অস্থিতিশীল পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে দেশের জনগণের সাথে সবসময় অস্থিরতা বিরাজ করে। উৎপাদন ব্যাহত হয়। যা অর্থনৈতিক অবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, ক্ষতিকর সমস্যা মোকাবেলায় সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

৮. কর্মদক্ষতা ও উৎসাহ সৃষ্টি : আর্থিকভাবে দেশকে সচ্ছল করতে হলে প্রয়োজন দক্ষ কর্মী এবং কর্মের প্রতি উৎসাহ। পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের ভেতর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের কর্মদক্ষতাও বহুগুণ বেড়ে যায়। দক্ষ কর্মী তৈরি করতে সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করে। তাছাড়াও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে মান উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক পরিকল্পনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, একটি দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সার্বিক কল্যাণে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। এটা উন্নয়নের পূর্ব পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে কাজ করে। তাই একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য। সামাজিক পরিকল্পনায় তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। সুষ্ঠু সামাজিক পরিকল্পনাই পারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন করতে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন॥১৭॥ পরিকল্পনার নীতিমালাসমূহ লিখ।

অথবা, পরিকল্পনার নীতিমালাসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, পরিকল্পনার মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কতকগুলো নীতি অনুসরণ করতে হয়। নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ ও বাস্তবায়ন উপযোগী হয়। পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত করার জন্য নীতিমালার ক্ষেত্রে সীমারেখা থাকতে হয়।

পরিকল্পনার নীতিমালাসমূহ : পরিকল্পনার সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নীতিমালা হিসেবে এইচ. বি. ট্রেকার (**H. B. Trecker**) কতগুলো নীতিমালার উল্লেখ করেন :

→ যে ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাদের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গঠন করা উচিত।

→ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে তথ্যভিত্তিক ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে।

→ পরিকল্পনাতে পেশাগত নেতৃত্ব প্রয়োজন।

→ স্বেচ্ছাসেবী, অপেশাদার ও পেশাদার নেতৃত্বের প্রয়োজন।

→ কাজের পূর্ববর্তী চিন্তার উপর পরিকল্পনা নির্ভরশীল।

সার্বিকভাবে পরিকল্পনা যেসব নীতিমালা অনুসরণ করে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি : পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি। পরিকল্পনা সবসময় তার লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা চালায়। কেননা লক্ষ্য পৌছতে না পারলে এটি ব্যর্থ হয়, ভিত্তিহীন হয় পরিকল্পনা। এজন্য পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে নীতি হিসেবে বেছে নিয়েছে।

২. অনুভূত প্রয়োজন পূরণ নীতি : জনগণের অনুভূত চাহিদার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এর অন্যতম নীতি।

৩. নমনীয় ও সহজবোধ্য নীতি : আরেকটি নীতি হলো নমনীয় ও সহজবোধ্য। পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যাতে এটি নমনীয় হয় এর ফলে পরিকল্পনা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৪. জনগণের অংশগ্রহণ নীতি : পরিকল্পনায় জনঅংশায়ন অত্যাবশ্যকীয় নীতি। এর ফলে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়। তাই জনঅংশায়ন যত ব্যাপক হবে, পরিকল্পনা তত প্রাণবন্ত হবে।

৫. সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি : পরিকল্পনার মূলনীতি হলো সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি। পরিকল্পনার মাধ্যমে বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদকে কাজে লাগানো হয়। এতে করে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৬. পর্যাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক নীতি : পরিকল্পনার আরেকটি মূলনীতি হলো এতে পর্যাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা ভরপুর থাকায় পরিকল্পনায় অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের সুযোগ থাকে না।

৭. সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন : বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সমান বণ্টন ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের সকল মানুষ উপকৃত হয়। এ নীতির ফলে সম্পদকে মানুষের কল্যাণে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

৮. বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নীতি : পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হতে হবে। বাস্তবমুখী না হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। কিন্তু পরিকল্পনা মানেই তা হতে হবে বাস্তবায়নযোগ্য।

৯. বাঞ্ছিত আর্থসামাজিক পরিবর্তন নীতি : পরিকল্পনা সবসময় প্রত্যাশিত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। এটি সর্বদা ইতিবাচক পরিবর্তন প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন কোনো ক্ষতি বয়ে না আনে।

১০. মূল্যায়ন নীতি : পরিকল্পনায় মূল্যায়নকে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিকল্পনা মাত্রই এর সফলতা ও ব্যর্থতা খতিয়ে দেখা। ফলে পরিকল্পনা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, এগুলো ছাড়াও পরিকল্পনার আরো বহুবিধ নীতি রয়েছে। যেগুলো পরিকল্পনায় অত্যাবশ্যকীয় নীতি। যেমন- লিপিবদ্ধকরণ নীতি, মূলধন গঠন নীতি, বিকল্প কার্যধারা নীতি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নীতি প্রভৃতি।

প্রশ্ন॥১৮॥ পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ লিখ।

অথবা, পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ তুলে ধর।

অথবা, পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছু কিছু বিষয়ের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। অনুকূল পরিবেশ ও সম্পদসহ কতিপয় বিষয় উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন হয়। এসব বিষয়ের উপস্থিতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ : যেসব বিষয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেই বিষয়গুলোকে বিবেচ্য বিষয় বা প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বলা হয়।

নিম্নে পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. সমস্যা : সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সমস্যা বলতে এক্ষেত্রে আর্থসামাজিক সমস্যাকে বুঝায়। সমস্যা নির্ধারণের পাশাপাশি সমাধানেরও দিক নির্দেশনা থাকে এতে। তাই সমস্যা ও তার সমাধান পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

২. চাহিদা : পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো চাহিদা বা প্রয়োজন। অনুভূত চাহিদার প্রতি ভিত্তি করেই পরিকল্পনা গঠিত হয়। চাহিদা পূরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অপরিহার্য।

৩. উপাত্ত : পরিকল্পনা প্রণয়নে উপাত্ত বা তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা অতি জরুরি। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, লক্ষ্য স্থির করা, সম্পদ আহরণ সবকিছুই তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। তাই সঠিক তথ্যসংগ্রহ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪. দক্ষতা ও নৈপুণ্য : পরিকল্পনা প্রণেতাদের অবশ্যই দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নৈপুণ্যের অধিকারী হতে হয়। নতুবা পরিকল্পনা গঠনমূলক তৈরি হয় না।

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যে কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। লক্ষ্য অর্জন করাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য থাকে। এটি পরিকল্পনার অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়।

৬. দক্ষ কর্মী : পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীকে অবশ্যই দক্ষ হতে হয়। দক্ষ কর্মীই পারে পরিকল্পনা সফল করতো তাই এটি অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয়।

৭. নীতিমালা : পরিকল্পনা মানেই কতিপয় নীতি থাকবে। নীতির উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা প্রণীত হবে। প্রণয়নকারী নীতিসমূহকে অনুসরণ করেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে তাই এটি অন্যতম উপাদান।

৮. সম্পদ : তথ্য, গবেষণা, বিশ্লেষণ, কর্মসূচি, বাস্তবায়ন প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পদ অপরিহার্য উপাদান। কেননা অর্থ ব্যতীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় না।

৯. অগ্রাধিকার : পরিকল্পনায় কোনো বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে সেটি নির্ণয় করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অপরিহার্য। তাহলেই পরিকল্পনা সফলতা পায়। এটি পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তার করে।

১০. নেতৃত্ব : দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব সুষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। কেননা দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অসম্ভব। যোগ্য নেতার নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা হয় বাস্তবভিত্তিক এবং বাস্তবায়ন হয় সফল। তাই নেতৃত্বে পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ পরিকল্পনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো ছাড়াও আরো নানাবিধ বিষয় আছে। এসব বিষয়ের উপস্থিতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি এগুলোর অনুপস্থিতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে। তাই এসব বিষয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন॥১৯॥ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যাবলি চিহ্নিত কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যে কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। কেননা উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক সময় পরিকল্পনার সফল প্রণয়ন বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সাধারণত যেসব কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিকল্পনার সাফল্যের মুখ দেখা অনিশ্চিত হয় তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশ উন্নয়ন বিশ্বের একটি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর দেশ, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশে অনেক সময় পরিকল্পনার সফল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে নি। বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ড. হামিদ বলেছেন, "বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে সে প্রেক্ষিতে তার ভূমিকা তথা জাতীয় মূল্যায়ন, নীতি প্রণয়ন, সম্পদ সংস্থান, সমন্বয় সাধন, গণ অংশায়ন নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক গবেষণা ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই যথাযথ অর্থবহ ও কার্যকর হয়ে উঠে নি।"

সাধারণত যেসব কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিকল্পনার সাফল্যের মুখ দেখা অনিশ্চিত হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. অপূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা : গৃহীত পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য; অবাস্তবতায় বিশেষায়িত সমষ্টি মডেল নির্ভরতা; সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা; অর্থনৈতিক বহির্ভূত দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়া, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সুবিধার সংযোগ সাধনে ব্যর্থতা এ দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা হিসেবে পরিগণিত।

২. সম্পদের সীমাবদ্ধতা : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হয়, তার অপ্রতুলতাও এদেশের পরিকল্পনার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

৩. দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যথাযথ সমন্বয় না হওয়া : উন্নয়ন খাতে সহায়তা লাভে দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের অসংলগ্নতা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অপরিকল্পিত পরিবর্তন ইত্যাদি বাংলাদেশে একটি সফল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এদেশে প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। সরকারি নির্বাহি ব্যবস্থায় পরিকল্পনা সংস্থার যথাযথ অবস্থান দানে ব্যর্থতা; পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক এবং তাদের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের মাঝে যথাযথ যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা, স্থানীয় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি এদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের একটি সমস্যা।

৫. বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা : বাংলাদেশের প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছাপ সুস্পষ্ট। যা এদেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি নির্ভরতা, উদ্ভাবনে বাধা দান করা এবং অত্যধিক বাড়াবাড়ি, ব্যক্তিগত এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ঈর্ষা পরায়ণতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়াবলিতে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন।১। পরিকল্পনা কাকে বলে? পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালাগুলো আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনা কী বলে? পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে কী কী নীতি অনুসরণ করা হয় আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দাও। পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সমস্ত নীতিমালা অনুসরণ করে তা আলোচনা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন, আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রাখা আবশ্যক যেগুলো পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু, যথাযথ, ফলপ্রসূ ও বাস্তবায়ন উপযোগী করে তোলে। মূলত এ সমস্ত বিষয়গুলোই পরিকল্পনার নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত। তবে পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে এসব নীতিমালার ক্ষেত্রেও সীমারেখা থাকা আবশ্যক। এর কারণ উল্লেখ করে **F. Zweig** বলেছেন, "The principle of planning should be applied only so for as it necessary. In small doses it may be useful, like a medicine but in large doses it may kill the patient." অর্থাৎ, পরিকল্পনার নীতিমালাসমূহ যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রয়োগ করা উচিত। তবে ঔষধের ন্যায় অল্প মাত্রায় এটি যেমন রোগীর জন্য উপযোগী আবার অতিরিক্ত মাত্রা রোগীর মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

পরিকল্পনার সংজ্ঞা : পরিকল্পনা বলতে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আওতাধীন সম্পদের সুষম বণ্টনের নিমিত্তে ভবিষ্যৎ কার্যাবলির সুশৃঙ্খল পদক্ষেপই হচ্ছে পরিকল্পনা।

অন্যকথায় বলা যায়, কোন দেশের সামাজিক সমস্যা, অনাচার দূর করার জন্য দেশীয় সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা নিরসনকল্পে পূর্বতর চিন্তাভাবনা করে যে নীল নকশা প্রণয়ন করা হয় তাই পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালা : নিম্নে পরিকল্পনার নীতিমালা সম্পর্কে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

১. পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য যেসব ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠান গঠিত তাদের প্রকাশিত ইচ্ছা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গঠন করা উচিত।

২. যারা পরিকল্পনার ফলাফল দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের অংশীদারিত্ব থাকতে হবে।

৩. পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে এটা যথেষ্ট বাস্তব তথ্যভিত্তিক হতে হবে।

৪. অধিক কার্যকরী পরিকল্পনায় কমিটি কর্মের অধিক যথাযথ নিয়মানুগ পদ্ধতি, মুখোমুখি পদ্ধতির সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হবে।

৫. অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াপূর্বক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বা বিশেষত্ব হতে হবে।

৬. পরিকল্পনাতে পেশাগত নেতৃত্বের প্রয়োজন।

৭. পরিকল্পনাতে স্বেচ্ছাসেবী, অপেশাদার, সমষ্টি এবং পেশাদার নেতৃত্বের প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়ে।

৮. পরিকল্পনাতে দলিল রচনা এবং লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন কেননা পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ও নির্দেশনা রক্ষার লক্ষ্যে আলোচনা ও বিচারবিবেচনা করা।

৯. প্রতিটি নতুন সমস্যার জন্য পরিকল্পনা শূন্য থেকে শুরু করার চেয়ে বিদ্যমান পরিকল্পনা ও সম্পদ বিবেচনা করা উচিত।

১০. ফার্মের পূর্ববর্তী চিন্তার উপর পরিকল্পনা নির্ভরশীল।

পরিকল্পনা প্রণয়নের আরো কিছু নীতিমালা :

১. সর্বস্তরের জনগণ তথা সমগ্র জাতির অনুভূত প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য ও কার্যধারায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

ক. সর্বাধিক আক্রান্ত সমস্যাসমূহ নির্ধারণ।

খ. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্যা নির্বাচন।

গ. প্রয়োজন পূরণে উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার ধরন।

ঘ. পরিবর্তনে জনগণের মতামত ও প্রত্যাশার স্তর।

২. কার্যোপযোগী ও নিশ্চিত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনাকে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, দর্শন, ভাবধারা ও ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কার্যধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

৪. জনগণের অনুভূত সমস্যা, চাহিদা এগুলো পূরণে প্রাপ্ত সম্পদ, জনবল, প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

৫. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য বিধান করা।

৬. সরকারি বেসরকারিভাবে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

৭. দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৮. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান ও পুনরাবৃত্তি বা অপচয় রোধের মাধ্যমে কার্যোপযোগী করে তোলা।

৯. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কি ধরনের আদর্শ মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হয় এবং কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় সে সম্পর্কে অবহিত না থাকলে সুষ্ঠু ও বাস্তব উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এসব আর্দশ মূল্যবোধ ও বিবেচ্য বিষয় হলো পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালা। আর এ নীতিমালাগুলো পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন।২। পরিকল্পনার ধাপসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার স্তরগুলো আলোচনা কর।

অথবা, পরিকল্পনার পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন ছোঁয়াচ ছিল না। সে যুগ Fatalism বা অদৃষ্টবাদী ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় মূলত তা ঠিক করার জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্পনার উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দিয়ে কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বিরল। কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

পরিকল্পনার ধাপসমূহ : পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুচিন্তিত কর্ম প্রক্রিয়ার নীল নকশা। নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কার্যাবলির সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্ম প্রণালীই হচ্ছে পরিকল্পনা। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্ত বায়নের জন্য কতকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ গঠন : পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম ধাপ হলো কর্তৃপক্ষ গঠন। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া কোন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে তা কিভাবে প্রণয়ন করা হবে এর সার্বিক দায়িত্ব সুদক্ষ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করতে হবে। যথা: বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করে।

২. ব্যাপক ভিত্তিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দেশের উন্নয়নের জন্যে কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে এবং এ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কি কি লক্ষ্য নির্ধারণ করবে তাই হচ্ছে পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর।

৩. পরিসংখ্যানগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ : পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ গঠন এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর পরিকল্পনার যে স্তরটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে তা হলো পরিসংখ্যানগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ। দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্পদ ও উপাদান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য কর্তৃপক্ষের হাতে না থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অসম্ভব।

৪. পরিকল্পনার কাল বা মেয়াদ ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ : প্রাপ্ততথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর এ ধাপে সঠিক উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্য অর্জন নিমিত্তে প্রাপ্তসম্পদের ভিত্তিতে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনের জন্যে কত সময়ের প্রয়োজন তার একটা মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে।

৫. বাজেট প্রণয়ন এবং সম্পদ পরিকল্পনা : কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কেননা, নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার বাজেট প্রণয়ন করলে তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৬. বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া : পরিকল্পনার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধাপ হলো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয় সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা স্ববিস্তারিত ও সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এর সাথে সাথে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন কর্মসংগঠন বা প্রশাসনিক বিভাগ জড়িত থাকবে তা বিভাজন করতে হবে এবং তাদের নীতিগুলো উল্লেখ করতে হবে। সাধারণত ৪টি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, যথা :

ক. জাতীয় পর্যায় : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, Planning Commission, মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলো হলো ক্ষেত্র পর্যায়। যেমন– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে, T.S.S. Programme and BRDB.

খ. ক্ষেত্র পর্যায় : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জাতীয় পর্যায়ের অধীনে কর্মরত। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলো হলো ক্ষেত্র পর্যায়। যেমন– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে TSS. Programme and BRDB. (Bangladesh Rural Development Bank).

গ. জাতীয় পর্যায় : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, Planning Commission মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন অধিদপ্তর এবং পরিদপ্তর।

ঘ. উপক্ষেত্র পর্যায় : ক্ষেত্রের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন উপক্ষেত্র। যেমন– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু কল্যাণ এবং এর অধীনে ক্ষেত্র হলো Correction Service.

৬. উপকেন্দ্রের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প : শিশুদের সংশোধনের জন্য কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে তারা সংশোধন করছে সেগুলো হলো উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প। এছাড়াও এ কর্মসূচি প্রক্রিয়ায় যারা কর্মরত থাকবে তাদেরকে কারা তদারকি করবে, কিভাবে করবে এবং (নিযুক্ত) উক্ত কর্মসূচিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য একটা কর্মনীতি থাকবে।

৭. মূল্যায়ন : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরে আসবে মূল্যায়নের কথা। মূল্যায়ন হচ্ছে অবস্থা যাচাইয়ের মাধ্যমে কোন কর্মসূচির সফলতা ও বিফলতা নির্ণয়। অর্থাৎ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো তার মধ্যে কি ত্রুটি ছিল, কিভাবে করলে বেশি সফলতা অর্জন করা যেত তা নির্ণয়ের জন্য মূল্যায়ন অতি প্রয়োজন। অতীতে এ মূল্যায়নের অভাবে অনেক পরিকল্পনাই শুধু অর্থের অপচয় হয়েছে মাত্র। মূল্যায়ন ৪টি স্তরে হয়ে থাকে। যেমন–

ক. পরিকল্পনা গ্রহণকালে কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা।

খ. পরিকল্পনা গ্রহণের কিছুদিন পর প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু সফল হয়েছে তা যাচাই করা।

গ. পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু দিন পর এর কাজকর্ম কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

ঘ. প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে তা কতটুকু লক্ষ্যার্জন করছে তা মূল্যায়ন করা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যার যাত্রা শুরু হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। তবে এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন মূখ্য বিষয় নয়। এটা কার্যকরী করাই হলো আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন।৩। **পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।**

অথবা, **পরিকল্পনা প্রণয়নের অ্যাপ্রোচগুলো আলোচনা কর।**

অথবা, **পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামো আলোচনা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন ছোঁয়াচ ছিল না। সে যুগ Fatalism বা অদৃষ্টবাদী ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় মূলত তা ঠিক করার জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্পনার উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দিয়ে কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বিরল। কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি : একটি যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পূর্ব থেকেই ঐ পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন খাতে সরকারি ব্যয় ধার্যকরণের উদ্দেশ্যে যেমন স্বল্পকালীন কার্যকরী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তেমনি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এটা অত্যাবশ্যক। নিম্নে পরিকল্পনার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. উদ্দেশ্য :

ক. প্রতিক্ষা

খ. অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন

গ. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

ঘ. পূর্ণ কর্মসংস্থান

ঙ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা

চ. সামাজিক নিরাপত্তা

ছ. লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

৩. প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ : এটি পরিকল্পনার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। Target growth rate নির্ধারণ হয় পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের উপর। তবে এটি সবসময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। কারণ এটি নির্ভর করে সরকারের স্থিতিশীলতার উপর বা জনগণের মনমানসিকতার উপর.।

৪. বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ : জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কতটুকু হবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতে হবে। এ বিনিয়োগ হার নির্ধারণের জন্য কতকগুলো formula ব্যবহৃত হয়। যেমন– Harrod Domar Model এটি ভারতীয় দীর্ঘ পরিকল্পনা।

৫. মূলধন উৎপাদন অনুপাত : এটি সবসময় বিশ্লেষণ করে যে কতটুকু মূলধন invest করলে কি পরিমাণ emergence output বেরিয়ে আসে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতি বা শিল্পক্ষেত্রে কতটুকু বিনিয়োগ করা হলো এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগ করে কতটুকু output পাওয়া গেল এবং সম্পর্কই হলো capital output ratio.

৬. ভৌত পরিকল্পনা বনাম আর্থিক পরিকল্পনা : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কতটুকু real resources থাকবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হবে। এ real resources গুলো হলো শ্রমিক, ইট, বালি ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, পরিকল্পনা বা জাতীয় উন্নয়নের জন্য আর্থিক সম্পদের দরকার হয়। এ আর্থিক সম্পদ কতটুকু হবে তার জন্য আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাধারণত আর্থিক পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং সমাজবাদী সমাজে বস্তুগত পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতিতে বিরাজ করায় উভয় ধরনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য উভয় পদ্ধতিই অধিকতর উপযোগী।

৭. পরিকল্পনা ভারসাম্যতা : পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য। অর্থাৎ, পরিকল্পনার সব sector গুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য বিরাজ করতে হবে। এ Balance planning তিন ধরনের হতে পারে। যথা :

a. Crosswise balance
b. The backward balances
c. Monetory balances

৮. উপরের দিক হতে পরিকল্পনা বনাম নিচের দিক হতে পরিকল্পনা : যখন পরিকল্পনার উপরের স্তর থেকে প্রণয়ন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে planning from above বলে। এর সুবিধা হলো দেশের সার্বিক চাহিদার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু এর অসুবিধা হলো দেশের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ চাহিদার গুরুত্ব দেয়া হয় না।

৯. পরিকল্পনার সময়কাল : পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকটি দেশে তার আর্থসামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিকল্পনাকালীন সময় নির্ধারণ করে। পরিকল্পনার সময় সাধারণত তিন ধরনের হয়। যথা :

a. **Annual Plan :** Annual plan say a plan for a period - 1 year.
b. **Medium term plan say :** A plan for a period - 5 year.
c. **Perspective plan say :** A plan for a period of 15 years to 20 years.

১০. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা : Professor G. Mydal এর মতে, Rolling Plan নিম্নরূপ :

Firstly - one plan for the next following year.

Secondly - one plan for the next following shorter period of some few years.

Thirdly - one perspective plan for 15 to 20 years.

Rolling planning বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতি বছরই একটি করে পরিকল্পনার সময় নির্ধারণ করতে হবে।

১১. পরিপূরক পরিকল্পনা : এর দু'টি অংশ হলো :

a. Essential on the 'core' part - "The essential part must be implementation at any cost and resources for its implementation must be assured in advance."
b. The 'contigent' part - in to be implementation only if necessary resources are forth comming in an adequate measure.

অর্থাৎ, পরিকল্পনার Essential দিকগুলোর বাস্তবায়নে তার যদি অতিরিক্ত অর্থ থাকে তার মাধ্যমে contigent part এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. নমনীয় ও কঠিন পরিকল্পনা : এটি পরস্পর বিরো[illegible] পরিকল্পনা। **প্রথমত,** পরিকল্পনাকে নমনীয় হতে হবে। কেন[illegible] দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, মানুষের চাহিদা, এবং মানসিক[illegible] ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে পারে। আবার পরিকল্পনাকে সঠিকভা[illegible] বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিকভাবে এটাকে কঠোর হতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত বিভিন্ন আলোচনার বিশ্লে[illegible] সাপেক্ষে বলা যায়, অনুন্নয়নের অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে এ[illegible] উন্নয়নের গতি সর্বোত্তম করার জন্যই পরিকল্পনার অত্যাবশ্যক[illegible] উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য যেসব তত্ত্বসমূহের কথা ব[illegible] হয়ে থাকে তাদের প্রায় অধিকাংশ তত্ত্বেই পরিকল্পনা[illegible] প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে[illegible] অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত[illegible] সীমাবদ্ধ সকল সম্পদসমূহের সুষ্ঠু এবং দক্ষ ব্যবহার পরিকল্পনা[illegible] গ্রহণের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব তা অপরিকল্পিত অবস্থায় সম্ভব ন[illegible]

প্রশ্ন॥৪॥ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্ব কী?

অথবা, উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনার প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন ছোঁয়া ছিল না। সে যুগ Fatalism বা অদৃষ্টবাদী ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় মূলত তা ঠি[illegible] করার জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্পনার উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দিয়ে কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ কর[illegible] হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বিরল। কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনার গুরুত্ব : বর্তমা[illegible] যুগ পরিকল্পনার যুগ। এ যুগের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'হয় পরিকল্পনা, [illegible] হয় ধ্বংস'। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে অব্যবহৃত সম্প[illegible] কাজে লাগানো যাবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণে[illegible] দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে এসব বিষয়ের বিবেচনায় প্রত্যেক[illegible] দেশেরই পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে পরিকল্পনার গুরু[illegible] বা প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হলো :

১. সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত উন্নয়ন : পরিকল্পনার মাধ্যমেই একটি[illegible] দেশের সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত উন্নয়ন সম্ভব। কারণ কোন ক্ষেত্রে[illegible] কতটুকু লক্ষ্য অর্জিত হবে; কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি দেশে[illegible] উন্নতির অনুকূলে; কোন ক্ষেত্রকে স্থির রাখা প্রয়োজন ইত্যাদি[illegible] এবং কিভাবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়।

২. সম্পদের সুষম বণ্টন : একমাত্র পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ সম্পদের সুষম বণ্টন করা যেতে পারে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে মূলধন এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ দুষ্প্রাপ্যতা বিদ্যমান। এ কারণে দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে মূলধনকে এমন করে বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে সর্বাধিক সামাজিক প্রয়োজনে সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, অব্যবহৃত সম্পদ কি পরিমাণে আছে এবং এগুলো কিভাবে জনগণ ও দেশের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় এর সবকিছুই সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব।

৩. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জন : পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করলে একটা দেশ সুনির্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। কারণ পরিকল্পনা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত। পরিকল্পনাহীন কাজ নাবিকহীন জাহাজের মত। কিন্তু পরিকল্পনার মাধ্যমে উদ্দেশ্য ও কর্মধারা নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে নিলে নাবিক যেমন তার জাহাজের নিয়ন্ত্রণ পাবে, তেমনি যে কোন কাজ তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে।

৪. সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন : নীতি বাস্তবায়িত হয় পরিকল্পনার মাধ্যমে, আর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় একমাত্র জনকল্যাণের জন্য। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে কল্যাণের প্রয়োজন ও কল্যাণকে প্রাধান্য না দিয়ে অধিক মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ও বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা নির্দেশ করে "To motivate the community to achieve higher productivity." সুতরাং, মানুষের কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, কি তার চাহিদা এবং অভাব এসবের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. সমন্বয় সাধন : অনুভূত প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভব। একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মসূচি থাকে; এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। আর একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। এতে কর্মবিভাজন ও দৈবীকরণ যাতে না ঘটে তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. উপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ : তাই এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন কার্যকরী হবে, কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশ মুক্ত থাকবে ইত্যাদি পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব।

৭. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : পরিকল্পনার ফলে সমাজ গতিশীল হয়। কিন্তু এ গতিশীল পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষ প্রতি মুহূর্তে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে কি কি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, জনগণের মধ্যে কিরূপ মনোভাব বিরাজ করবে, উৎপাদন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন আনবে এ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সক্রিয় থাকতে হবে। তাই সম্ভাব্য অসুবিধা দূর করার জন্য পূর্ব থেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, যা কি না পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব।

৮. দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন : সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং সমন্বয় থাকা আবশ্যক। যেমন– বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কুসংস্কারমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মধ্যে যথাযথ দায়িত্ব বণ্টন ও সমন্বয় সাধন করা। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি ছক নিম্নরূপ :
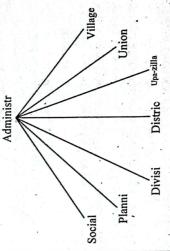
৯. বেকার সমস্যা সমাধান : অপরিকল্পিত সমাজব্যবস্থায় জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ অনেক ক্ষেত্রে বেকার অবস্থায় জীবনযাপন করে থাকে। এর ফলে অর্থনীতিতে নানারূপ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। কেইনস বলেছেন, "বিনিয়োগের স্বল্পতাই বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ।" সুতরাং, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্প্রসারণ, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ ও আয় বণ্টনে কাম্য পরিবর্তন আনয়ন করে, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো যায়।

১০. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণ : পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে নানাবিধ অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়ে থাকে। উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেক সময় অতি উৎপাদন অথবা স্বল্পতর উৎপাদন এর ফলে অর্থনীতির ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। তাছাড়া অনুন্নত দেশগুলোতে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মন্দাভাব, শ্রমিক ছাঁটাই, দ্রব্য মূল্যের উত্থানপতন ইত্যাদি পরিকল্পিত হয়ে থাকে, যা অর্থনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যা দূর করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে পারে।

১১. মূলধন গঠনে সহায়ক : অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মূলধন একটি অন্যতম বিষয়। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় মূলধন গঠন এবং বিনিয়োগ খুবই কঠিন। মূলধন গঠনে একমাত্র উপায় সঞ্চয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোগের উপর নিয়ন্ত্রণ এনে দেশের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে মূলধনের প্রবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। মূলধন গঠন সম্পর্কে **M.L. Seth** বলেছেন, "A planned economy can secure a far greater rate of capital accumulation than an unplanned economy."

১২. জাতীয় জরুরি অবস্থা মোকাবিলা : পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, যুদ্ধ ইত্যাদি জাতীয় জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, "An unplanned economy is a mistrit for any country at a time of war or of national agency."

উপসংহার : উপরিউক্ত বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, অনুন্নয়নের অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে এবং উন্নয়নের গতি সর্বোত্তম করার জন্য পরিকল্পনা আবশ্যক। উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য যেসব কথা বলা হয়ে থাকে তাদের প্রায় অধিকাংশ তত্ত্বেই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্য প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সকল সম্পদসমূহের সুষ্ঠু এবং দক্ষ ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তা অপরিকল্পিত অবস্থায় সম্ভব নয়।

প্রশ্ন॥৫॥ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বাধাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা লিখ।

অথবা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো লিখ।

অথবা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যে কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। কেননা উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক সময় পরিকল্পনার সফল প্রণয়ন বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সাধারণত যেসব কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিকল্পনার সাফল্যের মুখ দেখা অনিশ্চিত হয় তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশ উন্নয়ন বিশ্বের একটি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর দেশ। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশে অনেক সময় পরিকল্পনার সফল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে নি। বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ড. হামিদ বলেছেন, "বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে সে প্রেক্ষিতে তার ভূমিকা তথা জাতীয় মূল্যায়ন, নীতি প্রণয়ন, সম্পদ সংস্থান, সমন্বয় সাধন, গণ অংশায়ন নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক গবেষণা ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই যথাযথ অর্থবহ ও কার্যকর হয়ে উঠে নি।" সাধারণত যেসব কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিকল্পনার সাফল্যের মুখ দেখা অনিশ্চিত হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. অপূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা : গৃহীত পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য; অবাস্তবতায় বিশেষায়িত সমষ্টি মডেল নির্ভরতা; সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা; অর্থনৈতিক বহির্ভূত দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়া, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সুবিধার সংযোগ সাধনে ব্যর্থতা এ দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা হিসেবে পরিগণিত।

২. সম্পদের সীমাবদ্ধতা : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হয়, তার অপ্রতুলতাও এদেশের পরিকল্পনার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

৩. দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যথাযথ সমন্বয় না হওয়া : উন্নয়ন খাতে সহায়তা লাভে দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের অসংলগ্নতা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অপরিকল্পিত পরিবর্তন ইত্যাদি বাংলাদেশে একটি সফল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এদেশে প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। সরকারি নির্বাহি ব্যবস্থায় পরিকল্পনা সংস্থার যথাযথ অবস্থান দানে ব্যর্থতা; পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক এবং তাদের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের মাঝে যথাযথ যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা, স্থানীয় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি এদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের একটি সমস্যা।

৫. বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা : বাংলাদেশের প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছাপ সুস্পষ্ট। এদেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি নির্ভরতা, উদ্ভাবনে বাধা দান করা এবং অত্যধিক বাড়াবাড়ি, ব্যক্তিগত এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ঈর্ষা পরায়ণতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়াবলিতে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে যেসব মুখ্য ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো :

১. দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা অনুধাবনে উদাসীনতা, অক্ষমতা এবং পরিকল্পনার অবাস্তব উদ্দেশ্য।

২. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা (বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে সঠিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা)।

৩. দেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়ন উপযোগী প্রকল্প প্রণয়নে ব্যর্থতা।

৪. যথার্থ এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অভাব :

ক. দেশের অসংগঠিত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান;

খ. রাজনৈতিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাব;

গ. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য, দক্ষ পরিকল্পনা কর্মী এবং সমাজ গবেষকের সংকট;

ঘ. পরিকল্পনাকে অধিক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদানে খোলামেলা আলোচনা করার মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ থাকে না।

ঙ. পরিকল্পনায় সামগ্রিক বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয়ের অভাব;

চ. পরিকল্পনাকে অধিক কার্যকরী করে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনুপস্থিত;

ছ. পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্প নকশা তৈরি এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে দীর্ঘসূত্রিতা;

৫. বাংলাদেশে পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে দক্ষতার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিকল্পনা প্রণয়নকে ব্যাহত করে।

৬. একটি ফলপ্রসূ এবং কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যে পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন তার অভাব এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক আয়োজন এবং দক্ষ জনশক্তির অভাব।

৭. বাংলাদেশে সরকারের অস্থিতিশীলতা এবং সঠিক জনকল্যাণধর্মী (বিশেষ করে সমাজকল্যাণমূলক) অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দর্শনের অভাব (ঘনঘন ক্ষমতা বদল, সরকারি, রাজনৈতিক কার্যক্রমের ঘনঘন পরিবর্তন এবং উন্নয়ন পন্থা নিয়ে অধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রবণতা)।

৮. পরিকল্পনার সুষ্ঠু এবং নিয়মিত গবেষণা এবং মূল্যায়নের অভাব।

৯. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অভাব;

১০. দেশে অঙ্গিকারবদ্ধ এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের অভাব এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বার্থন্বেষী দল এবং গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ।

১১. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অধিকমাত্রায় পর নির্ভরশীলতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

প্রশ্ন।৬। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণের সাফল্যের চিত্র বর্ণনা কর।

অথবা, পরিকল্পনা কী? বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের শর্তাবলী আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পূর্বশর্ত লিখ।

উত্তর। ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন ছোঁয়াচ ছিল না। সে যুগ Fatalism বা অদৃষ্টবাদী ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় মূলত তা ঠিক করার জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্পনার উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দিয়ে কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বিরল। কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণের সাফল্যের চিত্র : পরিবার পরিকল্পনা গর্ভনিয়ন্ত্রণ, প্রজনন নিয়ন্ত্রণই নির্দেশ করে না, এটি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কৃতকার্য ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তথা সাফল্যের জন্য সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় :

১. **সবার জন্য শিক্ষা :** দেশের জনগণের শিক্ষা ছাড়া তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা যাবে না। বাংলাদেশের নারীপুরুষ উভয়ের গোঁড়ামির অবসান ঘটানোর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিবার ও পরিবারের সন্তান সম্পর্কে ধারণা প্রদানসহ তাদের সুখশান্তি সম্পর্কে অভিহিত করে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে এবং পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

২. **ছোট পরিবারের সুবিধা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে প্রচারকার্য সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশে বড় পরিবার থাকলে সংসারের অবস্থা কি রকম হয় এবং ছোট পরিবারের সুবিধা কেমন সে সম্পর্কে জনগণকে বাস্তব ধারণা প্রদান করে পরিবার পরিকল্পনার প্রচারকার্য আরও সম্প্রসারণ করতে হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পোস্টার, সাইন বোর্ড, প্রচারপত্র, দেয়ালপত্র, সংক্ষিপ্ত সিনেমা, যাত্রা, সভাসমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। অবশ্য এ বিষয়ে বাংলাদেশের সরকার স্ট্যাম্প, ইনভেলাপ, দলিলপত্রে এর কার্য সম্প্রসারণ করেছে।

৩. **সরকারি ও বেসরকারি সকল দপ্তরের উপর প্রচার কার্য দায়িত্ব অর্পণ :** বাংলাদেশে সকল রকমের অফিস ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারকার্যের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক অর্পণ করা দরকার। বিভিন্ন দপ্তর এ দায়িত্ব পালন করছে কি না তা তদারক করা উচিত। বর্তমানে সরকার এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করলেও তা সীমিত পর্যায়ে রয়েছে।

৪. **জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদি সহজলভ্য করা :** জনসাধারণ যাতে জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদি সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের সকল পরিবারের জন্য বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র প্রদান করা উচিত। বিনামূল্যে সুযোগ সুবিধা গ্রহণে দেশের জনগণ দ্রুত এগিয়ে আসবে।

৫. **পর্যাপ্ত ডাক্তার ও কর্মীবাহিনী নিয়োগ :** পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তার ও কর্মীবাহিনীর পর্যাপ্ততার প্রয়োজন রয়েছে। কর্মীবাহিনী বাস্তবে কতটুকু সফলতা লাভ করতে পেরেছে এ বিষয়ে তদারকী কার্যক্রমও জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশের গ্রামের অনেক নিয়োগকৃত কর্মী আছে যারা নিজের বাড়িতে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে সম্ভব হলে কিছুটা কাজ করে। মনে হয় তাদের চাকরিটা অনাবশ্যক। অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সফলতা সবচেয়ে বেশি তাদের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. **পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষা দান :** দেশের নারী, পরিবার সন্তান জন্ম দেয়ার সাথে সাথে যাতে রেজিস্ট্রি করে এবং পরবর্তী সন্তান নিবে কি না বা কখন নেয়া দরকার, ব্যবধান ইত্যাদি সম্পর্কে দেশের পরিবার পরিকল্পনাকে মাঠ পর্যায়ের কর্মীকে শিক্ষা প্রদান করলে তারা আবার পরিবারের নারী পুরুষকে শিক্ষা দিবে। এতে করে প্রত্যেকটি দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং এ ব্যবস্থা সহজে মেনে নিবে।

৭. **গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা :** পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ উপায় আবিষ্কার করতে হবে। বিদেশের উপর নির্ভর না করে দেশীয় চিন্তাচেতনায় অগ্রসর হওয়া দরকার। দেশীয় গবেষণা করা দরকার। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অধিকতর জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রকাশনার প্রয়োজন রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনাকে অধিকতর সাফল্য দক্ষ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা উচিত :

১. এ কার্যক্রমের প্রতি সার্বিক পর্যায়ে যে দৃঢ় রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে তা যথাযথভাবে সমগ্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত করা।
২. জন্ম নিরোধক ব্যবহারের প্রতি সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং সমাজকর্মীদের ঘনিষ্ঠভাবে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা।
৩. ছোট পরিবারকে জনপ্রিয় করা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করা, কন্যা সন্তান যাতে অধিক কাম্যবিবেচিত না হয়, এ লক্ষ্যে তথা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক কর্মসূচির সপক্ষে সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় জনমত সৃষ্টি।
৪. মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সমর্থনে ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন থাকে।
৫. কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ ব্যবস্থা ও নতুন গতি সৃষ্টির লক্ষ্যে পৌরসভা, থানা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম কমিটি কর্তৃক অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনাকে দক্ষ ও গতিশীল করার জন্য উপর্যুক্ত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশে পরিকল্পনা কর্মসূচি
Programme Planning in Bangladesh

ক বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২. বাংলাদেশে পর পর কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে পর পর ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

৩. ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাইরে প্রণীত আরেকটি পরিকল্পার নাম কী?

উত্তর : ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাইরে প্রণীত আরেকটি পরিকল্পার নাম দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা।

৪. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত?

উত্তর : মেয়াদ ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত। অর্থের পরিণাম ৪৪,৫৫০ কোটি টাকা।

৫. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো, জনসংখ্যা হ্রাস, মানব সম্পদ উন্নয়ন, মৌল মানবিক চাহিদাপূরণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

৬. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থের উৎস কী?

উত্তর : অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস।

৭. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতা কী?

উত্তর : জনসংখ্যা হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

৮. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি সমাজকল্যাণ কর্মসূষ্টির নাম লিখ।

উত্তর : পুনর্বাসনমূলক, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, যুব ও শিশুকল্যাণ, বৃদ্ধকল্যাণ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সরকারি অনুদান ইত্যাদি।

৯. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত?

উত্তর : ১৯৭৮–৮০, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩,৮৬১ কোটি টাকা।

১০. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পিছনে কারণ কী ছিল?

উত্তর : ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, আর্থসামাজিক পরিবর্তন, বিদেশি সাহায্য প্রাপ্তি সম্ভাব্যতা ইত্যাদি।

১১. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর : খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জনসংখ্যা হ্রাস করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আয় বৈবম্য হ্রাস, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১২. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি কী ছিল?

উত্তর : স্বনির্ভরতা অর্জন, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, পানীয় জল, জনঅংশায়ন প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানো ইত্যাদি।

১৩. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল কত?

উত্তর : দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল ৩.৫%।

১৪. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা কী ছিল?

উত্তর : প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন না করা, লক্ষ্যার্জন অর্জিত না হওয়া, প্রশাসনিক দুর্বলতা, সমন্বয়হীনতা, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা ইত্যাদি।

১৫. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ও অর্থের পরিমাণ লিখ।

উত্তর : ১৯৮০ – ১৯৮৫ পর্যন্ত, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৫,৫৯৫ কোটি টাকা এবং সংশোধিত ১৭,২০০ কোটি টাকা।

১৬. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর : জীবনমানের উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জনসংখ্যা হ্রাস, সম্পদের সুষম বন্টন, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি।

১৭. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজকল্যাণ কর্মসূচি কী কী?

উত্তর : গ্রামীণ সমাজসেবা চিকিৎসা সমাজকর্ম, শহর সমাজসেবা, পঙ্গু পুনর্বাসন, অবঘুরে কেন্দ্র স্থাপন, শিশু কল্যাণ, যুবকল্যাণ, সংশোধনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

১৮. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নেতিবাচক দিকগুলো কী কী?

উত্তর : রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদের ঘাটতি, তেলের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১৯. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কী ছিল?

উত্তর : ১৯৮৫–১৯৯০ পর্যন্ত, বরাদ্দকৃত অর্থ ৩৮,৬০০ কোটি টাকা।

২০. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : জীবনমানের উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

২১. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো কী কী?

উত্তর : শিশু কল্যাণ, গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা, সমাজসেবা একাডেমির উন্নয়ন ইত্যাদি।

২২. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুর্বলতাগুলো কী কী?

উত্তর : প্রশাসনিক দুর্বলতা, আর্থিক সমস্যা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়া ইত্যাদি।

২৩. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতা কী ছিল?

উত্তর : নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদের জন্য কর্মসংস্থান, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার, এতিম ও প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি।

২৪. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ এবং বরাদ্দকৃত অর্থ কত?

উত্তর : ১৯৯০–১৯৯৫ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ৬৭,২৩০ কোটি টাকা।

২৫. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর : গ্রামোন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পুনর্বাসন কার্যক্রম, শিশুদের চাহিদাপূরণ, প্রতিবন্ধী ও মুক্ত কয়েদিদের পুনর্বাসন ইত্যাদি।

২৬. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজকল্যাণ কর্মসূচি কী কী?

উত্তর : শিশু কল্যাণ, বৃদ্ধ কল্যাণ, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী কল্যাণ, চিকিৎসা কর্মসূচি ইত্যাদি।

২৭. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইতিবাচক দিকগুলো কী কী?

উত্তর : সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উন্নয়ন, সামষ্টিক বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ইত্যাদি।

২৮. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত ছিল?

উত্তর : ১৯৯৭–২০০২ পর্যন্ত, বরাদ্দকৃত অর্থ ৬৯,[illegible] কোটি টাকা।

২৯. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী কী ছিল?

উত্তর : উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি ইত্যাদি।

৩০. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ কী কী?

উত্তর : দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মানব সম্পদ কৌশল, শিক্ষার বিকাশ, নারী উন্নয়ন ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ কৌশল ইত্যাদি।

৩১. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজকল্যাণ কর্মসূচি কী কী?

উত্তর : শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, শিশু, যুবক বৃদ্ধ, অক্ষম, ভিক্ষুক, মাদকাসক্ত, নারী, পতিতা প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য কর্মসূচি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

৩২. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইতিবাচক দিক কী?

উত্তর : শিশু কল্যাণ ও মাদকাসক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এছাড়া বেসরকারি সংস্থাগুলো সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৩৩. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুর্বলতা কী ছিল?

উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণখাতে অর্থ বরাদ্দ ছিল খুবই নগণ্য। এছাড়া প্রতিবন্ধী, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি ইত্যাদি খাতেও তেমন সফলতা অর্জন করে নি।

খ বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কাকে বলে?

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা সংজ্ঞা দাও?

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজ পরিচালনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। আর এ পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি। উক্ত পরিকল্পনাগুলোর মাঝে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। সমাজে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন করাই সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সংজ্ঞা : সমাজে সার্বিক কল্যাণসাধন করাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। আর সমাজকল্যাণের এ লক্ষ্যার্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকেই সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনা বলা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। সমাজের অপরিকল্পিত ও অরক্ষিত পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষতিকর প্রভাব হতে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে সমাজ জীবনের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়ন করার লক্ষ্যে যে সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়, তাকেই বলা হয় সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। উল্লেখ্য, পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলন করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনাকে বিবেচনা করা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

Dictionary of Social Work এ সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "সামাজিক পরিকল্পনা পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থসামাজিক কাঠামো গঠন এবং যুক্তিসঙ্গত সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণের একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।" (Social planning is systematic procedures to achieve predetermined types of socio-economic structures and to manage social change nationally.)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **Kimball Young** সামাজিক পরিকল্পনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি বলেছেন, "নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অথবা লক্ষ্য প্রণোদিত মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচি হচ্ছে সামাজিক পরিকল্পনা।" (Social planning is a programme aimed at socio-cultural change in a particular direction with a given aim or goal in mind.)

উপসংহার : আলোচ্য সংজ্ঞাগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনিয়মের কারণে সমাজব্যবস্থায় যে ক্ষতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, সেসব ক্ষতিকর পরিবেশের সংস্কার সাধন ও রক্ষিত পরিবর্তন আনয়ন করে সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজকাঠামো বিনির্মাণ করার মানসে যে সুশৃঙ্খল ও সুচারু কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাকেই বলা হয় সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। কল্যাণধর্মী সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন॥২॥ সামাজকল্যাণ পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় দিকসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজকল্যাণ পরিকল্পনা তাৎপর্যপূর্ণ দিকসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজ পরিচালনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। আর এ পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা। উপর্যুক্ত পরিকল্পনার মাঝে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। সমাজে রক্ষিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন করাই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ : সামাজিক পরিকল্পনায় মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। দিক তিনটি হলো যথা : ১. নীতিমূলক দিক ২. কার্যক্রমমূলক দিক এবং ৩. মনস্তাত্ত্বিকমূলক দিক। এগুলোকে সামাজিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বলা হয়ে থাকে। সামাজিক পরিকল্পনার এ তিনটি দিককে বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ :

১. সামাজিক পরিকল্পনা হলো সমাজস্থ জনগণের চাহিদা পূরণের বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপন্থা।

২. সামাজিক পরিকল্পনায় সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কর্মসূচি সংযোজন করা হয়।

৩. সামাজিক পরিকল্পনা সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়ন বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

৪. সামাজিক পরিকল্পনায় জনসাধারণকে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সামাজিকভাবে প্রস্তুত করে তোলার রূপরেখা প্রণয়ন করা।

৫. সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের গঠনমূলক পরিবর্তন করে সামাজিক সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করা হয়।

৬. দেশের জনসংখ্যা এবং খাদ্য উৎপাদনের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সামাজিক পরিকল্পনা সামাজিক আইন প্রণয়নের রূপরেখা অঙ্কন করে।

৭. সমাজে পরিবর্তিত নতুন মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করে সামাজিক পরিকল্পনা।

উপসংহার : পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করতে হয়। উপরে দিকসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত দিকসমূহে মূলত মানুষের চাহিদাসমূহ পূরণের বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপন্থা এবং সমাজ প্রচলিত মূল্যবোধ সৃষ্টি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন॥৩॥ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আয়তন উল্লেখ কর।

অথবা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিসীমা উল্লেখ কর।

অথবা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিমাণ উল্লেখ কর।

অথবা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাজেট উল্লেখ কর।

অথবা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাৎসরিক হিসাব উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালের জুলাই হতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হয়। এর মেয়াদ ছিল ১৯৭৩ সালের জুলাই হতে ১৯৭৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত। এ পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪,৪৫৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩,৯৫২ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ৫০৩ কোটি টাকা। শতকরা হিসেবে মোট ব্যয়ের ৮৭ ভাগ সরকারি খাতে এবং অবশিষ্ট ১৩ ভাগ বেসরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে এবং শতকরা ৪০ ভাগ বৈদেশিক উৎস হতে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ২৬৯৮ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং বাকি ১,৭৫৭ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪০ ভাগ রাখা হয়েছিল যা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কমে এসেছে।

প্রশ্ন॥৪॥ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ কর।

অথবা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী কী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

অথবা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী কী Target নির্ধারণ করা হয়েছিল।

অথবা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী কী উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

উত্তর॥ ভূমিকা : মূলত ১৯৮০ সালের ১ জুলাই হতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন কার্যকাল সম্পন্ন হয়। উক্ত কার্যকালে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ : নিম্নে সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

১. জনসাধারণের জীবনধারণের মৌলিক দ্রব্যসামগ্রী পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৩. জণগণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৪. অধিক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৫. মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন।

৭. অধিক হারে স্বনির্ভরতা অর্জন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ :

১. জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ৫.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা।

২. মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা।

৩. কৃষি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.০ ভাগ বৃদ্ধি করা।

৪. শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ৮ ভাগ অর্জন।

৫. কম সময়ের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৬. সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

৭. জাতীয় সঞ্চয় ১৯৭৯-৮০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩.৩২ ভাগ হতে ১৯৮৪-৮৫ সালে শতকরা ৭.১৬ ভাগে বৃদ্ধি করা।

৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২.৭ ভাগ হতে শতকরা ১.৫ ভাগে হ্রাস করা।

৯. বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা শতকরা ৯৪ ভাগ হতে ৬১ ভাগে হ্রাস করা।

১০. পল্লি এলাকায় অধিক লোকের কর্মসংস্থান করা।

১১. নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

১২. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন।

উপসংহার : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের জন্য পুণর্বাসনমূলক পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনায় কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় যা দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন॥১১॥ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচিগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি উল্লেখ কর।

অথবা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্ম পদ্ধতি উল্লেখ কর।

অথবা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমগুলো কী কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. সরকারি সকল শিশুসদন ও বেবিহোমকে পর্যায়ক্রমে শিশু পরিবার এ রূপান্তরিত করা। যাতে করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও এতিম শিশুরা পারিবারিক জীবনের আদর, যত্ন ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

২. দৈহিক দিক থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে তাদের সেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আত্মকর্মসংস্থানের মতো বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ঢেলে সাজানো।

৩. বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের ভিতর স্বল্পমাত্রায় তহবিল বণ্টনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে কেবল সে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই আর্থিক সহায়তার জন্য নির্বাচিত করা। যেগুলো অতীতে সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

৪. সমাজকল্যাণ কার্যক্রম মূলত স্থানীয় পর্যায়ে সমাজসেবার উন্নয়নে নিয়োজিত। যেহেতু বেশ কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে থানা পরিষদের সহায়তার প্রয়োজন, তাই তৃতীয় পরিকল্পনার সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপার্জনমুখী কার্যক্রমসহ প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি অধিকাংশ সমাজসেবা প্রকল্পের সাথে সমন্বিত করা হয়।

উপসংহার : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের এক বিশেষ পরিসর। উক্ত পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রশ্ন॥১২॥ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুশীলিত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণীয় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুসৃত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : ১৯৯৫ সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের সকল নাগরিকের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি, যোগ্যতানুযায়ী কর্মসংস্থান লাভের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার, আর্থসামাজিক সাম্য, শহর ও নগরের বৈষম্য হ্রাস, সমাজের সকলক্ষেত্রে বৈষম্যহ্রাস, সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ এবং অনুপার্জিত আয়কে নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি কল্যাণমূলক দিকের সমন্বয়ে গঠিত। দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মানোন্নয়ন ও স্থানীয় সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে গৃহীত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ বিশেষ গুরুত্ব পায়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ : বাংলাদেশের প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি পরিকল্পনা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকার গতিশীল সমাজকল্যাণ নীতি সংযোজন করেন। সামজকল্যাণ ও উন্নয়নের মহান ব্রতকে সামনে রেখে সরকার গৃহীত সব পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

১. ভবঘুরে, দুস্থ এবং সামাজিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি;

২. দেশের পার্বত্য জেলাসমূহের উপজাতিদের জন্য আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি;

৩. সমাজের বয়স্ক ও জরাগ্রস্তদের জন্য কল্যাণমূলক সেবা কর্মসূচি;

৪. গ্রামীণ দারিদ্র্য ও অসুবিধাগ্রস্ত লোকজনের জন্য গ্রামভিত্তিক উন্নয়নমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৫. শহরের দরিদ্র লোকদের জন্য আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা এবং গৃহসংস্থান সুবিধা প্রদানের জন্য গৃহীত কর্মসূচি;

৬. দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে যেসব NGO বা স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থা কর্মরত আছে, তাদেরকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা।

৭. চরম দুরবস্থায় নিপতিত জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য টার্গেট গ্রুপের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা প্রদানের প্রতি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর সমবায় সাধারণের বন্দোবস্ত করা হয়। অর্থাৎ আধুনিক সমাজকল্যাণের লক্ষ্যার্জনে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন॥৭॥ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশলগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অ্যাপ্রোচ উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের নীতিমালা উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মপরিক্রমাগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণে গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়ক সমর্থনমূলক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা। যাতে অনগ্রসর শ্রেণী স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে পরিবারকে উন্নয়নের একক হিসেবে গ্রহণ করে উদ্বুদ্ধকরণ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ প্রাধান্য দেয়া।

২. সমাজকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভাগ ও এজেন্সির সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

৩. দৈহিক পঙ্গু, অসহায়, এতিম, ভিক্ষুকসহ অসহায় অনগ্রসর শ্রেণীর সমষ্টিভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সেবার পরিবর্তে সহায়তা গ্রহণকারিদের নিজেদের সামর্থ্য বিবেচনা করে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা।

৪. এতিম, দুস্থ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল বিপদগ্রস্ত শিশুদের স্বনির্ভর ও উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. নগর ও পল্লির মাদকাসক্তদের সমষ্টিকেন্দ্রীক কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬. সমষ্টিভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির আওতায় কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

৭. সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা।

৮. সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উপসংহার : বাংলাদেশে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় (১৯৯৭-২০০২) সাল পর্যন্ত। উক্ত পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপরিউক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন॥৮॥ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতের আর্থিক বরাদ্দ উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতের বাজেট উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতের আর্থিক বরাদ্দ পরিমাণ উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতের আর্থিক পরিসীমা উল্লেখ কর।

অথবা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতের আর্থিক মূলধন উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সার্বিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য সমাজের অসহায় ও অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা করা। বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহত্তম অধিদপ্তর সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আর্থসামাজিকভাবে অনগ্রসর দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি, যোগ্যতানুযায়ী কর্ম পাওয়ার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের প্রয়োজন হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের যে অর্থ বরাদ্দ দেখা দিয়েছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণে আর্থিক বরাদ্দসমূহ :

ক. সিলওভার প্রকল্পসমূহ ২৫টি – ৩২০০.০০

খ. নতুন কর্মসূচিসমূহ :

১. গ্রাম ও শহরের কমিউনিটি উন্নয়ন– ৮৪০.০০

২. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী অসমর্থ এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য কল্যাণ সেবা – ১৫৮.৭০

৩. এতিম ও অসহায় শিশুদের জন্য সেবা– ৬৪৫.০০

৪. অবহেলিত ও অপরাধী তরুণদের জন্য কল্যাণ সেবা – ১০০.০০

৫. বায়োবৃদ্ধ এবং দুর্বলদের জন্য কল্যাণ সেবা – ৪০.০০

৬. মাদকাসক্তদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম– ৪০.০০

৭. ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের জন্য সমাজসেবা – ৮০.০০

৮. সমাজকল্যাণের জন্য এনজিও সহায়তা – ১৩০.০০

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি– ২০.০০

১০. ব্যক্তি খাতের কর্মসূচি – ১,৭১০.০০

মোট = ৬,৯৬৩.৭০

প্রশ্ন॥৭॥ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

অথবা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : (২০১১-২০১৫) সালে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে স্ব-স্থায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করা। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উত্তরণ, দেশকে অব্যাহত দারিদ্র্য অবস্থা হতে মুক্তি প্রদান, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ : নিম্নে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : এ পরিকল্পনায় গড়ে ৭.২% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এতে চূড়ান্ত বছরে এ লক্ষ্যমাত্রা ৮.৩% উন্নীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : কৃষিখাত ৫ শতাংশ, শিল্পখাত ১৪.৯৪%, নির্মাণ ৭.৭%, শক্তি ও গ্যাসখাতে ২৫%, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৭.৫১%, বাসস্থান খাতে ৫.৫৪%, স্বাস্থ্যখাতে ৫.৭০%, শিক্ষাখাতে ৮.০৯% এবং বাণিজ্য খাতে ৬% হবে।

প্রধান প্রধান খাতের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : পরিকল্পনার শেষবর্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে কৃষি এবং শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৫.৮৭% এবং ৩০.৪২% হবে। মোট খাদ্য উৎপাদন ৩৮১.৭৪ লক্ষ্য মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৯.৪৯ লক্ষ্য মেট্রিক টন উন্নীত হবে। কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শস্যের নিবিড়তা ৮৫% থেকে ৯২% এ বৃদ্ধি পাবে।

পক্ষান্তরে, বাণিজ্যিক পণ্য পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৪.৮৭ মিলিয়ন বেল থেকে ৭.২৪ মিলিয়ন বেলে উন্নীত হবে। তুলা উৎপাদন বাড়বে ১ লক্ষ টন থেকে ২ লক্ষ টন। সুতা এবং কাপড় উৎপাদন ১১.৩ কোটি গজ এবং ১১৬.৩ মিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫২.২ কোটি গজ এবং ৩৬৪.১ মিটার বৃদ্ধি পাবে।

সার এবং সিমেন্ট উৎপাদন ২১৫৩ এবং ১০৭ হাজার মেট্রিক টন থেকে ২৫৮৫ এবং ২৩৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩,৪৫০ মেগাওয়াট থেকে ১০,৩৭০ মেগাওয়াটে উন্নিত হবে।

দারিদ্র্য, শিক্ষা এবং নিয়োগ : পরিকল্পনার সময় সীমায় শিক্ষার হার ৬৩.২% থেকে ৭০% এ উন্নীত হবে। দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী জনসংখ্যা ৪৭% হতে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫% এ উন্নীত করা। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত ৬ লক্ষ নতুন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যয় বরাদ্দ : জাতীয় সঞ্চয় হবে মোট জাতীয় উৎপাদনের GNP-১২% এবং বিনিয়োগ হবে ২৮.৯৭% এর মতো।

পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দ .১৯৬০ বিলিয়ন কোটি যার মধ্যে ৪৫% সরকারি খাতে এবং বাকি ৫৫% বেসরকারি খাতে ব্যয় করা হবে। মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭৭.৫৬% অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : বর্তমানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩৭% হ্রাস পেয়ে ১.২ হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ :

১. প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. দারিদ্র্য দূরীকরণ।

৩. নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. মানব সম্পদের উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা।

৫. বেসরকারি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি। এজন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ শক্তি, গ্যাস, কয়লা এবং অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬. তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা নীতির আলোকে শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ।

৭. মাতৃমঙ্গল, শিশু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধার সম্প্রসারণ করা হবে।

৮. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ।

৯. আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব দ্রব্যের মূল্য আপেক্ষিকভাবে বেশি সেগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি সম্প্রসারণ।

১০. স্বল্পমেয়াদের মধ্যেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন যাতে মানুষের দৈনন্দিন ক্যালরি গ্রহণ ১৯৫০ কিলোক্যালরি থেকে ২৩০০ কিলোক্যালরিতে উন্নীত হয়।

১১. পল্লি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রকরণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বেশি। এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হয়। ২০১১-০১৫ সালে গৃহীত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। যার মধ্যে দরিদ্রতার হার হ্রাসকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত আলোচনায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥১০॥ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কী?

অথবা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

অথবা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাকে বলে?

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য একটি সচেতন ও সুচিন্তিত কর্মনির্দেশনা। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের রূপরেখা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা দান, নীতি-কৌশল নির্ধারণ, কার্যক্রম গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনের সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। এ পর্যন্ত দেশে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬টি এবং ২০১৫-২০২০ সাল পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নয়ন, সরকারি ও বেসরকারি খাত, মানব সম্পদ, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি দিক প্রতিফলিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, আর্থসামাজিক সমস্যা নিরসন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি শ্রেণির পুনর্বাসন ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সম্পাদনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

সাধারণ ভাষায়, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনাকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট কিছু আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণে, পাঁচ বছর সময়সীমাকে ধরে নিয়ে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয় তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় দেশের উন্নয়নে এবং মানুষের কল্যাণে। এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রকল্প, কর্মসূচি, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধানের কর্মপন্থা, উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য যা জাতীয় স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এজন্য পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও বলা হয়। দেশ জাতির স্বার্থে জড়িত বিষয়সমূহ যেমন– সমাজকল্যাণমূ বিষয়াদি, কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, চিকিৎসা খাতে উন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয় এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জ উপযুক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হয় এবং পাঁ বছর মেয়াদের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় বাংলাদেশের ন্যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও এই পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত সরকারের বিভি পরিকল্পনার মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি দীর্ঘমেয়া পরিকল্পনা। একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত কত মজবুত তা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তবে সব দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার আকার আকৃতি কিং প্রকার-প্রকৃতি একই ধরনেই হয় না। পরিকল্পনার কৌশল ব পদ্ধতি নির্ভর করে এর প্রণেতাদের দূরদর্শিতা, দক্ষতা অভিজ্ঞতার উপর। পরিকল্পনাবিদরা যদি দক্ষতার সাথে উপযু কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনাও সার্থ হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ১টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কর হয়। সবগুলো পঞ্চ বার্ষিকীতেই দেশের অর্থনৈতিক সাম অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। সবগুলো পরিকল্পনা যথার্থভাবে সফল না হলেও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থাৎ ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল অব্যাহত আছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে ড. হেনসরাজ বলেন, "পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তা মূল্যায়নের দিক থেকে সবচেয়ে আদর্শ পরিকল্পনা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায় যে, সরকারি উদ্যোগে দেশের উন্নয়নের জন্য ৫ বছরের মেয়াদে, বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ প্রণেতা দ্বারা যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কর্মসূচি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা কর্মসূচির মধ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্যতম। দেশের উন্নয়ন, কল্যাণ তথা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে এসব পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদেশের শিশু, নারী, যুব, প্রতিবন্ধী অথবা দুটি শ্রেণির জন্যই এসব পরিকল্পনায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়েছে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এজন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন॥১॥ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কাকে বলে? সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও? সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজ পরিচালনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। আর এ পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি। উক্ত পরিকল্পনাগুলোর মাঝে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। সমাজে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন করাই সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সংজ্ঞা : সমাজে সার্বিক কল্যাণসাধন করাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। আর সমাজকল্যাণের এ লক্ষ্যার্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকেই সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনা বলা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। সমাজের অপরিকল্পিত ও অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষতিকর প্রভাব হতে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে সমাজ জীবনের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়ন করার লক্ষ্যে যে সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়, তাকেই বলা হয় সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। উল্লেখ্য, পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলন করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনাকে বিবেচনা করা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

Dictionary of Social Work এ সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "সামাজিক পরিকল্পনা পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থসামাজিক কাঠামো গঠন এবং যুক্তিসঙ্গত সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণের একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।" (Social planning is systematic procedures to achieve predetermined types of socio-economic structures and to manage social change nationally.)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **Kimball Young** সামাজিক পরিকল্পনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি বলেছেন, "নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অথবা লক্ষ্য প্রণোদিত মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য গৃহীত কর্মসূচি হচ্ছে সামাজিক পরিকল্পনা।" (Social planning is a programme aimed at socio-cultural change in a particular direction with a given aim or goal in mind.)

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য : পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কি উৎপন্ন হবে, কোন কাজে উৎপন্ন হবে এবং কার জন্য উৎপন্ন হবে যে কোন অর্থনৈতিক অবস্থায় এ তিন মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস থাকে। ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যও তাই। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পটভূমিকায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১. আর্থসামাজিক উন্নয়ন। জাতীয় অর্থগতির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এর মূল লক্ষ্য।

২. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এ লক্ষ্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৩. কর্মহীন লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৪. আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা।

৫. কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষিখাতের আধুনিকীকরণ।

৬. বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য সংরক্ষণ।

৭. জীবনের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ।

৮. দেশকে শিল্পায়নের পথে অগ্রসরকরণ।

৯. অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ।

১০. সমাজের অসমতা দূরীকরণ।

১১. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা খুঁজে বের করা এবং তা সমাধানের যথাযথ ব্যবস্থা করা।

এ সম্পর্কে শর্মা ও শাস্ত্রীর 'Social Planning' গ্রন্থে বলা হয়েছে "Planning is to undertake a diagnosis of the particular situation creating social problem on which action in needed."

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, কোন এলাকার জনসমষ্টির বিশেষ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। আর এলাকার আয়তন বা সমস্যার প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হওয়ায় সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কতকগুলো পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে সমস্যা পরিকল্পিতভাবে সমাধান করে সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন॥২॥ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কাকে বলে? সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কী? কী কী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কাজ করে।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজ পরিচালনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। আর এ পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, ইত্যাদি। উক্ত পরিকল্পনাগুলোর মাঝে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। সমাজে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন করাই সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সংজ্ঞা : সমাজে সার্বিক কল্যাণসাধন করাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। আর সমাজকল্যাণের এ লক্ষ্যার্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকেই সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনা বলা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। সমাজের অপরিকল্পিত ও অরক্ষিত পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষতিকর প্রভাব হতে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে সমাজ জীবনের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়ন করার লক্ষ্যে যে সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়, তাকেই বলা হয় সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। উল্লেখ্য, পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলন করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনাকে বিবেচনা করা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

Dictionary of Social Work এ সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "সামাজিক পরিকল্পনা পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থসামাজিক কাঠামো গঠন এবং যুক্তিসঙ্গত সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণের একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।" (Social planning is systematic procedures to achieve predetermined types of socio-economic structures and to manage social change nationally.)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **Kimball Young** সামাজিক পরিকল্পনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি বলেছেন, "নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অথবা লক্ষ্য প্রণোদিত মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য গৃহীত কর্মসূচি হচ্ছে সামাজিক পরিকল্পনা।" (Social planning is a programme aimed at socio-cultural change in a particular direction with a given aim or goal in mind.)

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য : বহুসংখ্যক অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যেগুলো সেসব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শনাক্ত করে তা অর্জনের জন্য সম্পদের যুক্তিগ্রাহ্য বিভাজনই পরিকল্পনার প্রধান ক্রিয়াকলাপ। তবে এ ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. পরিকল্পনা একটি সুচিন্তিত কর্মপ্রক্রিয়া, অর্থাৎ কোন কাজ সুস্পষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সচেতন ও সুচিন্তিতভাবে ঠিক করে নিতে হয়।
২. পরিকল্পনা সবসময় উদ্দেশ্যভিত্তিক। তাই বলা যায়, "It is a deliberate attempt to creat a logical measure for the achievement of the objectives."
৩. পরিকল্পনা অবশ্যই কাজের পূর্ব প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ কাজের পূর্বধারণা।
৪. পরিকল্পনা একটি যুক্তি নির্ভর ও গতিশীল প্রচেষ্টা তাই বলা যায়, "It can be mobilize local mutative energies and resources for local development."
৫. এটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যুক্তিপূর্ণ উপায় নির্ণয় করে থাকে।
৬. পরিকল্পনা সম্পদ ও জনগণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে, যেমন– "It achieve a better distribution of population, wealth and human activities and self meanest through a balanced urban-rural, relationship.
৭. পরিকল্পনা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং তথ্যভিত্তিক।
৮. পরিকল্পনা সবকিছুর ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া।
৯. পরিকল্পনা ক্ষেত্র ও অবস্থা বুঝে বিভিন্ন প্রকার রূপ নিতে পারে।
১০. পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা অর্থনীতিতে একটি গুরুপূর্ণ উপাদান। প্রত্যেক পরিকল্পনার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উপরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন॥৩॥ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যায়গুলো আলোচনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্তরগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারাগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন এলাকার জনগোষ্ঠীর বা কোন ক্ষেত্রের বা দিকের সন্তোষজনক ও প্রত্যাশিত মানবীয় জীবন লাভের শর্তাবলি এবং জীবনে সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয় এবং সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ এবং পরিচালনা করার প্রয়োজনে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পর্যায়গুলো : সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা অবস্থা বিশ্লেষণ করে সেবাকর্ম পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করা হয় বলে বিভিন্ন পর্যায়ে তা গৃহীত হয়। জাতীয় পর্যায়, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় এবং জনসমষ্টিগত পর্যায়ে সাধারণত সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

নিম্নে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পর্যায় ৩টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. জাতীয় পর্যায় : জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টা পরিষদ ইত্যাদি ধরনের সংস্থাগুলো সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সাথে জড়িত। এ পর্যায়ে সাধারণত পরিকল্পনায় অন্যান্য খাতের মতো সমাজকল্যাণকে একটা খাত হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে উদ্দেশ্য

নির্ধারণ করে তা অর্জনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। তাতে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা বৃহৎ পরিকল্পনার একটা অংশ। এ ধরনের পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতকে খণ্ড খণ্ড অংশ হিসেবে ধরে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় তা সন্নিবেশিত করা হয়। বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সরকারি পরিকল্পনা এভাবে প্রণয়ন করা হয়।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় :** বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কোন বিশেষ সেল বা সাধারণ পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে নিজেদের কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। তাতে নির্দিষ্ট সময়ে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তি ও সম্পদের সদ্ব্যবহারের সুচিন্তিত ব্যবস্থা নেয়া হয়। সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে সরকারি নীতি অনুসরণ করে। অপরদিকে বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেশের আইনগত কাঠামোর আওতায় নিজস্ব নীতিমালার আলোকে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রণয়ন মূলত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় হয়ে থাকে; কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে স্বাধীন ও মুক্ত থাকতে পারে।

৩. **জনসমষ্টি পরিকল্পনা :** জনসমষ্টি পরিকল্পনায় সমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বাস্তব কর্মসূচি তৈরি এবং তার কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব বলে তাকে অনেকে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সার্থক পরিচয়বাহক বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া অবস্থা বিশ্লেষণকেন্দ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সামাজিক পরিকল্পনার মুখ্য প্রতিপাদ্য হওয়ায় এ ধরনের পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রায়োগিকতা বেড়েছে। অডাম নামক একজন মনীষী বহু আগেই জাতীয় সামাজিক পরিকল্পনা রূপায়ণে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। জনসমষ্টি সংগঠনের কর্মক্ষেত্রে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনার অধিকতর অনুশীলন সম্ভব। এমনকি নগর পরিকল্পনা বলতে যা বুঝায় তাও জনসমষ্টি পরিকল্পনামুখী হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে গ্রাম, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, উপজেলা, জেলা ইত্যাদি পর্যায়ে যে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তা অনেকাংশেই এ প্রকৃতির পরিকল্পনা।

জনসমষ্টি পরিকল্পনা পূর্বে কিছু সমস্যা ও সম্পদকে নিয়ে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমিত পরিসরে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে তা ব্যাপক পরিসরে প্রয়োগ হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যাকে নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণে জনসমষ্টি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বস্তুত সামাজিক অবস্থা, সমষ্টির সমস্যা, মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদরাজি, স্থানীয় নেতৃত্ব, স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারি প্রতিষ্ঠান, জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক অবস্থা, সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিচারবিশ্লেষণ সাপেক্ষে জনসমষ্টি পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, কোন এলাকার জনসমষ্টির বিশেষ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। আর এলাকার আয়তন বা সমস্যার প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হওয়ায় সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কতকগুলো পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে সমস্যা পরিকল্পিতভাবে সমাধান করে সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন।৪। সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের উত্তমশর্তাবলি আলোচনা কর।

উত্তর৷ ভূমিকা : পরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজ পরিচালনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। আর এ পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি। উক্ত পরিকল্পনাগুলোর মাঝে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। সমাজে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন করাই সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তসমূহ : সবরকম পরিকল্পনার কতকগুলো আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত রয়েছে। এসব পূর্বশর্ত বা অবস্থার বিবেচনা করা ছাড়া পরিকল্পনা কখনও সুষ্ঠু ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। তেমনি সমাজকল্যাণ পরিকল্পনারও কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তোলার জন্য এসব পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা জরুরি। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী W.F. Ogburn এবং M.F. Nimkoff তাঁদের লেখা 'A Hand Book of Sociology' নামক গ্রন্থে সমাজকল্যাণ বা সামাজিক পরিকল্পনার কতকগুলো পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা তাঁদের পুস্তকে সামাজিক পরিকল্পনার যেসব পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করেছেন নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. **ঐতিহ্যগত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা :** ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ধ্যানধারণায় প্রভাবিত হয়ে যদি কোন সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহলে গৃহীত পরিকল্পনা কখনও কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক সমাজব্যবস্থার আলোকে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে সমাজব্যবস্থায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি, পরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুশৃঙ্খল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থার উপস্থিতি রয়েছে, সে সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা সবচেয়ে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

২. **পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটা পর্যাপ্ত ব্যবস্থার উপস্থিতি :** যে কোন পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকতে হবে। কেননা, সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব হলে সামাজিক পরিকল্পনা প্রত্যাশিত লক্ষ্যার্জনে সক্ষম হবে না। তাই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করাকে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩. **সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার প্রতি সমাজের জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে :** সমাজ ও সমাজের জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য যে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, তাতে সমাজের জনগণের চাওয়াপাওয়া ও প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকতে হবে, যাতে গৃহীত সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার প্রতি সমাজের জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। আর তা করা সম্ভব না হলে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কখনও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। তাই এটাকে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৪. **প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নেতৃত্বের উপস্থিতি :** সমাজকল্যাণ পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করার জন্য প্রণেতাদের প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতৃত্ব না থাকলে বাস্তব উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. **দায়িত্ববোধসম্পন্ন ভালো প্রশাসন ও সুশাসন :** সমাজকল্যাণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নযোগ্য করে প্রণয়ন করার জন্য দায়িত্ববোধসম্পন্ন গণপ্রশাসনের বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন এবং অভিজাত শিক্ষিত ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন গোষ্ঠী দ্বারা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক সুশাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার, যা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার একটি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত।

৬. **উচ্চ পর্যায়ের সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল সংগঠন বিদ্যমান থাকা :** সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল সংগঠন বিদ্যমান থাকতে হবে, যা ফলপ্রসূ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. **কার্যকর এবং সফল সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের পরিপূর্ণ মনোসংযোগ থাকতে হবে :** বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা অস্থিতিশীল সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে বাধ্য না হওয়ার মত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকতে হবে। সামাজকল্যাণ পরিকল্পনা হলো একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত প্রত্যাশিত আর্থসামাজিক কাঠামো অর্জন এবং যুক্তিসঙ্গত সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়, যা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার একটি পূর্বশর্ত।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা হলো একটি সমাজকল্যাণমূলক কর্মপ্রণালী। আর একটি উত্তম সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কতকগুলো শর্তের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়, যা উপরে বর্ণনা করা হলো। একটি ভালো সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়নে উল্লিখিত পূর্বশর্তসমূহের উপস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন॥৫॥ সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাঝে বিদ্যমান নেতিবাচক সম্পর্ক আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে কাজ পরিচালনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। আর এ পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক বা সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি। উক্ত পরিকল্পনাগুলোর মাঝে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। সমাজে লক্ষিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন করাই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য : জাতীয় উন্নয়নের দু'টি দিক হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য এ দু'টি উন্নয়ন ধারার গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে কৃষি, শিল্প, গ্যাস, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ, পশুসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদি। আর এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অপরদিকে, সামাজিক ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, শ্রম ও জনশক্তির উন্নয়ন ইত্যাদি। আর এসব ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকেই বলা হয় সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা। সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উভয়ই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হলেও উভয় পরিকল্পনার মাঝে কতিপয় সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরাসরি উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

   অপরদিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণসাধন এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে অর্থবহ করে গড়ে তোলার জন্য সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

   অন্যদিকে, মানুষের সামাজিক আচরণ ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা আবর্তিত হয়। সমাজের মানুষের মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

বিপরীত দিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক উন্নয়ন সাধন করার মাধ্যমে সমাজের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সবসময় সমাজে বস্তুগত পরিবর্তন সাধন করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নৈতিক ও মানসিক উন্নয়নের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব প্রদান করে।

অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনায় সমাজের নৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মূলধন গঠনের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

অপরদিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা মানবিক মূলধন গঠনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মূলত সমাজের বস্তুগত পরিবর্তন আনয়ন করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে সমাজে বস্তুগত পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কারণে সৃষ্ট সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে জনগণকে সক্ষম করে তোলার জন্যই সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৭. অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনবোধে বিদেশি প্রযুক্তি সরাসরি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে।

অপরদিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনায় বিদেশি প্রযুক্তি প্রয়োগ করার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্বদেশি আদর্শ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক প্রযুক্তি এতে প্রয়োগ করা হয়।

৮. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল।

অপরদিকে, সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তন করা যায় না। কারণ সমাজকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের আচার আচরণ, নীতিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি অবস্তুগত বিষয়াবলি সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের লক্ষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করাই সমাজকল্যাণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, অন্যদিকে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা অর্জিত প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন।৩। **একটি উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া আলোচনা কর।**

অথবা, উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দাও।

উত্তর। ভূমিকা : কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আগামীদিন সম্পদের সুষম বণ্টনের নিমিত্তে ভবিষ্যত কার্যাবলির সুশৃঙ্খল পদক্ষেপই হচ্ছে পরিকল্পনা। একটি উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। আর এ প্রণয়ন প্রক্রিয়া কতিপয় ধাপ অথবা স্তর অতিক্রম করে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কারণ **H.B. Traker** তাঁর 'Group process in Administrations' গ্রন্থে বলেছেন, "The alternative to a plan is no plan." একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন চক্রাকারে আবর্তিত হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন হলো কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপের সমষ্টি। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান ধাপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ : পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপই হলো পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মসূচি শুরু হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো উন্নয়নের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং দেশের আর্থসামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার পন্থা হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত দেশের সকল স্তরের জনসাধারণের প্রতি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দেশের সর্বস্তরের উন্নতি ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২. পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন : পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয় নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা মূল্যায়নকারী এজেন্সি, বাস্তবায়নকারী এজেন্সি, পরিসংখ্যান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে তা প্রণয়ন করে এর সার্বিক দায়িত্ব সুদক্ষ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা হয়।

৩. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ : পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সুবিবেচিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের উপরই একটি পরিকল্পনার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনা করে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে একটি ভালো পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক. দেশের অভ্যন্তরীণ মূলধন এবং জনশক্তির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য নির্ধারণ করা,

খ. দেশের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ,

গ. পরিকল্পনাকে সর্বাধিক বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য বাস্তব তথ্যের আলোকে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা,

ঘ. পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিশ্চিত করা ও

ঙ. পরিকল্পনার উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা।

৪. পরিকল্পনার পরিসংখ্যানগত উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা : পরিকল্পনার পরিসংখ্যানগত উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। একটি বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। গৃহীত পরিকল্পনার সম্ভাব্য সবরকম সমস্যা নিরূপণ, প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, দেশের জনগণের চাহিদা এবং সমস্যা অনুধাবন ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক বাস্তব তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং যথাযথ বিশ্লেষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

৫. অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ : পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয়। এটা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ পর্যায়ে পরিকল্পনার তাৎক্ষণিক এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ স্তরে বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্বানুসারে শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং সুনির্ধারিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ অপরিহার্য। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এ ধাপে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করা এবং সম্পদ প্রাপ্তির উৎসসমূহ চিহ্নিত করা। সম্পদ সংস্থানের ফলপ্রসূ কৌশল এবং হাতিয়ার হিসেবে বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করা হয়। কি উপায়ে, কোন উৎস থেকে, কখন এবং কোন ধরনের সম্পদের সংস্থান করা হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা না হলে সম্পদ সংস্থানে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সুতরাং, সুনির্দিষ্ট বাস্তবসম্মত নীতিমালার আলোকে সম্পদ সংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

৭. বিকল্প কর্মধারা নির্ধারণ : পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের নাম হলো বিকল্প কর্মধারা নির্ধারণ। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এ ধাপে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন মডেলের বিকল্প কর্মধারা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বিকল্প কর্মধারার আগেই লক্ষ্যার্জনের সুনির্দিষ্ট কৌশলের উল্লেখ থাকে।

৮. বিকল্প কর্মধারা মূল্যায়ন : পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে বিকল্প কর্মধারা মূল্যায়ন। এ ধাপে বাছাইকৃত বিভিন্ন বিকল্প কর্মধারার সুবিধা অসুবিধা ও বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কোন ধরনের বিকল্প কর্মধারা গ্রহণ করা হবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাযুক্ত কাম্য বিকল্প কর্মধারা গৃহীত হয়ে থাকে।

৯. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিকল্প কর্মধারা বাছাই : এ স্তরে বিকল্প কর্মধারাসমূহ মূল্যায়ন করে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যটি করা হয়। বিকল্প কর্মধারাসমূহের তুলনামূলক সুবিধা অ যাচাই করে কাম্য বিকল্প কর্মধারা বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে সুবিধা বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়। অনেক সময় প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনার প্রকল্পের মূল্য প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : পরিকল্পনা প্রণয়ন প্র উপরের ধাপগুলো অতিক্রম করার পর পরিক বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রভা রকারী বিভিন্ন উপাদান নির্দিষ্ট করা পরিকল্পনাবিদদের এ তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। গৃহীত পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্র করা হবে তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। পরিকল্পনা প্র প্রক্রিয়া চক্রাকারে আবর্তিত হয় বিধায় বাস্তবায়নকে উপেক্ষা যায় না।

১১. পরিকল্পনা মূল্যায়ন : পরিকল্পনা মূল্যায়ন পরিক প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ। পরিকল্পনার সফলতা ও ব্য যাচাই করাই হলো পরিকল্পনা মূল্যায়ন। 'মূল্যায়ন এ গবেষণামূলক কাজ। পরিকল্পনা মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা ভবি অধিক কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের দিক নির্দেশনা দি ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় উল্লিখিত ধাপগুলো অবলম্বন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্র সম্পন্ন হয় এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া কমবেশি সব দে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন॥৭॥ পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচ কর।

অথবা, পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধ গ্রহণ করা হয়?

অথবা, পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন কো কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়?

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রাচীনকালে পরিকল্পনার কোন গু ছিল না। সে যুগ Fatalist বা অদৃষ্টবাদী ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্ল ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেয় মূলত তা ঠিক ক জন্য তথা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিকল্প উন্মেষ। কি সম্পদ আছে, আমাদের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পদ দি কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ক হয়। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পরিকল্পনা একটি গুরুত্ব বিষয়। পরিকল্পনাবিহীন সমাজ বা রাষ্ট্র বর্তমান যুগে বি কারণ কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্প

পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি : একটি যথার্থ পরিক প্রণয়নের জন্য পূর্ব থেকেই ঐ পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন খাতে সরকারি ধার্যকরণের উদ্দেশ্যে যেমন স্বল্পকালীন কার্যকরী পরিকল্প ক্ষেত্রে এ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তেমনি দীর্ঘকালীন পরিকল্প ক্ষেত্রেও এটা অত্যাবশ্যক। নিম্নে পরিকল্পনার বিভিন্ন কৌ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. উদ্দেশ্য : পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম উপাদান হলো তার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা। "The first step for planners is to formulate the broad objectives of plan in a clear and concise manner." পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবমুখীভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে তবেই তার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন–

৩. প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ : এটি পরিকল্পনার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ... Target growth rate নির্ধারণ হয় পরিকল্পনার সঠিক বাস্ত... উপর। তবে এটি সবসময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। ... এটি নির্ভর করে সরকারের স্থিতিশীলতার উপর বা জনগণের ... নির্ভরতার উপর। এর তিনটি Approach যেমন–

a. The first approach is to let the country's requirements, determine the rate of growth.
b. The second approach is to leave the rate of growth to be fixed by the available resources.
c. The third approach is to set up the growth rate somewhere between the two limit laid down by the first and second approaches.

৪. বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ : জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কতটুকু হবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতে হবে। এ বিনিয়োগ হার নির্ধারণের জন্য কতকগুলো formula ব্যবহৃত হয়। যেমন– Harrod Domar Model একটি ভারতীয় ... পরিকল্পনা।

৫. মূলধন উৎপাদন অনুপাত : এটি সবসময় বিশ্লেষণ করে ... কতটুকু মূলধন invest করলে কি পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতি বা শিল্পক্ষেত্রে কতটুকু বিনিয়োগ করা হলো এবং ... নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগ করে কতটুকু output পাওয়া গেল এবং সম্পর্কই হলো capital output ratio.

৬. ভৌত পরিকল্পনা বনাম আর্থিক পরিকল্পনা : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কতটুকু real resources থাকবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হবে। এ real resources গুলো হলো সিমেন্ট, ইট, বালি ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, পরিকল্পনা বা জাতীয় উন্নয়নের জন্য আর্থিক সম্পদের দরকার হয়। এ আর্থিক সম্পদ কতটুকু হবে তার জন্য আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাধারণত আর্থিক পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং সমাজবাদী সমাজে বস্তুগত পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতিতে বিরাজ করায় উভয় ধরনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য উভয় পদ্ধতিই অধিকতর উপযোগী।

৭. পরিকল্পনা ভারসাম্যতা : পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য। অর্থাৎ, পরিকল্পনার সব sector গুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য বিরাজ করতে হবে। এ Balance planning তিন ধরনের হতে পারে। যথা :

a. Crosswise balance
b. The backward balances
c. Monetory balances

৮. উপরের দিক হতে পরিকল্পনা বনাম নিচের দিক হতে পরিকল্পনা : যখন পরিকল্পনার উপরের স্তর থেকে প্রণয়ন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে planning from above বলে। এর সুবিধা হলো দেশের সার্বিক চাহিদার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু এর অসুবিধা হলো দেশের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ চাহিদার গুরুত্ব দেয়া হয় না।

৯. পরিকল্পনার সময়কাল : পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকটি দেশে তার আর্থসামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিকল্পনাকালীন সময় নির্ধারণ করে। পরিকল্পনার সময় সাধারণত তিন ধরনের হয়। যথা :

a. **Annual Plan :** Annual plan say a plan for a period - 1 year.
b. **Medium term plan say :** A plan for a period - 5 year.
c. **Perspective plan say :** A plan for a period of 15 years to 20 years.

১০. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা : Professor G. Mydal এর মতে, Rolling Plan নিম্নরূপ :

Firstly - one plan for the next following year.

Secondly - one plan for the next following shorter period of some few years.

Thirdly - one perspective plan for 15 to 20 years.

Rolling planning বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতি বছরই একটি করে পরিকল্পনার সময় নির্ধারণ করতে হবে।

১১. পরিপূরক পরিকল্পনা : এর দু'টি অংশ হলো :

a. Essential on the 'core' part - "The essential part must be implementation at any cost and resources for its implementation must be assured in advance."
b. The 'contigenet' part - in to be implementation only if necessary resources are forth comming in an adequate measure.

অর্থাৎ, পরিকল্পনার Essential দিকগুলোর বাস্তবায়নে তার যদি অতিরিক্ত অর্থ থাকে তার মাধ্যমে contigent port এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. নমনীয় ও কঠিন পরিকল্পনা : এটি পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা। প্রথমত, পরিকল্পনাকে নমনীয় হতে হবে। কেননা, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, মানুষের চাহিদা, এবং মানসিকতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে পারে। আবার পরিকল্পনাকে সঠিকরূপে বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিকভাবে এটাকে কঠোর হতে হবে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করেই একটি সর্বোত্তম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। আর যে কোন দেশের উন্নয়নে একটি উত্তম পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন-৮। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিচয় দাও। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিবরণ দাও। কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গ্রহণ করা হয়েছিল।

উত্তর। **ভূমিকা :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি আওতাভুক্ত প্রদেশ ছিল। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা এবং অন্যান্য আরো অনেক আর্থসামাজিক সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় এ দেশে অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। এ সময়ে পাকিস্তানে দু'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছিল। তৎকালীন এসব পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পরিকল্পনায় এ অঞ্চলকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হতো না। স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল অতি নগণ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার মাধ্যমে এ দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সাল সম্পূর্ণই লেগে যায়। তাই ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম এ দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার পুনরুদ্ধার এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৭৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪,৪৫৫ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত এ বাজেটের মধ্যে সরকারি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩,৯৫২ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল ৫০৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, মোট বরাদ্দকৃত ব্যয়ের শতকরা ৮৭ ভাগ সরকারি খাতে এবং বাকি ১৩ ভাগ বেসরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়। আর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ খাত থেকে এবং শতকরা ৪০ ভাগ বৈদেশিক খাত থেকে সংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : ১৯৭৩ সালে গৃহীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। নিম্নে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও সুষমবণ্টন নিশ্চিতকরণ : জনসাধারণের ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর এ উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।

২. জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন সময়ে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ৫.৫ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ২.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা।

৩. বেকার সমস্যার সমাধান : এ পরিকল্পনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য ছিল দেশের বিশাল বেকারসমস্যার সমাধানকল্পে ৪১ লাখ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন : দেশের কৃষি অবকাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করার মধ্যদিয়ে খাদ্য ঘাটতি কাটিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৫. জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ : দেশের দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার রোধ করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার বার্ষিক শতকরা তিন ভাগ থেকে শতকরা ২.৮ ভাগে হ্রাস করা।

৬. বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের নির্ভরশীলতা হ্রাস : দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা।

৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি : দেশের জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং বৈদেশিক আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা।

৮. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য হলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা।

৯. মানবিক সম্পদের উন্নয়ন : দেশের মানবিক সম্পদের উন্নয়ন সাধন করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, পানি সরবরাহ ইত্যাদি অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

১০. বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈষম্যের উন্নতি সাধন : বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈষম্যের উন্নতি সাধন করার জন্য রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আমদানি বাণিজ্য হ্রাসের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

১১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমতা রক্ষা করা এবং সমগ্র দেশব্যাপী আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা।

১২. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন : দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য গৃহীত সকল ব্যবস্থাকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে আরো সুসংহত করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যেই ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও নানা প্রতিবন্ধকতার পাশ কাটিয়ে এ পরিকল্পনা তার নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জোর চেষ্টা চালায়। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খুব কম ক্ষেত্রেই তার সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তথাপি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তড়িঘড়ি করে দ্রুত প্রণয়ন করা এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তীতে একাধিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন।৭। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মকৌশল আলোচনা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে ২ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। দীর্ঘ নয় মাসের পর দেশের গচ্ছিত সম্পদ যুদ্ধবিধ্বস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধারের জন্য এবং এতিম, বিধবা, ছিন্নমুল মহিলা, যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও শারীরিক পঙ্গু ব্যক্তিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি : স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে হাজার হাজার অসহায়, এতিম, বিধবা, ছিন্নমুল মহিলা, যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও শারীরিকভাবে পঙ্গু ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. গ্রাম ও শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি হলো গ্রাম ও শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি। এ পরিকল্পনার সমষ্টি উন্নয়ন ব্যবস্থা হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ সমাজসেবা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং শহরে শহর সমাজসেবা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এ পরিকল্পনায় ১৬টি সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনায় গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় .৯০ কোটি টাকা এবং শহর সমাজসেবা উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় ০.১৭ কোটি টাকা।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম : ১৯৭১ সালে সংঘটিত এ দেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য শিশু ও নারীদের দেখাশুনা এবং পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরকম পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের ৬২টি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয় এ পরিকল্পনায় এবং এ খাতে ২৫·৪৭৩৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়।

৩. শিশুকল্যাণমূলক কার্যক্রম : শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। তাই সমাজের অবহেলিত এতিম শিশুদের স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি এতিমখানা অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা এবং শিশুদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করার জন্য বেবিহোম ও দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু রাখার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এরকম কিছু কিছু নতুন এতিমখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুকল্যাণ খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় .২৫ কোটি টাকা।

৪. দৈহিক বিকলাঙ্গদের জন্য সমাজসেবা কার্যক্রম : দেশের বোবা, বধির, অন্ধ ইত্যাদি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং .২৭৪৯ কোটি টাকা প্রায় মূক ও বধিরদের জন্য একটি স্কুল এবং অন্ধদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়।

৫. যুবকল্যাণ কার্যক্রম : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চালু যুবকল্যাণ কেন্দ্র এবং যুব হোস্টেলগুলোর উন্নতি সাধন করার প্রস্তাব করা হয়। এ পরিকল্পনার ১০টি যুবকল্যাণ কেন্দ্রের উন্নতিকল্পে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ০.১০ কোটি টাকা।

৬. ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম : স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকে সহায় সম্বল হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান হারে ভিক্ষাবৃত্তি মোকাবিলা করে ভিক্ষুকদেরকে সমাজে উৎপাদনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ খাতে দু'টি ভবঘুরে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ০.২৫ কোটি টাকা।

৭. সমাজের অক্ষম এবং ভিক্ষুকদের জন্য সমাজসেবা কার্যক্রম : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের বৃদ্ধদের জন্য একটি কেন্দ্র চালু করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সমাজের বৃদ্ধ ও কর্মে অক্ষম লোকদের জন্য অনুরূপ কোন কর্মসূচি না থাকায় সরকার এ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকারের এ কার্যক্রম দেশের সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ।

৮. কিশোর অপরাধ সংশোধন কর্মসূচি : দেশে দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে সৃষ্ট কিশোর অপরাধ প্রতিরোধকল্পে সংশোধনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। তাছাড়া দেশের চালু পাকিস্তান আমলের প্রবেশন ও মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদি পুনর্বাসনকে ফলপ্রসূ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয় এ পরিকল্পনায়।

৯. চিকিৎসা সমাজকর্ম : বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চিকিৎসা সমাজকর্মকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দেশে ১৪টি চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রকল্পের উন্নয়নে সরকার মনোযোগী হন এবং পরিকল্পনা মেয়াদকালে ·১৪৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ২৪টি কেন্দ্র স্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১০. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্যদানের কার্যক্রম : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য দান কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী এজেন্সির কর্মসূচি মূল্যায়ন সাপেক্ষে আর্থিক অনুদান প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ খাতে মোট আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয় ০·৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ·১৫ কোটি টাকা ঢাকার বহুমুখী পুনর্বাসন কেন্দ্রকে এবং ·৩০ কোটি টাকা সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের চালু প্রকল্পগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সৃষ্ট আর্থসামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর অধিকাংশ কর্মসূচি আজও সফলভাবে আলোর মুখ দেখে নি। তথাপি একথা জোর দিয়েই বলা যায়, এ পরিকল্পনার নীতি এবং উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের অগ্রযাত্রা অনেক দূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন॥১০॥ পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোর পরিসর উল্লেখ কর।

অথবা, পরিকল্পনার কাকে বলে। বাংলাদেশে প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোর বাজেট উল্লেখ কর।

অথবা, পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশে প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোর পরিসর উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। পরিকল্পিত আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়ন প্রতিটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট নীতি এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। বিশ্বের সকল দেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছে। সীমিত সম্পদ এবং সদা সম্প্রসারণশীল অভাব ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয়সাধনে পরিকল্পিত উন্নয়নের বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে, পরিকল্পনাই হলো ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি যা পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সম্পৃক্ত।

পরিকল্পনার সংজ্ঞা : নিম্নে পরিকল্পনার সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

পরিকল্পনা অদৃষ্টবাদ বা Fatallism এর বিপরীত দর্শন হলো পরিকল্পনা। কিভাবে নির্দিষ্ট ব্যয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে সর্বোত্তম উপকার লাভ করা যায় তার সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি বা কর্ম প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা।

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ভবিষ্যৎ কার্যাবলির পূর্বনির্ধারিত সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে।

'পরিকল্পনা হচ্ছে কাজ করার পূর্বে চিন্তা এবং অনুমান অপেক্ষা তথ্যের আলোকে কাজ করার একটি বুদ্ধিবৃত্তিজাত পদ্ধতি; সুশৃঙ্খল পন্থায় কাজ করার একটি মানসিক প্রবণতা। কোন লক্ষ্যার্জনে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত প্রস্তুতি হলো পরিকল্পনা।

'Encyclopaedia of Britanica' গ্রন্থে Planning শব্দটিতে অবস্থিত সবগুলো বর্ণের ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্দর ভাবে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

P = Process of work (কাজ করার প্রক্রিয়া),

L = Limit of time, money and manpower (সময়, অর্থ ও মানব সম্পদের সীমাবদ্ধতা),

A = Analysis of work and result (কর্ম ও ফলাফল বিশ্লেষণ),

N = Network of management (ব্যবস্থাপনা কর্মজাল),

N = Normally accepted (সাধারণভাবে গৃহীত),

I = Implementable (বাস্তবায়ন),

N = Natianal focus (জাতীয় ইস্যু),

G = Govern by the executive body or council (নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত)।

Social Work Dictionary এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "Planning is the process of specifying future objective, evaluating the means for achieving them and making deliberate choices about appropriate course of action." অর্থাৎ, পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, সেগুলো অর্জনের বিভিন্ন উপায়সমূহ মূল্যায়ন এবং যথাযথ ও কার্যধারা চয়নের প্রক্রিয়া।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অসংখ্য এবং বহুমুখী অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য একদিকে সম্পদ আহরণ এবং অন্যদিকে সম্পদের যৌক্তিক খাতওয়ারি বণ্টনের প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা।

বাংলাদেশে প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসর : স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালের জুলাই হতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। এর মেয়াদ কাল ছিল ১৯৭৩ সাল হতে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রয়াস বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় অধিক সময় ব্যয়, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের অনুপস্থিতি, সুশাসনের অভাব, বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি প্রভৃতি নেতিবাচক অবস্থার প্রভাবে পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি। বাংলাদেশে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনাগুলো হলো :

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা → ১৯৭৩-৭৮;
২. দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা → ১৯৭৮-৮০;
৩. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা → ১৯৮০-৮৫;
৪. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা → ১৯৮৫-৯০;
৫. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা → ১৯৯০-৯৫;
৬. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা → ১৯৯৭-২০০২।

চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যবর্তী ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য এডহক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুত করা হয়।

...হতে বিগত পরিকল্পনাসমূহের আকার, ব্যয় ও ...প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো :

[illegible]	পরিকল্পনার আকার	প্রাক্কলিত প্রকৃত ব্যয়	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত প্রবৃদ্ধি
...র্ষিকী ...কল্পনা- ...	৪৪,৫৫০	২০,৭৪০	৫.৫০	৪.০০
...র্ষিকী ...কল্পনা- ...	৩৮,৬১০	৩৩,৫৯০	৫.৬০	৩.৫০
...র্ষিকী ...কল্পনা- ...	১,৭২,০০০	১,৫২,৯৭০	৫.৪০	৩.৮০
...তীয় ...র্ষিকী ...কল্পনা- ...৮৫-৯০	৩,৮৬,০০০	২,৭০,১১০	৫.৪০	৩.৮০
...র্থ ...র্ষিকী ...কল্পনা- ...৯০-৯৫	৬,২০,০০০	৫,৯৮,৪৮০	৫.০০	৪.১৫
...ম ...র্ষিকী ...কল্পনা- ...৯৭-০২	১৯,৫৯,৫২১	১৩,৭৩,৬৩৯	৭.০০	৫.২১

উৎস : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রতিবেদন এবং ...নৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, পৃঃ, ২৫১

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা হলো ...ক কর্ম পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন কাজকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে ...বায়ন করা যায়। পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সফলভাবে ...বায়ন করা সম্ভব নয়। তাই অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব ...সীম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি ...বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ...ছে কিন্তু উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে ...ন পরিকল্পনারই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি।

প্রশ্ন।১১। **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কৌশলসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অ্যাপ্রোচসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তর।। ভূমিকা : (১৯৯৭-২০০২) সালে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে স্ব-স্থায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করা। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উত্তরণ, দেশকে অব্যাহত দারিদ্র্য অবস্থা হতে মুক্তি প্রদান, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ : নিম্নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : এ পরিকল্পনায় গড়ে ৭% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এতে চূড়ান্ত বছরে এ লক্ষ্যমাত্রা ৮.৩% উন্নীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : কৃষিখাত ৪ শতাংশ, শিল্পখাত ১৩.৯৪%, নির্মাণ ৭.৭%, শক্তি ও গ্যাসখাতে ২৩%, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৭.৫১%, বাসস্থান খাতে ৬.৫৪%, স্বাস্থ্যখাতে ৬.৫৪%, শিক্ষাখাতে ৭.০৯% এবং বাণিজ্য খাতে ৬% হবে।

প্রধান প্রধান খাতের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা : পরিকল্পনার শেষবর্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে কৃষি এবং শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ২৫.৮৭% এবং ১২.৭% হবে। মোট খাদ্য উৎপাদন ২.০৪ কোটি টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫ কোটি টনে উন্নীত হবে। কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শস্যের নিবিড়তা ৮৫% থেকে ৯২% এ বৃদ্ধি পাবে।

পক্ষান্তরে, বাণিজ্যিক পণ্য পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৪.৮৭ মিলিয়ন বেল থেকে ৭.২৪ মিলিয়ন বেলে উন্নীত হবে। তুলা উৎপাদন বাড়বে ১ লক্ষ টন থেকে দুই লক্ষ টন। সুতা এবং কাপড় উৎপাদন ১১.৩ কোটি গজ এবং ১১৬.৩ মিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫২.২ কোটি গজ এবং ৩৬৪.১ মিটার বৃদ্ধি পাবে।

সার এবং সিমেন্ট উৎপাদন ২১৫৩ এবং ১০৭ হাজার মেট্রিক টন থেকে ২৫৮৫ এবং ২৩৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২১৪৮ মেগাওয়াট থেকে ৫৭৩৯ মেগাওয়াটে উন্নিত হবে।

দারিদ্র্য, শিক্ষা এবং নিয়োগ : পরিকল্পনার সময় সীমায় শিক্ষার হার ৪৭% থেকে ৭০% এ উন্নীত হবে। দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী জনসংখ্যা ৪৭% হতে হ্রাস পেয়ে ৩৩% এ উন্নীত করা। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত .৬৩ কোটি নতুন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যয় বরাদ্দ : জাতীয় সঞ্চয় হবে মোট জাতীয় উৎপাদনের GNP-১২% এবং বিনিয়োগ হবে ২২% এর মতো।

পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দ .১৯৬০ বিলিয়ন কোটি যার মধ্যে ৪৫% সরকারি খাতে এবং বাকি ৫৫% বেসরকারি খাতে ব্যয় করা হবে। মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭৭.৫৬% অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩২% হ্রাস করা হবে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ :

১. প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. দারিদ্র্য দূরীকরণ।

৩. নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. মানব সম্পদের উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা।

৫. বেসরকারি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি। এজন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ শক্তি, গ্যাস, কয়লা এবং অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬. তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা নীতির আলোকে শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ।

৭. মাতৃমঙ্গল, শিশু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধার সম্প্রসারণ করা হবে।

৮. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ।

৯. আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব দ্রব্যের মূল্য আপেক্ষিকভাবে বেশি সেগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি সম্প্রসারণ।

১০. স্বল্পমেয়াদের মধ্যেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন যাতে মানুষের দৈনন্দিন ক্যালরি গ্রহণ ১৯৫০ কিলোক্যালরি থেকে ২৩০০ কিলোক্যালরিতে উন্নীত হয়।

১১. পল্লি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রকরণ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৌশলসমূহ : বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

পল্লিউন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন : দেশের প্রায় ৪৮% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। আবার এদের বেশিরভাগ পল্লি অঞ্চলে বসবাস করে। তাই পল্লি অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বেসরকারি খাত : দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে বেসরকারি খাত। প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান, ঋণ, সম্প্রসারণ সেবা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্ররোচনা এবং উৎসাহের ব্যবস্থা করা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধা : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭৫% থেকে ১.৩৫% এ হ্রাস করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাতৃমঙ্গল, স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।

সম্পদ সমাবেশ : পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের দেশীয় সম্পদের সাহায্যে মিটানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। মোট আমদানি ব্যয়ের ৪৫% বিদেশি সাহায্য দ্বারা পূরণ হবে। বিলাস দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি নীতি করে আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং মানব সম্পদ বৃদ্ধি সম্পদ সমাবেশ করা।

রপ্তানি চালিত শিল্পোন্নয়ন : রপ্তানিভিত্তিক শিল্প অনুসরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয়।

১. রপ্তানিযোগ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন উপকরণ আমদানির উদার নীতি গ্রহণ।

২. রপ্তানি ও আমদানি শিল্পের পুনর্বিন্যাস করা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন : মানব সম্পদ উন্নয়নের নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়–

১. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।

২. মধ্য পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ।

৩. কমিউনিটি স্কুল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৪. প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য ব্যবস্থা করা।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে–

১. অধিক উৎপাদনশীল বীজের ব্যবহার বাড়ানো।

২. আধুনিক সারের ব্যবহারের মাধ্যমে উৎ বৃদ্ধি করা।

৩. সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

অতিরিক্ত নিয়োগ ও আয় সৃষ্টি : দেশে অধিক আয় নিয়োগ সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে–

১. পল্লি অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ।

২. কৃষিখাতে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত নি সৃষ্টি করা।

৩. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সম্প্রসারণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে দী মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ হয়েছে বেশি। এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দে সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৯৭ সালে গৃহীত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। যার মধ্যে দরিদ্রতার হ্রাসকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত আলো পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ আলো করা হয়েছে।

প্রশ্ন।১২। **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচি ও সমস্যাসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।**

অথবা, **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম ও দুর্বলতা আলোচনা কর।**

উত্তর।। ভূমিকা : সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য সমাজের অসহায় ও অনগ্রসর শ্রেণীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহত্তম অধিদপ্তর সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আর্থসামাজিকভাবে অনগ্রসর দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আবার নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ : নিম্নে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ এবং বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. শহর ও গ্রাম সমষ্টি কর্মসূচি।

২. দৈহিক ও মানসিক পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৩. এতিম এবং অক্ষম শিশুদের উন্নয়ন কার্যক্রম।

৪. কিশোর ও যুব অপরাধীদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৫. বৃদ্ধ ও অক্ষমদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৬. মাদকাসক্তদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৭. ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং দুস্থ কল্যাণ কার্যক্রম।

৮. বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) সমাজসেবা কার্যক্রমে সহায়তা দান।

৯. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম।

১০. শিক্ষামূলক কার্যক্রম।

এছাড়া আরো যেসব কর্মসূচি হাতে নেয়া হয় তা হলো :

১. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ।

২. শহর ও গ্রামীণ মহিলা প্রধান দরিদ্র পরিবারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

৩. প্রবীণ ও অক্ষমদের সমষ্টিভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

৪. জুয়া এবং পতিতাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করার জন্য যথাযথ উপার্জনশীল কার্যক্রম।

৫. সংখ্যা লঘু এবং পার্বত্য এলাকার উপজাতীয়দের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম।

৬. যেসব লোক চরম অবস্থায় জীবনযাপন করছে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ।

৭. শহর এলাকায় দরিদ্রদের জন্য উপার্জন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা ও গৃহায়নের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ উপর্যুক্ত নীতি প্রণয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মাঠ কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রামীণ এলাকায় সম্পৃক্ত করে উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রকল্প পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাজসেবা কার্যক্রমে সরকারের অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে সকল সরকারি বেসরকারি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণের অতীত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। সেগুলো হলো :

১. সমাজকল্যাণ প্রকল্পসমূহের কাঠামোগত এবং আর্থিক সূচি অনুযায়ী অপর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ।

২. ৪২টি নতুন জেলায় সমাজসেবা বিভাগের অফিস না থাকায়, সমাজকল্যাণ প্রকল্পসমূহ সঠিক সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া।

৩. গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণ কাজের অস্বাভাবিক মন্থরতা ও ধীরগতি।

৪. বেসরকারি খাতে সমাজকল্যাণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব।

৫. সমাজকল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমষ্টির জনগণের সমর্থনের অভাব।

৬. দুর্বল স্থানীয় সরকার কাঠামো।

৭. দক্ষ সমাজকর্মীর অভাব।

৮. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মীর অভাব।

৯. সম্পদের স্বল্পতা।

১০. পারস্পরিক বুঝাপড়ার অভাব।

১১. বরাদ্দকৃত তহবিলের অপর্যাপ্ততা।

১২. পেশাদার সংগঠনের অভাব।

১৩. অপর্যাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা।

১৪. দেশজ ভিত্তির অভাব।

১৫. সামাজিক সমর্থনের অভাব।

১৬. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা।

১৭. গবেষণা ও মূল্যায়নের অভাব।

১৮. দৈহিক ও মানসিক পঙ্গুদের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের অভাব।

১৯. কিশোর ও যুব অপরাধীদের কল্যাণমূলক সেবা কর্মসূচি গ্রহণে অনীহা।

২০. মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণের স্বল্পতা।

উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে উপর্যুক্ত নীতি প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই সমাজকল্যাণ কর্মসূচিকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দরকার উক্ত সমস্যার সমাধান। তাহলেই সমাজকল্যাণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন॥১৩॥ বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সরকারি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যবলিগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে জাতীয় পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো সমাজকল্যাণ খাত। মূলত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর সার্বিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গৃহীত সরকারি কর্মসূচিসমূহ : স্বাধীনতার পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত করা হয়। এতিম, বিধবা, ছিন্নমূল মহিলা, যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং শারীরিক দিক থেকে পঙ্গুদের জন্য বেশ কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম (১৯৭৩-৭৮) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। দুস্থ জনগোষ্ঠী যারা সরকারের স্বেচ্ছাসেবী বা মানবহিতৈষীদের সাহায্য ছাড়া সমাজে ঠাঁই করে নিতে পারে না তাদের মঙ্গলার্থে কর্মসূচি নেয়া হয়।

নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বস্তিবাসিদের উৎপাদনশীল ও স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বৃত্তিমূলক এবং উপার্জনশীল প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৬৮টি কেন্দ্র খোলা হয়। চল্লিশটি গ্রামীণ থানাকে পল্লি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এসব কেন্দ্রের ভূমিহীন কৃষকসহ অসহায় জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নিয়োগ করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম (১৯৮০-৮৫) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ব্যাপক গ্রাম ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এতে স্কুল ত্যাগী কিশোর, যুবক, মহিলা এবং ভূমিহীনদের শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনা বিকাশের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় ১০৪টি থানায় (বর্তমানে উপজেলা) গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য ১৯৬ টি কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়। এতিমদের স্বাবলম্বী ও উৎপাদনক্ষম করে তুলতে দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে সাবেক মহকুমা শহরগুলোতে ৭০টি কারুশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় নিয়ে আসা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমসমূহ (১৯৮৫-৯০) : দৈহিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের পশ্চাৎপদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শরিক হতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই ছিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ :

১. গ্রামীণ গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়ন।
২. দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম।
৩. শিশু কল্যাণ কার্যক্রম।
৪. ভবঘুরে কল্যাণ কার্যক্রম।
৫. বহুমূত্র রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।
৬. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি উন্নয়ন কার্যক্রম।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম (১৯৯০-৯৫) : চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। এজন্য এতে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ছিল যেমন–

১. শহর ও পল্লি সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি।
২. দৈহিক ও মানসিক পঙ্গুদের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।
৩. শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম।
৪. কিশোর ও যুব অপরাধীদের কল্যাণমূলক সেবা।
৫. প্রবীণ এবং অক্ষমদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম।
৬. মাদকাসক্তদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম।
৭. ভিক্ষুকদের জন্য সেবা কার্যক্রম।
৮. চিকিৎসা সমাজকর্ম।

এছাড়াও ঐ মেয়াদে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তা হলো :

১. পল্লি ও শহর সমষ্টি কার্যক্রম।
২. শিশু কল্যাণ কার্যক্রম।
৩. দুস্থ ও ভবঘুরে কল্যাণ কার্যক্রম।

৪. সংশোধনমূলক কার্যক্রম।
৫. শারীরিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
৬. প্রবীণ কল্যাণ কার্যক্রম।
৭. চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রকল্প।
৮. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি (১৯৯৭-০২) : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের অসহায় ও অনগ্রসর শ্রেণীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহত্তম অধিদপ্তর সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আর্থসামাজিকভাবে অনগ্রসর দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১. শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি।

২. দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

৩. এতিম ও দুস্থ শিশুদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

৪. কিশোর ও যুব অপরাধীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

৫. শহর ও গ্রামীণ মহিলা প্রধান দরিদ্র পরিবারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

৬. সমাজসেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার উন্নয়ন।

৭. প্রবীণ এবং অক্ষমদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

৮. জুয়া এবং পতিতাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করার জন্য যথাযথ উপার্জনশীল কার্যক্রমের উন্নয়ন।

৯. ভিক্ষুক, দুস্থ ও সামাজিক পঙ্গুদের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১০. বৃদ্ধ অক্ষমদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

১১. সংখ্যালঘু এবং পার্বত্য এলাকার উপজাতীয়দের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত প্রধান কর্মসূচি :

১. শহর ও গ্রাম সমষ্টি কর্মসূচি।

২. দৈহিক ও মানসিক পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৩. এতিম এবং অক্ষম শিশুদের উন্নয়ন কার্যক্রম।

৪. কিশোর ও যুব অপরাধীদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৫. বৃদ্ধ ও অক্ষমদের কল্যাণ কার্যক্রম।

৬. মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনার আওতায় দেশের দুস্থ, অসহায় মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন।১৪। বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক বর্ণনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশে পরিকল্পনা কর্মসূচি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা কর্মসূচির মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কর্মসূচি অন্যতম। দেশের উন্নয়ন, কল্যাণ তথা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদেশের শিশু, নারী, যুব, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী অথবা প্রতিটি শ্রেণির জন্যই এ পরিকল্পনায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক : নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হলো :

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : ১৯৯৭ সালের জুলাই থেকে ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এটি বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের আর্থসামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় ৬৯,৬৩৭ লক্ষ টাকা। যার ৫২,৫৩৭ লক্ষ টাকা সরকারি খাতে এবং ১৭,১০০ লক্ষ টাকা বেসরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়। সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় ধরা হয় ৬,৯৬৩.৭০ মিলিয়ন টাকা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দারিদ্র্য বিমোচনসহ এদেশের আর্থসামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও এর আরো নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন–

১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরভিত্তিক দল গঠন করা এবং তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২. সমাজের সকল অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে উপার্জনমুখী করার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন।

৩. ভবঘুরেদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৪. অক্ষম, বেকার, বৃদ্ধ, তালাকপ্রাপ্ত, আশ্রয়হীন, পরিত্যক্ত প্রভৃতি শ্রেণির কষ্ট লাঘবে কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

৫. স্থানীয় জনগণকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

৬. প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা।

৭. নারী প্রধান মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

সমাজকল্যাণ কর্মসূচি : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। এজন্য এ খাতে মোট ব্যয় ধরা হয় ৬,৯৬৩.৭০ মিলিয়ন টাকা। নিম্নে এ পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো :

১. শহর ও গ্রামীণ সমষ্টির উন্নয়ন সাধন করা : সামাজিক উন্নয়নের অর্থ হলো শহর ও গ্রামীণ সমষ্টির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শহর ও গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এজন্য পরিকল্পনায় ৮৪০.০০ মিলিয়ন টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম : এদেশে অসংখ্য শিশু-কিশোর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এজন্য এ পরিকল্পনায় ১৮৫.৭০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

৩. এতিম ও অসমর্থ শিশুদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো এসব শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এজন্য এ পরিকল্পনায় ৬৪৪.০০ মিলিয়ন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়।

৪. অপরাধী ও অবহেলিত তরুণদের জন্য কল্যাণমূলক সেবা : অপরাধী ও মাদকাসক্ত কিশোরদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে কিশোররা সংশোধনের সুযোগ পায়। এজন্য পরিকল্পনায় ১০০.০০ মিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয়।

৫. বয়স্ক ও অক্ষমদের জন্য সেবা কর্মসূচি : বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জন্য সেবামূলক কর্মসূচি অত্যাবশ্যক। এ পরিকল্পনায় তাদের প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতাসহ নানা ধরনের সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় ৪০.০০ মিলিয়ন টাকা।

৬. মাদকাসক্তদের জন্য পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি : মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এজন্য ৪০.০০ মিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয়। এ কাজে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরকে মাদকাসক্তদের শনাক্ত ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৭. এনজিওদের সহায়তা : এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এদেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে। সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এনজিওগুলোকে উৎসাহ প্রদান, পরামর্শ, উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এজন্য পরিকল্পনার ১৩০.০০ মিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয়।

৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : যারা চরম দুর্দশা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার তাদের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য এ খাতে ২০.০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৯. দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন : দেশের যারা দরিদ্র ম... তারা বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নির্যা... বৈষম্যের শিকার হয়। তাদের জীবনমান উন্নয়নকরণের জন্য পরিকল্পনায় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এজন্য তা... উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১০. সমন্বিত কর্মসূচি চালু করা : পঞ্চম পঞ্চবার্ষি... পরিকল্পনায় শহরের দরিদ্রদের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি ... করা হয়। তাদের জন্য গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও আয় ... সুযোগ প্রদানের নিমিত্তে কর্মসূচি রাখা হয়েছে। দারি... দূরীকরণে এ ধরনের কর্মসূচি ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমি... রাখে।

বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো পরিকল্পনা প্রণীত ... বাস্তবায়িত হয়েছে তন্মধ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দে... উন্নয়নের গতিধারাকে অনেকাংশে ত্বরান্বিত করতে স... হয়েছে। এ পরিকল্পনা দেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হলেও ... সফলতা ও ব্যর্থতা দু'দিকই রয়েছে। নিম্নে এ পরিকল্প... মূল্যায়ন বর্ণনা করা হলো :

মূল্যায়ন : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাংলাদে... উন্নয়নে পরিকল্পনার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ... বার্ষিক ৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন। বেসরকারি বা ব্যক্তি খাতকে প্রধা... খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমো... মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনমান উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা অ... প্রভৃতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এ পরিকল্পনার সাফল্যসমূহ : এ পরিকল্পনার সফলতাগু... হলো–

⇒ এতিম শিশুদের জন্য ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ও ... সদনগুলোতে ৯,৪০০ জন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

⇒ মাদকাসক্তদের জন্য পুনর্বাসনে ৪০ মিলিয়ন টা... বরাদ্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

⇒ সমাজকল্যাণে বেসরকারি সংস্থাকে সহায়তা এক... যুগপোযোগী পদক্ষেপ।

ব্যর্থতাসমূহ : সমাজকল্যাণ খাতে জনসংখ্যার অনুপাতে ... বরাদ্দ, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব প্রভৃতি উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত করে–

⇒ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মাত্র ২০ মিলিয়ন অর্থ বরাদ্দ।

⇒ মাত্র ৯টি প্রকল্প চালু করা হয়। যা নিতান্তই কম।

⇒ এছাড়াও প্রতিবন্ধী কর্মসূচি, সংশোধনমূলক কার্যক্র... বয়স্ক ও অক্ষমদের কল্যাণ, শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি কর্মসূচি প্রভৃ... সফল হয় নি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বহুবিধ ব্যর্থতা থা... সত্ত্বেও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে এক... যুগোপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এ পরিকল্পনায় অনে... উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। তাই অন্যা... পরিকল্পনা থেকে এ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ... অনুসরণীয় বলে বিবেচিত।
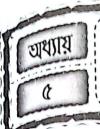
বাংলাদেশের সরকারি সমাজসেবা
Government Social services in Bangladesh

ক বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশে যে কোন একটি সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির নাম লিখ।
উত্তর : বাংলাদেশে একটি সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির নাম শহর সমাজসেবা কার্যক্রম।

২. বাংলাদেশে কত সালে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয়?
উত্তর : বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয়।

৩. বাংলাদেশের প্রথম সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশের প্রথম সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির নাম শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প।

৪. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারের সহায়তা এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনাকে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বলে।

৫. ঢাকা প্রজেক্ট কত সালে শুরু করা হয়?
উত্তর : ঢাকা প্রজেক্ট ১৯৫৫ সালে শুরু করা হয়।

৬. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৭. শহর সমাজসেবা কর্মসূচির পূর্ব নাম কী?
উত্তর : শহর সমাজসেবা কর্মসূচির পূর্ব নাম পৌর সমাজসেবা।

৮. বাংলাদেশের কয়টি জেলায় শহর সমাজসেবা প্রকল্প চালু রয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় শহর সমাজসেবা প্রকল্প চালু রয়েছে।

৯. শহর সমাজসেবার কার্যক্রমের যে কোন একটি ত্রুটি লিখ।
উত্তর : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের জন্য অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ।

১০. গ্রামীণ সমাজসেবার একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা লিখ।
উত্তর : গ্রামের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গ্রামীণ সমাজসেবা বলে।

১১. শহরের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচালিত সমাজসেবামূলক কর্মসূচির নাম কী?
উত্তর : শহর সমাজসেবা কার্যক্রম।

১২. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের নাম কত সালে পৌর সমাজসেবা নামে রাখা হয়?
উত্তর : ১৯৮৪ সালে।

১৩. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রধান কে?
উত্তর : সরকারের একজন সিনিয়র উপপরিচালক।

১৪. কী কী সমস্যা সমাধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়?
উত্তর : শহরের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, পতিতাবৃত্তি, বস্তি সমস্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, জনসংখ্যাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা।

১৫. গ্রামীণ সমাজসেবা কত সালে শুরু করা হয়?
উত্তর : গ্রামীণ সমাজসেবা ১৯৭৪ সালে শুরু করা হয়।

১৬. গ্রামীণ সমাজসেবার বর্তমান নাম কী?
উত্তর : গ্রামীণ সমাজসেবার বর্তমান নাম উপজেলা সমাজসেবা।

১৭. গ্রামীণ সমাজসেবার মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর : গ্রামের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনই গ্রামীণ সমাজসেবার মূল লক্ষ্য।

১৮. বাংলাদেশের কয়টি উপজেলায় গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প চালু রয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশের ৪০০টি উপজেলায় গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প চালু রয়েছে।

১৯. গ্রামীণ সমাজসেবার ১টি সীমাবদ্ধতা লিখ।
উত্তর : এলাকার চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের পরিমাণ অপর্যাপ্ত।

২০. TSSO-এর পরিপূর্ণ রূপ কী?
উত্তর : Thana Social Service Officer.

২১. বাংলাদেশে প্রথম প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করা হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৮৪ সালে।

২২. স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এমন একটি এনজিওর নাম লিখ।
উত্তর : BRAC।

২৩. গ্রামীণ মানুষের কয়েকটি সমস্যার নাম লিখ।

উত্তর : জনসংখ্যাস্ফীতি, ক্ষুধা, অস্বাস্থ্য ও অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, গৃহায়ন সমস্যা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যা।

২৪. বাংলাদেশ সরকারের গ্রামোন্নয়নভিত্তিক সর্ববৃহৎ কর্মসূচির নাম কী?

উত্তর : গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি।

২৫. চিকিৎসা সমাজকর্মের বর্তমান নাম কী?

উত্তর : চিকিৎসা সমাজকর্মের বর্তমান নাম হাসপাতাল সমাজসেবা।

২৬. হাসপাতাল সমাজসেবার একটি সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : হাসপাতাল সমাজসেবা একটি প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কার্যক্রম, যাতে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করে অসুস্থ ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা প্রয়োজনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

২৭. হাসপাতাল সমাজসেবার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর : হাসপাতাল সমাজসেবার মূল লক্ষ্য রোগ ও রোগীর চিকিৎসার সমন্বয়সাধন করা।

২৮. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির ১টি সীমাবদ্ধতা লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির ১টি সীমাবদ্ধতা স্বল্প অর্থ বরাদ্দ।

২৯. পৃথিবীতে কবে, কোথায় সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু হয়?

উত্তর : ১৯০৫ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু হয়।

৩০. বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু রয়েছে।

উত্তর : ৬৪ জেলার ৮৪টি হাসপাতালে।

৩১. চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে?

উত্তর : Allied Discipline.

৩২. চিকিৎসাক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সেবা প্রদান করেন?

উত্তর : অসুস্থতা, সম্পদ, অসুস্থ ব্যক্তি প্রভৃতি।

৩৩. রোগীকল্যাণ সমিতি কী?

উত্তর : রোগীকল্যাণ সমিতি এমন একটি সংগঠন যা হাসপাতালের রোগীদের কল্যাণে নিয়োজিত।

৩৪. বর্তমানে রোগীকল্যাণ সমিতির সংখ্যা কত?

উত্তর : ৯০টি।

৩৫. প্রতিবন্ধী কারা?

উত্তর : যারা মনো-দৈহিক বা আর্থসামাজিক সমস্যার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত তারাই প্রতিবন্ধী।

৩৬. প্রতিবন্ধীর শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

উত্তর : প্রতিবন্ধী ৪ প্রকার। যথা : দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধী।

৩৭. চিকিৎসা সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র কোনটি?

উত্তর : হাসপাতাল।

৩৮. বাংলাদেশে কত সালে প্রথম প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে ১৯৬২ সালে প্রথম প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু হয়।

৩৯. CRP এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Centre for the Rehabilitation of the Parolysed.

৪০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কত সালে প্রণীত হয়?

উত্তর : ২০১৩ সালে।

৪১. সংশোধন কার্যক্রম কী? এককথায় লিখ।

উত্তর : অপরাধীকে শাস্তিদানের পরিবর্তে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে সংশোধনমূলক কার্যক্রম বলে।

৪২. বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সূচনা হয় কবে?

উত্তর : বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সূচনা হয় ১৯৪৯ সালে।

৪৩. বাংলাদেশের প্রথম সংশোধনমূলক কর্মসূচি কোনটি?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রথম সংশোধনমূলক কর্মসূচি বোরস্টাল স্কুল।

৪৪. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত সংশোধনমূলক কর্মসূচি কী কী?

উত্তর : বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত সংশোধনমূলক কর্মসূচিগুলো হলো প্রবেশন, প্যারোল, আফটার কেয়ার সার্ভিস, জাতীয় কিশোর সংশোধনী ইনস্টিটিউট, নিরাপদ আবাসন।

৪৫. প্রবেশনে ও প্যারোলের মধ্যে যে কোন ১টি পার্থক্য লিখ।

উত্তর : প্রবেশন শাস্তি স্থগিত রেখে আদালত থেকে অপরাধীকে সাময়িকের জন্য মুক্তি দেয়া হয় অন্যদিকে প্যারোলে অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি আংশিক ভোগ করার পর জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

৪৬. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি সংশোধনী ইনস্টিটিউট রয়েছে?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি সংশোধনী ইনস্টিটিউট রয়েছে।

৪৭. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়।

৪৮. সংশোধনমূলক কার্যক্রম কয়টি ও কী কী?

উত্তর : সংশোধনমূলক কার্যক্রম ৭টি। যথা : প্রবেশন, প্যারোল, কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, মুক্ত কয়েদীদের পুনর্বাসন সেবা, বোরস্টাল স্কুল, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়।

৪৯. জাতীয় কিশোর সংশোধনী ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম কী?

উত্তর : জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান।

৫০. শান্তিনিবাস কী?

উত্তর : সরকারে শিশুসদন ও শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে বসবাসের ঠিকানা।

৫১. "অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়"–এটি কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উত্তর : অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫২. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এমন একটি অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের নাম লিখ।

উত্তর : প্রবেশন ব্যবস্থা।

৫৩. Probation শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে এবং এর অর্থ কী?

উত্তর : Probation শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Probare' থেকে এবং এর অর্থ পরীক্ষা, চেষ্টা বা প্রমাণ করা।

৫৪. প্রবেশন ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রথম কোথায়, কে প্রবর্তন করেন?

উত্তর : ১৮১৪ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরের এক জুতার কারিগর জন আগস্টস প্রবেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

৫৫. বাংলাদেশে প্রবেশন ব্যবস্থা কবে থেকে চালু হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশন আইন প্রণীত হয় ১৯৬০ সালে এবং তা চালু হয় ১৯৬২ সালে।

৫৬. প্যারোল ব্যবস্থা প্রথম কোথায় কবে চালু হয়?

উত্তর : প্যারোল ব্যবস্থা ১৮৭৭ সালে আমেরিকায় প্রথম চালু হয়।

৫৭. আমাদের দেশে কিশোর আদালতে কত বছরের কিশোর অপরাধীদের বিচারকার্য করা হয়?

উত্তর : ৭ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদের।

৫৮. বাংলাদেশে কিশোর আদালত কখন স্থাপিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

৫৯. বোরস্টাল স্কুল কেন নামকরণ করা হয়েছে?

উত্তর : ইংল্যান্ডের বোরস্টাল নামক স্থানে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য এ স্কুল স্থাপিত হয় বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে বোরস্টাল স্কুল।

৬০. বাংলাদেশে আফটার কেয়ার সার্ভিস চালু করা হয় কবে?

উত্তর : ১৯৬৫ সালে।

৬১. আমাদের দেশে কখন বোরস্টাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে কী এটি চালু রয়েছে?

উত্তর : আমাদের দেশে ১৯৪৯ সালে বোরস্টাল স্কুল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বোরস্টাল স্কুল বন্ধ রয়েছে।

৬২. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধী সংশোধনী কেন্দ্র কবে, কোথায় চালু করা হয়?

উত্তর : ১৯৭৬ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে।

৬৩. জাতীয় কিশোর ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম কী?

উত্তর : জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান।

৬৪. জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কয়টি বিভাগ আছে এবং এগুলো কী কী?

উত্তর : তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা : ক. কিশোর আদালত, খ. কিশোর হাজত এবং গ. সংশোধনী প্রতিষ্ঠান।

৬৫. সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী অপরাধ কী?

উত্তর : সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "অপরাধ হচ্ছে যে কোন ধরনের আচরণ যা আইন লঙ্ঘন করে।"

৬৬. অপরাধ সমাজে কোন কোন কাজের বিনষ্ট করে?

উত্তর : অপরাধ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি, নিরাপত্তা, মূল্যবোধ ও প্রগতিকে বিনষ্ট করে।

৬৭. পুলিশের নিকট কোন ধরনের কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য?

উত্তর : পুলিশের নিকট ঐসব কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় যা শান্তিভঙ্গের কারণ হয় এবং যে কাজ নিয়ে মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হয়।

৬৮. অপরাধের কয়েকটি ধরন বা প্রকারভেদ লিখ।

উত্তর : অপরাধের ধরনগুলো হলো– গুরুতর অপরাধ, যৌন অপরাধ, রাজনৈতিক অপরাধ, জনস্বার্থ বিরোধী অপরাধ, ভদ্রবেশী অপরাধ, রাষ্ট্রীয় অপরাধ প্রভৃতি।

৬৯. ভদ্রবেশী অপরাধ কী?

উত্তর : ভদ্রবেশী অপরাধ হচ্ছে এমন সব অপরাধ, যা সমাজের উচ্চপদস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকজন করে এবং নিজেদের পোশাককে কাজে লাগিয়ে তারা এসব অপরাধ করে থাকে।

৭০. বাংলাদেশের বেশিরভাগ অপরাধের প্রকৃতি কেমন?

উত্তর : বাংলাদেশের বেশিরভাগ অপরাধের প্রকৃতি অর্থনৈতিক ও নারীনির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত।

৭১. কয়েকটি অপরাধমূলক কাজের নাম লিখ।

উত্তর : কয়েকটি অপরাধমূলক কাজ হলো : দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চোরাচালান, ভেজাল, প্রতারণা, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, সম্পত্তি দখল, কর ফাঁকি, অবৈধ আয় প্রভৃতি।

৭২. নতুন কয়টি ভবঘুরে কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে?

উত্তর : ৫টি।

৭৩. **বাংলাদেশে অপরাধের প্রধান প্রধান কারণগুলো কী কী?**

উত্তর : বাংলাদেশে অপরাধের প্রধান প্রধান কারণগুলো হলো– দৈহিক, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দরিদ্রতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, রাজনৈতিক, অপসংস্কৃতি, বংশগত, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা প্রভৃতি।

৭৪. **অপরাধের প্রভাবে আমাদের সমাজে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে?**

উত্তর : অপরাধের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমূহ– দরিদ্রতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, নারী-নির্যাতন, মাদকাসক্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তাহীনতা, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি।

৭৫. **অপরাধের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?**

উত্তর : অপরাধের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো– 'অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধী নয়।'

৭৬. **অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া যায়?**

উত্তর : অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেয়া যায়।

৭৭. **বাংলাদেশে অপরাধ মোকাবিলার উপায়গুলো কী কী?**

উত্তর : বাংলাদেশে অপরাধ মোকাবিলার উপায়গুলো হলো :

(i) প্রতিরোধমূলক,

(ii) প্রতিকারমূলক ও

(iii) পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা।

৭৮. **বাংলাদেশে অপরাধ মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো কী কী?**

উত্তর : বাংলাদেশে অপরাধ মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো হলো ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার, মানবীয় চেতনা জাগ্রত করা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি।

৭৯. **অপরাধ মোকাবিলায় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো কী কী?**

উত্তর : অপরাধ মোকাবিলায় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো হলো– প্রবেশন, প্যারোল, জেল ব্যবস্থার সংস্কার, বিচারকার্যকে ত্রুটিমুক্ত করা প্রভৃতি।

৮০. **অপরাধ দমনে পুর্নবাসনমূলক ব্যবস্থা কী কী?**

উত্তর : অপরাধ দমনে পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থাগুলো হলো মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদিদের পুনর্বাসন কর্মসূচি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি।

৮১. **কিশোর কারা?**

উত্তর : আমাদের দেশে ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কিশোর বলা হয়।

৮২. **কিশোর অপরাধ কী?**

উত্তর : অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের দ্বারা সংঘটিত অসামাজিক কার্যকলাপকে কিশোর অপরাধ বলা হয়।

৮৩. **"কিশোর অপরাধ হচ্ছে প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-কানুনের উপর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের অবৈধ হস্তক্ষেপ"– এটি কার উক্তি?**

উত্তর : সমাজবিজ্ঞানী বিসলার এর উক্তি।

৮৪. **একজন লেখক প্রদত্ত কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : অপরাধবিজ্ঞানী সুলম্যান এর মতে, "অপ্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর উপর পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণহীনতাকে কিশোর অপরাধ বলে।"

৮৫. **কিশোর অপরাধের ব্যাপারে সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞা লিখ।**

উত্তর : সমাজকর্ম অভিধান এর সংজ্ঞানুযায়ী, "বয়স্করা যেসব আচরণ করলে অপরাধ হিসেবে গৃহীত হয় সেসব আচরণ কিশোর কর্তৃক সংঘটিত হলে তাকে কিশোর অপরাধ বলে।"

৮৬. **অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্যের মূল বিষয়গুলো কী কী?**

উত্তর : অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্যের মূল বিষয়গুলো হলো– বয়স, উদ্দেশ্য, মানসিক অবস্থা, আচরণগত দিক, সংশোধনগত দিক, শাস্তির ধরন, বিচারব্যবস্থা, অপরাধের মূল্যায়ন প্রভৃতি।

৮৭. **কয়েকটি কিশোর অপরাধের ধরন লিখ।**

উত্তর : কয়েকটি কিশোর অপরাধের ধরন– ছিনতাই, পরীক্ষায় নকল করা, চুরি করা, পকেট মারা, মেয়েদের শীস দেয়া, মাদকাসক্ত হওয়া, ঢিল ছোড়া, খেলার মাঠে মারামারি, অন্যের গাছের ফল খাওয়া প্রভৃতি।

৮৮. **অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে একটি পার্থক্য লিখ।**

উত্তর : অপরাধ প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের দ্বারা সংঘটিত। অন্যদিকে, কিশোর অপরাধ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের দ্বারা সংঘটিত।

৮৯. **বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণগুলো লিখ।**

উত্তর : বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণগুলো হলো– জৈবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বংশগত, দরিদ্রতা, সংঘদোষ, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, বস্তির প্রভাব, ভৌগোলিক কারণ প্রভৃতি।

৯০. **বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের ফলে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয়?**

উত্তর : বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের ফলে সৃষ্ট সমস্যা– নৈতিক অবক্ষয়, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানব সম্পদ ধ্বংস, সামাজিকীকরণে ত্রুটি প্রভৃতি।

৯১. **কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কয়টি বিভাগ আছে এবং কী কী?**

উত্তর : কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিনটি করে বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো : কিশোর আদালত, কিশোর হাজত ও ট্রেনিং স্কুল।

৯২. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সমাজকর্মীর ভূমিকা লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সমাজকর্মী বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, ইতিবাচক পরিবেশ, অভিভাবক সমিতি গঠন, সামাজিক নিরাপত্তাবিধান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৯৩. কিশোর অপরাধ নিরসনে সরকারি প্রচেষ্টা কী কী?

উত্তর : কিশোর অপরাধ নিরসনে সরকারি প্রচেষ্টার অন্যতম হচ্ছে– জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

৯৪. জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম কী?

উত্তর : জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান।

৯৫. বাংলাদেশে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কয়টি এবং এগুলো কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বাংলাদেশে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তিনটি। এগুলো গাজীপুরের টঙ্গী, কোনাবাড়ি ও যশোরে অবস্থিত।

৯৬. কিশোরী অপরাধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংশোধনী প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : কিশোরী অপরাধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত।

৯৭. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট আসন সংখ্যা কত?

উত্তর : কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট আসন সংখ্যা ৭৫০টি।

৯৮. কিশোর অপরাধ দমনে কাজ করে যাচ্ছে এমন কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার নাম লিখ।

উত্তর : কিশোর অপরাধ দমনে কাজ করে যাচ্ছে– কিশোর অপরাধী কল্যাণকর সহায়ক ব্যবস্থা (APJD), নির্মল আশ্রয়কেন্দ্র, রিমান্ড কামরেসকিউ হোম, আইনগত সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।

৯৯. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা কতসালে প্রণয়ন করা হয়?

উত্তর : ১৯৯৫ সালে।

১০০. শিশু কারা?

উত্তর : ১৬ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের শিশু বলা হয়।

১০১. ভবঘুরে কারা?

উত্তর : যাদের নির্দিষ্ট কাজ নেই, নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, অন্যের করুনা প্রার্থনা করে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয় তারাই ভবঘুরে।

১০২. ভবঘুরেরা কোথায় অবস্থান করে?

উত্তর : ফুটপাথ, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, পার্ক, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি স্থানে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

১০৩. ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণের জন্য কত সালে আইন প্রণয়ন করা হয়?

উত্তর : ১৯৪৩ সালে।

১০৪. আমাদের দেশে বর্তমানে কয়টি ভবঘুরে কেন্দ্র রয়েছে?

উত্তর : ৬টি।

১০৫. ভবঘুরে হওয়ার মূল কারণ কী?

উত্তর : অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং বিভিন্ন রোগব্যাধি।

১০৬. সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রধান কাজ কী?

উত্তর : ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০৭. ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রের প্রধান কে এবং বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ব্যবস্থাপক এবং বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১০।

১০৮. দুঃস্থ শিশু কারা?

উত্তর : দুঃস্থ শিশু বলতে এতিম শিশু যারা সহায়সম্বলহীন ও অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করে তাদের বুঝায়।

১০৯. SWID এর পরিপূর্ণ রূপ লিখ।

উত্তর : SWID = Society for the Welfare of Intellectual Disables.

১১০. SWAC এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : SWAC = Society for the Welfare of the Disabled.

১১১. VSC এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : VSC = Victim Support Centre.

১১২. শিশুকল্যাণের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : সমাজস্থ সকল শিশুর আর্থসামাজিক ও মনো-দৈহিক কল্যাণে নিয়োজিত কার্যক্রমের সমষ্টিকে শিশুকল্যাণ বলে।

১১৩. শিশুকল্যাণের যে কোন ১টি বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর : শিশুকল্যাণের ১টি বৈশিষ্ট্য হলো শিশুকে সকল ধরনের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা প্রদান।

১১৪. শিশুকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : শিশুকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর সকল দিকের উন্নয়ন সাধন করা।

১১৫. শিশুদের ১টি মৌলিক চাহিদা লিখ।

উত্তর : শিশুদের ২টি মৌলিক চাহিদা হলো শিশুর সকল দিকের উন্নয়ন সাধন করা।

১১৬. শিশুকল্যাণের ক্ষেত্রে ১টি সীমাবদ্ধতা লিখ।

উত্তর : শিশুকল্যাণ কর্মসূচি বেশিরভাগই শহরকেন্দ্রিক।

১১৭. বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১৮. বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদের মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর : বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদের মূল লক্ষ্য এদেশের শিশুদের কল্যাণ করা।

১১৯. বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২টি সংগঠনের নাম লিখ?

উত্তর : বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২টি সংগঠনের নাম (i) ফুলকুড়ি আসর, (ii) চাঁদের হাট।

১২০. প্রবীণ কারা?

উত্তর : ৬০ বছর থেকে জীবনাবসান সময়কে প্রবীণ বলে।

১২১. মানুষের জীবনে কয়টি স্তর আছে এবং প্রবীণ কাল কোন স্তরে?

উত্তর : মানুষের জীবনে ১টি স্তর আছে এবং প্রবীণ কাল বলা হয় অন্তিমকালকে।

১২২. বার্ধক্যের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ৬০ বছর থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত পর্যায়কে বার্ধক্য বলে।

১২৩. প্রবীণদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম কী?

উত্তর : প্রবীণদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংঘ হলো– বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

১২৪. বাধ্যর্কের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : প্রবীণরা দিন দিন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। চামড়া কুঁচকে যায়, মাথার চুল পেকে যায়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, দাঁত পড়ে যায়, এক সময় চলাফেরা করার শক্তি থাকে না।

১২৫. বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা কত?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ১ কোটির উপরে।

১২৬. বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত অংশ প্রবীণ?

উত্তর : বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬.৮৭% প্রবীণ (তথ্য-২০১০)।

১২৭. বাংলাদেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা কী কী?

উত্তর : বাংলাদেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যাসমূহ স্বাস্থ্যহীনতা, কর্মবিমুখতা, নিরাপত্তাহীনতা, যাতায়াতের অসুবিধা, অর্থসংকট, দৈহিক আকর্ষণহীনতা প্রভৃতি।

১২৮. বাংলাদেশে প্রবীণ সমস্যার কারণ কী?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রবীণ সমস্যার কারণ– রোগব্যাধি, অর্থসংকট, ভিক্ষাবৃত্তি, নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক ও পারিবারিক বঞ্চনা, মৃত্যুভয় প্রভৃতি।

১২৯. বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার প্রভাব লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার প্রভাব একাকিত্ব জীবনযাপন, সেবাযত্ন থেকে বঞ্চিত, দরিদ্র্যতা, প্রবীণদের পরিবারে ঠাঁই না হলে শিশুরা আদরযত্ন থেকে বঞ্চিত হয়, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি।

১৩০. ২০২৫ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ক প্রবীণ থাকবে?

উত্তর : ২০২৫ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ১১ ভাগ প্রবীণ থাকবে।

১৩১. বাংলাদেশে প্রবীণ সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারি

উত্তর : সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্যসে বয়স্কভাতা বৃদ্ধি, প্রবীণ পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি।

১৩২. আমাদের দেশে প্রবীণদের কল্যাণে সরকারি কর্মসূ

উত্তর : বয়স্কভাতা কর্মসূচি, শান্তিনিবাস স্থাপন, প্রবীণ কমিটি গঠন, অবসর ভাতা, কল্যাণ তহবিল প্র

১৩৩. প্রবীণ কল্যাণে কাজ করছে এমন কয়েকটি সে সংস্থার নাম লিখ।

উত্তর : বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ স বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কল্যাণ সমিতি, সেনাকল্যাণ সংস্থা, হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

১৩৪. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার একটি সংজ্ঞা লিখ।

উত্তর : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা অলাভজনক বেসরকারি সংস্থাকে বুঝায়, যা জন স্বতঃস্ফূর্ত ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় সেবা প্রদানের প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে কয়ভাগে ভা যায় ও কী কী?

উত্তর : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে ৪ ভাগে করা যায়। যথা :

(i) সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী, (ii) জাতীয় সমাজকল্যাণ স (iii) বিদেশি সাহায্যপুষ্ট সমাজকল্যাণ সংস্থা, (iv) জাতিক বিদেশি সংস্থা।

১৩৬. সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণের মধ্যে ১টি পা দেখাও।

উত্তর : সরকারি সমাজকল্যাণের মূল উদ্যোক্তা স নিজে। অন্যদিকে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা উদ্যোক্তা জনদরদী ব্যক্তি।

১৩৭. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার যে কোন এ সীমাবদ্ধতা লিখ।

উত্তর : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার এ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কহীনতা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অ সমস্যা।

১৩৮. কখন বাংলাদেশে প্রথম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে

উত্তর : উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৩৯. বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত এনজিও এর সংখ্যা কত?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত এনজিও সংখ্যা প্রায় ৮৫০টি।

১৪০. এতিমখানার বর্তমান নাম কী?
উত্তর : শিশুসদন।

১৪১. জাতীয় প্রবীণ নীতি কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ২০১৩ সালে।

১৪২. কখন বাংলাদেশে প্রথম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে?
উত্তর : উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে প্রথম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৪৩. সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণের মধ্যে ১টি পার্থক্য দেখাও।
উত্তর : সরকারি সমাজকল্যাণের মূল উদ্যোক্তা সরকার নিজে। অন্যদিকে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার মূল উদ্যোক্তা জনদরদী ব্যক্তি।

১৪৪. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : অধ্যক্ষ ড. এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ।

১৪৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার যে কোন একটি সীমাবদ্ধতা লিখ।
উত্তর : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার একটি সীমাবদ্ধতা সম্পর্কহীনতা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম সমস্যা।

১৪৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
উত্তর : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
(i) সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী, (ii) জাতীয় সমাজকল্যাণ সংস্থা, (iii) বিদেশি সাহায্যপুষ্ট সমাজকল্যাণ সংস্থা, (iv) আন্তর্জাতিক বিদেশি সংস্থা।

১৪৭. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কত সালে গঠিত হয়?
উত্তর : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ১৯৫৬ সালে গঠিত হয়।

১৪৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন এমন ২ জন লেখকের নাম লিখ।
উত্তর : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন এমন ২ জন লেখকের নাম হলো : (i) রবার্ট এল. বার্কার, (ii) ড. আলী আকবর।

১৪৯. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ সম্পর্কে এককথায় লিখ।
উত্তর : প্রবীণ হিতৈষী সংঘ দেশের সকল প্রবীণদের কল্যাণে নিয়ুক্ত।

খ বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন।১। সমাজসেবা কাকে বলে?
অথবা, সমাজসেবা বলতে কী বুঝ?
অথবা, সমাজসেবা ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজসেবা হল সামাজিক উন্নয়ন এবং নীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি কল্যাণরাষ্ট্রই সমাজসেবার প্রতি সর্বোত্তম গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কেননা সমাজসেবা ছাড়া কোন সমাজের সার্বিক কল্যাণ কখনও নিশ্চিত করা যায় না। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। তখনকার সমাজে আর্তমানবতার সেবায় পরিচালিত যে কোন প্রকারের কর্মকাণ্ডকে সমাজসেবা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বর্তমান যুগেও সাধারণ জনগণ সমাজসেবা বলতে বুঝে থাকে দুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় গৃহীত কর্মকাণ্ড। আর এজন্যই আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজসেবাকে এতবেশি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

সমাজসেবা : ঐতিহ্যগত বা সনাতন ধ্যানধারণা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সমাজসেবা (Social Welfare) হল সমাজের সমস্যাগ্রস্ত, দুস্থ, এতিম ও অসহায় শ্রেণীর উন্নয়ন ও কল্যাণসাধনে গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। আধুনিক ধারণানুযায়ী সমাজসেবা হল মানবসম্পদের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণের জন্য সংগঠিত কর্মকাণ্ডের সমন্বিত রূপ। অবশ্য আধুনিককালে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমাজসেবাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সমাজসেবার কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

সমাজসেবাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (Social and Economic Commission of United Nations) মন্তব্য করেছেন, "Social service is an organised activity that aims at helping towards a mutual adjustment of individuals and their environment." অর্থাৎ, সমাজসেবা হল ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে গৃহীত ও সংঘটিত কার্যাবলির সমষ্টি।

সমাজকর্ম অভিধান বা **Social Work Dictionary** এর ৩৫৬ নং পৃষ্ঠায় সমাজসেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "Social services is the activities of social workers and others in promoting the health and well-being our people and in helping people become more self-sufficient preventing sependency: strengthening family relationships and restoring individuals, families, groups or communities to successful social functioning." অর্থাৎ, সমাজসেবা হল সমাজকর্মী এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত একটি সুসংগঠিত কার্যক্রম যা প্রধানত মানুষের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত। এসব কার্যক্রম মানুষকে অধিক স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে, পরনির্ভরশীলতা প্রতিরোধ করে, পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করে এবং ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সমষ্টির সদস্যদের সফলভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে সমাজসেবার সংজ্ঞায় সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমাজসেবা হল ঐসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগঠিত কার্যাবলি বা কার্যাবলির সমষ্টি যা যথাযথভাবে মানবসম্পদের সংরক্ষণ, রক্ষণ, প্রতিপালন ও উন্নয়নে নিয়োজিত। বর্তমানে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবেই সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন॥২॥ সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

অথবা, সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।
অথবা, কী কী লক্ষ্য ও উদ্দশ্য সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয় লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজসেবা হল সামাজিক উন্নয়ন এবং নীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি কল্যাণরাষ্ট্রই সমাজসেবার প্রতি সর্বোত্তম গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কেননা সমাজসেবা ছাড়া কোন সমাজের সার্বিক কল্যাণ কখনও নিশ্চিত করা যায় না। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। তখনকার সমাজে আর্তমানবতার সেবায় পরিচালিত যে কোন প্রকারের কর্মকাণ্ডকে সমাজসেবা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বর্তমান যুগেও সাধারণ জনগণ সমাজসেবা বলতে বুঝে থাকে দুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় গৃহীত কর্মকাণ্ড। আর এজন্যই আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজসেবাকে এতবেশি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজসেবা হচ্ছে সেসব কার্যাবলির সমষ্টি যা মানবসম্পদের উন্নয়ন, প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষকে সাহায্য করাই হল সমাজসেবার মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে সমাজসেবার উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরা হল :

১. মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ লাভে মানুষকে সহায়তা করা;
২. সমাজের জনগণের সন্তান ও পোষ্যদের সেবাযত্ন করার ব্যবস্থা করা;
৩. সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
৪. মানুষকে সমাজ এবং পরিবেশের উপযোগী করে তৈরি করা;
৫. সমাজের সম্পদ ও সমাজসেবা গ্রহীতাদের মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করা;
৬. মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক সবরকম কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করা;
৭. সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে নিশ্চিত করার জন্য সমাজের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে সমাজসেবার সংজ্ঞায় সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমাজসেবা হল ঐসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগঠিত কার্যাবলি বা কার্যাবলির সমষ্টি যা যথাযথভাবে মানবসম্পদের সংরক্ষণ, রক্ষণ, প্রতিপালন ও উন্নয়নে নিয়োজিত। বর্তমানে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবেই সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন॥৩॥ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য কী কী।

অথবা, সমাজসেবার মানদণ্ড উল্লেখ কর।
অথবা, সমাজসেবার বিষয়বস্তু লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজসেবা হল সামাজিক উন্নয়ন এবং নীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি কল্যাণ রাষ্ট্রই সমাজসেবার প্রতি সর্বোত্তম গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কেননা সমাজসেবা ছাড়া কোন সমাজের সার্বিক কল্যাণ কখনও নিশ্চিত করা যায় না। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো, তখনকার সমাজে অতি মানবতার সেবায় পরিচালিত যে কোন প্রকারের কর্মকাণ্ডকে সমাজসেবা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বর্তমান যুগেও সাধারণ জনগণ সমাজসেবা বলতে বুঝায় দুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় গৃহীত কর্মকাণ্ড। আর এজন্যই আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজসেবাকে এতবেশি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য : সমাজসেবার প্রামাণ্য সংজ্ঞাগুলোকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে সমাজসেবার কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে সমাজসেবার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল :

১. বর্তমানে সমাজসেবা একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত সেবা কর্মসূচি।
২. সমাজসেবা হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে গৃহীত সেবামূলক কার্যক্রম।
৩. আধুনিক সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যক্তি এবং পরিবেশের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।
৪. সমাজসেবা কার্যক্রম সরকারি এবং বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।
৫. আধুনিক সমাজসেবার মূল লক্ষ্য হল মানবসম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং প্রতিপালনে সহায়তা করা।
৬. আধুনিক সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য হল প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।
৭. আধুনিক সমাজসেবা কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন এবং বাসস্থানের মাধ্যমে সমাজে সুখী এবং রক্ষিত জীবন আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়।

৮. বর্তমানে সমাজসেবার সাথে শিশুকল্যাণসহ মানবকল্যাণের সব কার্যক্রম সম্পৃক্ত।

৯. আধুনিক সমাজসেবা কার্যক্রম সংশোধনমূলক কর্মসূচিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে, যা এটার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

১০. বর্তমানে আধুনিক সমাজসেবা নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও চিত্তবিনোদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় য়, সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবা উভয়ের লক্ষ্যই হল সমাজের ল্যাণসাধন করা। তাই এদের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান য়েছে। তথাপি সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবার মাঝে কতিপয় সুস্পষ্ট পার্থক্যের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষকে সহায়তা করা আধুনিক সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবার মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন।৪। গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বুঝ?

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবার কাকে বলে।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবার ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। এদেশের সমাজব্যবস্থা গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০% লোক এখনও গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে। সুতরাং গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন সাধন ছাড়া দেশের উন্নয়ন কামনা করা আর বোকার রাজ্যে বসবাস করা একই কথা। বাংলাদেশের গ্রাম অসংখ্য সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, উচ্চ জন্মহার ইত্যাদি হাজারও সমস্যা এদেশের গ্রাম্য জীবনকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে আছে। আর তাই এসব সমস্যার সমাধান করে গ্রামের আপামর জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। গ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

গ্রামীণ সমাজসেবা : গ্রামীণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যেসব সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাই গ্রামীণ সমাজসেবা। সাধারণভাবে গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে বুঝায় গ্রাম অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে গৃহীত একটি সমন্বিত বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রকাশিত 'Social Services in Bangladesh' নামক গ্রন্থে Rural Social Service কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "গ্রামীণ সমাজসেবা হল বহুমুখী এবং সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ সকল শ্রেণীর জনগণের সুষম এবং সার্বিক কল্যাণসাধন ও মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন করা যায়।

গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞায় পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের দ্বারা গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম্য সমস্যা সমাধানের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামীণ সমাজসেবা। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত পশ্চাৎপদ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত সমাজসেবা কার্যক্রম হল গ্রামীণ সমাজসেবা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। গ্রামের অবহেলিত অধিকারবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা এতদিন সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হতো, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর ও সম্পদশালী জাতি গঠনে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন।৫। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশের গ্রাম অসংখ্য সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, উচ্চ জন্মহার ইত্যাদি হাজারও সমস্যা এদেশের গ্রাম্য জীবনকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে আছে। আর এসব সমস্যার সমাধান করে গ্রামের আপামর জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। গ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

গ্রামীণ সমাজসেবার লক্ষ্য :

১. বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় ভূমিহীন কৃষক, পশ্চাৎপদ নারীসমাজ, বেকার যুবক শ্রেণীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুষম এবং সুশৃঙ্খল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২. গ্রামের ভূমিহীন দুস্থ, অসহায় এবং কর্মহীনদের শহরমুখী প্রবণতা রোধকল্পে গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গ্রামীণ সংগঠন গঠন করা এবং গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪. দেশের জনকল্যাণ বিভাগগুলোর সহযোগিতায় কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশের ব্যাপক বেকারত্ব হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

৫. গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক জ্ঞান এবং ধ্যানধারণা গ্রহণে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করা।

৬. গ্রামীণ ভবঘুরে এবং উশৃঙ্খল যুবকদের প্রেরণা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে গ্রাম সংস্কারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা।

৭. গ্রামে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো।

৮. নির্ভরশীল মানসিকতা পরিবর্তন করে স্বনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা।

৯. গ্রামীণ সমাজে সুস্থ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. সমাজের শারীরিক, পঙ্গু এবং অক্ষমদের জন্য কল্যাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

১২. পেশা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় গঠনের মাধ্যমে অকৃষি ভিত্তিক আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

১৩. গ্রাম্য এলাকায় আত্মবিশ্বাস এবং মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশের জাতীয় উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।

উপসংহার : উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সময় পরিক্রমায় পরবর্তীতে গ্রামীণ সমাজসেবার লক্ষ্যে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর গ্রামীণ সমাজসেবা সুনির্দিষ্ট পাঁচটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নির্ধারিত করেছেন।

প্রশ্ন॥৬॥ শহর সমাজসেবা বলতে কী বুঝ?

অথবা, শহর সমাজসেবা কাকে বলে?

উত্তর॥ বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণ বাস্তবায়নের সূচনা হয় ১৯৫৩ সালের জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশের আলোকে। যাত্রাকালে প্রকল্প ছিল শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক সমাজকল্যাণের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে Dhaka Project নামে শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প (Urban Community Development Project) গ্রহণের মাধ্যমে। পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত এ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৫৭-৫৮ সালের ঢাকার গোপীবাগ, লালবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরও তিনটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং ১৯৫৯-৬০ সালে দেশের ১২টি বৃহত্তর জেলায় ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এসব প্রকল্পের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৯৮১ সালে এ প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০টিতে। ১৯৮২ সালে দেশের প্রতিটি পৌরসভাকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। ১৯৮২ সালে এরকম প্রকল্পের সংখ্যা কমিয়ে ৩৯টি করা হয়। ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাস্তবায়িত শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩টিতে। ২০০২ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যানুসারে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৩৪টি জেলায় ৫০টি শহর সমাজসেবা ইউনিট চালু করা হয়।

শহর সমাজসেবা : শহর সমাজসেবা হল আধুনিক সমাজকর্মের জনসমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিনির্ভর একটি কার্যক্রম। শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের বিভিন্নমুখী সমস্যা যেমন- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, চরম দুর্দশাগ্রস্ত দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, জনসংখ্যাধিক্য, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, অপরাধ এবং কিশোর অপরাধ প্রবণতা। ভিক্ষাবৃত্তি, পারস্পরিক সহানুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সমাধানের জন্য প্রয়োজনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করাই হল শহর সমাজসেবা কার্যক্রম।

শহর সমাজসেবা শহরবাসী এবং সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত এমন একটি সমন্বিত কার্যক্রম, যার মাধ্যমে শহরবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শহর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্বাবলম্বন নীতির উপর এটা পরিচালিত হয়। পৌর সমাজসেবা একটি বহুমুখী শহর উন্নয়ন প্রকল্প, যার মূল উদ্দেশ্য শহর এলাকার সমাঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল শহর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র এবং অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বস্তি এলাকায় যেসব স্বল্প আয়ের লোকজন বসবাস করে তাদের চিহ্নিত এবং সংগঠিত করে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন করে তোলা এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে আর্থসামাজিক কার্যক্রম ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্থানীয়ভাবে অর্থোপার্জনে সহায়তা দান করা। শহর সমাজসেবা মূলত একটি বহুমুখী প্রকল্প যার উদ্দেশ্য শহর এলাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা। শহর এলাকায় সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন॥৭॥ শিশুকল্যাণ কাকে বলে?

অথবা, শিশুকল্যাণ বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। সুতরাং শিশুদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের উপরই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নির্ভর করে। তাই দেশ এবং জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই শিশুকল্যাণ অপরিহার্য। শিশুর সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ সহ সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শিশুকল্যাণের আওতাভুক্ত।

শিশুকল্যাণ : সাধারণ অর্থে শিশুর কল্যাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি শিশুকল্যাণ নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশুকল্যাণ প্রত্যয়ই অতীতের তুলনায় ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ব্যাপক অর্থে শিশুকল্যাণ বলতে এসব কর্মসূচিকেই বুঝায় যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধিসাধনে নিয়োজিত এবং এটা জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

...প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান তাদের ...দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশুকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ...র্বজনগ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

...শিশুকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে **Md. Ali** ...ar তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে ...ন, "Child welfare refers to care and protection ...owed on the child before and after birth, during ...ncy and from pre-school age to adolesence."

...বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী **W. A. Friedlander** তাঁর ...oduction to social welfare' নামক গ্রন্থে শিশুকল্যাণকে ...ায়িত করেছেন এভাবে, "Child welfare also ...porates the social, economic and health activities ...public and private welfare agencies which that ...re and protect the well-being of all childen in their ...sical, intellectual and emotional development."

...এলিজাবেথ ডব্লিউ ডিউএল এর মতে, "শিশুকল্যাণ বলতে ...ক অর্থে সমাজের সদস্য হিসেবে সকল শিশুর ...সাধনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও তাঁর ...বুঝায়। এ কার্যাবলির উদ্দেশ্য প্রথমত, শিশুর পরিবারের ...র্থ ও সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজস্ব ও পারিবারিক স্বার্থ সংরক্ষণ ..., যাতে শিশুর বাল্যে ও কৈশোরে পুষ্টিসাধন হতে পারে। ...ীয়ত, শিশুর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের ...শিশুর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।"

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় পরিশেষে বলা যায় ...শিশুকল্যাণ জন্মের পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং শিশুসহ ...বারের সকল সদস্য, পারিবারিক পরিবেশ বিদ্যালয়ের ...বেশ প্রভৃতি এর আওতায় আসে। শিশুকল্যাণের প্রয়োজনীয় ...ক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক ...রে গড়ে তোলা।

...শ্ন।১৮। সংশোধনমূলক পদ্ধতি বলতে কি বুঝ?

...অথবা, সংশোধনমূলক পদ্ধতি কাকে বলে?

...অথবা, সংশোধনমূলক পদ্ধতি কী?

উত্তর। ভূমিকা : পৃথিবীতে কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ ...র না। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মাঝে কোন পাপ থাকে না। তার ...পাশের পরিবেশ, আচার আচরণ, রীতিনীতি তাকে ধীরে ধীরে ...রাধী করে তোলে। আবার কখনও কখনও কোন বিশেষ ...স্থার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি অপরাধ করতে বাধ্য হয়। যদিও ...ক অপরাধ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, মানুষ অপরাধ করার ...ণতা দীনগতভাবে পেয়ে থাকে বা মানুষের বিভিন্ন প্রকার ...রিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার অপরাধের জন্য দায়ী কিন্তু সে ...মত আজ উপেক্ষিত। তাই আজ অপরাধীকে সরাসরি শাস্তি ...নের পরিবর্তে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য সংশোধন ...স্থার কথা বলা হয়।

সংশোধনমূলক পদ্ধতি : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে কারাগারে ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন সংশোধনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, এ শাশ্বত বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপরাধ সংশোধন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। যেসব ব্যবস্থা ও কার্যাবলির মাধ্যমে অপরাধীর আচার আচরণ, ব্যক্তিত্ব, অপরাধ প্রবণতা এবং চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয় সেসব কার্যাবলিকেই সংশোধনমূলক পদ্ধতি বলা হয়। বস্তুত কোন শাস্তিই অপরাধীকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। আর সে কারণেই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি। একথা না বললেই নয় যে অপরাধ প্রবণতা এক ধরনের মানবীয় আচরণ এবং অপরাধী ব্যক্তির চারিত্রিক বা ব্যবহারিক উন্নতি না ঘটলে তার মধ্যের অপরাধ প্রবণতা কোন শাস্তি দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব নয়। আর তাই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীকে ঘৃণা না করে অপরাধকে ঘৃণা করার নীতি গৃহীত হয় এবং অপরাধী যে কারণে অপরাধে লিপ্ত হয় সে কারণের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে অপরাধীর সংশোধনের জন্য বহু ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

অপরাধীর সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে প্রোবেশন ও প্যারোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয় পদ্ধতিতে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন এবং সমাজ পুনর্বাসনের প্রয়াস রয়েছে।

উপসংহার : সমালোচনা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে আধুনিক যুগে প্রোবেশন ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এ ব্যবস্থায় শাস্তি মওকুফ করা হয় না বরং স্থগিত থাকে। তাছাড়া অপরাধীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেওয়া হলেও সে থাকে বিশেষ শর্তাধীন এবং যে কোন সময় তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে।

প্রশ্ন।১৯। প্যারোল ব্যবস্থার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, প্যারোল ব্যবস্থার উদ্ভব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, প্যারোল ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : পৃথিবীতে কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মাঝে কোন পাপ থাকে না। তার চারপাশের পরিবেশ, আচার আচরণ, রীতিনীতি তাকে ধীরে ধীরে অপরাধী করে তোলে। আবার কখনও কখনও কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি অপরাধ করতে বাধ্য হয়। যদিও অনেক অপরাধ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, মানুষ অপরাধ করার প্রবণতা দীনগতভাবে পেয়ে থাকে বা মানুষের বিভিন্ন প্রকার শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার অপরাধের জন্য দায়ী কিন্তু সে মতামত আজ উপেক্ষিত। তাই আজ অপরাধীকে সরাসরি শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য সংশোধন ব্যবস্থার কথা বলা হয়।

প্যারোল ব্যবস্থা উদ্ভবের ইতিহাস : শাস্তির একটি অন্যতম প্রকরণ হিসেবে Transpartation বা নির্বাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং তার অনিবার্য অসন্তোষজনক ফলশ্রুতিতে ব্রিটেনে প্যারোলের উদ্ভব ঘটে। ব্রিটেনে নির্বাসন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোর ফলে কারাগারগুলো অপরাধীতে জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কারাগারে অপরাধীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় না 'Ticket on Leave' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু এ পদ্ধতি তেমন সফল হয় নি কারণ সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ না দিয়েই অপরাধীকে শুধুমাত্র সাময়িককালে আচরণ বিচারে কারাগার ত্যাগ করার অনুমতিপত্র দেওয়া হতো। ফলস্বরূপ অপরাধীরা আরও বেশি অপরাধে লিপ্ত হতে থাকে এবং বিপজ্জনক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমাজ জীবন আরও বেশি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য ব্রিটেনে ১৮২০ সালে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন ও পুনর্বাসনমূলক এক আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় যার নাম প্যারোল। আমেরিকার কারাগারগুলোতে অপরাধীর সংশোধনের একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যেখানে অপরাধীদের কৃত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বা অনুতপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষ সংশোধনমূলক শাস্তিঘরের ব্যবস্থা রাখা হতো। ১৮৭০ সালে কারাগার ব্যবস্থায় সংস্কার আনয়নমূলক আন্দোলন গড়ে উঠার আগ পর্যন্ত উক্ত পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয় নি। কতিপয় আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী কারাগারের বিশৃঙ্খল শোচনীয় অবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে প্যারোল ব্যবস্থা উদ্ভবের জন্য তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিউইয়র্কে Elmirra Reharmatory প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম প্যারোল ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। আমেরিকার প্যারোল ব্যবস্থা উৎপত্তির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। আমেরিকায় বসবাসকারীদের পরীক্ষামূলকভাবে তাদের নিয়োগকর্তা ব্যক্তির বা কোম্পানির কাছে ফেরত পাঠানো হতো এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাদের চলাফেরার উপর দৃষ্টি রাখা হতো। এ ব্যবস্থার পাশাপাশি আমেরিকান রাজ্যসমূহে সরকারিভাবে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, যাদের কাজ ছিল অপরাধীদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকাতে অনেক Prison Aid Society গড়ে ওঠে। এসব Societyগুলো আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে প্যারোল ব্যবস্থার প্রবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

উপসংহার : সমালোচনা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক যুগে প্যারোল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যবস্থায় অপরাধীকে শাস্তিও ভোগ করতে হয় আবার সংশোধনেরও সুযোগ লাভ করে। মূলত প্যারোল ব্যবস্থায় শাস্তি এবং সংশোধনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। একারণেই এ ব্যবস্থা সমাজ ও অপরাধী উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন॥১০॥ চিকিৎসা সমাজকর্ম কাকে বলে?

[জা. বি.

অথবা, চিকিৎসা সমাজকর্ম বলতে কী বুঝ?

অথবা, চিকিৎসা সমাজকর্ম সংজ্ঞা দাও?

অথবা, চিকিৎসা সমাজকর্ম কী?

অথবা, চিকিৎসা সমাজকর্ম ব্যাখ্যা কর?

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক সমাজকর্মের একটি ... শাখার নাম হল চিকিৎসা সমাজকর্ম (Hospital ... Work)। শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাই হল স্বাস্থ্য। ... অর্থে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সমাজকর্মের ... কর্মসূচি পরিচালিত তাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়। ... সমাজকর্ম মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতির উপর ... এমন একটি কার্যক্রম, যার মাধ্যমে পীড়িত মানুষের জীবনে ... কল্যাণসাধন করা হয়।

চিকিৎসা সমাজকর্ম : সাধারণ অর্থে সমাজকর্মের ... কর্মসূচি চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী উপাদানসমূহ দূরীকরণের ... মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হতে সার্বিকভাবে সহায়তা ... তাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলে। ব্যাপক অর্থে চিকিৎসা সমাজকর্ম ... হল আধুনিক সমাজকর্মের সে শাখা, যা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যে ... সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ ... চিকিৎসারত রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সব বাধা দূর করে ... আওতাধীন স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা কার্যক্রমের পূর্ণতম সদ্ব্যবহারে ... সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিক কার্যকর ... করে তোলা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে চিকিৎসা ... সমাজকর্মের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ... কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বি... মনীষী **এলিজাবেথ** এবং **কারগিউসন** বলেছেন, "চিকিৎসা ... সমাজকর্ম হল স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ... করার জন্য সমাজকর্মের মৌলনীতি ও কৌশলের আশ্রয়ে ... সেবাকর্ম।"

'Social. Work Year Boor' নামক গ্রন্থে চিকিৎসা ... সমাজকর্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "স্বা... চিকিৎসাক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োগই হচ্ছে চিকিৎসা ... সমাজকর্ম।"

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী **R. A. Skid...** **& M. G. Thakeray** চিকিৎসা সমাজকর্মকে সংজ্ঞায়িত ... করেছেন এভাবে, "Medical Social work is ... application of social work knowledge, ... attitudes and values to the field of health ... medicine." অর্থাৎ, চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ... ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের ... প্রয়োগ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল চিকিৎসা সমাজকর্ম। চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, কৌশল, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে রোগীকে তার আওতাধীন চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার পূর্ণতম সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্ন।১১। **বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজকর্মের উপযোগিতা আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজকর্মের তাৎপর্য আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রভাব আলোচনা কর।**

উত্তর। **ভূমিকা :** আধুনিক সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম হল চিকিৎসা সমাজকর্ম (Hospital Social Work)। শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাই হল স্বাস্থ্য। সাধারণ অর্থে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণের যে কর্মসূচি পরিচালিত তাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়। চিকিৎসা সমাজকর্ম মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল এমন একটি কার্যক্রম, যার মাধ্যমে পীড়িত মানুষের জীবনে সামগ্রিক কল্যাণসাধন করা হয়।

বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ঘনবসতিপূর্ণ অধিক জনসংখ্যার দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৪ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪০ এবং ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩৪ জন। তাছাড়া বাংলাদেশ নানারকম আর্থসামাজিক সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশ। এরকম পরিস্থিতিতে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কোন রোগীর চিকিৎসা গ্রহণকালে এবং চিকিৎসার পর আরও বহু প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রয়োজন হতে পারে, যেমন– ঔষধ, রক্ত, পথ্য, চশমা, ক্রাচ, হুইল চেয়ার প্রভৃতি। এদেশের দরিদ্র এবং অসহায় রোগীদের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগী কল্যাণ সমিতি থেকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

৩. চিকিৎসা সমাজকর্ম হাসপাতালের নানারকম বিষয় যেমন– সভা-সমিতি পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, নথিপত্র সংরক্ষণ, প্রচারণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালের (ফার্মেসিসহ) শয্যাপ্রতি ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমানে লোকসংখ্যা ৪,০৩৬ জন এবং প্রতি একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা ৩৯৭৭ জন। ২০০৩ সালের রিপোর্ট অনুসারে মানুষের গড় আয়ু ৬১ বছর। প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ৫১ জন। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে রোগীদের কল্যাণে চিকিৎসা সমাজকর্মের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা জোর দিয়েই বলা যায়।

৫. বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর অধিকাংশ রোগীই পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে হাসপাতাল, চিকিৎসা সমাজকর্মী, ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে রোগীর সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৬. প্রবাদ আছে যে, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। কাজেই রোগ প্রতিকারের পর রোগের পুনরাক্রমণ রোধ এবং রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা, জনমত সৃষ্টি, প্রচারণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. সাধারণত কোন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসা গ্রহণে রোগীকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে অজ্ঞ। তারা চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতে হাসপাতাল সমাজকর্মের মাধ্যমে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

৮. হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের কেবলমাত্র শারীরিক চিকিৎসা নয়, সাথে সাথে মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক চিকিৎসা প্রদানেরও প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

৯. রোগী এবং রোগীর ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন অনুধ্যান, রোগ নির্ণয় এবং সমাধানের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০. রোগীর রোগ থেকে নিরাময় লাভের পর কিছু সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন– গৃহ পরিদর্শন, অনুসরণ, মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি, যা কেবল চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমেই সফলভাবে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব দিনদিন বেড়েই চলেছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্ম কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি। এদেশের দরিদ্র মানুষের রোগ প্রতিরোধ এবং উন্নয়নে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ জাতি গঠনে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন।১২। প্রতিবন্ধী বলতে কী বুঝ? প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিভাগ দেখাও।

অথবা, প্রতিবন্ধী কারা? প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিভাগ দেখাও।

অথবা, প্রতিবন্ধী সংজ্ঞা দাও? প্রতিবন্ধীদের প্রকারভেদ দেখাও।

অথবা, প্রতিবন্ধী কাকে বলে? প্রতিবন্ধীদের প্রকৃতি দেখাও।

অথবা, প্রতিবন্ধী কী? প্রতিবন্ধীদের ধারণা দেখাও।

উত্তর। ভূমিকা : প্রতিবন্ধী বলতে সাধারণত দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এসব ব্যক্তিরা তাদের পঙ্গুত্বের কারণে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। পঙ্গুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ আজ তাদেরকে প্রতিবন্ধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রতিবন্ধীদেরও মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং স্বাভাবিক সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। আর তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি।

প্রতিবন্ধী : সাধারণভাবে যারা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক কারণে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না তারাই প্রতিবন্ধী। সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী বলতে কেবল দৈহিক বিকলাঙ্গ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম লোকদেরই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগে এ ধারণার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবন্ধী বলতে ঐসব লোকদের বুঝানো হয়ে থাকে, যারা শারীরিক, মানসিক অথবা আর্থসামাজিক অক্ষমতা বা অসুবিধার কারণে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পরিচালনা করতে পারে না।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে সর্বজনগ্রাহ্য কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী **অশোক শর্মা** প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "কোন মানুষ যখন তার শারীরিক কাঠামো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাকশক্তি এবং মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে তার জীবনযাপনের স্বাভাবিক কর্মশীলতা সম্পন্ন করতে একজন স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বাধাগ্রস্ত হয় তখন ঐ ব্যক্তিকেই প্রতিবন্ধী বলা হয়।"

ইউনিসেফের সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হল, "Disability is the difficult in seeing, speaking, hearing, writing, walking, conceptualising or in any function within the range considered normal for a human being." অর্থাৎ, পঙ্গুত্ব বলতে ঐসব অসুবিধাকে বুঝায় যেগুলো মানুষের দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, লিখনশক্তি, হাঁটা, বোধশক্তি অথবা অন্যকোন কার্যক্রম ব্যাহত করার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অবশেষে প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় যে, শারীরিক অপূর্ণতা, মানসিক অসুস্থতা এবং প্রতিকূল আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নির্ভরশীলতা এবং অন্যের করুণা প্রার্থী হয়ে জীবননির্বাহ করে এবং সমাজের নিকট বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয় তাদেরকেই বলা হয় প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধীর শ্রেণীবিভাগ : প্রতিবন্ধীত্বের কারণ ও প্রকারভেদ আলোচনা করলে প্রতিবন্ধী লোকদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে প্রতিবন্ধীদের এ শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. দৈহিক প্রতিবন্ধী : যাদের দেহে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই অথবা থাকলেও তা কাজের অনুপযোগী ঐসব ব্যক্তি এবং দৈহিকভাবে দুর্বল অথবা ঐ ব্যক্তি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– বোবা, অন্ধ, বধির, ল্যাংড়া, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং চরম পুষ্টিহীন ইত্যাদি।

২. মানসিক প্রতিবন্ধী : অস্বাভাবিক এবং ভারসাম্যহীন মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম তারাই মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। যেমন– পাগল, ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন, জড় ব্যক্তি, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি।

৩. সামাজিক প্রতিবন্ধী : যেসব লোক প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে অস্বাভাবিক, অরক্ষিত, লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়, তারাই সামাজিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। যেমন– পতিতা, জেলফেরা কয়েদি, অবৈধ সন্তান, লাঞ্ছিতা নারী, অসহায় এতিম, পরিত্যক্ত শিশু প্রভৃতি।

৪. অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধী : যারা বিপর্যয়মূলক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আর্থিক অক্ষমতা এবং অসুবিধার জন্য সমাজে প্রত্যাশিত, রক্ষিত ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম, তারাই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধী। যেমন– নিঃস্ব, ভিক্ষুক, ছিন্নমূল, ভবঘুরে ইত্যাদি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের এ বিশাল প্রতিবন্ধী জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা, প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ করা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজবাসীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন ইত্যাদির জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং দেখা যায়, প্রতিবন্ধীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রমের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন॥১৩॥ BRDB-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

অথবা, BRDB-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি লিখ?

অথবা, কী কী লক্ষ্য উদ্দেশ্য BRDB কার্যক্রম পরিচালিত হয়?

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Development Board) পল্লি এলাকার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহত্তম সংস্থা। পল্লি এলাকার জনগণকে সমবায় এবং আনুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করা এর মূল লক্ষ্য। বিত্তহীন জনগোষ্ঠী, পল্লির পেশাজীবী শ্রেণী, মহিলা ও কৃষকদের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর উদ্দেশ্য : পল্লিউন্নয়নের মাধ্যমে বিশেষ করে পল্লির দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করে পল্লির জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ডের অন্যতম লক্ষ্য। এর অপরাপর উদ্দেশ্যসমূহ হল নিম্নরূপ :

১. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড প্রসারের মাধ্যমে লাভজনক কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করা।
২. প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. উৎপাদনশীল কার্যক্রমের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের উৎসসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ।
৪. পল্লি এলাকায় অফিস, বাজার, গুদাম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারখানা প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।
৫. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশীদারিত্বের প্রসার ঘটানো।
৬. সহায়ক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ডের মূলনীতি নিম্নে উল্লিখিত গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান করা। যথা :

ক. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ দরিদ্র্য নারী ও পুরুষ,
খ. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং
গ. গ্রামীণ গৃহকর্মী (প্রধানত কৃষি ও অকৃষিকাজে নিয়োজিত গরিব মহিলা)।

বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ :

i. সরেজমিন বিভাগ,
ii. দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প,
iii. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি,
iv. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণে পল্লিউন্নয়ন ও সমবায়ের ব্যবহার,
v. মহিলা বিষয়ক প্রকল্প,
vi. কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড তার কর্মসূচিগুলো যতটুকু সম্প্রসারিত করেছে তাতে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার সংখ্যা বেশি। কিন্তু BRDB এর অসংখ্য ব্যর্থতা সত্ত্বেও গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন॥১৪॥ বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড বলতে কি বুঝ?

অথবা, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড কাকে বলে?

অথবা, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ডের সংজ্ঞা দাও?

উত্তর॥ ভূমিকা : সমন্বিত পল্লিউন্নয়ন কর্মসূচির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'পল্লিউন্নয়ন বোর্ড'। গ্রামীণ জনসমষ্টির সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সমন্বিত পল্লিউন্নয়ন কর্মসূচি বলে কুমিল্লা উন্নয়ন একাডেমির গবেষণালব্ধ মডেলের উপর ভিত্তি করে এ কর্মসূচির উদ্ভব। একাডেমির দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লিউন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচিই ১৯৮২ সালে 'বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড' নামক জাতীয় সংস্থাতে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড গ্রামীণ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারি খাতের অন্যতম একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক চাষি, সুবিধাবঞ্চিত মহিলা এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে সমবায়, প্রাক সমবায় ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত করা BRDB এর প্রধান কর্মসূচি। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৬৬টি থানায় বিআরডিবি এর কর্মসূচি চালু রয়েছে। বোর্ড সম্প্রতি কৃষিখাতের পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়ন খাতে তার তৎপরতাকে সম্প্রসারণ করছে। বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) নিম্নোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান করে :

ক. ভূমিহীন কৃষিপ্রধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারী ও পুরুষ,
খ. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং
গ. গ্রামীণ গৃহবাসী (প্রধানত কৃষি ও অকৃষিকাজে নিয়োজিত গরিব মহিলা)।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড এর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এটি পল্লিউন্নয়নের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিআরডিবি এর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সরকারি সুদৃষ্টি এবং চাহিদা মোতাবেক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে এর কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করতে পারলে BRDB পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সার্থক ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন।১৫। পরিবার কল্যাণের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, পরিবার কল্যাণ কাকে বলে।

অথবা, পরিবার কল্যাণ কী?

উত্তর। ভূমিকা : পরিবার একটি মৌলিক সামাজিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। পরিবার রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ কতিপয় সদস্য বা ব্যক্তি নিয়ে সংগঠিত। প্রতিটি সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষই পরিবারের সদস্য। পরিবারেই মানুষের জন্ম, পরিবারেই লালনপালন, পরিবারেই প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবারের প্রভাবেই গড়ে উঠে মানুষের আদর্শ, মূল্যবোধ, সর্বোপরি ব্যক্তিত্ব। আর একারণেই পরিবার সমাজের মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অপরদিকে, কল্যাণ হচ্ছে মানুষের সুখকর একটি অবস্থা। কল্যাণ একটি আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল প্রত্যয়। সুতরাং পরিবার কল্যাণ হল পরিবারের সকল সদস্যদের সুখশান্তি নিশ্চিতের জন্য কাজ করা।

পরিবার কল্যাণ : সাধারণভাবে পরিবার কল্যাণ হল সেসব সমাজসেবামূলক কাজ যা পারিবারিক জীবনকে দৃঢ় করে এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাভাবিক অভিযোজনে সাহায্য করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে পরিবার কল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে পরিবার কল্যাণের সর্বজনগ্রাহ্য কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

পরিবার কল্যাণের সংজ্ঞায় 'Social Work Year Book (1960)' এ বলা হয়েছে, "ব্যাপক অর্থে পরিরার কল্যাণ হল পারিবারিক জীবনের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা এবং পারিবারিক সম্যকজনিত সমস্যায় সহায়তা করার জন্য সব ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি।"

The Committee of the Family Service Association of America এর বিবরণ অনুযায়ী, পরিবার কল্যাণ হল, "The aim of family welfare is the contribute to harmonious family inter-relationship to strengthen the positive values of family life and to promote healthy personality development and satisfactory social functioning of various members." অর্থাৎ, পরিবার কল্যাণের উদ্দেশ্য হল পারিবারিক জীবনে রক্ষিত মূল্যবোধসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য পরিবারের সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং সদস্যদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ও সন্তোষজনক সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা।

জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন পরিবার কল্যাণের আওতায় যেসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক. স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবারের অর্থনৈতিক মর্যাদা রক্ষা করা।

খ. পারিবারিক জীবনকে সংরক্ষণ এবং বাধাবিপত্তি হতে রক্ষা করা।

গ. অভাব এবং দুর্গত পরিস্থিতিতে পরিবারকে সাহায্য প্রদান এবং পুনর্বাসন করা।

ঘ. জীবিকানির্বাহ ছাড়া পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করা।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, পারিবারিক পর্যায়ে সুসম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলা এবং পরিবারের সদস্যদের সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সমান করে তোলার জন্য পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রমই হল পরিবার কল্যাণ। পরিবার কল্যাণ পারিবারিক পরিমণ্ডলে পরিচালিত সেবা কার্যক্রম হওয়ায় তা পরিবার সমাজকর্ম নামেও পরিচিত।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, মানবীয় কল্যাণ, সামাজিক প্রগতি এবং সুখ সমৃদ্ধকর জীবন লাভের প্রয়োজনে পরিবার প্রথার ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন। একইভাবে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গেও পরিবার কল্যাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবার পরিবার কল্যাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন।১৬। বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ কর্মপরিকল্পনাসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : পরিবার একটি মৌলিক সামাজিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। পরিবার রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ কতিপয় সদস্য বা ব্যক্তি নিয়ে সংগঠিত। প্রতিটি সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষই পরিবারের সদস্য। পরিবারেই মানুষের জন্ম, পরিবারেই লালনপালন, পরিবারেই প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবারের প্রভাবেই গড়ে উঠে মানুষের আদর্শ, মূল্যবোধ, সর্বোপরি ব্যক্তিত্ব। আর এ কারণেই পরিবার সমাজের মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম :

১. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম : পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিবার কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক থেকে পরিবার উপকৃত হয়। আর্থিক দিক থেকে এটি পরিবারকে মুক্তি দিতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সবার উপরে যেটা তা হল পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ রেখে সুন্দর পরিকল্পিত পরিবার গঠন করা সম্ভব। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাপক হারে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২. কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল : কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে চাকরিরত নারীদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক মহিলা চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে চাকরি করতে পারে না। এক্ষেত্রে চাকরি লাভকারী মহিলা হোস্টেলে থাকলে চাকরি তথা পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং পরিবারে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। আর এগুলো পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

৩. ভিক্ষুক, দুস্থ, অবযুরে এবং সামাজিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম : ভিক্ষুক, দুস্থ, অবযুরে এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী এরা সবাই কোন না কোন পরিবারের সদস্য। তাই এদের যথাযথ কল্যাণ নিশ্চিত করার উপরই যথার্থ পরিবার কল্যাণ নির্ভর করে। এসব ভিক্ষুক, দুস্থ, অবযুরে এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে তাদের পুনর্বাসিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, কর্মসংস্থান করে দেওয়া হয় এবং পর্যাপ্ত কাজের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. UCD এর আর্থসামাজিক কার্যক্রম : এ কর্মসূচির মাধ্যমে শহরে যেসব দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার রয়েছে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সেলাই, স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্যানিটেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। তাছাড়া মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলা হয়।

৫. RSS বা পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম : পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম হল গ্রামীণ সমাজসেবা, যার মাধ্যমে মহিলা এবং পুরুষদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়। সর্বোপরি গ্রামীণ জনগণের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যা পরিবার কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. গৃহায়ন কার্যক্রম : গৃহায়ন কার্যক্রম পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির একটি অংশ। গৃহায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে গৃহায়ন সুযোগ সরকারিভাবে প্রদান করা হয় এবং চাকরিজীবীদের সুযোগ সুবিধা এক্ষেত্রে বেশি।

৭. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম : এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যেক সরকারি এবং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। ফলে পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে থাকে, যা পরিবার কল্যাণকে নিশ্চিত করে।

৮. দিবাযত্ন কেন্দ্র : বাংলাদেশে সরকারিভাবে একটি দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং বেসরকারিভাবে কয়েকটি দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। চাকরিরত কর্মজীবী মহিলাদের সন্তান লালনপালনের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র কাজ করে থাকে। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, যা প্রকারান্তরে পরিবার কল্যাণকে ত্বরান্বিত করে।

৯. বৃত্তি এবং এককালীন অর্থ : বাংলাদেশে সরকার, ব্যাংক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্রছাত্রীদের মেধা এবং দরিদ্রতার উপর ভিত্তি করে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধার জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে, যার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পরিবার কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।

১০. বার্ধক্য ভাতা এবং দুঃস্থ বিধবা মহিলা ভাতা কার্যক্রম : বাংলাদেশে বিশাল সংখ্যক বার্ধক্য এবং দুঃস্থ মহিলাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা পরিবার কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই পরিবার কল্যাণ তথা বার্ধক্য ও দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বার্ধক্য এবং দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতাল : বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতাল রয়েছে। থানা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলো পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কিছু কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে যুব এবং শিশুদের জন্য 'ডে কেয়ার সেন্টার' কাজ করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবারের সকল সদস্যদের সুরক্ষায়, নিরাপত্তা বিধানের জন্য পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কাজ করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়ন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানদানসহ বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন॥১৭॥ যুবকল্যাণ কাকে বলে?

অথবা, যুবকল্যাণ বলতে কী বুঝ।
অথবা, যুবকল্যাণ কী?
অথবা, যুবকল্যাণের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, যুবকল্যাণের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধারণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়, যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যমান। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হল যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি।

যুবকল্যাণ : সাধারণভাবে যুবকল্যাণ বলতে যুবকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক তথা সার্বিক কল্যাণকে বুঝায়, যা তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে। অর্থাৎ যুবকল্যাণ এমন একটি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ যা যুবকদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভরশীল ও সৃজনশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এ কর্মসূচি তাদেরকে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য কাজের সাথে সাথে অবকাশকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের হতে পারে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে যুব কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হল :

Dr. Ali Akbar তাঁর, 'Elements of Social Welfare' গ্রন্থে বলেছেন, "By youth welfare we understand those governmental and voluntary youth services which are disigned to provide the youth, in their leisure time, with opportunities of various

kinds, contemporary to those of home, formal education and work to enable them to discover and develop their personal resources of body, mind and spirit and thus better equip themselves to live the life mature, creative and responsible members of the society."

ভারতীয় সমাজকর্ম জ্ঞানকোষে যুবকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়, "We may therefore say taht youth welfare swrvices are a broad spectrum of activities which either in education institutions or outside them gater to the mental, moral and physical needs of the young and so in areas which are not usually covered by formal schooling."

যুবক বলতে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট বয়স স্তরকে বুঝায়। কোন দেশে কোন বয়সসীমা যুবক হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সংশ্লিষ্ট দেশই নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে অনেক দেশেই ১৮–৩৫ বয়স স্তরকে যুবক বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যুবক বলতে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়স সীমার লোককে যুববয়সী হিসেবে সরকারিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের যুবক শ্রেণী অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত যা তাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ করে দিচ্ছে। অথচ একটি দেশের যুব শ্রেণীই হল সকল আশা ভরসার কেন্দ্র স্থল। তাই দেশ ও জাতির সামগ্রিক জল্যাণের কথা চিন্তা করে যুবকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ যুবকল্যাণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন।১৮। **বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যাগুলো আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশে যুবকদের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?**
অথবা, **বাংলাদেশে যুবকদের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।**
অথবা, **বাংলাদেশে যুবকদের দুর্বল দিক আলোচনা কর।**
অথবা, **বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যাগুলো উল্লেখ কর।**

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশের যুবসমাজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য ও অস্থিতিশীল সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায় আজ দিশেহারা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শের অভাবে যুবসমাজ স্বীয় ভূমিকা নির্ধারণে ব্যয় হয়ে নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তেমনি সৃষ্টি করছে অসংখ্য সমস্যার।

বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যা :

১. **বেকারত্ব :** আমাদের দেশের এক তৃতীয়াংশ যুবক বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। কথায় বলে শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। কর্মহীন যুব সম্প্রদায় তাই তাদের মূল্যবান সময় বিভিন্ন অসামাজিক কাজে ব্যয় করে। নেতিবাচক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদের ক্ষোভ।

২. **নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা :** ডায়গ্যানিসেস বলেছে[illegible] "প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিত হল সে দেশের শিক্ষিত যুবসমাজ"। এলিজা কুকের মতে, "যুবসমাজের সঠিক শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মজবুত ভিত্তি।" কিন্তু আমাদের যুবসমাজের ব্যাপক অংশ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বলে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ বা ভূমিকা আশা কর[illegible] মূল্যহীন।

৩. **মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ :** যুবসমাজ তাদের ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে পারে না। ফলে তাদের ক্ষোভ পু[illegible] অসন্তোষে রূপ নেয়।

৪. **হতাশা ও নৈরাশ্য :** হতাশা ও নৈরাশ্য জীবনযুদ্ধে ক্ষয়িষ্ণু মানুষকে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। গোটা সমাজের ন্যায় যুবকরাও নৈরাশ্য ও হতাশার আঘাতে মুহ্যমান। তাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও পর্যাপ্ত সুযোগ। ভালো চাকরি ও সুস্থ পরিবেশ চাওয়াপাওয়ার মধ্যে বিরাট গরমিল এ অনিশ্চয়তা স্বভাবতই তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

৫. **স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা :** বাংলাদেশের মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় না। ফলে অপুষ্টিজনিত কারণে যু[illegible] সম্প্রদায়ের শারীরিক ও মানসিক গঠন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীন মানুষ স্বভাবত শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে থাকে। ফলে এ অসুস্থতা তাদের কাজ কর্মে ও আচরণে প্রকাশ পায়।

৬. **নেতৃত্বের অভাব :** যুবকদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও যোগ্য নেতৃত্বের। এ ধরনের আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের বড়ই অভাব। ফলে লক্ষ্যহীন, দাঁড়হীন নৌকার মত অথবা নেতৃত্ব পেলেও আদর্শবর্জিত, অযোগ্য, নীতিহীন যা তাদের বিপদগামী হতে বাধ্য করছে।

৭. **বৈষম্য :** আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট। দেশের ৯০ ভাগ সম্পদ যার ১০ ভাগ লোক ভোগ করে। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। বলা যেতে পারে দেশের ৯০ ভাগ যুবকই এ ধরনের বৈষম্যের শিকার। ফলে সংগত কারণেই তাদের এ হয়ে উঠে বিদ্রোহী। প্রকারান্তরে যা যুব অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

৮. **আদর্শ শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব :** এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবা-মা এর পরেই শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতা রাজনৈতিক অস্থিতি, অস্থিরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা পালনে বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। এ ব্যর্থতাই সৃষ্টি করছে যুব বিশৃঙ্খলা।

৯. **রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার :** স্বাধীনতার উত্তরকালে যুবসমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করার প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যত রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আছে তার সবই রাজনৈতিক নেতারা তাদের দিয়ে করাচ্ছে। ফলে যুবকদের চরিত্র ও চেতনা কলুষিত হয়ে পড়ছে। চরিত্রের এ কলুষতাই তাদের অপরাধপ্রবণ করে তুলছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের যুবক শ্রেণী অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত যা তাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ করে দিচ্ছে। অথচ একটি দেশের যুব শ্রেণীই হল সকল আশা ভরসার কেন্দ্র স্থল। তাই দেশ ও জাতির সামগ্রিক জল্যাণের কথা চিন্তা করে যুবকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ যুবকল্যাণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন॥১৯॥ বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে যুবকদের বর্তমান সমস্যা নিরসনে তোমার মতামত পেশ কর।

অথবা, বাংলাদেশে যুবকদের বর্তমান সমস্যা নিরসনে তোমার সুপারিশমালা পেশ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে যুবকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এ কার্যক্রম গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত সীমিত ছিল। স্বাধীনতার পর যুবসমাজের কল্যাণের জন্য একদিকে যেমন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় অন্যদিকে, পুরাতন কার্যক্রমের উন্নতি ও সম্প্রসারণ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি :

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : যুব সম্প্রদায়ের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৯-৮০ সালে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। এর মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য মোট ৮২টি কেন্দ্র চালু আছে।

২. থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প : গ্রামীণ, দরিদ্র-দুস্থ যুবক-যুবতীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩২টি থানায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হল গ্রামীণ দরিদ্র যুবসমাজকে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান।

৩. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প : কর্মক্ষম বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে ১০টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক. গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস। হাঁসমুরগি পালন, গরু মোটাজাতাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ২৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ মাস। চিংড়ি চাষ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৪. যুবকল্যাণ তহবিল : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান কাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সরকারি সাহায্যে একটি যুবকল্যাণ তহবিল গঠিত হয়েছে। যুবকদের বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার প্রেক্ষিতে এ টাকার প্রাপ্ত আয় থেকে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়া এ তহবিল থেকে যুবকল্যাণ সংগঠনগুলোকে অনুদান দেওয়া হয়।

৫. বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প : এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫টি জেলায় কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিপি, রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রভৃতি বিষয়ে যুব পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ মাস। এখানে যুবকদের কারিগরি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ. দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। অফিস আদালতে দপ্তরি কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গ. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। টাইপ, ফটোকপি, কম্পিউটার প্রোগ্রামস্ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঘ. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। পোশাক তৈরি, সেলাই, বোতাম লাগানো প্রভৃতি বিষয়ে যুব মহিলা পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এসব কেন্দ্র থেকে।

ঙ. উল বুনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। উলের সোয়েটার, চাদর প্রভৃতি তৈরি ও বুনন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যুবকল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের মৌলিক সমস্যার সমাধান প্রতিটি দেশের জন্য অপরিহার্য। যুবক সম্প্রদায় দেশের প্রাণশক্তি। এ শক্তিকে টিকিয়ে রেখে কাজে লাগাতে হলে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

প্রশ্ন॥২০॥ নারীকল্যাণ কী?

অথবা, নারীকল্যাণ কাকে বলে?

অথবা, নারীকল্যাণের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বের সকল সমাজেই নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। নারীকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের দিক থেকে নারীকল্যাণ বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল সমাজেই উন্নয়নের জন্য নারীদের ভূমিকা এবং গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। আর সকল পরিবারেই নারীদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নারীকল্যাণ : নারীকল্যাণের সংজ্ঞায় সাধারণভাবে বলা যায়, নারীদের সার্বিক বিকাশ, উন্নয়ন, ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য যাবতীয় কর্ম প্রণালীই হল নারীকল্যাণ। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে নারীদের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য সকল সমস্যা সমাধানে কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি চালু ও প্রণয়ন করাকেই বলা হয় নারীকল্যাণ। নারীকল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **Dr. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "By women welfare we understand those socio-economic activities which are designed to solve the problems of women so that they may play their proper role in the family as well as in the society." অর্থাৎ, নারীকল্যাণ বলতে আমরা ঐসব আর্থসামাজিক পদক্ষেপকে বুঝি, যা একটি প্রক্রিয়ায় নারীদের সমস্যাবলি সমাধানের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার ও সামাজিক ভূমিকা পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সুতরাং উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে নারীকল্যাণের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, মানসিকসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে তাদের দৈহিক উন্নতি সাধন করে বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করাকেই বলা হয় নারীকল্যাণ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নারীকল্যাণের উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নে নারীদের সত্যিকারের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। কাজেই নারীকল্যাণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমাজকর্মী এবং অন্যান্য কর্মী যারা নারীকল্যাণ কর্মসূচির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত আছেন, তাদের আন্তরিকতার সাথে উক্ত নীতি ও উদ্দেশ্যগুলোকে তাদের কাজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা করা হলেই সত্যিকারভাবে নারীকল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন॥২১॥ পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।

[জা. বি.-২০১১]

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা কাকে বলে।

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা কী?

অথবা, পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত আদর্শ প্রক্রিয়া হলো পরিবার পরিকল্পনা। এ কার্যক্রম প্রবর্তনের পথিকৃৎ হচ্ছেন আমেরিকার মার্গারেট স্যাঙ্গার (Margaret Sangar)। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে অসরকারি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির সূচনা হয়। ১৯৬৫ সালের দিকে সরকারি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গৃহীত হয়। বর্তমানে সরকারি-অসরকারি পর্যায়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা সংজ্ঞা : পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবার গঠনের পরিকল্পিত কার্যক্রম। এটি পরিবারকেন্দ্রিক একটি কল্যাণধর্মী কর্মসূচি। সংকীর্ণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে বুঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে, পরিবারের আয় ও সদস্য সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পিত উপায়ে সন্তান জন্মদান সীমিত রেখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার পরিকল্পিত কার্যক্রম।

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "Family planning is making deliberate and voluntary decisions about reproduction" অর্থাৎ সন্তান প্রজনন সম্পর্কে বিবেচনা প্রসূত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো পরিবার পরিকল্পনা। আর্থিক অবস্থা, জীবনের লক্ষ্য, সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ধরন ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে, কোন দম্পতি পরিবার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞানুযায়ী "পরিবার পরিকল্পনা জীবনযাপনের এমন একটি চিন্তাধারা ও পদ্ধতি, যা কোন ব্যক্তি বা দম্পত্তি স্বীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে। যাতে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উন্নতি সাধিত হয় এবং তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়।"

উপসংহার : পরিবার পরিকল্পনা বলতে এমন একটি পরিবার কল্যাণমূলক কর্মসূচিকে বুঝায়, যা দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে সুখী, স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সন্তানের জন্মদান ঘটনাক্রমে না হয়ে, পরিকল্পনা মাফিক হওয়াই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মূলকথা।

প্রশ্ন॥২২॥ সমবায়ের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, সমবায় বলতে কী বুঝ।

অথবা, সমবায়ের পরিচয় দাও।

অথবা, সমবায়ের ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের পরীক্ষিত ও আদর্শ পদ্ধতি হলো সমবায়। সমবায় হচ্ছে একটি মতাদর্শ, প্রক্রিয়া, সংগঠন ও আন্দোলন, যা মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করার সুযোগ দান করে।

"সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের
র" কবি কামিনী রায়ের এ উক্তিতে লিখিত হয়েছে সমবায়ের
মন্ত্র। "অন্যের কল্যাণ কামনায় আমরা নিজেদের পথ খুঁজে
র" দার্শনিক প্লেটোর এ উক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সমবায়ের
ল লক্ষ্য ও দর্শন।

সমবায়ের সংজ্ঞা : সম-উদ্দেশ্যে সংগঠিত একদল লোক
আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় যে উদ্যোগ বা কর্মসূচি
গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় সমবায়। আর সমশ্রেণীর একাধিক
লোক পারস্পরিক সাহায্যে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নতির জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম-অধিকারের ভিত্তিতে যে
সংগঠন পরিচালনা করে, তাকে সমবায় সংগঠন বা সমবায়
সমিতি বলা হয়।

আধুনিক সমবায়ের জনক **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen)
বলেছেন, "প্রতিযোগিতা মাত্রই এক প্রকার যুদ্ধ। যার পরিণতি
হলো সবলের বিজয় ও দুর্বলের বিনাশ। পক্ষান্তরে, সমবায় হলো
এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা,
গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার স্থান অধিকার করে নেয়।"

মনীষী কালভার্ট-এর মতে, "সমবায় হলো এমন একটি
প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের আর্থিক
উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সম-অধিকারের ভিত্তিতে
পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে।"

অধ্যাপক সেলিগম্যানের মতে, "সমবায় অর্থ হচ্ছে
উৎপাদন ও বণ্টন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার এবং সকল প্রকার
মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন।"

অর্থনীতিবিদ প্লাংকেট-এর মতে, "সমবায় হলো সংগঠনের
মাধ্যমে কার্যকর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।"

জি. আই. হলিওয়েক (G.I Holyoake) এর মতে,
"স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গঠিত ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে
পরিচালিত একাধিক লোকের কর্ম প্রচেষ্টার নাম সমবায়।"
প্রখ্যাত সমবায়ী সি.এফ. স্ট্রিকল্যান্ড (C.F. Strickland) এর
মতে, "সমবায় হলো এমন একটি আন্দোলন, যা কতগুলো
ব্যক্তির যৌথ উদ্যোগে বিশেষ একটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার
উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যা কারো একক প্রচেষ্টায় সাধন সম্ভব
নয়।"

সমবায়ের মূলকথা হলো, একজন লোকের পক্ষে সীমিত শক্তি
ও সামর্থ্যের দ্বারা এককভাবে তার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের
ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ সমপর্যায়ের অন্যান্য ব্যক্তিদের
সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সে তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ
সাধনের সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়ে, সম্পদশালীদের মতো
জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

উপসংহার : সমবায় শুধু একটি নিছক অর্থনৈতিক পদ্ধতি
নয়; বরং এমন একটি মতাদর্শ যা মানুষকে জাতিগত, ধর্মগত,
পেশাগত ও বংশগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন॥২৩॥ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে যেসব সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তার বর্ণনা দাও।

অথবা, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে যেসব সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তার আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে যেসব সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যেসব ব্যক্তি মনোদৈহিক কিংবা আর্থসামাজিক অক্ষমতার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবহেলার শিকার হয়। অথচ তারাও মানুষ এবং সামাজিক অধিকার ভোগ করার দাবিদার। যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। বাংলাদেশের সরকার তাদের কল্যাণার্থে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি : বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৬২ সালে। তাদের স্বাভাবিক জীবনে সক্ষম করে তুলতে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালন করছে। নিচে সরকারি কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৬২ সালে দেশে ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলো হলো— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সদরে। এ সকল কেন্দ্রে অন্ধ, মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়।

২. সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা : ১৯৬৯ সালে কতিপয় বিদ্যালয় চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০ এবং ১৫টিতে হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অন্ধদের সহায়তা দানের জন্য একজন করে রিসোর্স টিচার নিয়োগ করা হয়।

৩. অন্ধ ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন : অন্ধ ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে ৪টি এবং পরবর্তীতে আরো ১টি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্ধ শিশুদের ব্রেইলি পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৯৮০ সালে গাজিপুরের টঙ্গীতে অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অন্ধদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রে তাদের জন্য ওয়েল্ডিং, ফিটিং, ছোটোখাটো যন্ত্র তৈরি প্রভৃতি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. মূক ও বধির বিদ্যালয় : ১৯৬২ সাল থেকে মূক ও বধির বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, ফরিদপুরে, খুলনা ও চাঁদপুর মোট ৭টি বিদ্যালয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ; ছবি আঁকা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ১০০ জন শিক্ষার্থীর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐ পর্যন্ত এ বিদ্যালয় থেকে ১৭২৮ জনকে বাইরে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৫. পঙ্গুত্ব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ : আমাদের দেশে নানা কারণে শিশুরা প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে। ফলে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। যেমন– শহর সমাজসেবা, পল্লি সমাজসেবা, হাসপাতাল সমাজসেবা, মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান দান করে সন্তানদের প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সহায়তা করা হয়।

৬. জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র : দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিমিত্তে ঢাকার মিরপুরে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ১টি প্রশিক্ষণ কলেজ, ছাত্রাবাস ও একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। এর আসন সংখ্যা ১৩০।

৭. ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র : গাজীপুরে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ ও অঙ্গহানিদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদনের জন্য এ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা হয়েছে।

৮. মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রামে রউফাবাদে ১০০ আসনবিশিষ্ট মানসিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী শিশুদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে সরকারের সহায়তায় মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৯. জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল : এটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে সরকারিভাবে ঢাকায় এটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে সকল অর্থোপেডিক রোগীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়। হাসপাতালটির বর্তমান আসন সংখ্যা ৪০০।

১০. ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : ১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬টি ভবঘুরে কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব কেন্দ্রে ঢাকা, ঢাকার পূবাইল, বেতিলা, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এবং ময়মনসিংহের ধলায় চালু রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে ভিক্ষুকদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে আরো ৫টি কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারিভাবে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে দেশের সকল প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রাম ও শহরভিত্তিক আরো অধিক প্রকল্প গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন॥২৪॥ বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : দৈহিক প্রতিবন্ধীরাও আমাদের মতো এই সমাজের সদস্য। আমাদের মতো তাদেরও সামাজিক ও মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার রয়েছে। রয়েছে স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার। কিন্তু প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবহেলা ও ঘৃণার শিকার হয়। তাই যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান কর যায়। সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে তাদের কল্যাণার্থে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি : দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে সক্ষম করে তুলতে সমাজসেবা অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিচে বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হলো :

১. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র: সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৬২ সালে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রগুলো হলো : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সদর। এ সকল কেন্দ্রে অন্ধ, মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান হয়।

২. মূক ও বধির বিদ্যালয় : ১৯৬২ সাল থেকে মূক ও বধির বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। দেশে মূক ও বধিরদের জন্য ৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব বিদ্যালয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি, প্রশিক্ষণ, ছবি আঁকা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ১০০ জন শিক্ষার্থীর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. অন্ধ বিদ্যালয় : ১৯৬২ সালে ৪টি এবং পরবর্তীতে আরো ১টি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশালে অবস্থিত এসব অন্ধ স্কুলে মোট ৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্ধ শিশুদের ব্রেইলি পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

৪. সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা : ১৯৬৯ সালে কতিপয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অন্ধদের সহায়তার জন্য একজন করে রিসোর্স টিচার নিয়োগ করা হয়েছে।

৫. অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন : ১৯৮০ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রে অন্ধদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষ্যে অন্ধদের ওয়েল্ডিং, ফিটিং, ছোটখাটো যন্ত্র তৈরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. পঙ্গুত্ব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ : আমাদের দেশে নানা কারণে শিশুরা প্রতিবন্ধিত্ববরণ করে। ফলে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। যেমন- শহর সমাজসেবা, পল্লি সমাজসেবা, হাসপাতাল সমাজসেবা, মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান দান করে সন্তানদের প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সহায়তা করা হয়।

৭. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি : দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঢাকার মিরপুরে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কলেজ, ছাত্রাবাস ও একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। আসন সংখ্যা ১৩০। এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সার্ক দেশসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক নরওয়ের তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ৬.০০ একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়।

৮. ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র : গাজিপুরের টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ ও অঙ্গহানিদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদনের জন্য এ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তথা স্বাবলম্বী করার জন্য উপরিউক্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যার তুলনায় এসব কার্যক্রমের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য। এসব কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধীরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন॥২৫॥ বাংলাদেশে যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশে যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, বাংলাদেশে যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল বাহন হচ্ছে এদেশের যুবশক্তি। দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে যুবসম্প্রদায়। আমাদের দেশে ১৮-৩৫ বছর বয়সিদের যুবশ্রেণি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরা জাতির আশা ভরসার প্রতীক। তারাই ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার কর্ণধার হিসেবে কাজ করবে। এজন্যই যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের মানব সম্পদে রূপান্তর করা অতি জরুরি। যুবকদের জন্য গৃহীত সকল কল্যাণমূলক কর্মসূচিকে যুবকল্যাণ বলা হয়।

বাংলাদেশে যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যুবকদের কল্যাণের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে যুবকল্যাণ। যুবকল্যাণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো, চাহিদা পূরণ, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রভৃতি। নিচে যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : যুবকদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা যুবকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য। কেননা, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই যুবসম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার মাধ্যমে যোগ্য ও দক্ষ করে তুলতে যুবকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. যুবকদের উৎকর্ষ বিধান : জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল যুবকদের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিধান করা যুবকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যুবকদের মনো-দৈহিক ও আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতা সাধন করা যায়। যুবকল্যাণ এ লক্ষ্যে সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

৩. সমস্যা মোকাবিলা : আর্থসামাজিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে যুবকরা বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত থাকে। যেগুলো তাদের বিকাশকে ব্যাহত করে। যুবকল্যাণ তাদের সার্বিক সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে। যুবকদের সমস্যা সমাধানে যুবকল্যাণের রয়েছে নানাবিধ কর্মসূচি।

৪. জনশক্তিতে রূপান্তর : উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের সম্পদশালী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। যা দেশের কল্যাণ বয়ে আনে। তাই উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের সম্পদশালী জনশক্তিতে পরিণতকরণ এর আরেকটি প্রধান লক্ষ্য।

৫. সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ : বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা যুবকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য। যুবসম্প্রদায় তাদের প্রতিভা বিকাশের পথে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুবকল্যাণ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীভূত করে যুবকদের অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের মাধ্যমে সহায়তা করে।

৬. স্বাবলম্বী করে তোলা : যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলা প্রতিটি দেশেরই কাম্য। যুবকরা স্বাবলম্বী হলেই দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। তাই যুবকল্যাণের অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য হলো উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা।

৭. নির্দেশনা ও পরামর্শ : নির্দেশনা ও পরামর্শ যুবকদের একান্ত প্রয়োজন। এটি তাদের প্রতিভা বিকাশ ও সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করে। যে যুবক যে কাজে দক্ষ তাকে সে কাজের জন্য সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা যুবকল্যাণের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুবকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. হতাশা থেকে রক্ষা : হতাশা, গ্লানি শুধু ব্যক্তি নয়, যেকোনো দেশের জন্যই অশনিসংকেত। অনেক না পাওয়া থেকে যুবকরা হতাশার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। হতাশাগ্রস্ত যুবসম্প্রদায় নিজের এবং দেশের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই দেশের মঙ্গলের জন্য যুবকল্যাণ যুবকদের হতাশা থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৯. অপরাধ থেকে বিরত রাখা : যুবকদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখে তাদের সামাজিক ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা যুবকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশে যুবকরা বিভিন্ন কারণে বিপথগামী হচ্ছে। তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি।

১০. নেতৃত্বের বিকাশ : যুবশ্রেণির উন্নয়নের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ একান্ত অপরিহার্য। কেননা, যুবকরাই দেশের ধারক ও বাহক। বিশেষ করে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে সঠিক নেতৃত্ব না থাকলে যুবসমাজের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। তাই যুবকদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে যুবকল্যাণ প্রয়োজনীয় কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যুবকদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে যুবকল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। যুবকদের আর্থসামাজিক, মনো-দৈহিক দিক দিয়ে উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশীয় কল্যাণ সম্পৃক্ত করাই যুবকল্যাণের মূল লক্ষ্য। উপরিউক্ত লক্ষ্যসমূহ ছাড়াও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ, মূল্যবোধের বিকাশ কার্যক্রম করা, দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা প্রভৃতি যুবকল্যাণের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন॥২৬॥ প্রবেশন কী?

অথবা, প্রবেশনের সংজ্ঞা লিখ।

অথবা, প্রবেশন বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : অপরাধ সংশোধনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতি। প্রবেশন অপরাধ সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। প্রবেশনের ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৮৪১ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরের এক জুতার কারিগর জন আগস্টস প্রবেশন ব্যবস্থার সূচনা করেন। প্রবেশন আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৮৭৮ সালে এবং ফেডারেল কোর্ট কর্তৃক প্রথম অনুমোদিত হয় ১৯২৫ সালে। বাংলাদেশের প্রথম প্রবেশন আইন প্রণীত হয় ১৯৬০ সালে এবং তা চালু করা হয় ১৯৬২ সালে।

প্রবেশনের সংজ্ঞা : ইংরেজি প্রবেশন শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Probare থেকে। এর অর্থ পরীক্ষা, চেষ্টা করা বা প্রমাণ করা। তাই শব্দগত অর্থে প্রবেশন হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চেষ্টা ও প্রমাণের দ্বারা শর্তসাপেক্ষে অপরাধীকে মুক্ত করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

সাধারণ অর্থে বলা যায় যে, আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তির বিচার কার্য স্থগিত রেখে শর্তাধীনে একজন প্রবেশন কর্মকর্তার অধীনে সংশোধনের নিমিত্তে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থাকে প্রবেশন বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের নিজ নি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রবেশনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তন্মধ্যে বহুল প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো :

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, প্রবেশন হলো এম একটি মর্যাদা যার জন্য অপরাধীর কারারুদ্ধ করার প্রক্রি শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রত্যাহার করা হয়। সাধারণত এরূপ শর্তে অন্তর্ভুক্ত হলো প্রবেশন অফিসারের বা সমাজকর্মীর মাধ্যমে নিয়মিত আদালতে হাজির হওয়া।

রবার্ট ডি. ভিনটার বলেন, প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াই হলো প্রবেশন।

অধ্যাপক সাদারল্যান্ড বলেন, প্রবেশন হচ্ছে অভিযুক্ত অপরাধীর জন্য এমন এক ব্যবস্থা যাতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি স্থগিত রাখা হয়, ভালো ব্যবহার প্রদর্শনপূর্বক তাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে তারা সংশোধিত হয়ে পুনরায় সমাজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ লাভ করে।

ওয়াল্টার সি. র‍্যাক লেস এর মতে, প্রবেশন হচ্ছে আদালত কর্তৃক দণ্ডের বোঝা না চাপানো এবং দণ্ডের কষ্ট থেকে অপরাধীকে অব্যাহতি প্রদান করা।

মনীষী **চার্লস শিরম্যাস** বলেন, প্রবেশন হচ্ছে আদালত কর্তৃক দোষী ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে আদালত আরোপিত শর্ত এবং প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অপরাধীকে তার নিজ নিজ সমাজে জীবনযাপনের সুযোগ দানের মাধ্যমে সংশোধনের প্রচেষ্টা করা হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, কোনো অপরাধীর বিভিন্ন বিষয় বিবেচনাপূর্বক আদালত কর্তৃক তার শাস্তি স্থগিত রেখে কোনো প্রবেশন কর্মকর্তার অধীনে রেখে তার অপরাধ সংশোধনের যে প্রক্রিয়া, তাই হচ্ছে প্রবেশন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, নতুন অপরাধী যার পূর্বে কোনো রেকর্ড নেই, তার শাস্তি স্থগিত রেখে আদালত কর্তৃক শর্তাধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মুক্তিদানের প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রবেশন। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এর ফলে অপরাধী সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ পায়।

প্রশ্ন॥২৭॥ প্রবেশন ও প্যারোলের পার্থক্যসমূহ লিখ।

অথবা, প্রবেশন ও প্যারোলের বৈসাদৃশ্য লিখ।

অথবা, প্রবেশন ও প্যারোলের পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : 'অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়।' জন্মগতভাবে কেউ অপরাধী নয়। পরিবেশের প্রভাবেই ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়। এজন্যই আধুনিক বিজ্ঞান অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে উঠে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে অর্থাৎ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা নেওয়া হলে ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

প্রবেশন ও প্যারোলের পার্থক্যসমূহ : প্রবেশন ও প্যারোল হলো সংশোধনমূলক কার্যক্রমের দুটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি। অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসিত করা প্রবেশন ও প্যারোলের প্রধান লক্ষ্য। প্রবেশন ও প্যারোলের মধ্যে বহুদিকে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু দিকে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে ছক আকারে দেখানো হলো :

প্রবেশন	প্যারোল
একজন অপরাধীর শাস্তি স্থগিত রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে মুক্তিদানের প্রক্রিয়াকে প্রবেশন বলে।	১. অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তির আংশিক ভোগ করার পর মুক্তি দেওয়াকে প্যারোল বলে।
প্রবেশনে অপরাধীকে শর্তাধীন মুক্তি দেওয়া হয় আদালত থেকে।	২. প্যারোলে অপরাধীকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হয় কারাগার থেকে।
প্রবেশনের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা আদালত কর্তৃপক্ষের।	৩. প্যারোলের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারাগার কর্তৃপক্ষের।
প্রবেশন হলো সহজ তত্ত্বাবধানকারী পদ্ধতি।	৪. প্যারোল হলো প্রবেশনের চেয়ে কঠিন ও জটিলতম পদ্ধতি।
এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি।	৫. এটির গ্রহণযোগ্যতা কম।
প্রবেশন এর অর্থ হলো পরীক্ষাকাল। অর্থাৎ অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়।	৬. প্যারোল এর অর্থ হলো নিরীক্ষণকাল। অর্থাৎ অপরাধীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মানগুলো পর্যবেক্ষণ করা।
বিচারকার্য বিশ্লেষণ না করেই শর্তসাপেক্ষ এটা দেওয়া হয়।	৭. অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ বিচার যখন সম্পাদিত হয়ে যায় তখন এটা দেওয়া হয়।
প্রবেশন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অপরাধীদের সংস্পর্শে আসতে হয় না।	৮. সাময়িকভাবে কারাগারের অপরাধীদের সংস্পর্শে আসতে হয়।
প্রবেশনের শর্তগুলো পূরণ হলেই অপরাধীর মুক্তি দিতে সহায়ক হবে।	৯. শর্তগুলো পূরণ না হলেও মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।
১০. প্রবেশন ব্যবস্থায় কিশোর অপরাধী, নতুন ও কাঁচা অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	১০. প্যারোল ব্যবস্থা সাধারণত বয়স্ক দাগি ও পুরাতন অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১১. প্রবেশনের শর্ত ভঙ্গ করলে বিচারের মাধ্যমে পুরো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।	১১. প্যারোলের শর্ত ভঙ্গ করলে বাকি শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে হয়।
১২. প্রবেশন ব্যবস্থায় বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পাদিত হয়।	১২. প্যারোলে বিচারকার্য বিচারকর্তার উপস্থিতিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে।
১৩. প্রবেশন পদ্ধতিতে অপরাধীকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় না।	১৩. প্যারোলে শাস্তি ভোগের কারণে অপরাধীকে কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হয়।
১৪. প্রবেশন একটি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত।	১৪. প্যারোল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।
১৫. প্রবেশনে অপরাধী অন্যান্য অপরাধীর দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং নিজেও প্রভাবিত করে না।	১৫. প্যারোলে অপরাধী অন্যান্য অপরাধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অন্যদেরও প্রভাবিত করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, প্রবেশন ও প্যারোলের উপরিউক্ত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হলেও উভয়ে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনে প্রচেষ্টা চালায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সমাজ তথা জাতীয় ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম। বিশেষ করে সমাজ থেকে অপরাধপ্রবণতা কমাতে উভয় পদ্ধতিরই গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রবেশন ও প্যারোলের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য থাকলেও বর্তমানে উভয়েরই গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন॥২৮॥ বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্বসমূহ সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা অত্যধিক। সামাজিক সমস্যার প্রভাবে এদেশে অপরাধী ও কিশোর অপরাধীর সংখ্যাও অনেক বেশি। তাই সামাজিক সমস্যা তথা অপরাধমূলক কার্যক্রম দূর করতে হলে সংশোধনমূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে। অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ব্যবস্থা করা বিজ্ঞানসম্মত কাজ।

সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্বসমূহ : বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী, ও গবেষকগণ এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ দিলে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাই সংশোধনমূলক কার্যক্রম চরিত্র সংশোধনের একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। নিম্নে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক অনাচার রোধ : অপরাধীকে সংশোধন করার সুযোগ দিলে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পায়। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। তাই সামাজিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. সামাজিক সমস্যার সমাধান : অপরাধীকে শাস্তি দিলে অপরাধী পুনরায় প্রতিশোধের স্পৃহায় অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। অথচ সংশোধনের সুযোগ দিলে সামাজিক সমস্যা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

৩. সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ : অপরাধী চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পেলে তার সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটে থাকে। তাই সংশোধনমূলক কার্যক্রম অপরাধীর মানসিক বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক।

৪. স্বনির্ভরতা অর্জন : অপরাধী সংশোধনরত অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ অবস্থায় তাকে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়ার ফলে সে সহজেই আয় রোজগারের পথ খুঁজে পায়, ফলে সংশোধিত ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

৫. অর্থের অপচয় রোধ : অপরাধীকে সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করলে সরকারি প্রশাসনের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হয়। কেননা অপরাধী স্বাভাবিক জীবনে চলে যাওয়ার ফলে কারা প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণ বাবদ অনেক অর্থ বেঁচে যায়।

৬. বিপথগামিতা থেকে রক্ষা : যুবসমাজ এর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও বিপথগামিতা রোধ করার জন্য সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. অপরাধের ধরন জানা : সংশোধন পদ্ধতিতে অপরাধের কারণ, পরিবেশ, পরিস্থিতি, অপরাধীর চরিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে। ফলে অপরাধী সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সুযোগ পায়।

৮. পৃথক ব্যবস্থায় বিচার : সংশোধন পদ্ধতিতে কিশোর অপরাধীদের পৃথক ব্যবস্থায় বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয়। সে দাগি ও বড় অপরাধীদের ছোঁয়া থেকে রক্ষা পায়। ফলে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা সহজ হয়।

৯. পারিবাকি ভাঙন রোধ : অপরাধীকে শাস্তি দিলে তার পরিবার তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ আর্থসামাজিক নানা সমস্যায় পতিত হয়। সংশোধনমূলক পদ্ধতি পরিবারের কার্যক্রমকে স্বাভাবিক রাখে।

১০. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ : সংশোধনমূলক পদ্ধতিতে অপরাধী তার মৌল চাহিদা পূরণ করতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে পুনর্বাসনের মাধ্যমে সে সহজেই সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অত্যধিক। এর ফলে শুধু অপরাধীরাই উপকৃত হয় না পাশাপাশি সমাজও লাভবান হয়। সমাজে অপরাধ হ্রাস পায় ও সুশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে। এককথায় দেশের কল্যাণে সংশোধনমূলক পদ্ধতির গুরুত্ব অতুলনীয়।

প্রশ্ন।২৯। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কর্মসূচির গুরুত্বসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির গুরুত্বসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর। ভূমিকা : বিশ্বের প্রায় ১০ ভাগ লোক কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। জাতিসংঘের মতে বাংলাদেশের বিশ [...] জনগোষ্ঠী দৈহিক প্রতিবন্ধীর শিকার। অথচ তাদের মধ্যে লুকি[...] আছে প্রতিভা, সম্ভাবনা ও ক্ষমতা। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ [...] পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির গুরুত্বসমূহ

প্রতিবন্ধীরাও মানুষ এবং তাদেরও সামাজিক অধিকার [...] করার অধিকার রয়েছে। যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদে[...] স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়[...] বাংলাদেশ সরকার তাদের কল্যাণার্থে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন[...] কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। নিম্নে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি : প্রতিবন্ধিদের স্বাবল[...] করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্র[...] এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসূচি। তাই বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ [...] পুনর্বাসন কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

২. সচেতনতা সৃষ্টি : প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টি হয় দু'ভাবে। যথা জন্মগতভাবে এবং জন্মের পর। অথচ মায়েরা সচেতন থাক[...] অসংখ্য শিশু প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। কর্মসূ[...] গ্রহণের মাধ্যমে মায়েদের সচেতন করা যায়।

৩. পরনির্ভরশীলতা হ্রাস : প্রতিবন্ধীরা পরনির্ভরশীল [...] সমাজের বোঝাস্বরূপ। তবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পার[...] তারা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সক্ষম। এ জন্য প্রয়োজ[...] বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ।

৪. ভিক্ষাবৃত্তি রোধ : সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ কর[...] জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকতে হবে[...] এজন্য ভবঘুরে কেন্দ্র ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকা চাই।

৫. স্বাভাবিক জীবনযাপন : উপযুক্ত ট্রেনিং গ্রহণের মাধ্য[...] অধিকাংশ প্রতিবন্ধীই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। [...] ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

৬. প্রতিভার বিকাশ : প্রতিবন্ধীদের মাঝে রয়েছে প্রতিভা[...] ক্ষমতা ও সম্ভাবনা। তাই তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পরিবে[...] দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি[...] গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. শিশুদের রক্ষা করা : শিশু বয়সেই অনেকে প্রতিবন্ধী[...] শিকার হয়। তাই শিশুদের প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা[...] জন্য গ্রহণ করতে হবে যথাযথ কর্মসূচি।

৮. **ঘৃণা ও করুণা থেকে মুক্তি :** প্রতিবন্ধীরা করুণার পাত্র। তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হলে সমাজ তাদের করুণার চোখে দেখে না। তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৯. **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন :** উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হলে, তারাও মানসিকভাবে শক্তিশালী হবে। এটা সম্ভব যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

১০. **সমাজের কল্যাণে :** প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত সমাজেরই কল্যাণ সাধিত হয়। এজন্যই প্রতিবন্ধীদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক এই প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা এবং তাদের জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রতিবন্ধী ও পুনর্বাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনেও এ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই ব্যাপকহারে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন॥৩০॥ প্যারোল কী?

অথবা, প্যারোল কাকে বলে?

অথবা, প্যারোলের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : অপরাধ সংশোধনের জন্য রয়েছে নানা পদ্ধতি। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায় এবং সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম হয়। অপরাধ সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো প্যারোল। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কারাগার থেকে বিশেষ শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্যারোল : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনমূলক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন ইংল্যান্ডের অধিবাসী ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার মেকেন কি। প্যারোল ব্যবস্থা ১৮৭৭ সালে আমেরিকায় চালু হয় এবং পরবর্তীতে তা সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করে।

সাধারণ অর্থে, প্যারোল ব্যবস্থা বলতে এমন এক সংশোধনমূলক কার্যক্রমকে বোঝায় যেখানে অপরাধীকে কারাগারে কিছুদিন শাস্তিভোগের পর শাস্তিদান স্থগিত রেখে তাকে সংশোধনের শর্তাধীনে সমাজকর্মী ও প্যারোল কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে শর্ত ভঙ্গ করলে অপরাধীকে পুনরায় বাকি সাজা ভোগ করতে হয়।

বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানী প্যারোলকে নিজেদের মতো করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

অপরাধবিজ্ঞানী **ড্রেসলার** বলেন, "প্যারোল বলতে এমন এক সংশোধনমূলক ব্যবস্থাকে বোঝায় যার মাধ্যমে অপরাধীকে কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য প্যারোল কর্মীর তত্ত্বাবধানে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়।"

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "প্যারোল হলো অপরাধীকে কারাগার থেকে মুক্তিদানের এমন একটি আইনগত ব্যবস্থা, যাতে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী দণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কারাগারের মধ্যে তার উত্তম আচরণ, অপরাধ না করার প্রতিজ্ঞা এবং ধারাবাহিক তত্ত্বাবধানের প্রেক্ষিতে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়।

ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার এর মতে, প্যারোল হলো শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীকে শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শর্তসাপেক্ষে মুক্তিদানের প্রক্রিয়া। যাতে সে আরোপিত শর্ত ভঙ্গ করলে পুনরায় শাস্তি ভোগ করতে হয়।

রবার্ট ডি. ভিনটার এর মতে, "অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য প্রাপ্ত শাস্তির আংশিক ভোগ করার পর কারাগার হতে মুক্ত হওয়ার সংশোধনমূলক প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্যারোল।"

ওয়াল্টার সি. র‍্যাকলেস এর মতে, অপরাধীকে কারাগারে কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর সমাজকর্মী ও প্যারোল কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মুক্তি দেওয়াকে প্যারোল বলে। তবে শর্ত ভঙ্গ করলে অপরাধীকে পূর্ণ সাজা ভোগ করার বিধান থাকবে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, অপরাধীর সংশোধন ও পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থার একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে প্যারোল।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, প্যারোল ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধী সাময়িকভাবে শর্তাধীন প্যারোল কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে চারিত্রিক সংশোধন ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার অভ্যাস আয়ত্ত করে। অপরদিকে প্যারোলে যাওয়ার পূর্বে এক-তৃতীয়াংশ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন॥৩১॥ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বসমূহ তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জনসংখ্যাবহুল দেশ আমাদের বাংলাদেশ। জনসংখ্যা সমস্যা গোটা আর্থসামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ সমস্যা। এমতাবস্থায় পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক।

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব : আর্থসামাজিক নানাবিধ সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠন অতি আবশ্যক। দেশকে জনসংখ্যার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো :

১. পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা : পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্টের পিছনে জনসংখ্যার আধিক্য বহুলাংশে দায়ী। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এর প্রভাবে পরিবেশ দূষণ হয় দ্রুত। তাই প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদনের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

৩. উন্নত জীবন মান অর্জন : সন্তানসন্ততি কম হলে আয়ের সাথে সংগতি রেখে জীবন মান বজায় রাখা যায়। এজন্য দরকার পরিবার পরিকল্পনা।

৪. বেকারত্ব দূরীকরণ : যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সে একই হারে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। এটি দেশের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই পরিবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়।

৫. শিশু মৃত্যুহার রোধ : আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৫১ জন (২০০৪)-এর মূল কারণ দারিদ্র্য। অশিক্ষা, ঘন ঘন সন্তান গ্রহণ, স্বাস্থ্যহীনতা, অযত্ন, অবহেলা প্রভৃতি। তাই শিশুর মৃত্যুহার রোধ করতে হলে পরিবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে।

৬. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ : পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা সীমিত রাখতে পারলে মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব।

৭. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি : অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে মাথাপিছু আয় কমে যায়। উৎপাদন, আয় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও হ্রাস পায়। তাই মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে জীবনমান উন্নয়নে এ কর্মসূচি অর্থবহ ভূমিকা রাখে।

৮. মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার : জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারলে দেশের জনগণকে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এজন্যই সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. অস্থিরতা দূরীকরণ : আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা অর্জনে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা অপরিসীম।

১০. সার্বিক কল্যাণ : পরিবার পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও এর সফলতার উপর দেশের সার্বিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভর করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, এদেশের বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

প্রশ্ন।২১। পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা লিখ।

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমি[কা] আলোচনা কর।

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমি[কা] ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সমাধানও রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রয়েছে অন[েক] প্রতিবন্ধকতা। অপরদিকে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য র[য়েছে] নানা পদক্ষেপ। যা বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মীর ভূমি[কা] অপরিহার্য।

পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর গুরুত্ব অপরিসী[ম]। সমাজকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার কারণেই এ কর্ম[সূচি] বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। নিম্নে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ব[াস্তব]ায়নে একজন সমাজকর্মী যেসব ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন : পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে[র] ব্যাপারে এদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সা[ধন] অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধ[তি] প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতার পরিব[র্তন] আনতে সক্ষম। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধা[রণা] দিয়ে এর পক্ষে জনমত গঠনে সমাজকর্মী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিক[া] পালন করতে পারেন।

২. অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ : অজ্ঞতা ও অশিক্ষা সমস্যার মূলে ইন্ধন যোগায়। সমাজকর্মী দলীয় আলোচ[না], উদ্বুদ্ধকরণ, কমিটি গঠন, সাক্ষরতা অভিযান প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করে পরিবার পরিকল্প[না] গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপ[ত্তা] কর্মসূচি আধুনিক সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্মীরা এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. নেতৃত্বের বিকাশ : পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানী[য়] নেতৃত্ব অপরিহার্য। স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সমাজকর্মীরা পারদর্শী। সমাজকর্মীরা নেতা নির্বাচন করে পরিবার পরিকল্প[না] কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

৫. দারিদ্র্য বিমোচন : পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য। সমাজকর্মী দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহায়তা করে।

৬. সামাজিক আন্দোলন : সামাজিক আন্দোলন এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রয়োজনে সামাজিক আইন প্রণয়নেও ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারেন।

৮. প্রচার : যেকোনো কাজের সফলতার জন্য "প্রচার" একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সমাজকর্মী জনগণকে এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

৯. নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি : নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর পরিবার পরিকল্পনার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সমাজকর্মী সহায়তা করে থাকেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম। সমাজকর্মী সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে জনগণকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম। সমাজকর্মীর প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই এ কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব।

প্রশ্ন৩৩। **বাংলাদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ লিখ।**

অথবা, বাংলাদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর৷ **ভূমিকা :** দারিদ্র্য ও জনসংখ্যাধিক্যের দেশ এ বাংলাদেশ। এদেশের যুবসমাজের উন্নয়নের উপর দেশের জাতীয় উন্নয়ন, যুবকরাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নিম্নে বাংলাদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো :

১. উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আর তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান যুব কল্যাণের একটি অংশ। তাই যুবক শ্রেণির যথাযথ শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে যুব কল্যাণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২. জাতীয় উন্নয়ন : যুবকদের কর্মতৎপরতার উপর দেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল। এজন্য যুব কল্যাণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। অর্থাৎ যুব কল্যাণ কার্যক্রম জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম।

৩. যুবকদের উৎপাদনমুখী করা : দেশের আর্থসামাজিক অস্থিরতার মধ্যে যুব সম্প্রদায়কে গঠনমূলক সংগঠনের আওতায় এনে তাদেরকে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করার জন্য যুব কল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ : যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে যুব কল্যাণের ভূমিকা রয়েছে। যুব সম্প্রদায় তাদের প্রতিভা বিকাশের পথে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুব কল্যাণ যুবসমাজের প্রতিভা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. স্বাবলম্বী করে তোলা : যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলা প্রতিটি দেশেরই কাম্য। স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য প্রয়োজন সংগঠিত কর্মসূচি। যুব শ্রেণির স্বার্থেই যুব কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা একান্ত অপরিহার্য।

৬. নেতৃত্বের বিকাশ : যুব শ্রেণির উন্নয়নের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ একান্ত অপরিহার্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে সঠিক নেতৃত্ব না থাকলে যুবসমাজের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা।

৭. হতাশা ও গ্লানি থেকে মুক্ত করা : হতাশা, গ্লানি শুধু ব্যক্তি নয়, দেশের জন্য অশনিসংকেত। এটি জাতিকে নিম্নের দিকে নিয়ে যায়। যুব কল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে হতাশা, গ্লানি থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

৮. কর্মসংস্থান : আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের অভাবে যুবসমাজ নানা সমস্যায় পতিত হয় এবং এরা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যুব কল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবসমাজকে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

৯. কর্মক্ষম যুবশক্তি : কর্মক্ষম যুবশক্তি দেশের সম্পদ। যুবকদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। যুব কল্যাণের মাধ্যমেই এসব সম্ভব।

১০. জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ : যুবকদের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে পারলে তারা সম্পদে পরিণত হবে। এজন্য প্রয়োজন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। যুব কল্যাণের মাধ্যমে এ কাজে যুব শ্রেণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে যুবসমাজের উন্নয়নে যুব কল্যাণের গুরুত্ব অত্যধিক। তবে এজন্য কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। যুবকদের সার্বিক কল্যাণে যুব কল্যাণ কর্মসূচি যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম। দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি এর উপর নির্ভর করে। তাই এদেশে যুব কল্যাণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন৩৪। **বাংলাদেশে নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতাসমূহ লিখ।**

অথবা, বাংলাদেশে নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতাসমূহ তুলে ধর।

উত্তর৷ **ভূমিকা :** যে দেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী সে দেশের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অতি জরুরি। নারী কল্যাণে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এদেশে কাজ করে। সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, অধিকার, উপার্জনক্ষম প্রভৃতি বিষয়ে সক্ষম করে তুলতে প্রচেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশের নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশে নারী কল্যাণের গুরুত্ব অপরিসীম। নারী উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিম্নে নারী কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো।

১. আর্থসামাজিক অগ্রগতি : দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির জন্য নারী কল্যাণের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান থাকতে হবে।

২. অধিকার সংরক্ষণ : পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার সংরক্ষণে নারী উন্নয়ন অপরিহার্য। নারীর অধিকার সংরক্ষণ না করতে পারলে সমাজে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। তাই নারীর অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নে নারী কল্যাণ খুবই প্রয়োজন।

৩. স্বাভাবিক জীবনযাপন লাভ : নারীকে স্বাভাবিক জীবন লাভের সুযোগ দিতে হবে। কেননা এর উপর সুখী সমাজ নির্ভর করে। নারী কল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব।

৪. দায়িত্বশীল জাতি গঠন : একজন সচেতন মায়ের আশ্রয়েই দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে ওঠে। নারী কল্যাণের মাধ্যমে নারীরা সচেতন হয় এবং দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৫. দারিদ্র্য দূরীকরণ : দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারীরা পুরুষের পাশাপাশি দারিদ্র্যদূরীকরণের কাজ করবে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন হবে।

৬. বেকারত্ব নিরসন : দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে নারীর ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নারীকেও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এদেশের নারীদের বেকারত্ব হ্রাস অনেকাংশে সম্ভব।

৭. নারী নির্যাতন রোধ : নারী নির্যাতন রোধে নারীকে নিজেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশে নারী নির্যাতন একটি ভয়াবহ সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে নারী কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. শিক্ষার প্রসার : দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য নারীদের উন্নয়ন করতে হবে। বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। এর উপর জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। নারী কল্যাণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব।

৯.জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি : দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারীর ভূমিকা রয়েছে। নারীর অংশগ্রহণ যত সুদৃঢ় হবে দেশের উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাবে। নারী কল্যাণ নারীকে উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

১০. সামাজিক সমস্যার সমাধান : নারী উন্নয়ন কর্মসূচি সমাজের অগ্রগতি ও প্রগতিকে গতিশীল রাখে। তাই সমাজ তথা দেশের স্বার্থে নারী কল্যাণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।"

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের উন্নয়নে নারী কল্যাণের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা থাকতে হবে। নারীর সমঅধিকার ও মানবধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই নারী কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

প্রশ্ন।৩৫। বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** শিশুরাই জাতির কর্ণধার। আজকের শিশুরাই আগামী দিন দেশ গঠন করবে। তাদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা, যা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়। আমাদের দেশে শিশুদের কল্যাণে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। শিশু কল্যাণ পরিষদ তাদের মধ্যে অন্যতম। এ পরিষদ শিশু বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন, উৎসাহ, পরামর্শ দান ও তদারকি করে থাকে।

শিশু কল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশুদের অধিকার তথা শিশুদের সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করে। শিশুদের সুনিশ্চিত জীবনই এদের উদ্দেশ্য। নিম্নে পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা হলো :

১. কর্মসূচির উন্নয়ন : বাংলাদেশ একটি দরিদ্রতম এবং জনবহুল দেশ। এদেশে এখনো শিশু অধিকার নিশ্চয়তা পায় নি, যার কারণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীও সরকারি সংস্থা শিশুদের নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। শিশু কল্যাণ পরিষদের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত সকল ধরনের কর্মসূচির উন্নয়ন পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান করা।

২. সচেতনতা আনয়ন : সচেতনতাই পারে শিশুদের বিকাশে ভূমিকা রাখতে। কেননা এদেশের মানুষ শিশুদের বিকাশ নিয়ে এখনো অজ্ঞতা প্রদর্শন করে। আর তাই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু বিকাশ ও অধিকার সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা শিশু কল্যাণ পরিষদের অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩. সমন্বিত কার্যক্রম : শিশু কল্যাণ পরিষদের অপর একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সকল শ্রেণির শিশুদের কল্যাণের নিমিত্তে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা। গ্রাম ও শহর এলাকার অনেক শিশুই দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। এসব শিশুদের দৈহিক, মানসিক উন্নয়নের নিমিত্তে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করে শিশু কল্যাণ পরিষদ।

৪. আইন প্রণয়ন : শিশুদের কল্যাণে আইন প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়ন জরুরি। এজন্য শিশু কল্যাণ পরিষদে অন্যান্য সংস্থাকে সাহায্যের পাশাপাশি সরকারকেও সহযোগিতা করে থাকে। শিশুদের কল্যাণ আইন ও নীতি প্রণয়নে সরকারকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

৫. শাখা বৃদ্ধি : শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশুদের নিয়ে বহু বছর কাজ করে চলেছে। শহরে এদের শাখা থাকলেও গ্রামে এদের কোনো শাখা নেই। অথচ গ্রামীণ শিশুরাও অবহেলিত হচ্ছে। আর তাই শাখা বৃদ্ধি করা এদের অন্যতম একটি লক্ষ্য।

৬. সভা-সমিতির আয়োজন : শিশু কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চাই পর্যাপ্ত প্রচারণা এবং সচেতনতা। শিশু কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সংস্কার সাধনের জন্য শিশু কল্যাণ পরিষদ সেমিনার, সভা-সমিতি, সম্মেলন, গবেষণা, প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৭. শিশু-কিশোর সংগঠন : শিশুরাই শিশুদের সমস্যা ও চাহিদা ভালো বোঝে। তাই নতুন নতুন শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তুলে তা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করাও এদের লক্ষ্য। কেননা সংগঠন থেকে শিশুরা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

৮. সমস্যার সমাধান : শিশুরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। তাদের নির্যাতনের কারণ ও সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলে তার সমাধান পাওয়া সহজ। তাই শিশু কল্যাণ পরিষদের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হলো শিশু নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ করা এবং প্রকৃত সমস্যা উদ্‌ঘাটন ও তার প্রতিকার করা।

তাছাড়াও অভিভাবকদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা, শিশু সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করা, শিশু কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে শিশু কল্যাণ পরিষদ কাজ করে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশুদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে এটি বদ্ধ পরিপক্ব। এজন্য শিশু কল্যাণ পরিষদ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

প্রশ্ন।৩৬। বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** আজকের শিশুরাই আগামী দিন দেশ গঠন করবে। তাদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা, যা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায়। আমাদের দেশে শিশুদের কল্যাণে অনেকগুলো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে শিশু কল্যাণ পরিষদ অন্যতম।

বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমসমূহ : শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশু বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন, উৎসাহ, পরামর্শ ও তদারকি করে থাকে। এটি শিশু কল্যাণে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. শিশু পাঠাগার : ১৯৬৭ সালে শিশু কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু পাঠাগার। পঙ্গু শিশু এবং তাদের পিতামাতারা এখানে পড়াশোনা করতে পারেন। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকে।

২. পঙ্গু হাসপাতাল : ঢাকার তোপখানা রোডে অবস্থিত হাসপাতালটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ফিরোজা বারী পঙ্গু শিশু হাসপাতাল নামে পরিচিত। হাসপাতালে বহির্বিভাগের ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফিজিওথেরাপিস্ট। তাছাড়াও অনারারি কনসালট্যান্ট। তাঁরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্মীও রয়েছে। প্রতিদিন ৭০/৮০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

৩. গবেষণামূলক কার্যক্রম : শিশুদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণাধর্মী বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করে এই পরিষদ। এটি সরকারের সহযোগী হয়েও গবেষণা করে থাকে। এজন্য শিশু বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে থাকে।

৪. সমন্বয় সাধন : শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশু কল্যাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করে থাকে। তাই বলা যায়, সকলের স্বার্থে সমন্বয় করা এর অন্যতম কাজ।

৫. পুনর্বাসন কর্মসূচি : ঢাকা জেলার লালবাগ এলাকায় প্রতিবন্ধীদের সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছে। এখানে মেডিক্যাল চেকআপ ও ফিজিওথেরাপি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। অত্র এলাকায় ৫০ জন প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। খরচ বহন করে শিশু কল্যাণ পরিষদ।

৬. শামসুন্নাহার শিশু কলাভবন : এটি শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং আত্মনির্ভরশীল করার একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশুদের চারু ও কারুকলার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বেশ কিছু শিশু এখান থেকে শিক্ষা লাভ করেছে।

৭. ব্রেইস ওয়ার্কশপ : ব্রেইস ওয়ার্কশপ পঙ্গুদের কৃত্রিম হাত-পা বা প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার প্রকল্প। দুজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান এসব উপকরণাদি তৈরি করে থাকে। দেশের বাইরেও এর উপকরণাদির বেশ চাহিদা রয়েছে।

৮. ঋণদান কর্মসূচি : বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ প্রতিটি সেক্টর থেকে গ্রুপভিত্তিক ঋণদান করে থাকে। ঋণদান ও ফেরত দেওয়ার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা।

৯. পরামর্শ দান : শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশু কল্যাণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সরকার পরামর্শ মোতাবেক শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

১০. সমন্বিত কার্যক্রম : শিশু কল্যাণ পরিষদ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে থাকে। এজন্য ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, মহিলা সমিতি, বয়স্কাউট প্রভৃতি সংস্থার সাথে সমবেতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ শিশুদের উৎকর্ষ সাধনে অর্থাৎ তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন৩৭ **উল্লেখযোগ্য শহর সমাজসেবা কর্মসূচির বিবরণ দাও।**

অথবা, **উল্লেখযোগ্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বর্ণনা দাও।**

অথবা, **উল্লেখযোগ্য শহর সমাজসেবা কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : শহর সমাজসেবা কার্যক্রম মূলত সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। শহর এলাকার অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেণির সমস্যা সমাধানে এ কর্মসূচির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শহর সমাজ সেবার একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি লোকদের নিয়ে এ কাঠামো গঠিত হয়।

শহর সমাজসেবার কর্মসূচিসমূহ : দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, পতিতাবৃত্তি, বস্তি সমস্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে শহর সমাজসেবা বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে কর্মসূচিসমূহ আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো।

১. অর্থনৈতিক কার্যক্রম : শহর সমাজসেবার প্রধান প্রকল্প হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যক্রম। শহরের নারী পুরুষ তথা বেকারদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেমন– পাটের কাজ, মাদুর তৈরি, মোম তৈরি, পুতুল তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, কার্পেট তৈরি, সাইকেল, রিকসা মেরামত, ইলেকট্রিক কাজ, হাঁস-মুরগি পালন, কুটিরশিল্প, শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং প্রভৃতি বেকার নারী পুরুষদের দেওয়ার ব্যবস্থা। তাছাড়াও বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা এবং ঋণদানের ব্যবস্থাও রয়েছে এ প্রকল্পে।

২. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম : এ কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রদান, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞানদান, পরিচ্ছন্নতা অভিযান প্রভৃতি।

৩. শিক্ষা কার্যক্রম : শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে কর্মসূচিগুলো রয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়ের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন, শিল্পবিদ্যালয়, সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪. বিনোদনমূলক কার্যক্রম : সুস্থ ও রুচিশীল বিনোদনের জন্য শহর সমাজসেবা খেলার মাঠ, কমিউনিটি কেন্দ্র স্থাপন, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, শিশু পার্ক, ক্লাব, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, প্রামাণ্য, চিত্র প্রদর্শন, সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বক্তৃতামালার আয়োজন প্রভৃতি এ কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

৫. যুব উন্নয়ন কার্যক্রম : শহর সমাজসেবা যুবকদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যেমন– প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, ঋণদান, সহযোগিতা, স্বকর্মসংস্থানে সাহায্য, সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি।

৬. পরিবেশ উন্নয়ন : পরিবেশ উন্নয়নমূলক বিশেষ করে বস্তি এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ ও সচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান, যানজট নিরসন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

৭. শিশু কল্যাণ কার্যক্রম : শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, লালনপালন, পুনর্বাসন, বিদ্যালয় স্থাপন, দুস্থ, অনাথ শিশুদের পুনর্বাসন তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, দিবাশিশু কেন্দ্র স্থাপন, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. ঘূর্ণায়মান ঋণদান কার্যক্রম : শহর সমাজসেবা প্রকল্পের অধীন রয়েছে ঘূর্ণায়মান ঋণদান কার্যক্রম। সরকার কর্তৃক যুব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় একটি প্রকল্পে মোট ৩,৩৪,০০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণদান প্রোগ্রাম প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত ২,০৭,৩০৫ জন উপকৃত হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শহরের নারী, পুরুষ, শিশু, যুবকদের সার্বিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা বহুমুখী কর্মসূচি পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণির আর্থসামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন৩৮ **শহর সমাজসেবার কার্যক্রমের সমস্যাবলি দূরীকরণের উপায়সমূহ লিখ।**

অথবা, **শহর সমাজসেবার কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা সমাধানের তোমার সুপারিশসমূহ তুলে ধর।**

অথবা, **শহর সমাজসেবার কার্যক্রমের সমস্যাবলি দূরীকরণের উপায়সমূহ উল্লেখ কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : আধুনিক সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি নির্ভর করে একটি কর্মসূচি হচ্ছে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারের সহায়তায় এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনাকে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বলে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো দূর করতে পারলে এ প্রকল্প আরো গতিশীল হবে।

সমস্যাবলি দূরীকরণের উপায় : শহর সমাজসেবার কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা কাটিয়ে এর কার্যক্রমকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. কর্মসূচির সমন্বয়সাধন : শহর সমাজসেবা কর্মসূচির পাশাপাশি শহরের উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হবে। কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করতে পারলে শহর সমাজসেবা প্রকল্প আরো জোরদার হবে।

২. আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো : শহর সমাজসেবার প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই এ প্রকল্পের জন্য সময়মতো ও প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা অত্যাবশ্যক।

৩. বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন : যে কোনো কাজের মূল্যায়ন এর সফলতার জন্য অপরিহার্য। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের এর যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন হলে এ প্রকল্পের সফলতা আসবে নিশ্চিত করে বলা যায়।

৪. অনুভূত প্রয়োজন : শহরের জনগণের অনুভূত প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করলে এর সুফল পাওয়া যাবে সবচেয়ে বেশি।

৫. কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : শহর সমাজসেবা প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী এর জনবলও বাড়াতে হবে।

৬. স্থানীয় নেতৃত্বের অংশগ্রহণ : এ কার্যক্রমে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। তাই এ কর্মসূচিতে স্থানীয় নেতৃত্বের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

৭. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি : শহর সমাজসেবা প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা আরো বাড়াতে হবে। এর ফলে এটি পুরোপুরি আলোর মুখ দেখতে পাবে, সফল হবে কর্মসূচি।

৮. বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন : এ প্রকল্পের কর্মসূচি হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবভিত্তিক। এর ফলে কর্মসূচির সফলতা আসবে দ্রুত। এলাকার সমস্যার সমাধানও হবে স্থায়ী।

৯. সমাজকর্মীর মানসিকতা অর্জন : এ প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। তাদেরকে সমাজকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর ফলে জনগণ ও কর্মসূচির মধ্যে ব্যবধান দূর হবে।

১০. সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার : এ প্রকল্পের আওতায় সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে। কর্মসূচি সফলতা অর্জন করবে।

উপসংহার : শহর সমাজসেবার সীমবাদ্ধতা দূরীকরণের অন্যান্য পদক্ষেপগুলো হলো উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, গবেষণা কার্যক্রম, উন্নয়নধর্মী দর্শন ও নীতিকে গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহর এলাকার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায়।

প্রশ্ন॥৩৭॥ শহর সমাজসেবার সমস্যাবলি লিখ।

অথবা, শহর সমাজসেবার সীমাবদ্ধতাসমূহ তুলে ধর।

অথবা, শহর সমাজসেবার সমস্যাবলি উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শহর সমাজসেবা এমন একটি বহুমুখী প্রকল্প, যার মাধ্যমে শহর এলাকার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়। এটি সরকারি সাহায্য পুষ্ট স্বাবলম্বন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি শহর এলাকার অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেণির সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে কিছু সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেসব সমস্যাবলির কারণে জনগণ তাদের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়।

শহর সমাজসেবা সমস্যাবলি : শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রথম সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচি। পুরাতন কর্মসূচি হওয়া সত্ত্বেও এটি আশানুরূপ অবদান রাখতে পারেনি। সাধারণ মানুষ এখনো পুরোপুরি সফলতার মুখ দেখেনি। নিম্নে শহর সমাজসেবার সমস্যাবলি বর্ণনা করা হলো :

১. অর্থের সীমাবদ্ধতা : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রধান ও অন্যতম সমস্যা হলো অর্থ বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা। অর্থের অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. অনুভূত চাহিদাকে গুরুত্ব না দেওয়া : জনগণের কল্যাণের জন্যই মূলত কর্মসূচি গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু জনগণের চাহিদা কি সেটা না জানলে কোনো প্রকল্পই বাস্তবায়িত হয় না। এ কার্যক্রমের অনেক প্রকল্পেই জনগণের অনেক প্রয়োজনই স্থান পায়নি ফলে সমস্যার সমাধান হয়েছে অনেক কম।

৩. অজ্ঞতা : অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তখন মানুষ কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ বুঝতে পারে না। কর্মসূচিসমূহ মানুষের কল্যাণে গ্রহণ করা হলেও অজ্ঞতার কারণে তাদের অংশগ্রহণের অভাবে কর্মসূচিসমূহ সফলতার মুখ দেখতে পারে না।

৪. সমন্বয়ের অভাব : শহর সমাজসেবার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারিভাবে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয় না। যা কি না কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্তরায়।

৫. অপরিকল্পিত কর্মসূচি : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন হচ্ছে না। অপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে কর্মসূচি। ফলে ব্যর্থতা কাটিয়ে সফলতার মুখ দেখেছে খুবই কম কর্মসূচি।

৬. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : এদেশে ঘন ঘন সরকার বদল হওয়ার কারণে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসও হয়েছে বেশি। তাছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশকেও শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্যতম সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায়।

৭. সংস্থাসমূহের দ্বন্দ্ব : শহর এলাকায় স্থানীয় অনেক সংস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। তাই স্থানীয় সংস্থাগুলোর দ্বন্দ্ব ও কলহের কারণে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

৮. কর্মের অনিশ্চয়তা : এসব কর্মসূচিতে যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিন্তু প্রশিক্ষণের পর কোনো কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়নি ফলে এটি প্রকল্পের জন্য একটি প্রতিবন্ধক।

৯. মর্যাদার অভাব : শহর সমাজসেবা কর্মীদের যে মর্যাদা প্রাপ্য তা অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয় এবং তাদের পদোন্নতি ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে রয়েছে সীমাবদ্ধতা। ফলে তাদের কর্মতৎপরতা হ্রাস পায়। যা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্তরায়।

১০. সমাজকর্মী মনোভাবের অভাব : পৌর সমাজসেবা কর্মকর্তাদের মনোভাব অফিসার সুলভ। অথচ তাদের সমাজকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কথা। এর ফলে জনগণ ও কর্মসূচির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করা যায় যা কি না শহর সমাজসেবার অন্যতম সমস্যা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার উপরিউক্ত সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্যাগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে বাধাস্বরূপ। এসব সমস্যা দূর করতে পারলেই প্রকল্প গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষ ও দেশের ও কল্যাণ হবে।

প্রশ্ন॥৪০॥ গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যাবলি লিখ।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যাবলি তুলে ধর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যাবলি উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : গ্রামীণ সমাজসেবা বাংলাদেশ সরকারের গ্রামোন্নয়ন ভিত্তিক একটি বৃহৎ কর্মসূচি। গ্রামীণ জনগণের জীবন চলার পথে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানে এ কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবার রয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম যা গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যাবলি : গ্রামীণ সমাজসেবার কর্মকর্তা সব ধরনের কাজে নেতৃত্ব দানের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি একজন পথপ্রদর্শক, সংগঠক, গবেষক, সমন্বয়কারী ও পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি প্রকল্পের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর গতিশীল কার্যাবলি ও ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. সম্পদ ও সমস্যা চিহ্নিত করা : গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তা গ্রামীণ জনগণের সম্পদ ও তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তিনি আলোচনা, সাক্ষাৎকার, জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত সহায়তা করেন। এক্ষেত্রে সমাজসেবা কর্মকর্তা গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

২. জনগণকে সংগঠিত করা : গ্রামীণ জনগণ প্রায়ই অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকে। তাই তাদেরকে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালান তিনি। এক্ষেত্রে তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

৩. জনগণকে সচেতন করা : গ্রামীণ লোক অজ্ঞ ও অসচেতন। তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের সচেতন করা অত্যাবশ্যক। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তা এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৪. কর্মসূচি প্রণয়ন : গ্রামীণ উন্নয়নে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজটি করে থাকেন সমাজসেবা কর্মকর্তা। এক্ষেত্রে তিনি কর্মসূচি প্রণেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

৫. সামঞ্জস্য বিধান : গ্রামীণ জনগণের সম্পদ ও সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কর্মকর্তার অন্যতম কাজ। এজন্য তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবে প্রয়োগ করেন।

৬. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ : গ্রামীণ সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ অপরিহার্য। এজন্য তিনি নেতা নির্বাচিত করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন।

৭. পরিবর্তনের প্রতিনিধি : গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তাকে বলা হয় পরিবর্তনের প্রতিনিধি। তিনি জনগণের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেন এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে প্রচেষ্টা চালায়।

৮. যোগাযোগ রক্ষা করা : জনগণ উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তা জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি জনগণের অংশগ্রহণেরও সুযোগ সৃষ্টি করেন।

৯. তত্ত্বাবধান ও দায়িত্ব বণ্টন : তিনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব বণ্টন করে থাকেন। এছাড়া তিনি গ্রামীণ সমাজসেবার সকল কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

১০. মূল্যায়নকারীর ভূমিকা : গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সফলতা ব্যর্থতা নির্ণয় করা সমাজসেবা কর্মকর্তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্যই তাকে মূল্যায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এর মাধ্যমে কর্মসূচির সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, একজন গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকর্তা গ্রামীণ উন্নয়নের প্রাণ। তিনি কর্মসূচিসমূহকে বেগবান ও ফলপ্রসূ করে তোলেন। কখনো তিনি শিক্ষক, কখনো গবেষক, কখনো পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে গ্রামীণ উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। সুতরাং বলা যায় যে, গ্রামীণ উন্নয়নে সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যাবলি অনন্য।

প্রশ্ন॥৪১॥ সংক্ষেপে গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্বসমূহ লিখ।

অথবা, সংক্ষেপে গ্রামীণ সমাজসেবার প্রয়োজনীয়তাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সংক্ষেপে গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্বসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা। যা সরকারি সহায়তায় অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্বসমূহ : বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, জনসংখ্যা স্ফীতি, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান প্রভৃতি গ্রামের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। নিম্নে গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

১. জীবনমান উন্নয়ন : গ্রামের অধিকাংশ জনগণই নিম্নমানের জীবনযাপন করেন। অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, নিম্ন আয় প্রভৃতি দায়ী। গ্রামীণ সমাজসেবা অবহেলিত, দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের স্বনির্ভর করার জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। এজন্যই গ্রামীণ সমাজসেবার তাৎপর্য অপরিসীম।

২. আয়বৃদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন : গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে গ্রামীণ সমাজসেবা। এজন্য তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩. নারীসমাজের উন্নয়ন : নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি তথা অবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ সমাজসেবায় রয়েছে বিশেষ কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে নারীসমাজকে উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে।

৪. জনসংখ্যা স্ফীতি রোধ : জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যান্য সমস্যারও উৎস। গ্রামীণ সমাজসেবা জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলে এবং ছোট পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন : গ্রামের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রামীণ সমাজসেবা গ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. কুটির শিল্পের উন্নয়ন : এক সময় এদেশের গ্রামগুলো কুটিরশিল্পভিত্তিক ছিল। গ্রামীণ সমাজসেবা কুটিরশিল্প পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে থাকে।

৭. সমবায় সমিতি গঠন : "একতাই বল" গ্রামীণ সমাজসেবা এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনগণকে সহায়তা করে। তাই ভূমিহীন মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা সর্বাত্মক সহযোগিতা করে।

৮. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা : গ্রামের মানুষ যেন তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে সে লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ মানুষের কল্যাণ তথা সমস্যার সমাধানে গ্রামীণ সমাজসেবা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এটি অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবার ভূমিকা শুধু অতুলনীয় নয় অনুকরণীয় বটে।

প্রশ্ন॥৪২॥ গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সমস্যাসমূহ তুলে ধর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের দুর্বলদিকসমূহ তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : গ্রামীণ সমাজসেবা বাংলাদেশের সরকারের গ্রামোন্নয়ন ভিত্তিক একটি বৃহৎ কর্মসূচি। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের নিকট সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ সমাজসেবা।

সমাজসেবা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাসমূহ : গ্রামীণ সমাজসেবা গ্রামীণ জনগণের কল্যাণের নিমিত্তে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এসব কর্মসূচির বাস্তবায়নের পথে অনেক সমস্যা এসে দাঁড়ায়। এই সমস্যাগুলোই কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. প্রকল্পের স্বল্পতা : পল্লি এলাকার চাহিদা বা সমস্যার তুলনায় প্রকল্পের পরিমাণ অনেক কম। ফলে এলাকার সমস্যার সমাধানে তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

২. ঋণ আদায়ে মন্থর গতি : গ্রামীণ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও সমস্যাগ্রস্তদের ঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু অনাদায়ি ঋণ আদায়ের কোনো সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই ফলে অনেক ঋণই অনাদায়ি থেকে যায়।

৩.আধুনিকীকরণের অভাব : এ প্রকল্পের কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নে আধুনিকীকরণ করা হয় না। ফলে আধুনিকীকরণ না করার ফলে এর পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৪. উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির অনুপস্থিতি : এ প্রকল্পে এখনো তথ্যপ্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটে নি। সবক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার না করা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব এর পুরোপুরি সফলতা আসে নি।

৫. সমাজকর্মীর স্বল্পতা : কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ে সমাজকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এছাড়া পর্যাপ্ত কার্যালয়ের ও অভাব রয়েছে।

৬. পরিবহণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা : এ কর্মসূচির আওতায় মাঠকর্মীদের যাতায়াত এর জন্য পরিবহণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। এতে করে কর্মীদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় অপচয় হয়।

৭. মূলধনের অভাব : গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সেই তুলনায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব রয়েছে এটি অন্যতম বাধা।

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৯. আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্য : আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এ প্রকল্পের অন্যতম অন্তরায়। পেশাদার সমাজকর্ম ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় সমাজসেবা কর্মকাণ্ড প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

১০. সমন্বয়হীনতা : উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের দেশে সরকারি ও বেরসকারি কর্মসূচির ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার অভাব রয়েছে। এই সমন্বয়হীনতা গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পে বাধার সৃষ্টি করছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, নানাবিধ সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায় গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের পথে। যা কিনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসব সীমাবদ্ধতা দূর করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে গ্রামীণ জনগণ উপকৃত হবে।

প্রশ্ন।৪৩। **বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের গুরুত্বসমূহ সংক্ষেপে লিখ।**

অথবা, বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের প্রয়োজনীয়তাসমূহ সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের তাৎপর্যসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারাই এক সময় দেশ পরিচালনা করবে। তাই সুস্থ, সবল ও প্রতিভাবান শিশু সবারই কাম্য। এজন্য শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ একান্ত অপরিহার্য।

শিশুকল্যাণের গুরুত্বসমূহ : শিশু বিকাশের জন্য শিশুকল্যাণ খুবই জরুরি। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, মেধার বিকাশ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। নিম্নে বাংলাদেশের শিশুকল্যাণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

১. শিশু মৃত্যুহার হ্রাস : বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার অত্যধিক। প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুর হারও বেশি। স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অযত্ন প্রভৃতির কারণ এর জন্য দায়ী। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু ওজন স্বল্পতা দূরীকরণ, প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার হ্রাস প্রভৃতির জন্য শিশুকল্যাণ কর্মসূচি অপরিহার্য।

২. এতিম শিশু সমস্যার সংকট দূরীকরণ : এদেশের এতিম শিশুদের অধিকাংশই দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতার শিকার। এসব দরিদ্র এতিম সন্তানদের প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের জন্য অধিক সংখ্যক শিশু সদন কেন্দ্র স্থাপন দরকার। এটি শিশুকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত কাজ।

৩. স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাস : এদেশের অধিকাংশ মা শিশু স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বিশেষ করে শিশুরা ভিটামিন 'এ' র অভাবে অন্ধত্ব বরণ করছে। পুষ্টির অভাবে অনেক শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এ অবস্থার উত্তরণ শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমেই সম্ভব।

৪. মৌল চাহিদাসমূহ পূরণ : মৌল মানবিক চাহিদা ছাড়াও শিশুদের আরো কিছু চাহিদা থাকে সেগুলো যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে পূরণ না হলে, শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয়। শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব।

৫. স্বাস্থ্য পরিচর্যা : মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ তথা যত্নের জন্য শিশুকল্যাণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। এজন্য বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের গুরুত্ব অত্যধিক।

৬. মায়েদের সচেতন করা : শিশুকল্যাণের জন্য সবার আগে প্রয়োজন মায়ের সচেতনতা। শিশুরা নানাবিধ সমস্যায় ভোগে মায়েদের কুসংস্কারের জন্য। শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মায়েদের সচেতন করে তোলা যায়।

৭. শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করা : সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই এ কর্মসূচির আওতায় শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৮. প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন : শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. কিশোর অপরাধ সংশোধন ও পুনর্বাসন : কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য কেন্দ্র রয়েছে ৩টি মাত্র। সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রধানত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে। তাই শিশুদের সুস্থ সুন্দর ও সম্ভাবনাময়ী মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিশুকল্যাণ কর্মসূচি ব্যাপকহারে প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন।৪৪। **প্রবেশনের শর্তগুলো উল্লেখ কর।**

উত্তর। ভূমিকা : প্রবেশন ব্যবস্থায় মুক্তিদানের জন্য অপরাধীকে কতিপয় শর্ত পালন করতে হয়। এসব শর্তের উপর ভিত্তি করেই অপরাধীকে প্রবেশন অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রবেশনের শর্তাবলি : প্রবেশন শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভবিষ্যতে অপরাধ করবে না বলে অপরাধীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।
২. সমাজের সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা।
৩. প্রবেশন কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চলাফেরা করা।
৪. সমাজে অবস্থানকালীন অন্য কোন অপরাধীর সংস্পর্শে না যাওয়া।
৫. সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি মেনে চলা।
৬. সমাজে বসবাসরত অবস্থায় সাধারণ কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া।
৭. প্রবেশন কর্মকর্তার অনুমতি না নিয়ে নিজস্ব কর্মস্থল বা বাসস্থান ত্যাগ না করা।
৮. আদালত প্রদত্ত নির্দিষ্ট তারিখে অবশ্যই হাজির দিতে হবে।
৯. প্রবেশন কর্মকর্তা যে কোন সময় অপরাধীর গৃহ পরিদর্শন করতে পারবেন। এতে অপরাধীর কোন আপত্তি থাকবে না।
১০. অপরাধী তার আয়ের উৎস সম্পর্কে প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।
১১. সংশোধনের পর তাকে যেভাবে পুনর্বাসিত করা হয় তা মেনে নিতে হবে।
১২. আদালত কর্তৃক কোন নির্ধারিত স্থানে অপরাধীকে বসবাস করতে হতে পারে।

উপসংহার : প্রবেশনের শর্তগুলো প্রবেশনাধীন ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়। প্রবেশনের শর্ত ভঙ্গ করলে প্রবেশন বাতিল হয়ে যায়। তখন প্রবেশনাধীন ব্যক্তি প্রবেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন৪৫। স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর। ভূমিকা : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম নানারকম কর্মক্রমের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ও মানুষের জীবন যাত্রীর মান উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও সক্ষম করে মানুষকে পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সাহায্য করাই স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য।

সাধারণ অর্থে, সাধারণ অর্থে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম বলতে জনসেবামূলক কাজকর্মকে বুঝায়। আমাদের দেশে সাধারণত দুভাবে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। **প্রথমত,** সরকারিভাবে। **দ্বিতীয়ত,** বেসরকারিভাবে। বেসরকারিভাবে পরিচালিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কার্যক্রম বলে অভিহিত করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক ভূমিকা পালন করতে শক্তিশালীকরণ এবং মানুষকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, বেসরকারি সমাজকল্যাণ জনসাধারণের নানারকম চাহিদা পূরণার্থে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ প্রতিষ্ঠান জনগণের সরকারি অর্থ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সাহায্য পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে।

সংজ্ঞাগত অর্থে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম বা সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছা সমাজকর্মের সচিবালয় তাদের এক সম্মেলনে বলেছেন, "স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম সামাজিক কার্যক্রমের এমন এক কৌশল, যার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে গৃহীত এবং পরিচালিত সব উন্নয়নমূলক কাজে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।"

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যেসব প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কর্মীগণ জনগণের কাছাকাছি থেকে তাদের সাথে সহজে মেলামেশা করে জনগণের আস্থা অর্জনে সহায়তা করে। স্বেচ্ছামূলক কাজের মাধ্যমেই সাধারণ জনগণের চাহিদা, রুচি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করা যায়। এ কারণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন৪৬। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য লিখ।

উত্তর। ভূমিকা : মানুষ জন্মগ্রহণ করে আস্তে আস্তে বড় হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়। বৃদ্ধ বয়সে উপনীতদের সাধারণত প্রবীণ বলা হয়। বাংলাদেশে ৬০ বছরের উর্ধ্বের নরনারীদের সাধারণত প্রবীণ বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ... লক্ষ্য প্রবীণ রয়েছে। যা মোট জন সংখ্যার প্রায় ১০.০৭ ভাগ। ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হবে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কারণে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯২১ সালে গড় আয়ু ছিল ২১ বছর, ১৯৫৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮ বছর এবং বর্তমানে গড় আয়ু প্রায় ৬৫ বছর। গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রবীণদের সমস্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের নানারকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রবীণদের অধিকতর কল্যাণের জন্য এ সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে তোলা দরকার।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৭ এর প্রতিবেদনে সংঘের নিম্নোক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে :

১. বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও যথাযথ সেবা প্রদান করা।
২. প্রবীণ বয়সে সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং চিন্তাভাবনাহীন, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিক নির্দেশনা দেয়া।
৩. সক্ষম প্রবীণদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা।
৪. প্রবীণদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৫. প্রবীণদের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যা অনুসন্ধান ও তাঁর সমাধান বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং সেগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা।
৬. প্রবীণদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৭. দেশের প্রবীণ সমাজের সেবাদানের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মকে বার্ধক্য বিষয়ে সচেতন ও তৎপর করা।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। প্রবীণ মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে তাদের সমস্যা। বাংলাদেশে প্রবীণদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ সংঘের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা প্রবীণদের অধিকতর সেবাদানে বাধার সৃষ্টি করছে। তাই প্রবীণদের কল্যাণ ও অধিক সেবাদানের লক্ষ্যে যতদ্রুত সম্ভব এ সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে তুলতে হবে।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ সমাজসেবা কাকে বলে? সমাজসেবার উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা কর। সমাজসেবা কর্মসূচির শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সমাজসেবার ব্যাখ্যা দাও। সমাজসেবার লক্ষ্য ও ধরণ আলোচনা কর।

অথবা, সমাজসেবা কী? সমাজসেবার উল্লেখ ও প্রকৃতি আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজসেবা হল সামাজিক উন্নয়ন এবং নীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি কল্যাণরাষ্ট্রই সমাজসেবার প্রতি সর্বোত্তম গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কেননা সমাজসেবা ছাড়া কোন সমাজের সার্বিক কল্যাণ কখনও নিশ্চিত করা যায় না। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। তখনকার সমাজে আর্তমানবতার সেবায় পরিচালিত যে কোন প্রকারের কর্মকাণ্ডকে সমাজসেবা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বর্তমান যুগেও সাধারণ জনগণ সমাজসেবা বলতে বুঝে থাকে দুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় গৃহীত কর্মকাণ্ড। আর এজন্যই আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজসেবাকে এতবেশি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

সমাজসেবা : ঐতিহ্যগত বা সনাতন ধ্যানধারণা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সমাজসেবা (Social Welfare) হল সমাজের সমস্যাগ্রস্ত, দুস্থ, এতিম ও অসহায় শ্রেণীর উন্নয়ন ও কল্যাণসাধনে গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। আধুনিক ধারণানুযায়ী সমাজসেবা হল মানবসম্পদের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণের জন্য সংগঠিত কর্মকাণ্ডের সমন্বিত রূপ। অবশ্য আধুনিককালে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমাজসেবাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সমাজসেবার কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

সমাজসেবাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (Social and Economic Commission of United Nations) মন্তব্য করেছেন, "Social service is an organised activity that aims at helping towards a mutual adjustment of individuals and their environment." অর্থাৎ, সমাজসেবা হল ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে গৃহীত ও সংঘটিত কার্যাবলির সমষ্টি।

সমাজকর্ম অভিধান বা **Social Work Dictionary** এর ৩৫৬ নং পৃষ্ঠায় সমাজসেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "Social services is the activities of social workers and others in promoting the health and well-bein[g of] our people and in helping people become more self sufficient preventing sependency: strengthenin[g] family relationships and restoring individuals, families, groups or communities to successful socia[l] functioning." অর্থাৎ, সমাজসেবা হল সমাজকর্মী এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত একটি সুসংগঠিত কার্যক্রম যা প্রধানত মানুষের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত। এসব কার্যক্রম মানুষকে অধিক স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে, পরনির্ভরশীলতা প্রতিরোধ করে, পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করে এবং ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সমষ্টির সদস্যদের সফলভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজসেবা হচ্ছে সেসব কার্যাবলির সমষ্টি যা মানবসম্পদের উন্নয়ন, প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষকে সাহায্য করাই হ[ল] সমাজসেবার মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে সমাজসেবার উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরা হল :

৮. মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য পর্যা[প্ত] সম্পদ লাভে মানুষকে সহায়তা করা;

৯. সমাজের জনগণের সন্তান ও পোষ্যদের সেবা[য়] করার ব্যবস্থা করা;

১০. সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত কর[ার] জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;

১১. মানুষকে সমাজ এবং পরিবেশের উপযোগী ক[রে] তৈরি করা;

১২. সমাজের সম্পদ ও সমাজসেবা গ্রহীতাদের মা[ঝে] তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করা;

১৩. মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গি[ক] সবরকম কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করা;

১৪. সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাদের যথাযথ ভূমি[কা] পালনে নিশ্চিত করার জন্য সমাজের সর্বস্তরে সামাজিক সম্পর্ক শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করা।

উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে সমাজসে[বা] কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

সমাজসেবা কর্মসূচির শ্রেণীবিভাগ : সমাজের প্রতি[টি] মানুষকে তাঁদের আর্থসামাজিক সমস্যার মোকাবিলা এবং যথা[যথ] সামাজিক ভূমিকা পালনকে নিশ্চিত করার জন্যই সমাজসে[বা] কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সমাজসেবা কর্মসূচি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে সমাজসেবা কর্মসূচিকে আ[মরা] তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। নিম্নে সমাজসেবা কর্মসূচির তিনটি শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. মানুষের সামাজিকীকরণ ও বিকাশ সম্পৃক্ত সমাজসেবা কর্মসূচি : সমাজে মানুষের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ সামাজিকীকরণ ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন। তাই সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিকীকরণ ও বিকাশে সহায়তা করার জন্য অনেক রকম সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এ ধরনের সমাজসেবা কর্মসূচি শিশু-কিশোর, বয়স্ক, বিকলাঙ্গ এবং অক্ষম জনগণের সুষ্ঠ সামাজিকীকরণ ও বিকাশ সাধনের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রকারের সমাজসেবা কার্যক্রমসমূহ সামাজিক এবং সমষ্টির মূল্যবোধ আত্মস্থকরণ হতে ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়তা করে থাকে। পরিবার এবং শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্কাউটিং কর্মসূচি, পিতামাতার শিক্ষামূলক কার্যক্রম প্রভৃতি সমাজসেবা কর্মসূচি এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

২. সাহায্য, প্রতিকার, পুনর্বাসন ও সামাজিক সংরক্ষণমূলক সমাজসেবা কার্যক্রম : সমাজের অধিকারবঞ্চিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অসহায় শ্রেণীর সাহায্য, প্রতিকার, পুনর্বাসন ও সামাজিক সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজন হয় সমাজসেবাকে নিশ্চিত করার জন্য। এ প্রকারের সমাজসেবা কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাভোগী শ্রেণী নিয়ে ব্যাপৃত। এরকম সমাজসেবা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় প্রকার হতে পারে। এসব কর্মসূচি জনগণের বিভিন্ন রকমের বিচিত্র সমস্যা সমাধান করার কাজে নিয়োজিত। পারিবারিক সেবা প্রতিষ্ঠান, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রবেশন এবং প্যারোল কর্মসূচি, শিশুকল্যাণ কর্মসূচি, হাসপাতাল, স্কুল ও প্রবীণদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো এ প্রকারের সেবাদান কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়িত করে চলেছে। এসব কর্মসূচিসমূহ সমাজসেবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

৩. সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা ও প্রয়োজনের জন্য গৃহীত সমাজসেবা কর্মসূচি : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা বা ব্যবহারের পথ সুগম করা সমাজসেবা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং অন্তরায় সৃষ্টিকারী উপাদানের প্রভাবে সমাজে প্রাপ্ত সামাজিক সুযোগ সুবিধা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের দ্বারা সম্পদ ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করে দেয়। যেমন– সমাজের কোন প্রতিষ্ঠান কি প্রকার সেবা প্রদান করে সে সম্পর্কিত তথ্যাবলির অভাবে বা প্রতিষ্ঠানের সেবা লাভের জটিলতায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার কারণে সেবা লাভ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা, বয়স ইত্যাদি কারণেও সুবিধাভোগী শ্রেণী সুবিধা লাভ হতে বঞ্চিত হয়। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত সেবা লাভের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতার। এ প্রকার সেবার অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সেবা হল তথ্য, উপদেশ, পরামর্শ, আইনগত সেবা ইত্যাদি ব্যক্তি এবং দলভিত্তিক সমাজসেবা কর্মসূচি প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা ব্যবহারের পথ সুগম করার জন্য মানুষকে সহায়তা প্রদান করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজের আর্তমানবতার সেবাই হল সমাজসেবা কর্মসূচি। কর্মসূচির কাজগুলোর উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এগুলো শ্রেণীভেদ করা হলেও সবরকম কর্মসূচির একটিই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, যা সমাজের সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা। কারণ বর্তমানকালে সমাজসেবা বলতে দুস্থ অসহায়দের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচিকে বুঝানো হয়ে থাকে।

প্রশ্ন॥২॥ গ্রামীণ সমাজসেবা কি? গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞা দাও। গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধর এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা ব্যাখ্যা দাও। গ্রামীণ সমাজসেবার বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক এর প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। এদেশের সমাজব্যবস্থা গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০% লোক এখনও গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে। সুতরাং গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন সাধন ছাড়া দেশের উন্নয়ন কামনা করা আর বোকার রাজ্যে বসবাস করা একই কথা। বাংলাদেশের গ্রাম অসংখ্য সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, উচ্চ জন্মহার ইত্যাদি হাজারও সমস্যা এদেশের গ্রাম্য জীবনকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে আছে। আর তাই এসব সমস্যার সমাধান করে গ্রামের আপামর জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। গ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

• গ্রামীণ সমাজসেবা : গ্রামীণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যেসব সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাই গ্রামীণ সমাজসেবা। সাধারণভাবে গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে বুঝায় গ্রাম অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে গৃহীত একটি সমন্বিত বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রকাশিত 'Social Services in Bangladesh' নামক গ্রন্থে Rural Social Service কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "গ্রামীণ সমাজসেবা হল বহুমুখী এবং সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ সকল শ্রেণীর জনগণের সুষম এবং সার্বিক কল্যাণসাধন ও মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন করা যায়।

গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞায় পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের দ্বারা গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম্য সমস্যা সমাধানের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামীণ সমাজসেবা। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত পশ্চাৎপদ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত সমাজসেবা কার্যক্রম হল গ্রামীণ সমাজসেবা।

গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য : গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম, গ্রামীণ সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করলে গ্রামীণ সমাজসেবায় কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নিম্নে গ্রামীণ সমাজসেবার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হল :

১. গ্রামীণ সমাজসেবায় গ্রামকে উন্নয়নের একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২. গ্রামের সকল অসুবিধাগ্রস্ত, অধিকারবঞ্চিত এবং অবহেলিত গোষ্ঠীকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়, যারা সমাজের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ হতে বঞ্চিত।

৩. গ্রামীণ সমাজসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটা একটি বহুমুখী এবং সমন্বিত গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

৪. গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পে নিয়োজিত সমাজসেবা অফিসার এবং কর্মীগণ পরিবর্তনের বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৫. গ্রামীণ সমাজসেবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করে জনগণের শহরমুখী প্রবণতা রোধ করা।

৬. গ্রামীণ সমাজসেবার আরেকটি দিক হল এখানে নিম্নপর্যায় থেকে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়, যাতে পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়নে সকল স্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

৭. গ্রামীণ সমাজসেবায় জনগণ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮. গ্রামীণ সমাজসেবায় গ্রামের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশের সমাজ জীবন দরিদ্রতা, জনসংখ্যা নীতি, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, উদাসীনতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। গ্রামের জনগোষ্ঠীকে এসব সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে প্রত্যাশিত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। তাই অতি সংগত কারণেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ নে নিম্নে বাংলাদেশের গ্রাম্য জনগণের অবস্থার উন্নয়নে গ্রা সমাজসেবা কার্যক্রমের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্প আলোচনা করা হল :

১. গ্রামের অবহেলিত এবং অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় : গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প গ্রাম উন্নয়নের এ আধুনিক পদ্ধতির নাম। গ্রামাঞ্চলের নানামুখী উন্নয়ন সাধ জন্য বহুকাল আগে থেকেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, যেম শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, সমবায়, পল্লিউন্নয়ন কাজ ক আসছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত অগ্রগতিও সা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন ক্ষেতম এবং বর্গাচাষি, অসহায় মহিলা, বেকার ভবঘুরে যুবক এ বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এ শ্রে সবরকম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে থেকে যায়। ফলে তা জীবিকা অর্জনের প্রত্যাশায় পাড়ি জমায় শহরে, নয়তো গ্রামে হতাশার কাফন গায়ে জড়িয়ে জড় পদার্থের ন্যায় জীবনযাপ করে। এ শ্রেণীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামী সমাজসেবা এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করে। সুতরাং দে যাচ্ছে গ্রামের ঐ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধ গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা এবং আয় বৃদ্ধি করা : গ্রা জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশই অদক্ষ এবং স্বল্প আয়ী। গ্রামে ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, মহিলা এবং অন্যান্য নির্ভরশীল সম্প্রদ গ্রামে এক অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করে। এদের অন্য কো উপার্জনশীল কাজ করার সুযোগ, দক্ষতা বা পুঁজি কোনটি নে এদের জন্য গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ উপকরণের সাহায্যে কর্ম বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দান করে তাদের দক্ষতা বৃ কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনকল্পে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রাম্য জনগো দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির জন্যও গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্র গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

৩. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। বিপুলসংখ্যক নারী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত কর না পারলে প্রত্যাশিত সুষম গ্রামীণ উন্নয়ন আশা করা যায় ন গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে দরিদ্র ও বিত্তহীন গ্রামীণ পরিবা মহিলাদের উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার প্রতি অধি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

৭. দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষে মাঝে নাগরিক চেতনা, দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম বৃদ্ধি করার প্রচে চালানো হয়, যা দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণে পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৪. সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী জাতি গঠন করা : গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি বিরাট বাধা হল গ্রামের মানুষের ব্যাপক নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং নিয়তিনির্ভর মানসিকতা। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকাণ্ডে এসব মৌলিক সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রাম্য জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতার মানসিকতা জাগিয়ে তোলার জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মকাণ্ডে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা : জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। তাই গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে বয়স্ক কেন্দ্র, যুব ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্রে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুতরাং দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেও গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

৬. স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করা : গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হল গ্রামের মানুষের উদ্যমহীনতা, গতানুগতিক জীবন এবং চিন্তাধারা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন এবং কর্মসূচির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করা। ফলে জনগণ কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৮. যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করা : গ্রামীণ সমস্যাসমূহের পরিকল্পিত সমাধানের জন্য প্রয়োজন সরকার এবং জনগণের যৌথ প্রচেষ্টার সমষ্টিকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম, যা গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে নেওয়া হয়। সুতরাং গ্রামের অসংখ্য সমস্যা সমাধানেও গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব অপরিসীম।

৯. স্থানীয়ভাবে গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করা : গ্রামীণ সমস্যার সমাধান গ্রাম পর্যায়ে না করা হলে শহরকেন্দ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যা সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি তাই গ্রামীণ পর্যায়েই গ্রাম্য সমস্যার সমাধান দিতে প্রচেষ্টা চালায়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। গ্রামের অবহেলিত অধিকারবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা এতদিন সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হতো, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর ও সম্পদশালী জাতি গঠনে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন॥৩॥ গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) প্রকল্পের কর্মসূচি ব্যাখ্যা কর।

[জা. বি.-২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৩]

অথবা, **কি কি কার্যক্রম গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয় আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। এদেশের সমাজব্যবস্থা গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০% লোক এখনও গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে। সুতরাং গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কামনা করা আর বোকার রাজ্যে বসবাস করা একই কথা। বাংলাদেশের গ্রাম অসংখ্য সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, উচ্চ জন্মহার ইত্যাদি হাজারও সমস্যা এদেশের গ্রাম্য জীবনকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে আছে। আর তাই এসব সমস্যার সমাধান করে গ্রামের আপামর জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। গ্রাম্য জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণসাধনে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের গৃহীত কর্মসূচিসমূহ : গ্রামাঞ্চলের চরম দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক ও অবহেলিত নারী সম্প্রদায়, স্বাস্থ্যহীন এবং পুষ্টিহীন শিশু এবং ভবঘুরে ও উচ্ছৃঙ্খল বেকার যুব সম্প্রদায়ের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্মানজনক জীবনযাপন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে গ্রামীণ সমাজসেবার যাত্রা শুরু। গ্রামীণ সমাজসেবার সামগ্রিক কর্মসূচি রচিত হয় গ্রামে বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যাগুলো সমাধান করার মধ্যে। যেসব গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রাম্য জনগণের অবস্থার উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়েছে নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

১. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি : গ্রামের অধিকাংশ জনগণই অদক্ষ এবং স্বল্প আয়ী। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় না, যা তাদের নিম্ন জীবনমানের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই গ্রামীণ নিম্ন আয়ের জনগণ, বেকার, অর্ধবেকারসহ অন্যান্য বিভিন্ন সময়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় মৎস্য চাষ, পশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া মূলধন বিনিয়োগ এবং মূলধন সৃষ্টির জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন, ধানভাঙা প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, রিকশা ক্রয় প্রভৃতি কর্মসূচি এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ কর্মসূচির অধীনে দেশের ৪৬১টি থানায় প্রায় দশ লাখ জনগোষ্ঠীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল এবং উনিশ লাখ পরিবারকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য ১০২·১৫ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতাধীন রয়েছে।

২. মাতৃকেন্দ্র : বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে ৮টি করে মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব মাতৃকেন্দ্র স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামীণ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জনসংখ্যা, শিক্ষা ও পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, শিশু যত্ন ও প্রতিপালন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক এবং জাতীয় পর্যায়ে মহিলাদের ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত মাতৃকেন্দ্রের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির নাম হল যথা : ১. প্রশিক্ষণ ফার্ম উৎপাদন কেন্দ্র এবং ২. মহিলা ঋণদান কর্মসূচি। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সারা দেশের মোট ১৫৬টি থানায় ৯৮০০টি মাতৃকেন্দ্র (Mother Club) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৯৭ সলের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৮৩,৭১৮ জন মহিলাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ৫,৮০৩ জন মহিলাকে ১·২৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের ষষ্ঠ স্তরে ২০০১ সালে দেশের ২০০টি উপজেলায় ৩,০০০ মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

৩. সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি : দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুঁজির অভাবই হল গ্রামীণ দরিদ্র ও দুস্থতার প্রধান কারণ। তাই পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়। গ্রামের ভূমিহীন কৃষক, ভবঘুরে ও উচ্ছৃঙ্খল বেকার যুবক এবং দুস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুদমুক্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৮ লাখ পরিবারকে মোট ৮৭·৪২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয় এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৯ লাখ পরিবারকে এ ঋণদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়।

৪. কমিউনিটি সেন্টার (গোষ্ঠী কেন্দ্র) : গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রামীণ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত জনসমষ্টিকে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করার জন্য গ্রহণ করা হয়। সারাদেশে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এরকম ১৯৬টি কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়। এ কমিউনিটি সেন্টারের প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামীণ সমস্যা, সম্পদ এবং সমাধান সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সচেতন করে তোলা।

৫. সম্প্রসারিত পল্লি সমাজকর্ম প্রকল্প : বাংলাদেশে ১৯৭৪ সাল থেকে সম্প্রসারিত পল্লি সমাজকর্ম নামক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম জোরদার, সম্প্রসারণ এবং ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় চারটি পর্যায়ের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫ম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাপ্ত ৪টি পর্যায়ে দেশের ৩৪২টি থানার এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ১৯৯টি থানাসহ মোট ৪১৬টি থানায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের এ প্রকল্পের লক্ষ্য হল গ্রামের ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, ভবঘুরে বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুকিশোর, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনা যোগ্যতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা। ১৯৭৪ সালে এ প্রকল্প শুরুর পর থেকে ১৯৯৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সারাদেশের ৩৪২টি থানায় ১৭ লাখের অধিক লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবারকে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া ৫,৯৩,৬৯০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সম্প্রসারিত পল্লি সমাজকর্ম প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের আওতায় ২০০১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩১১টি উপজেলায় ৩০৬ লাখ পরিবারকে ৪৪·২০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ করা হয়েছে।

৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পল্লি মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে রোধ করার জন্য বাংলাদেশে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হল গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মাতৃকেন্দ্রগুলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা। পল্লি মাতৃকেন্দ্র (Mother Club) একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প। নানারকম বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা এ কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পল্লি মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার প্রকল্পের পঞ্চম পর্যায়ের কার্যক্রম ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে ২০০১ সাল থেকে ষষ্ঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ১৯৭৪ সাল থেকে এ প্রকল্পের আওতায় কর্মসূচি গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৯ অনুসারে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ প্রকল্পের তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা ছিল ৭,৮৩,০৫৩ জন। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত দেশের ১৬৫টি থানায় ৪৪,১৮১ জন মহিলাকে ১২·২২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ৬,৩৫,৭৬৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৮,৮২,৯৩৫ জন মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হয়। এ প্রকল্পের পঞ্চম পর্যায়ের আওতায় দেশের ২২২টি থানায় ৮,৩১,৫৬৭ জন মহিলাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। এ প্রকল্পের ষষ্ঠ পর্যায়ের আওতায় দেশের ২০০টি থানায় ৩,০০০ টি মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সরকারি সাহায্য সহায়তার দ্বারা গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষক, ভবঘুরে বেকার যুবক, দুস্থ নারী ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ তহবিল, ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের মত আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পগুলোকে আরও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন। গ্রামীণ সমাজসেবা কাকে বলে? গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা কী? গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

অথবা, গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বুঝ? গ্রামীণ সমাজসেবার কার্যক্রম আলোচনা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের সমাজব্যবস্থা গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সকল আর্থসামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০% লোক এখনও গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে। সুতরাং গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন সাধন ছাড়া দেশের উন্নয়ন কামনা করা আর বোকার রাজ্যে বসবাস করা একই কথা। বাংলাদেশের গ্রাম অসংখ্য সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, উচ্চ জন্মহার ইত্যাদি আরও সমস্যা এদেশের গ্রাম্য জীবনকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে রেখেছে। আর এসব সমস্যার সমাধান করে গ্রামের আপামর জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। গ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

গ্রামীণ সমাজসেবা : গ্রামীণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যেসব সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাই গ্রামীণ সমাজসেবা। সাধারণভাবে গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে বোঝায় গ্রাম অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে গৃহীত একটি সমন্বিত বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রকাশিত 'Social Services in Bangladesh' নামক গ্রন্থে 'Rural Social Service' কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "গ্রামীণ সমাজসেবা হল বহুমুখী এবং সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ সকল শ্রেণীর জনগণের সুষম এবং সার্বিক কল্যাণ সাধন ও মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন করা যায়।"

গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞায় পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের দ্বারা গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম্য সমস্যা সমাধানের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামীণ সমাজসেবা। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত পশ্চাৎপদ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত সমাজসেবা কার্যক্রম হল গ্রামীণ সমাজসেবা।

গ্রামীণ সমাজসেবার লক্ষ্য : গ্রামীণ জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই গ্রামীণ সমাজসেবার (Rural Social Services) একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। গ্রামীণ সমাজসেবার মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামের দরিদ্র, অধিকারবঞ্চিত ও অসুবিধাগ্রস্ত জনসমষ্টিকে সুসংগঠিত করে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবন মানের উন্নতি সাধন করা। গ্রামীণ সমাজসেবা প্রজেক্টের যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের যৌথ প্রচেষ্টার ভূমিহীন কৃষক, পশ্চাৎপদ নারীসমাজ, বেকার যুবক শ্রেণীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুষম এবং সুশৃঙ্খল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২. গ্রামের ভূমিহীন দুস্থ, অসহায় এবং কর্মহীনদের শহরমুখী প্রবণতা রোধকল্পে গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গ্রামীণ সংগঠন গঠন করা এবং গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪. দেশের জনকল্যাণ বিভাগগুলোর সহযোগিতায় কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশের ব্যাপক বেকারত্ব হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

৫. গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক জ্ঞান এবং ধ্যানধারণা গ্রহণে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করা।

৬. গ্রামীণ ভবঘুরে এবং উশৃঙ্খল যুবকদের প্রেরণা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে গ্রাম সংস্কারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা।

৭. গ্রামে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো।

৮. নির্ভরশীল মানসিকতা পরিবর্তন করে স্বনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা।

৯. গ্রামীণ সমাজে সুস্থ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. সমাজের শারীরিক পঙ্গু এবং অক্ষমদের জন্য কল্যাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

১২. পেশা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় গঠনের মাধ্যমে অকৃষি ভিত্তিক আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

১৩. গ্রাম্য এলাকায় আত্মবিশ্বাস এবং মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশের জাতীয় উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।

উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সময় পরিক্রমায় পরবর্তীতে গ্রামীণ সমাজসেবার লক্ষ্যে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর গ্রামীণ সমাজসেবা সুনির্দিষ্ট পাঁচটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নির্ধারিত করেছেন। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

ক. দেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত পশ্চাৎপদ জনসমষ্টি বিশেষ করে অনগ্রসর ভূমিহীন, বিত্তহীন কৃষক, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু-কিশোর, বেকার বয়স্ক পুরুষ এবং দরিদ্র মহিলাদেরকে সুসংগঠিত করে কারিগরি এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক অর্থনৈতিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

খ. গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান, সঞ্চয় সৃষ্টি এবং অর্থকরী লাভজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

গ. গ্রামের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি উন্নয়ন, শিশু যত্ন, হাতে খাবার স্যালাইন তৈরি, জলাবদ্ধ পায়খানার উপকারিতা, বিশুদ্ধ পানি পানের উপকারিতা ইত্যাদি অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র সক্ষম দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহায়তার জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা।

ঙ. গ্রামের দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বের পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক চেতনার বিকাশ এবং সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, গ্রামের দরিদ্র, অধিকার বঞ্চিত ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করাই গ্রামীণ সমাজসেবা (Rural Social Service) এর মূল লক্ষ্য। গ্রামীণ সমাজসেবা গ্রামীণ জনগণের কল্যাণসাধনে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পল্লির অবহেলিত এবং বঞ্চিত গোষ্ঠীর যারা এতদিন সমাজের দায় হিসেবে পরিগণিত ছিল, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর ও সম্পদশালী জাতি গঠন করা গ্রামীণ সমাজসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, যদি গ্রামীণ সমাজসেবা তার লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রত্যাশিত জীবনমান লাভ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন॥৫॥ শহর সমাজসেবা কর্মসূচির সমস্যা তু ধর। শহর সমাজসেবার সম মোকাবিলার উপায়সমূহ আলোচ কর।

অথবা, শহর সমাজসেবা কর্মসূচির দুর্বল দিক তু ধর। শহর সমাজসেবার সমস্যা মোকাবে পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, USS বা শহর সমাজসেবা কর্মপদ্ধ প্রতিবন্ধকতা তুলে ধর। এ সমস্যা সমাধা উপায় খুঁজে বের কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিল্পায়ন ও শহরায়ণ, প্রাকৃতিক দু বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দার ফলে আমাদের দেশের শহরগু জনসংখ্যার চাপ নিয়ত বেড়েই চলেছে। সীমিত সম্পদের ম জনসংখ্যার চাহিদা ও সমস্যা মিটানোর ক্ষেত্রে শহর সমাজসে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু করে অদ্য এ কর্মসূচির অবদান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রশংসিত। শহরের পরিধি এবং সমস্যার ব্যাপকতা যে হারে বে কর্মসূচির প্রসার কিংবা জনসাধারণের উৎসাহ ও সহযোগি ক্ষেত্রে অনুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি।

শহর সমাজসেবা প্রকল্পের সমস্যা : সনাতন ধা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত শহর সমাজ উন্নয়নের কতিপয় স নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. প্রশাসনিক কাঠামোর রদবদল : বাংলাদেশের অ কার্যক্রমের ন্যায় শহর সমাজসেবা প্রকল্পের অন্যতম সমস্যা প্রশাসনিক রদবদল। এতে কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় সম্ভব হয় না।

২. জনসাধারণের অনীহা : সমাজসেবা কর্মসূচির সফ বহুলাংশে নির্ভরশীল জনসাধারণের সচেতনতা ও আগ্রহের উ কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বেশি থাকার ফলে তারা গতানুগ জীবনযাপনে বিশ্বাসী। নতুন কোন উপায়ে জীবনমান উন্ন তারা ভীত এবং দ্বিধান্বিত।

৩. জনগণের অজ্ঞতা : প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম সঠিক ধারণা এবং জ্ঞানের অভাবে জনগণ একে অন্যান্য সর কর্মসূচির ন্যায় মূল্যায়ন করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজেদের দা ও কর্তব্য সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। জনগণের অজ্ঞতা সচেতনতার অভাব বাংলাদেশের শহর সমাজ উন্নয়নে গুরু প্রতিবন্ধকতা।

৪. ব্যাপক দারিদ্র্য ও পরনির্ভরশীলতা : আমাদের দে ব্যাপক দারিদ্র্যের ফলে আত্মসাহায্য বা আত্মনির্ভরশীল কারণগুলো জনমনে স্থান করে নিতে পারছে না। তারা সব তাৎক্ষনিক ফল পেতে চায়। তাছাড়া পরনির্ভরশীল মনোভ জন্য বৈষয়িক সাহায্যের প্রত্যাশা বেশি করে।

৫. অনুভূত প্রয়োজনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা : সরকারি ভুল নীতি, রাজনৈতিক কারণে এমনসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যা জনগণের অনুভূত প্রয়োজনের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে জনসাধারণ কর্মসূচির বাস্তবায়নে অসহযোগিতা বা বিরোধিতা করে থাকে।

৬. সুষ্ঠু সমন্বয় ও কার্যকর যোগাযোগের অভাব : প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সাথে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু সমন্বয় ও কার্যকর যোগাযোগের জন্য কোনরূপ সমন্বয় সাধনকারী সংস্থা নেই। ফলে প্রকল্প এলাকায় কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি এবং সময় ও সম্পদের অপচয় ঘটে। জনগণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে।

৭. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের অভাব : স্থানীয় প্রশাসনে শহর সমাজসেবা প্রকাশ এবং স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ এবং সম্পর্ক তেমন না থাকায় প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেহেতু উভয়ের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরবাসীর সামগ্রিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি সেহেতু উভয়ের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮. পেশাদার সমাজকর্মীর অভাব : পূর্বে সংগঠক হিসেবে সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগপ্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও সংগঠক হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ফলে সত্যিকার [illegible] এবং প্রশিক্ষণের অভাবহেতু সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের অবদান আশানুরূপ হচ্ছে না।

৯. অর্থ বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা : শহর সমাজসেবা প্রকল্পে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সে তুলনায় সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কম। অর্থের অভাবে প্রয়োজন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হয় না।

১০. সমাজসেবা সংগঠকদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব : শহর সমাজসেবার অধিকাংশ সংগঠক নিজেদের প্রশাসক বা অফিসার মনে করে তাদের ক্রিয়াকর্ম অফিসেই সীমাবদ্ধ রাখেন। জনসাধারণের সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগের অভাবহেতু কর্মসূচি সম্পর্কে জনমনে কোন উৎসাহ বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে নি।

১১.ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প পরিষদ গঠন : গতানুগতিক প্রথায় এবং ধরাবাধা ছকে প্রকল্প পরিষদ গঠন করতে হয়। এতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় জনগণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারছে না।

১২. মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধানের অভাব : ১৯৫৫ সাল হতে এদেশে এ প্রকল্প শুরু হলেও সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে কর্মসূচির মধ্যে প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আজও পরিবর্তন সাধন করা হয় নি। সুষ্ঠু মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে পৌর সমাজসেবা প্রকল্পের ভুলত্রুটি এবং দুর্বলতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয় নি।

১৩. কর্মীদের পদোন্নতি ও সুযোগ সুবিধার অভাব : এ প্রকল্পে নিয়োজিত অফিসারের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং মহল্লা কর্মীদের পদোন্নতির কোন সুযোগ নেই। এতে তাদের কর্মদক্ষতা এবং কর্মস্পৃহা হ্রাস পেয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের মান কমতে থাকে।

১৪. অন্যান্য জাতিগঠনমূলক বিভাগের অসহযোগিতা : শহর সমাজসেবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং সমাজসেবা অফিসারের কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবগত না থাকার কারণে এলাকার অন্যান্য জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলো কার্যকর সহযোগিতা প্রদান করছে না।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সমস্যা সমাধানের উপায় : শহর সমাজসেবা কর্মসূচির সফলতা নির্ভর করছে এর সঠিক বাস্তবায়নের উপর। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এসব সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা দুর করা অনেকাংশে সম্ভব :

ক. অনুভূত প্রয়োজন অনুসারে কর্মসূচি প্রণয়ন : কর্মসূচি হতে সরাসরি ও স্বল্প সময়ে উপকৃত হলে জনগণের মধ্যে অনীহা দেখা দেয়। অনুভূত চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করলে জনগণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অগিয়ে আসে।

খ. ব্যাপক সামাজিক গবেষণা পরিকল্পনা : শহর এলাকার সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক সামাজিক গবেষণা পরিচালনা এবং তার ভিত্তিতে বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

গ. স্থানীয় নেতৃত্বের অভাব : স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

ঘ. প্রত্যক্ষ ও দ্রুত উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি : প্রত্যক্ষ ও দ্রুত উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচির প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করা। যাতে এসব কর্মসূচির ফলাফল স্থানীয় জনগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি এবং সমাজসেবায় তাদেরকে উৎসাহিত করা।

ঙ. সচেতনতা বৃদ্ধি : সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।

চ. সরকারি আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি : সরকারি পর্যায়ে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। যাতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যানুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ ও সময়মতো বাস্তবায়ন করা যায়।

ছ. পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগ : সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার সমাজকর্মীদের শহর সমাজসেবা অফিসার হিসেবে নিয়োগদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

জ. সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন : প্রকল্প এলাকায় কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যাবলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঝ. ব্যাপক প্রচার : শহর সমাজসেবার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। যাতে জনগণ শহর সমাজসেবা প্রকল্প সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

ঞ. ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধানের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ, নিয়মিত গবেষণা ও জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসূচির মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প একটি সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম। কিন্তু এর কর্মসূচি ও কার্যক্রম সমষ্টি উন্নয়ন নীতি এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে নি। বরং কতকগুলো কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতি এর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন নীতি এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে শহর সমাজসেবা প্রকল্প পরিচালিত না হওয়ায় আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তবে উপরিউক্ত সুপারিশ বা পন্থা অনুসারে কাজ করলে ভবিষ্যতে এ প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন॥৬॥ পৌর সমাজসেবা কি? বাংলাদেশে পৌর সমাজসেবা কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [জা. বি.-২০০৭, ২০৯, ২০১১]

অথবা, শহর সমাজসেবা কী বাংলাদেশের শহর সমাজসেবা কর্মসূচির বিবরণ দাও।

অথবা, পৌর সমাজসেবা কাকে বলে। বাংলাদেশে পৌর সমাজসেবার কর্মপদ্ধতির বিবরণ দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে প্রচলিত সরকারি সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন অথচ গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মসূচি হল পৌর/শহর সমাজসেবা। ১৯৫৪ সালের ঢাকা প্রজেক্ট দিয়ে এর সূচনা এবং ১৯৫৬ সালে জাতিসংঘের সহায়তায় ঢাকার কয়েতটুলিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প নামে আর একটি পরীক্ষামূলক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে এর কার্যক্রম ১৯৫৯-'৬০ সালের দিকে আরও ১২টি শহরে এবং ১৯৮০ সালে তা ৬৮টি উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নীত হয়। তবে পরবর্তীতে সরকারি কার্যক্রমের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে শহর/পৌর সমাজসেবা প্রকল্পের পরিধি সংকুচিত করে নিয়ে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০টি শহর সমাজসেবা ইউনিট চালু রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকার ১৯৮৪ সালে 'শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প' নামে পরিচালিত কার্যক্রমের নাম পরিবর্তন করে 'পৌর সমাজসেবা প্রকল্প' নামকরণ করে।

পৌর/শহর/নগর সমাজসেবা : শহুরে সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গৃহীত একটি কর্মসূচি হল পৌর/শহর সমাজসেবা। পেশাদার সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির আলোকে মূলত এ পৌর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শহর সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী সমস্যা; যেমন– দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বস্তি, বাস্তুহারা, আবাসন সংকট, নিরক্ষরতা, কিশোর অপরাধ, অপরাধ প্রবণতা, ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে সমস্যা ইত্যাদি বহুমুখী সমস্যা সমাধানের জন্য শহর সমাজসেবা/পৌর সমাজসেবা পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে সরকার এবং শহুরে জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগ/প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। শহরের Balance Development জীবন এবং পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে (Selfhelp) স্বাবলম্বীকরণের প্রচেষ্টা পৌর সমাজসেবা কর্মসূচিতে পরিলক্ষিত হয়। মূলকথা হল শহরের জনসাধারণের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে, তাদের অংশগ্রহণ ও শ্রম এবং পরস্পরে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয় শহর সমাজসেবা কর্মসূচি।

বাংলাদেশে শহর সমাজসেবা/পৌর সমাজসেবা কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বাংলাদেশে পৌর সমাজসেবা কর্মসূচি যথেষ্ট দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পৌর সমাজসেবা কর্মসূচি কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। সে উদ্দেশ্যগুলো হল নিম্নরূপ :

পৌর সমাজসেবার উদ্দেশ্য : পৌর সমাজসেবা কর্মসূচি মূলত শহুরে সমাজের সমস্যাগ্রস্ত জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। তবে বাংলাদেশে পরিচালিত পৌর সমাজসেবা কর্মসূচি দু'টি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। যথা :

১. শহর এলাকার লোকজন যাতে সেখানকার জীবনযাত্রার সাথে সংগতি বিধান করে চলতে পারে সেজন্য তাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা এবং সাবলম্বন নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতামূলক কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধ করা।

২. দায়িত্বশীল এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নাগরিক সংস্থা গঠন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জোরদার করা। পৌরসভা ঘরবাড়ি সংস্থাগুলোর সাথে পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

পৌর সমাজসেবার কর্মসূচি/কার্যক্রম : বাংলাদেশে পৌর সমাজসেবা কর্মসূচির অধীনে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

বাংলাদেশে পৌর সমাজসেবা কর্মসূচি প্রধানত চার ধরনের কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। যথা :

১. অর্থনৈতিক কার্যক্রম,
২. স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম,
৩. শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম এবং
৪. চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম।

১. অর্থনৈতিক কার্যক্রমে : শহর সমাজসেবা কর্মসূচি যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

ক. মাতৃসদন : উক্ত কর্মসূচি শহরের অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মহিলাদের জন্য প্রণীত। তাদেরকে উক্ত কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, যত্ন ও কল্যাণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের টিকা ও ইনজেকশন প্রদানের ক্ষেত্রে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি পানিবাহিত রোগ থেকে রক্ষার পদক্ষেপ শিক্ষা দেওয়া হয়।

খ. সেলাই কেন্দ্র : স্বল্প আয়ের মহিলাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা দানে সক্ষম করে তোলার জন্য সেলাই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে তারা সেলাই ও উল বুনন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পায় এবং প্রশিক্ষণ শেষে তারা এখানে কাজ করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং তাদেকে লভ্যাংশ প্রদান করে।

গ. কুটিরশিল্প ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : শহরের দরিদ্র পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধির জন্য এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আয়ের পথ সুগম করার নিমিত্তে তাদেরকে কুটিরশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে, সূঁচের কাজ, পাটের কাজ, পোষাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, পুতুল তৈরি, চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

ঘ. পারিবারিক ঋণদান কর্মসূচি : এ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলারা যাতে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সেলাই, হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কর্মসূচির জন্য বিনা সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং এর মাধ্যমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান লাভের সুযোগ প্রদান করা হয়।

২. স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম : শহর সমাজসেবা কর্মসূচির স্বাস্থ্য বিষয়ক যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

ক. মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র : এসব কেন্দ্র থেকে শিশু ও মহিলাদের সন্তান জন্ম পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বিনামূল্যে এবং স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়।

খ. পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র : শহুরে জনসমষ্টিকে উক্ত কর্মসূচির আওতায় পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাদেরকে পরিবারের আকার ছোট রাখতে উৎসাহিত করা হয়। তাদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রিক সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

গ. দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র : অসহায় ও গরিব জনসাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এখান থেকে বিনা পয়সায় ঔষধ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৩. শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম : শহর সমাজসেবা কর্মসূচির শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হল :

ক. বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র : যেসব ছেলেমেয়ে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না বা যাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স পেরিয়ে গেছে তাদের জন্য উক্ত কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে নতুন নতুন ধ্যানধারণার সাথে পরিচিত করা হয় এবং এসব গ্রহণ এবং অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয় : শহরের যেসব অংশে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়ার সুযোগ প্রদান করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় শহর সমাজসেবা প্রকল্পের আওতায়। এসব বিদ্যালয়ের ব্যয় অনেকটাই প্রকল্প পরিষদ বহন করে।

গ. পাঠাগার : শহরের অপেক্ষাকৃত কমবয়সী নাগরিকদের জন্য পৌর সমাজসেবা প্রকল্পের আওতায় পাঠাগার স্থাপন করা হয়। যাতে এসব কোমলমতি শিক্ষার্থী তাদের মেধা চর্চার সুযোগ পায়।

৪. চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম : পৌর সমাজসেবার কর্মসূচি চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত। শহরে খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক স্থাপন, খেলাধুলার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উন্নয়ন ও জনসংখ্যামূলক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া পৌর সমাজসেবার অধীনে অবসর যাপন ও সামাজিক মেলামেশার জন্য Community Center প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

এসব প্রধান প্রধান কর্মসূচি ছাড়াও পৌর সমাজসেবা প্রকল্পের অধীনে মাঝে মাঝে টিকা ও ইনজেকশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে খেলাধুলা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে পৌর সমাজসেবার ইতিহাস যে খুব বেশি দিনের তা বলা যায় না। তারপরেও প্রায় ৫০ বছরের অনুশীলনকালে উক্ত প্রকল্পে কতিপয় সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যেমন– স্বল্প বরাদ্দ, অপর্যাপ্ত কর্মসূচি, অদক্ষ ও অপেশাদার কর্মীবাহিনী ইত্যাদি, যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যার্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যদি আলোচ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা যায় তবে উক্ত প্রকল্প আরও বেশি বেশি সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রশ্ন॥৭॥ শিশুকল্যাণ কাকে বলে? শিশুকল্যাণের উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, শিশুকল্যাণ কী? শিশুকল্যাণের মানদণ্ড আলোচনা কর।

অথবা, শিশুকল্যাণ বলতে কী বুঝ? শিশুকল্যাণের প্রকৃতি আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। সুতরাং শিশুদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের উপরই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নির্ভর করে। তাই দেশ এবং জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই শিশুকল্যাণ অপরিহার্য। শিশুর সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ সহ সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শিশুকল্যাণের আওতাভুক্ত।

শিশুকল্যাণ : সাধারণ অর্থে শিশুর কল্যাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি শিশুকল্যাণ নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশুকল্যাণ প্রত্যয়ই অতীতের তুলনায় ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ব্যাপক অর্থে শিশুকল্যাণ বলতে এসব কর্মসূচিকেই বুঝায় যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধিসাধনে নিয়োজিত এবং এটা জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশুকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

শিশুকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে **Md. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Child welfare refers to care and protection best owed on the child before and after birth, during in fancy and from pre-school age to adolesence."

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী **W. A. Friedlander** তাঁর 'Introduction to social welfare' নামক গ্রন্থে শিশুকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Child welfare also incorporates the social, economic and health activities of public and private welfare agencies which that secure and protect the well-being of all childen in their physical, intellectual and emotional development."

এলিজাবেথ ডব্লিউ ডিউএল এর মতে, "শিশুকল্যাণ বলতে ব্যাপক অর্থে সমাজের সদস্য হিসেবে সকল শিশুর কল্যাণসাধনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও তাঁর লক্ষ্য বুঝায়। এ কার্যাবলির উদ্দেশ্য **প্রথমত,** শিশুর পরিবারের সামর্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজস্ব ও পারিবারিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যাতে শিশুর বাল্যে ও কৈশোরে পুষ্টিসাধন হতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** শিশুর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিশুর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।"

অতএব, শিশুকল্যাণের সংজ্ঞার পরিশেষে বলা যায় যে, শিশুকল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঐসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যাবলির সমষ্টিকে বুঝায় যেগুলো সকল শিশুর শারীরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রভৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিবারের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে থেকে শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে কৈশোর পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

শিশুকল্যাণের উপাদানসমূহ : শিশুর উন্নতির জন্য গৃহীত সবরকম ব্যবস্থাই শিশুকল্যাণ। শিশু জন্মের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুর সামগ্রিক বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল শিশুই শিশুকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শিশুকল্যাণ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর এজন্যই শিশুকল্যাণ বহুমুখী উপাদানে গঠিত। শিশুকল্যাণের প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচনা কর হল :

১. জন্মের পূর্বে সেবা : শিশুর জন্মের পূর্বে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক অবস্থা যাতে সুন্দর, স্বাভাবিক এবং গঠনমূলক থাকে সেজন্য Pre-natal service শিশুকল্যাণের অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। কেননা মায়ের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থা নবজাতক শিশুর উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

২. মায়ের পরিচর্যা এবং বাবা-মার শিক্ষা : মায়ের যথাযথ পরিচর্যার উপরই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে। শিশুকল্যাণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিশু যত্ন ও শিশু পালন বিষয়ক জ্ঞান। শিশুকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাসহ পরিবারের সকল সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং পিতামাতাসহ পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা আবশ্যক।

৩. শিশু পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা : শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশু পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা অপরিহার্য। আর এজন্যই শিশুকল্যাণ এ ধরনের সেবাকে অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৪. সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশ : শিশুকল্যাণের এক[illegible] গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশ। কারণ জ[illegible] থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত মানবসন্তানের ঘনিষ্ঠতম সম্প[illegible] তার পরিবারের সাথে। পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ, স্বাভাবিক এ[illegible] শান্ত না হলে শিশু কিশোরদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠ[illegible] মানসিক বিকাশ এবং যথাযথ সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় না। কাজেই শিশুর জন্য পারিবারিক পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ এব[illegible] গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. শিশুর প্রতি ভালোবাসা এবং স্নেহ : পিতামাত[illegible] ভালোবাসা, স্নেহ এবং সাহচর্যে শিশুর যথাযথ বিকাশে অত্য[illegible] তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এজন্যই শিশুকল্যাণ পিতামাত[illegible] স্নেহ, ভালোবাসা এবং সাহচর্যকে একটি অন্যতম বিশেষ উপাদা[illegible] হিসেবে স্বীকার করে এ বিষয়ে পিতামাতাকে সচেতন ক[illegible] তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৬. মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা : এটা শিশুকল্যাণের এক[illegible] অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মায়ের এবং শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা[illegible] প্রয়োজনীয় পরিচর্যা এবং চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান ক[illegible] অপরিহার্য। বিশেষ করে শিশুসন্তানের স্বার্থেই মায়ের স্বাস্থ্য এব[illegible] পুষ্টি ঠিক রাখা প্রয়োজন। মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হলে স্বাভাবিকভাবে[illegible] শিশু পরিচর্যার ব্যাঘাত এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হবে।

৭. শিশুর চাহিদা পূরণ : শিশুর চাহিদা পূরণ কর[illegible] শিশুকল্যাণের একটি তাৎপর্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। কার[illegible] শিশুর কোন চাহিদা অপূর্ণ থাকলে তা তার মধ্যে হতাশা সৃ[illegible] করে স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

৮. শিশু শিক্ষা : শিশুদের জন্য একঘেয়ে কোনকিছু[illegible] গ্রহণযোগ্য নয়। তাই শিক্ষাকেই তাদের নিকট উপভোগ্য এব[illegible] আকর্ষণীয় করে তোলা আবশ্যক। শিশু শিক্ষার উপাদান এব[illegible] উপায় এমন হওয়া উচিত যা সহজেই শিশুর সুপ্ত প্রতিভা এব[illegible] সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়।

৯. শিশু নির্যাতন রোধ করা : শিশুদের উপর সর্বপ্রকারে[illegible] নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, উৎপীড়ন, ভয়ভীতি থেকে রক্ষা কর[illegible] তাদেরকে স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার উপ[illegible] শিশুকল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে।

১০. প্রাতিষ্ঠানিক সেবা : প্রাতিষ্ঠানিক সেবাও শিশুকল্যাণে[illegible] একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজের অনাথ, এতিম, দুঃ[illegible] পরিত্যক্ত ইত্যাদি শ্রেণীর শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালনপালনে[illegible] জন্য নানারকমের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কোন এতিম খানা[illegible] বেবীহোম, শিশুসদন, দিবাযত্ন কেন্দ্র, দত্তক কেন্দ্র ইত্যাদি[illegible] সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১১. খেলাধুলা ও নির্মল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা : শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা এব[illegible] নির্মল আনন্দের অবদান অপরিসীম। খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদ[illegible] শিশুদের অপরাধ প্রবণতা রোধে এবং দায়িত্বশীল ও উন্ন[illegible] নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১২. সামাজিক নিরাপত্তা : যে কোন প্রকারের দৈব দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি যাতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য শিশুকল্যাণ শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৩. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ সেবা : বিপদগামী শিশুদের চরিত্র সংশোধন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সংশোধনমূলক কর্মসূচি ও পঙ্গুকল্যাণ কার্যক্রম শিশুকল্যাণের অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

১৪. গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ : সামাজিক পরিবেশ সবার উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। শিশুদের উপর এর প্রভাব আরও বেশি। এজন্য পরিবার দল, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান সমষ্টি তথা সমাজের পরিবেশ যাতে গঠনমূলক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় পরিশেষে বলা যায় যে, শিশুকল্যাণ জন্মের পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং শিশুসহ পরিবারের সকল সদস্য, পারিবারিক পরিবেশ বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভৃতি এর আওতায় আসে। শিশুকল্যাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রশ্ন॥৮॥ শিশুকল্যাণ বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে সরকারি শিশুকল্যাণ কার্যক্রমসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, **শিশুকল্যাণ বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশ সরকারের শিশুকল্যাণ কর্মসূচি উন্নয়নে তোমার সুপারিশ প্রদান কর।**

অথবা, **শিশুকল্যাণ কী? সরকার কর্তৃক গৃহীত শিশুকল্যাণ কার্যক্রম আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : সাধারণ অর্থে শিশুকল্যাণ বলতে ঐসব কার্যক্রমকে বুঝায় যা শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পিতামাতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়। যে কোন সমাজে শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং গুণগতমান সাধারণত নির্ভর করে সে সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিশুদের সামাজিকভাবে কিরূপ মূল্যায়ন করা হয় তার উপর। বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তাই বাংলাদেশে সরকারি শিশুকল্যাণ কার্যক্রম তেমনভাবে বিস্তৃত হয় নি।

শিশুকল্যাণ : সাধারণ অর্থে শিশুর কল্যাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি শিশুকল্যাণ নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশুকল্যাণ প্রত্যয়ই অতীতের তুলনায় ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ব্যাপক অর্থে শিশুকল্যাণ বলতে এসব কর্মসূচিকেই বুঝায় যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধিসাধনে নিয়োজিত এবং এটা জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশুকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

শিশুকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে **Md. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Child welfare refers to care and protection best owed on the child before and after birth, during in fancy and from pre-school age to adolesence."

এলিজাবেথ ডব্লিউ ডিউএল এর মতে, "শিশুকল্যাণ বলতে ব্যাপক অর্থে সমাজের সদস্য হিসেবে সকল শিশুর কল্যাণ সাধনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও তাঁর লক্ষ্য বুঝায়। এ কার্যাবলির উদ্দেশ্য **প্রথমত,** শিশুর পরিবারের সামর্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজস্ব ও পারিবারিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যাতে শিশুর বাল্যে ও কৈশোরে পুষ্টিসাধন হতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** শিশুর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিশুর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।"

অতএব, শিশুকল্যাণের সংজ্ঞার পরিশেষে বলা যায় যে, শিশুকল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঐসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যাবলির সমষ্টিকে বুঝায় যেগুলো সকল শিশুর শারীরিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, শিক্ষাগত প্রভৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিবারের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে থেকে শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে কৈশোর পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশে সরকারি শিশুকল্যাণ কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে শিশুকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালে, তবে স্বাধীনতার পর এ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে অধিক বিস্তার লাভ করে। নিম্নে বাংলাদেশের সরকারি শিশুকল্যাণ কার্যক্রমগুলো আলোচনা করা হল :

১. সরকারি শিশুসদন : মাতাপিতাহীন যেসব শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্বভার নেওয়ার মত সমাজে কেউ নেই সেসব শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নামই হল সরকারি শিশুসদন। বাংলাদেশে মোট ৭৩টি সরকারি শিশুসদন রয়েছে। এসব শিশু সদনে মোট ৯,৫০০ জন এতিম শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত ৫ থেকে ১৮ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদেরকে শিশু সদনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। এ সময়ে শিশুদের মধ্যে ছেলেমেয়েদেরকে সাধারণ শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি ও ব্যবসায় ইত্যাদির মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে, মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়ার দ্বারা পুনর্বাসিত করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ১২,০০০ এতিমকে সমাজে পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মাহকুমা শহরে মোট ৭৮টি সরকারি শিশুসদন রয়েছে যেখানে মোট ৯,২৯০ জন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ রয়েছে।

২. শিশু পরিবার : বর্তমানে এতিমদেরকে পারিবারিক পরিবেশে লালনপালনের উদ্দেশ্যে দেশের ২৩টি শিশুসদনকে ঝঞ্ঝা শিশু পল্লির আঙ্গিকে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২,৮০০ জনের জন্য ১১২টি পরিবার গঠন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫০টি শিশু সদনের শিশুদের জন্য শিশু পরিবার গঠন করা হবে। শিশু পরিবার ব্যবস্থায় দেশে দু'রকম শিশুসদন থাকবে। যেমন– শূন্য বয়স থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের সদন। সেখানে প্রতি ১৫ জন শিশুর জন্য একটি পরিবার থাকবে। প্রতি পরিবারের জন্য একজন 'মা' থাকবেন যিনি শিশুদের সর্বময় দায়িত্বে নিয়োজিত। আবার ১১-১৮ বছর বয়সের শিশুদের ২৫ জনের একটি পরিবার থাকবে। প্রতিটি পরিবারের জন্য যথাক্রমে একজন 'বড় ভাই' ও 'বড় আপা' থাকবেন। প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা রান্নাঘর, খাবার ঘর ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. বেবী হোম, শিশু নিবাস বা ছোটমনি নিবাস : বেবী হোমে সাধারণত মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুদের পাঁচ বছর বয়সে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদের বয়স পাঁচ বছর অতিক্রম করলে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকার আজিমপুরে ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি শিশু নিবাস স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০-৮১ সালে চট্টগ্রামে ও রাজশাহীতে ১০০ আসন বিশিষ্ট আরও দু'টি বেবী হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেবী হোমগুলোতে খেলাধুলার মাধ্যমে নিবাসী শিশুদের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. দিবাযত্ন কেন্দ্র : দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রধানত কর্মজীবী মায়েদের কর্মকালীন সময়ে তাদের শিশুসন্তানদের সেবাযত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সাপ্তাহিক কাজের দিনগুলোতে মায়েরা সকাল সাড়ে ৭টায় শিশুদের এখানে রেখে যান এবং বিকাল সাড়ে ৫ টায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যান। দিবাযত্ন কেন্দ্রে ঐ সময় শিশুদের জন্য আহার, বিশ্রাম, লেখাপড়া, ছবি আঁকা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়। দিবাযত্ন কেন্দ্র একজন পেশাদার সমাজকর্মীর অধীনে পরিচালিত হয়। শিশুকল্যাণের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৩৩৮ জন শিশু উপকৃত হয়েছে। এখানে শিশুর ভরণপোষণ ব্যয় নেওয়া হয় ৩৭০ টাকা মাসিক। প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে সরকার সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে আরও ৪০টি Day Care Centre স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

৫. দুস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের ৫৬টি কেন্দ্র দেশব্যাপী চালু করা হয়। মহিলাদের পুনর্বাসিত করার জন্য ১৯৮১ সালে এসব কেন্দ্রকে সরকারি শিশু সদনে রূপান্তরিত করা হয়। এসব শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৮৪ সালে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার এরকম আরও কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে যথাযথভা পুনর্বাসিত করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। তাছাড়া শিশুদের দৈহি ও মানসিক অবস্থার উৎকর্ষতা সাধন এবং মানসিক গুণাবলি প্রতিভার বিকাশ ঘটানোও হয়।

৬. প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এতিম শিশুদে আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এতিমখানায় বৃত্তিমূ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো চাঁদপুর, তেজগা বাগেরহাট, রাজশাহী এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখান অবস্থিত। এখানে বয়স্ক এতিমদের বিভিন্ন কারিগরি এ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এখানে ১৯৭২-৯৬ স পর্যন্ত ৬৩৪ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৭. প্রতিবন্ধী শিশুকল্যাণ কার্যক্রম : বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ঢাক চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনার ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ক হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ৫টি অন্ধ স্কুল, ৭টি মূক ও বধির স্কু ৫টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। এছাড়া অ শিশু-কিশোরদের জন্য সারাদেশে ৪৭টি সমন্বিত অন্ধ শি প্রকল্প আছে।

৮. কিশোর অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম : বাংলাদে কিশোর অপরাধ প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে অপরাধ প্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধনের জন্য সারাদে ২২টি প্রবেশন কেন্দ্র চালু রয়েছে। এছাড়া ঢাকার অদূরে গাজীপু জেলার টঙ্গীতে একটি কিশোর অপরাধ সংশোধন ইনস্টিটি কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন এবং পুনর্বাসনে বিশে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৯. মাতৃমঙ্গল এবং শিশুকল্যাণ কেন্দ্র : বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা সদরে মাতৃমঙ্গল এবং শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রসূতির জন্য পৃথ শয্যায় মা ও শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং শিশু হাসপাতাল, পু ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কেন্দ্রেও একরকম ব্যবস্থা চালু আছে।

১০. দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের কল্যাণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের ১৫টি শহরে সুবিধাবঞ্চিত এবং ভাসমান শিশু রাস্তায় বসবাসরত দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় শিশুর কল্যাণের উন্নয় ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মৌল সুযো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালানো হয়।

১১. ক্যাপিটেশন গ্রান্ট : বাংলাদেশে মোট ১,২৭ নিবন্ধীকৃত এতিমখানার মধ্যে ১,১৪৩টি ক্যাপিটেশন গ্রান্টে আওতাভুক্ত। বেসরকারি এতিমখানার শিশুদের খাদ্য এব প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় মিটানোর জন্য অনুদান প্রদান করা হয় দেশের ১,১৪৩টি এতিমখানার ১৭,৫০১ জনের মাথাপিছু মাসিক ৪০০ টাকা হারে অনুদান দেওয়া হয়। অন্যান্য এতিমখানা এককালীন ২,০০০-১০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান কর হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, শিশুকল্যাণ বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুকল্যাণের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রশ্ন॥৭॥ সংশোধনমূলক পদ্ধতি বলতে কি বুঝ? সংশোধনমূলক পদ্ধতি হিসেবে প্যারোলের ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, সংশোধনমূলক পদ্ধতি কী? সংশোধনমূলক পদ্ধতি হিসেবে প্যারোলের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, সংশোধনমূলক পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও। সংশোধনমূলক পদ্ধতির কৌশল হিসেবে প্যারোলের প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পৃথিবীতে কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মাঝে কোন পাপ থাকে না। তার চারপাশের পরিবেশ, আচার আচরণ, রীতিনীতি তাকে ধীরে ধীরে অপরাধী করে তোলে। আবার কখনও কখনও কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি অপরাধ করতে বাধ্য হয়। যদিও অনেক অপরাধ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, মানুষ অপরাধ করার প্রবণতা দীনগতভাবে পেয়ে থাকে বা মানুষের বিভিন্ন প্রকার শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার অপরাধের জন্য দায়ী কিন্তু সে মতামত আজ উপেক্ষিত। তাই আজ অপরাধীকে সরাসরি শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য সংশোধন ব্যবস্থার কথা বলা হয়।

সংশোধনমূলক পদ্ধতি : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে কারাগারে ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন সংশোধনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, এ শাশ্বত বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপরাধ সংশোধন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। যেসব ব্যবস্থা ও কার্যাবলির মাধ্যমে অপরাধীর আচার আচরণ, ব্যক্তিত্ব, অপরাধ প্রবণতা এবং চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয় সেসব কার্যাবলিকেই সংশোধনমূলক পদ্ধতি বলা হয়। বস্তুত কোন শাস্তিই অপরাধীকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। আর সে কারণেই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি। একথা না বললেই নয় যে অপরাধ প্রবণতা এক ধরনের মানবীয় আচরণ এবং অপরাধী ব্যক্তির চারিত্রিক বা ব্যবহারিক উন্নতি না ঘটলে তার মধ্যের অপরাধ প্রবণতা কোন শাস্তি দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব নয়। আর তাই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীকে ঘৃণা না করে অপরাধকে ঘৃণা করার নীতি গৃহীত হয় এবং অপরাধ যে কারণে অপরাধে লিপ্ত হয়, সে কারণের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে অপরাধীর সংশোধনের জন্য বহু ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

অপরাধীর সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে প্রোবেশন ও প্যারোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয় পদ্ধতিতে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন এবং সমাজ পুনর্বাসনের প্রয়াস রয়েছে।

প্যারোলের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি : কারাভোগের নির্দিষ্ট সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষে প্যারোল অফিসার তত্ত্বাবধানে অপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থার নাম প্যারোল। সাধারণত কারাগারের নির্ধারিত শাস্তিসীমার কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তবেই অপরাধীকে চূড়ান্ত মুক্তি দেওয়ার পূর্বে বিশেষ শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হয়। অপরাধীকে স্বাভাবিক সমাজ জীবনে খাপখাইয়ে চলার প্রশিক্ষণ দেওয়াই প্যারোল ব্যবস্থায় এ ধরনের মুক্তির উদ্দেশ্য। এতে অপরাধী কিছুকাল শাস্তিভোগের পর সাময়িকভাবে শর্তাধীনে মুক্তিলাভ করে বিধায় শাস্তির কষ্টের কথা মনে রেখে সে তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

সাধারণত তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান প্যারোল প্রদানের ক্ষমতা রাখে। যথা :

ক. সংশোধনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বোর্ড।
খ. কেন্দ্রীয় প্যারোল বোর্ড।
গ. প্যারোল কমিশন।

কারাদণ্ডভোগী অপরাধীদের মধ্যে যারা কারাগারের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে এ ব্যবস্থায় মুক্তি দেওয়া যায় না। অর্থাৎ বলা যায় কারাদণ্ডভোগী যে কোন অপরাধী প্যারোলে বসবাসকালে নিয়মকানুন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং যাদের চরিত্রের মধ্যে শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাদেরকেই কেবল শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে প্যারোল ব্যবস্থায় আনা হয়। সমাজ এবং প্যারোলাধীন অপরাধী উভয়ের জন্যই প্যারোল ব্যবস্থা মঙ্গলজনক। কারণ প্যারোল ব্যবস্থায় থাকাকালীন সময়ে অপরাধী থেকে সমাজ নিরাপত্তা লাভ করে। আবার অপরাধী কারাগারের বাইরে আপেক্ষিক অর্থে মুক্তজীবন কাটাতে পারে। অপরাধী যদি প্যারোলের নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তাকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

প্যারোল ব্যবস্থায় নেওয়ার আগে প্যারোল কর্তৃপক্ষ অপরাধীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এরপর প্যারোল বোর্ড অপরাধী সম্পর্কে রিপোর্টগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার জন্য প্রয়োজনবোধে প্যারোল ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। প্যারোল বোর্ড অপরাধীকে প্যারোলে পাঠানো প্রসংগে যেসব বিষয় বিবেচনা করে দেখেন তার মধ্যে পারিবারিক ইতিহাস, তার শিক্ষকদের মন্তব্য, ধর্মযাজক নিয়োগকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ইত্যাদি।

তাহলে বলা যায় যে, প্যারোল হচ্ছে অপরাধীর সংশোধন ও পুনর্বাসনমূলক এমন এক ব্যবস্থার নাম যেখানে অপরাধী সাময়িকভাবে বিশেষ শর্তাধীনে সমাজ জীবনে ফিরে আসে। তবে প্যারোলে যাওয়ার পূর্বে তাকে প্রদেয় নির্ধারিত শাস্তিসীমার কিছুকাল কারাগারে কাটিয়ে আসতে হয়। অন্যদিকে, প্যারোলে থাকা অবস্থায় অফিসারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে চারিত্রিক সংশোধন ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার অভ্যাস আয়ত্ত করে।

প্যারোল ব্যবস্থা উদ্ভবের ইতিহাস : শাস্তির একটি অন্যতম প্রকরণ হিসেবে Transpartation বা নির্বাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং তার অনিবার্য অসন্তোষজনক ফলশ্রুতিতে ব্রিটেনে প্যারোলের উদ্ভব ঘটে। ব্রিটেনে নির্বাসন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোর ফলে কারাগারগুলো অপরাধীতে জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কারাগারে অপরাধীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় যা 'Ticket on Leave' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু এ পদ্ধতি তেমন সফল হয় নি কারণ সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ না দিয়েই অপরাধীকে শুধুমাত্র সাময়িককালে আচরণ বিচারে কারাগার ত্যাগ করার অনুমতিপত্র দেওয়া হতো। ফলস্বরূপ অপরাধীরা আরও বেশি অপরাধে লিপ্ত হতে থাকে এবং বিপজ্জনক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমাজ জীবন আরও বেশি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য ব্রিটেনে ১৮২০ সালে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন ও পুনর্বাসনমূলক এক আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় যার নাম প্যারোল। আমেরিকার কারাগারগুলোতে অপরাধীর সংশোধনের একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যেখানে অপরাধীদের কৃত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বা অনুতপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষ সংশোধনমূলক শাস্তিঘরের ব্যবস্থা রাখা হতো। ১৮৭০ সালে কারাগার ব্যবস্থায় সংস্কার আনয়নমূলক আন্দোলন গড়ে উঠার আগ পর্যন্ত উক্ত পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয় নি। কতিপয় আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী কারাগারের বিশৃঙ্খল শোচনীয় অবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে প্যারোল ব্যবস্থা উদ্ভবের জন্য তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিউইয়র্কে Elmirra Reharmatory প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম প্যারোল ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। আমেরিকার প্যারোল ব্যবস্থা উৎপত্তির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। আমেরিকায় বসবাসকারীদের পরীক্ষামূলকভাবে তাদের নিয়োগকর্তা ব্যক্তির বা কোম্পানির কাছে ফেরত পাঠানো হতো এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাদের চলাফেরার উপর দৃষ্টি রাখা হতো। এ ব্যবস্থার পাশাপাশি আমেরিকান রাজ্যসমূহে সরকারিভাবে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, যাদের কাজ ছিল অপরাধীদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকাতে অনেক Prison Aid Society গড়ে ওঠে। এসব Societyগুলো আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে প্যারোল ব্যবস্থার প্রবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

প্যারোল ব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রম : প্যারোল ব্যবস্থার সফলতার জন্য কিছু নীতি ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

১. কোন কোন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে প্যারোল ব্যবস্থাধীনে রাখা হবে তা সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, মনোভাব এবং তার সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য অনুসন্ধান করে তবেই তার প্যারোলের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. কারাবাসীদের সম্পর্কে সংগৃহীত কাগজপত্র, তথ্যাবলি পরীক্ষায় যখন এমন বিশ্বাস জন্মাবে যে, তাদের শর্তাধীন মুক্তি দিলে চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে কেবল তখনই তাদের প্যারোলে প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৩. কারাবাসীদের প্যারোলে প্রেরণের আগে দেখতে হবে যে, শর্তাধীন কারাবাসীদের মুক্তি দিলে তাদের সমাজে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে কি না। অপরাধী সম্পর্কে তার নিজস্ব সমাজ কী বিবেচনাপ্রসূত শাস্তি কামনা করে। কোন বিশেষ কারাবাসীকে প্যারোলে প্রদান করলে সমাজ যদি মনে করে যে, অপরাধীকে বরং শাস্তি ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাহলে প্যারোল ব্যবস্থা আশানুরূপভাবে কার্যকর করা যাবে না।

৪. প্যারোলাধীন অপরাধীর কর্মসংস্থান যাতে সম্ভব হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত প্রয়াস থাকা উচিত। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকলে প্যারোলাধীন অপরাধী দ্রুত চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার চেষ্টা করে।

৫. প্যারোলাধীন অপরাধীর চারপাশের পরিবেশ যাতে তার চারিত্রিক উন্নতির অনুকূল বলে বিবেচিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. প্যারোলে থাকাকালে অপরাধীর সাথে নির্দিষ্ট প্যারোল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং এটি খুবই জরুরি। তাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ প্রদান করে সমাজের সাথে খাপখাইয়ে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. প্যারোলাধীন অপরাধীকে সমাজে পুনর্বাসিত করার চেষ্টায় প্যারোল অফিসারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্যারোল অফিসার আরও দক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

৮. প্যারোল অফিসারবৃন্দের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য প্যারোল বোর্ড বা কমিশন থাকবে। এ প্যারোল বোর্ড বা কমিশন গঠিত হবে যারা বুদ্ধিজীবী ও সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন এবং এ ধরনের কাজে উৎসাহী ও অভিজ্ঞ। কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে এসব ব্যক্তিকে প্যারোল বোর্ডের সদস্য করা যাবে না।

৯. অনেক সময় প্যারোলাধীন অপরাধী যদি জানতে পারে যে, তার শাস্তিসীমা শেষ হওয়ার পথে তাহলে সে তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে প্যারোল কর্মসূচির সময় বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পরও অপরাধীর বিশেষ প্যারোল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

১০. প্যারোল অফিসারের সংখ্যা যথেষ্ট হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান কাজে তাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্যারোল অফিসারের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মূলত সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ ও অপরাধবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ প্যারোল অফিসার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। উপরন্তু তাদের কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকতে হবে। যথা : ক. সৎ ও উদ্দেশ্যপ্রবণ, খ. ধীর প্রকৃতির বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, গ. ধৈর্যশীল এবং ঘ. রসিক সর্বোপরি মানবচরিত্র সম্পর্কে আশাবাদী মনের অধিকারী হবেন।

১১. প্যারোল বোর্ড বা প্যারোল ব্যবস্থা সর্বময় কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ প্যারোলের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে না পারে।

১২. প্যারোলাধীন হওয়ার আগে অপরাধীকে প্যারোল চুক্তিতে সাক্ষর দান করতে হবে। চুক্তিতে অন্যান্য শর্তের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে, সে যদি প্যারোল ব্যবস্থার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে পাঠানো হবে।

প্যারোল কর্মকর্তার কাজ : যদিও বিভিন্ন প্যারোল কর্মকর্তা বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করেন তবুও তাদের কতকগুলো সাধারণ কার্যাবলি রয়েছে। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

ক. তদন্ত করা (Investigation) : প্যারোল কর্মকর্তার অনুসন্ধানমূলকবাদের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে প্যারোল বোর্ড, প্যারোল পরিদর্শক বা প্যারোল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। অপরাধীর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক তথ্যাবলিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্যারোল কর্মকর্তা সংগ্রহ করবেন। এসব তথ্যাবলি অপরাধী প্যারোলে যাওয়ার পূর্বে এবং প্যারোলে থাকাকালীন সময়ে প্যারোল বোর্ডের কাছে পৌঁছাতে হবে।

খ. তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ দান (Supervesion and counselling) : একজন প্যারোল কর্মকর্তা অপরাধীর সামাজিক পুনর্বাসনের পথে সকল বাধা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। বস্তুতপক্ষে প্যারোল কর্মকর্তা প্যারোলাধীন অপরাধীর সামগ্রিক তত্ত্বাবধায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের দায়িত্ব পালন করবেন। অপরাধীকে তার পরিবার ও সমাজের সাথে পুনরায় স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজের পাশাপাশি তার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্যারোল কর্মকর্তা তার প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন।

গ. প্যারোল নীতির প্রয়োগ (Enforcement of parole Principles) : প্যারোল কর্মকর্তা প্যারোলাধীন অপরাধীকে প্যারোল নীতি মেনে চলতে বাধ্য করবেন এবং প্যারোলাধীন অপরাধীর কার্যাবিধি সম্পর্কে নিয়মিত রেকর্ড লিপিবদ্ধ করবেন। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্যারোল বোর্ডে উত্থাপন করতে পারেন। আবার প্রয়োজনবোধে প্যারোলাধীন অপরাধীকে তিনি তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন।

প্যারোলের সুবিধা :

১. অপরাধমূলক আচরণ যেহেতু এক ধরনের চারিত্রিক অসংগতির অনিবার্য ফলশ্রুতি তাই অপরাধীর শাস্তির চেয়ে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন অধিক যুক্তিসংগত। সে কারণেই প্যারোল ব্যবস্থায় অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

২. প্যারোল ব্যবস্থা শাস্তি এবং সংশোধন উভয়ের মধ্যে এক অনন্য সমন্বয়। কারণ এ ব্যবস্থায় চারিত্রিক সংশোধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হলেও শাস্তিকে উপেক্ষা করা হয় না, বরং কোন অপরাধীর নির্ধারিত শাস্তির কিছুটা তাকে ভোগ করে তবেই প্যারোলাধীন হতে হয় এবং অবশ্যই শর্তসাপেক্ষে।

৩. এ ব্যবস্থায় অপরাধী অপরাধজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামাজিক পরিমণ্ডলে স্বাভাবিক জীবনযাপনের তথা পুনরায় সমাজে খাপখাইয়ে চলার সুযোগ লাভ করে।

৪. প্যারোল ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয় যা সাধারণ কারাগারে প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে সেহেতু প্যারোল ব্যবস্থায় সে তার প্রকৃত চিকিৎসা লাভে সক্ষম হতে পারে।

৫. প্যারোল ব্যবস্থা সমাজ এবং প্যারোলাধীন অপরাধী উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা প্যারোল ব্যবস্থায় থাকাকালীন সময়ে অপরাধীর থেকে সমাজ নিরাপত্তা লাভ করে।

৬. যেহেতু প্যারোলাধীন ব্যক্তি তার পেশাগত কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে সেহেতু জাতীয় অর্থনীতিতে তার অবদান অব্যাহত রাখতে পারে এবং সে যথাবিহিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৭. প্যারোল ব্যবস্থায় যেহেতু অপরাধী কিছুকাল শাস্তি ভোগের পর সাময়িকভাবে শর্তাধীনে মুক্তি লাভ করে সেহেতু শাস্তির কষ্টের কথা মনে রেখে সে তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করে।

প্যারোল ব্যবস্থার অসুবিধা : এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্যারোল ব্যবস্থার কতিপয় অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

১. প্যারোল ব্যবস্থায় অপরাধীর সংশোধনের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। এটা বিচারের মূল্যবোধকে বেশ খানিকটা খর্ব করে। কেননা অভিযোগকারী বিচার থেকে এমনকিছু প্রত্যাশা করে, যা তার স্বার্থসংরক্ষণে সহায়ক। যদিও প্যারোল ব্যবস্থায় অপরাধীকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতেই হয়, তবুও প্রত্যক্ষভাবে বলতে গেলে অভিযোগকারী তার থেকে তেমন প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে না।

২. প্যারোল ব্যবস্থায় অপরাধীকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ করে বিধায় সে যে অপরাধমূলক পরিবেশে অপরাধকাজে লিপ্ত হয়েছিল সে পরিবেশেই তাকে আবার ফিরে যেতে হয়। এতে তার চারিত্রিক সংশোধনের বদলে আরও চারিত্রিক অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৩. অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের দায়িত্ব পালন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তাই একজন প্যারোল কর্মকর্তার পক্ষে অপরাধের চারিত্রিক সংশোধন কতটা সম্ভব তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

৪. আদালত যদি কোন কারণে সততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে পেশাদার দাগি অপরাধী অপরাধ করেও প্যারোলে সুযোগ লাভ করে শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে। আর এমতাবস্থায় প্যারোলের ফল হবে মানবতা এবং সমাজের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

৫. প্যারোল ব্যবস্থায় অনেক সময় অপরাধী নিঃশর্ত আশু মুক্তির জন্য দ্বৈত আচরণের পরিচয় দিতে পারে এবং ভনিতার আশ্রয় নিয়ে সাময়িকভাবে সাধুবেশ ধারণ করতে পারে। ফলে এ ব্যবস্থা অপরাধীর জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং সুবিধাভোগের মাধ্যমে বার বার কোন অপরাধী অপরাধকর্ম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ অর্জন করতে পারে।

উপসংহার : সমালোচনা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক যুগে প্যারোল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যবস্থায় অপরাধীকে শাস্তিও ভোগ করতে হয় আবার সংশোধনেরও সুযোগ লাভ করে। মূলত প্যারোল ব্যবস্থায় শাস্তি এবং সংশোধনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। একারণেই এ ব্যবস্থা সমাজ ও অপরাধী উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন॥১০॥ প্রোবেশন ও প্যারোল বলতে কি বুঝ? প্রোবেশন ও প্যারোলের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনাপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা কর। প্রোবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর আলোকপাত কর।

অথবা, প্রোবেশন ও প্যারোল কী? প্রোবেশন ও প্যারোলের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মসূচি উল্লেখপূর্ব প্রোবেশন অফিসারের কর্তব্য আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে কারাগার ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন সংশোধনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। মূলত কোন শাস্তিই অপরাধীকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। আর সে কারণেই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি। অপরাধ প্রবণতা এক ধরনের মানবীয় আচরণ এবং অপরাধী ব্যক্তির চারিত্রিক বা ব্যবহারিক উন্নতি না ঘটলে তার মধ্যের অপরাধ প্রবণতা কোন শাস্তি দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব নয়। আর সে কারণেই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। চারিত্রিক সংশোধনের ক্ষেত্রে পাপকে নয় পাপীকে ঘৃণা কর, এ নীতি গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে অপরাধকর্মের চেয়ে অপরাধী যে কারণে অপরাধে লিপ্ত হয় সে কারণের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আধুনিক বিশ্বে অপরাধীর সংশোধনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে প্রোবেশন এবং প্যারোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয় পদ্ধতিতেই অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন এবং সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রোবেশন : Probation শব্দটির অর্থ শিক্ষানবিসি। অপরাধবিদ্যায় প্রোবেশন বলতে বুঝায় অপরাধীকে সংশোধন করার এমন একটি কর্মসূচি বা প্রক্রিয়া যেখানে অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্তসাপেক্ষে প্রোবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অপরাধীকে সমাজে খাপখাইয়ে চলার এবং চারিত্রিক পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ প্রদান করা হয়। বস্তুত Probation হচ্ছে অপরাধীর বিশৃঙ্খল আচরণ সংশোধনের লক্ষ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর সাজা স্থগিত রেখে Probation কর্মসূচির বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী অপরাধীর উপর কতিপয় শর্ত আরোপ করে তার কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার, তার চারিত্রিক পরিবর্তন আনার এবং স্বাভাবিকভাবে সমাজ জীবনে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। অপরাধীকে পুনরায় সমাজের সাথে খাপখাইয়ে চলার এবং সমাজ ও আইনবিরোধী আচরণ পরিত্যাগ করার সুযোগ প্রদান করা হয় মূলত একজন probation কর্মকর্তার অধীনে।

তাহলে বলা যায় Probation হচ্ছে অপরাধীর সংশোধনের এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেখানে কারাগারের ন্যায় শাস্তি প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই।

Probation এর ক্ষেত্রে অপরাধীকে মনে করা হয় একজন অসুস্থ ব্যক্তি। কারণ তার মানসিক অসুস্থতার কারণেই সে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একজন probation কর্মকর্তারূপী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অপরাধীর এ চারিত্রিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা হয়। অপরাধী যাতে চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে সেজন্য তাকে এমনসব শর্ত মেনে চলতে হয় যা তার আচার আচরণের উপর প্রভাব ফেলে এবং তাকে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ প্রদান করে। অতএব, একথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, Probation কর্মসূচির দৃষ্টিতে অপরাধী ঘৃণার পাত্র নয়। এখানে মূলত অপরাধকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

বয়স্ক এবং কিশোর উভয় অপরাধীর জন্যই Probation কর্মসূচির বিধান থাকতে পারে। Probation এর ক্ষেত্রে অপরাধী তার পরিবারের, সমাজের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং তার কৃত অপরাধের প্রতি যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তা দেখে, শুনে, লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করে। Probation এ শাস্তি এবং চারিত্রিক সংশোধন উভয়ই একই সাথে বিদ্যমান। স্থগিত শাস্তি এবং শর্তাধীন সাময়িক মুক্তি এক ধরনের মানসিক শাস্তি বলা যায়। এজন্য আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানে probation কর্মসূচির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়।

প্যারোল : কারাভোগের নির্দিষ্ট সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষে প্যারোল অফিসার তত্ত্বাবধানে অপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থার নাম প্যারোল। সাধারণত কারাগারের নির্ধারিত শাস্তি সীমার কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তবেই অপরাধীকে চূড়ান্ত মুক্তি দেওয়ার পূর্বে বিশেষ শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হয়। অপরাধীকে স্বাভাবিক সমাজ জীবনে খাপখাইয়ে চলার প্রশিক্ষণ দেওয়াই প্যারোল ব্যবস্থায় এ ধরনের মুক্তির উদ্দেশ্য। এতে অপরাধী কিছুকাল শাস্তিভোগের পর সাময়িকভাবে শর্তাধীনে মুক্তিলাভ করে বিধায় শাস্তির কষ্টের কথা মনে রেখে সে তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

সাধারণত তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান প্যারোল প্রদানের ক্ষমতা রাখে। যথা :

ক. সংশোধনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বোর্ড,

খ. কেন্দ্রীয় প্যারোল বোর্ড এবং

গ. প্যারোল কমিশন।

কারাদণ্ডভোগী অপরাধীদের মধ্যে যারা কারাগারের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে এ ব্যবস্থায় মুক্তি দেওয়া যায় না। অর্থাৎ বলা যায় কারাদণ্ডভোগী যে কোন অপরাধী প্যারোলে বসবাসকালে নিয়মকানুন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং যাদের চরিত্রের মধ্যে শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাঁদেরকেই কেবল শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে প্যারোল ব্যবস্থায় আনা হয়। সমাজ এবং প্যারোলাধীন অপরাধী উভয়ের জন্যই প্যারোল ব্যবস্থা মঙ্গলজনক। কারণ প্যারোল ব্যবস্থায় থাকাকালীন সময়ে অপরাধী থেকে সমাজ নিরাপত্তা লাভ করে। আবার অপরাধী কারাগারের বাইরে আপেক্ষিক অর্থে মুক্তজীবন কাটাতে পারে। অপরাধী যদি প্যারোলের নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তাকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

প্যারোল ব্যবস্থায় নেওয়ার আগে প্যারোল কর্তৃপক্ষ অপরাধীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এরপর প্যারোল বোর্ড অপরাধী সম্পর্কে রিপোর্টগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার জন্য প্রয়োজনবোধে প্যারোল ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। প্যারোল বোর্ড অপরাধীকে প্যারোলে পাঠানো প্রসঙ্গে যেসব বিষয় বিবেচনা করে দেখেন তার মধ্যে পারিবারিক ইতিহাস, তার শিক্ষকদের মন্তব্য, কর্মযাজক নিয়োগকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ইত্যাদি।

তাহলে বলা যায় যে, প্যারোল হচ্ছে অপরাধীর সংশোধন ও পুনর্বাসনমূলক এমন এক ব্যবস্থার নাম যেখানে অপরাধী সাময়িকভাবে বিশেষ শর্তাধীনে সমাজ জীবনে ফিরে আসে। তবে প্যারোলে যাওয়ার পূর্বে তাকে প্রদেয় নির্ধারিত শাস্তিসীমার কিছুকাল কারাগারে কাটিয়ে আসতে হয়। অন্যদিকে, প্যারোলে থাকা অবস্থায় অফিসারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে চারিত্রিক সংশোধন ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার অভ্যাস আয়ত্ত করে।

প্রোবেশন এবং প্যারোলের মধ্যে মিল এবং অমিল উভয়ই রয়েছে। নিম্নে প্রোবেশন ও প্যারোলের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা হল :

প্রোবেশন এবং প্যারোলের মধ্যে সাদৃশ্য :

১. প্রোবেশন এবং প্যারোল এ অর্থে একই বৈশিষ্ট্যের যে উভয়ক্ষেত্রে অপরাধীকে শর্তাধীনে মুক্তি দিয়ে চারিত্রিক সংশোধন এবং সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

২. উভয় প্রকার ব্যবস্থাতেই অপরাধীকে কারাগারে শাস্তি ভোগের স্থলে কারাগার থেকে মুক্তি প্রদানের প্রয়াস রয়েছে।

৩. প্রোবেশন এবং প্যারোল উভয় ব্যবস্থারই সুবিধা এবং অসুবিধা একই প্রকৃতির।

৪. উভয় ব্যবস্থায়ই অপরাধীকে প্রায় একই প্রকার শর্ত মেনে চলতে হয়।

প্রোবেশন এবং প্যারোলের মধ্যে বৈসাদৃশ্য :

১. প্রোবেশনের ক্ষেত্রে অপরাধীকে যে শাস্তি প্রদান করা হয় সে শাস্তিকে সম্পূর্ণ স্থগিত রেখে তাকে প্রোবেশনাধীনে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ অপরাধী শাস্তি ভোগের আগেই প্রোবেশন কর্মসূচির আওতায় আসে। কিন্তু প্যারোলের ক্ষেত্রে অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তির কিছু ভোগ করে প্যারোল কর্মসূচির আওতায় আসতে হয়।

২. প্রোবেশন ব্যবস্থা কারাগারে শাস্তিভোগের বিকল্প ব্যবস্থা। প্রোবেশনের ক্ষেত্রে অপরাধীর মধ্যে ভালো আচরণের লক্ষণ আছে কি না তা তেমন বিচার করে দেখা হয় না। কিন্তু প্যারোলের ক্ষেত্রে বিষয়টি লক্ষণীয়। কেননা, প্যারোলে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে শাস্তিভোগের সময় অপরাধীর চারিত্রিক উন্নতি হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে। চারিত্রিক শুভ পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিলেই কেবলমাত্র অপরাধীকে প্যারোল ব্যবস্থায় নেওয়া হয়।

৩. প্রোবেশনের ক্ষেত্রে শাস্তিভোগের পূর্বেই অপরাধীকে প্রোবেশন কর্মসূচির আওতায় আনা হয় বিধায় তাকে কারাগারের অন্যান্য অপরাধীদের সংস্পর্শে আসতে হয় না। ফলশ্রুতিতে সে যেমন অন্যকে প্রভাবিত করে না তেমনি অন্যান্য অপরাধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু প্যারোলের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে হলেও এর বিপরীত ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্যারোলাধীন ব্যক্তি যেহেতু প্যারোলপূর্ব কারাগার জীবনে অন্যান্য অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে সেহেতু সে আরও অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। আবার সবাইকে শাস্তিভোগ করতে দেখে শাস্তি সম্পর্কে তার ভয় ও লজ্জা কমে আসে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্যারোলের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য যাই থাকুক আধুনিক বিশ্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্যারোল এবং প্রোবেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উভয়

ব্যবস্থাই অপরাধীর চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তিত করার জন্য গৃহীত হয়েছে। তাই সমাজে এ দুই প্রকার সংশোধনমূলক পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর তা হবে সমাজের জন্য স্বস্তিদায়ক এবং মঙ্গলজনক।

প্রোবেশন কর্মকর্তার কার্যকৌশল : আদালত কর্তৃক নির্ধারিত প্রোবেশন কর্মকর্তার মূল দায়িত্ব হচ্ছে প্রোবেশনাধীন অপরাধীকে তার চারিত্রিক সংশোধন আনয়নে এবং সামাজিক পুনর্বাসনে যথাসাধ্য সাহায্য করা। এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন কৌশলের সাহায্য নিতে পারেন। **David Dressier** তার 'Practice and Theory of Probation and Parole' নামক গ্রন্থে প্রোবেশন কর্মকর্তার কার্যকৌশলগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হল :

ক. বস্তুগত সাহায্য কৌশল, খ. প্রশাসনিক কৌশল, গ. তত্ত্বাবধায়ক কৌশল এবং ঘ. পরামর্শদান কৌশল।

ক. বস্তুগত সাহায্য কৌশল : প্রোবেশন কর্মকর্তা যদি মনে করেন অপরাধী ব্যক্তিটি কোন আর্থিক সাহায্য পেলে একটি সৎ উৎপাদনের পথ বেছে নেবে যা তার জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে এবং সৎভাবে কর্মব্যস্ত জীবনে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করবে তাহলে তিনি প্রোবেশন কর্মসূচির আওতায় অপরাধীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। চাকরিরত কোন শ্রমিক যদি অপরাধে লিপ্ত হয়ে চাকরিচ্যুত হয় তাহলে তাকে প্রোবেশনে রাখার পর যদি প্রোবেশন কর্মকর্তা লক্ষ্য করেন যে, তার হারানো চাকরি পুনরায় ফিরে পেলে সে আগের ন্যায় সৎ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে তাহলে প্রোবেশন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অথবা অন্যত্র কোন চাকরি প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

খ. প্রশাসনিক কৌশল : প্রোবেশন কর্মকর্তা যদি দেখেন যে কোন বিশেষ অপরাধীকে এমন সাহায্য করা প্রয়োজন বা প্রোবেশন কর্মসূচির সম্পদ এবং সুযোগ দ্বারা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে তিনি সমাজের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে অপরাধীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অপরাধী যদি কোন আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে তাকে সমাজে কোন আইন সংস্থার কাজে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

গ. তত্ত্বাবধায়ক কৌশল : কোন জটিল মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োজন নেই। এমন কোন উপদেশ বা সাহায্য সহানুভূতি প্রোবেশন কর্মকর্তা নিজেই অপরাধীকে দেখাতে পারেন। এ অবস্থায় উপদেশ বা তত্ত্বাবধানের কাজটি হবে প্রত্যক্ষ। তবে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে অপরাধীকে কোন প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বস্তুগত সাহায্য ছাড়া প্রদান করা হয় না। তবে প্রোবেশন কর্মকর্তার উপদেশ অপ্রত্যক্ষভাবে অপরাধীকে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রোবেশন কর্মকর্তা অপরাধীর পারিবারিক আয়ব্যয়ের মধ্যে সংগতি রেখে একটি যুক্তিসিদ্ধ বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করতে পারেন। আবার অপরাধীর জন্য কোন ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে কি না তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে সহায়তা করতে পারেন।

ঘ. পরামর্শ দান কৌশল : পরামর্শ দান কৌশলের ক্ষে প্রোবেশন কর্মকর্তাকে ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতা অর্জন ক হয়। এক্ষেত্রে তিনি অপরাধীর মনোভাব, আবেগ, অনুভূ উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জ্ঞান অর্জন করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অপরাধীর সমস্যাগুলোকে বি বিশ্লেষণ করে তার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিবেন। প্রোবেশন কর্মকর্তা আন্তরিক পরামর্শ দানের মাধ্যমে অপরা কোন বিশেষ সমস্যা লাঘবের জন্য যত্নবান থাকবেন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যায় যে, কোন অপরাধী যদি দাম্পত্য জীবনে খাপখাইয়ে চ অপারগ হয় এবং তার ফলে যদি আবেগতাড়িত হয়ে সে অপ অভ্যস্ত হয় তাহলে প্রোবেশন কর্মকর্তা তাকে নিবিড়ভাবে প প্রদান করে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন।

প্রশ্ন॥১১॥ চিকিৎসা সমাজকর্ম কাকে ব বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচ কর। [জা. বি.-২০

অথবা, চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদে চিকিৎসা সমাজকর্মের তাৎপর্য আলোচনা ক

অথবা, হাসপাতাল সমাজকর্ম কী? বাংলাদেশে হাসপা সমাজকর্মের প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক সমাজকর্মের একটি গুরু শাখার নাম হল চিকিৎসা সমাজকর্ম (Hospital S Work)। শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাই হল স্বাস্থ্য। স অর্থে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ কর্মসূচি পরিচালিত তাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়। চি সমাজকর্ম মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতির উপর নি এমন একটি কার্যক্রম, যার মাধ্যমে পীড়িত মানুষের জীবনে স কল্যাণসাধন করা হয়।

চিকিৎসা সমাজকর্ম : সাধারণ অর্থে সমাজক কর্মসূচি চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী উপাদানসমূহ দূরী মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হতে সার্বিকভাবে সহায়ত তাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলে। ব্যাপক অর্থে চিকিৎসা স হল আধুনিক সমাজকর্মের সে শাখা, যা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়ো চিকিৎসারত রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সব বাধা দূর ক আওতাধীন স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা কার্যক্রমের পূর্ণতম স সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিক করে তোলা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে সমাজকর্মের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে সর্বাধিক গ্র কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মনীষী **এলিজাবেথ** এবং **কারগিউসন** বলেছেন,

সমাজকর্ম হল স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সাহায্য করার জন্য সমাজকর্মের মৌলনীতি ও কৌশলের আশ্রয়ে প্রদত্ত সেবাকর্ম।"

'Social Work Year Boor' নামক গ্রন্থে চিকিৎসা সমাজকর্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োগই হচ্ছে চিকিৎসা সমাজকর্ম।"

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী **R. A. Skidmore** ও M. G. Thakeray চিকিৎসা সমাজকর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Medical Social work is the application of social work knowledge, skill, attitudes and values to the field of health and medicine." অর্থাৎ, চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের প্রয়োগ।

চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞায় পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল চিকিৎসা সমাজকর্ম। চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, কৌশল, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে রোগীকে তার আওতাধীন চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার পূর্ণতম ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে থাকে।

বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : সামাজিক চিকিৎসা অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্ম সব ধরনের স্বাস্থ্যহীনতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালায়। চিকিৎসা সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হল অসুস্থ ব্যক্তিদের দৈহিক, মানসিক, আবেগজনিত ইত্যাদি দিকের কল্যাণসাধন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা, যাতে তারা সমাজে দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত একটি আর্থসামাজিক পশ্চাৎপদ দেশের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল :

১. বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ঘনবসতিপূর্ণ অধিক জনসংখ্যার দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৪ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪০ এবং ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩৪ জন। তাছাড়া বাংলাদেশ নানারকম আর্থসামাজিক সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশ। এরকম পরিস্থিতিতে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কোন রোগীর চিকিৎসা গ্রহণকালে এবং চিকিৎসার পর আরও বহু প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রয়োজন হতে পারে, যেমন– ঔষধ, রক্ত, পথ্য, চশমা, ক্রাচ, হুইল চেয়ার প্রভৃতি। এদেশের দরিদ্র এবং অসহায় রোগীদের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগী কল্যাণ সমিতি থেকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

৩. চিকিৎসা সমাজকর্ম হাসপাতালের নানারকম বিষয় যেমন– সভা-সমিতি পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, নথিপত্র সংরক্ষণ, প্রচারণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালের (ফার্মেসিসহ) শয্যাপ্রতি ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমানে লোকসংখ্যা ৪,০৩৬ জন এবং প্রতি একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা ৩৯৭৭ জন। ২০০৩ সালের রিপোর্ট অনুসারে মানুষের গড় আয়ু ৬১ বছর। প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ৫১ জন। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে রোগীদের কল্যাণে চিকিৎসা সমাজকর্মের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা জোর দিয়েই বলা যায়।

৫. বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর অধিকাংশ রোগীই পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে হাসপাতাল, চিকিৎসা সমাজকর্মী, ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে রোগীর সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৬. প্রবাদ আছে যে, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। কাজেই রোগ প্রতিকারের পর রোগের পুনরাক্রমণ রোধ এবং রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা, জনমত সৃষ্টি, প্রচারণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. সাধারণত কোন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসা গ্রহণে রোগীকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে অজ্ঞ। তারা চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতে হাসপাতাল সমাজকর্মের মাধ্যমে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

৮. হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের কেবলমাত্র শারীরিক চিকিৎসা নয়, সাথে সাথে মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক চিকিৎসা প্রদানেরও প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

৯. রোগী এবং রোগীর ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন অনুধ্যান, রোগ নির্ণয় এবং সমাধানের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০. রোগীর রোগ থেকে নিরাময় লাভের পর কিছু সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন– গৃহ পরিদর্শন, অনুসরণ, মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি, যা কেবল চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমেই সফলভাবে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব দিনদিন বেড়েই চলেছে।

১১. রোগীকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ করে তোলার জন্য রোগীর মানসিক তৃপ্তি, নিঃসঙ্গতা দূর করা এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার, যা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। আর এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১২. রোগীর সফল নিরাময়ের জন্য চিকিৎসাকালে রোগীর জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। যেমন– এক্সরে, বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, অস্ত্রোপচার, অন্যত্র প্রেরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর পক্ষে এসব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৩. চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমন– পরিবার, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব।

১৪. রোগীর সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে এ সুবিধা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে রোগীর পুরাতন কর্মস্থলে যোগাযোগ, নতুন চাকরি প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থসামাজিকভাবে রোগীকে পুনর্বাসিত করা যায়।

১৫. তাছাড়া বাংলাদেশে চিকিৎসার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্লাড ব্যাংক গঠন, রক্ত সংগ্রহ, মৃতদেহ সৎকার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও চিকিৎসা সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্ম কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি। এদেশের দরিদ্র মানুষের রোগ প্রতিরোধ এবং উন্নয়নে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ জাতি গঠনে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন॥১২॥ হাসপাতাল সমাজসেবা কি? একজন হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারের ভূমিকা আলোচনা কর। [জা. বি.-২০০

অথবা, চিকিৎসা সমাজকর্ম কি? একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, হাসপাতাল সমাজসেবার কাকে বলে? হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারের কার্য আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : হাসপাতালে আগত রোগীদের চিকি সেবাদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রোগীর বিদ্যমান অবস্থার আ তাকে সেবা প্রদান করে তার রোগের সম্পূর্ণ উপশম করা যে ডাক্তারদের পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি রোগীর রোগের পূর্ববর্তী কা তথা যেসব মনোসামাজিক অবস্থা রোগীর রোগের পিছনে সম্প তার রহস্যও একজন ডাক্তারের পক্ষে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হ ওঠে না। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে আগত রোগীদের ম আবার এমন কিছু রোগী দেখা যায় যাদের চিকিৎসার পরে কি যাওয়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত থাকে না। হাসপাতালে আগ রোগীদের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য চিকিৎসকরা অনু করেন পেশাদার কর্মীর, যার ফলশ্রুতিতেই আজকের পেশ সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। হাসপাতালে রোগীর সর্বে সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা, চিকিৎসা পরে রোগীকে তার সম পুনর্বাসন এবং রোগী, তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন কাউন্সিলিংসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ চিকিৎসা সমাজকর্মী স করে থাকেন।

চিকিৎসা সমাজকর্ম : আমেরিকার ম্যাসাসুয়েট জেন হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রিচার্ড সি. ক্যাবোট ১৯০৫ স সর্বপ্রথম চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। চিকিৎসা সমাজকর্ম হ সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা, যা চিকিৎসা সেবার স সম্পৃক্ত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নী কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসারত রোগীর চিকি সংক্রান্ত সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয় এর আওতাধীন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচির পূর্ণতম সদ্ব্য সক্ষম করার মাধ্যমে চিকিৎসাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তো

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী চিকিৎসা সমাজ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল :

রেক্স. এ. স্কিডমোর ও এম. জি. থ্যাকরী বলে "চিকিৎসা সমাজকর্ম হল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতির প্রয়োগ।"

The Dictionary of Social Work (1995 : 2 এর ভাষায়, "Medical social work practice that oc in hospitals and other health settings to facili good health, prevent illness, and aid physically patients and their families to resolve the social psychological problems related to the ill Medical care also sensitizes other health providers about that the social psychological asp of illness."

Social Work Year Book (1945 : 262, Vol-8) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Medical social work is a special field of social work which has developed in relation to the practice of medicine care."

Elizabeth M. R. Clarkson (1974 : 3-4) এর মতে, "Medical social work is a specialized branch of social work practiced in hospitals, and sometimes in general practice."

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের এই শাখা যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসার অন্তরায়সমূহ দূরীভূত করে রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসিত হতে সহায়তা করে।

একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী বা হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারের ভূমিকা : একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হাসপাতালে একজন রোগীর আগমন থেকে শুরু করে রোগীর পুনর্বাসন পর্যন্ত রোগীকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। সাধারণত একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. **হাসপাতালে রোগী ভর্তি এবং শয্যা বরাদ্দ :** একজন রোগী যখন হাসপাতালে আসে তখন সে ঐ হাসপাতাল, হাসপাতালের সেবা ব্যবস্থা এসব সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমতাবস্থায় একজন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে সহায়তা করেন চিকিৎসা সমাজকর্মী। শুধু তাই নয়, সমাজকর্মী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তার জন্য শয্যা বরাদ্দের কাজটিও সম্পাদন করে থাকেন।

২. **সম্পর্ক স্থাপন ও সামঞ্জস্য বিধান :** হাসপাতালে যখন একজন রোগী ভর্তি হল তখনও পর্যন্ত সে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এদের কাউকেই চেনে না বা জানে না। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে তার রোগের জন্য উপযুক্ত ডাক্তার নির্ণয়, ডাক্তার-রোগী, নার্স-রোগী সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, রোগীর সাথে যথাযথ র‍্যাপো গঠনের মাধ্যমে সমাজকর্মী রোগীকে হাসপাতাল পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হতে এবং সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করেন।

৩. **যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা :** আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অজ্ঞ ও নিরক্ষর। তারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে খুব একটা যেমন জানে না তেমনি স্বাস্থ্য রক্ষায়ও খুব একটা সচেতন নয়। এ বৃহৎ অজ্ঞ এবং অসচেতন জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি তাদের যথাযথ চিকিৎসা সেবা পেতে আগ্রহী এবং উৎসাহিতকরণে চিকিৎসা সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪. **অর্থনৈতিক সাহায্য দান :** হাসপাতালে আগত অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য প্রদান, তাদের জন্য ফ্রি ডাক্তার ও ঔষধপত্র সরবরাহ ইত্যাদি সরবরাহকরণের বিষয়টি চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাই দেশের হাসপাতালগুলোতে রোগীদের অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মীর প্রয়োজন রয়েছে।

৫. **সেবা গ্রহণের মানসিকতা তৈরি :** রোগীকে মানসিকভাবে সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়টি চিকিৎসা সমাজকর্মে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। তাই দেখা যায়, বেশিরভাগ রোগীই তাদের রোগ ভালো করতে চায়, কিন্তু তারা সার্জারি বা অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ভয় পায়। এ ভীতি রোগীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এবং উক্ত সেবা গ্রহণে সে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে সে রোগ থেকে মুক্তি পায় না। এসব রোগীদের সার্জারি বা অপারেশনজনিত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের মানসিকতা তৈরিতে সমাজকর্মী বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **চিকিৎসককে সহায়তা :** রোগীর রোগের উপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য ডাক্তারকে সাহায্য করে থাকেন চিকিৎসা সমাজকর্মী। চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রোগীর রোগের পূর্ববর্তী বিভিন্ন ঘটনা ও কারণ অনুসন্ধানের তৎপরতা চালিয়ে থাকেন এবং সংগৃহীত এসব তথ্য ডাক্তারকে সরবরাহ করেন। ফলে ডাক্তারের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই রোগের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি ও সেবাপ্রদান সহজ হয়।

৭. **রোগীর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা :** অনেক সময় দেখা যায়, রোগী তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আবার কখনও দেখা যায় রোগী একজন মা। এসব পরিবারে সন্তানরা একধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এক্ষেত্রে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের মনোসামাজিক নিরাপত্তা, সন্তানদেরকে বিভিন্ন চাইল্ড হোম কিংবা ফস্টার কেয়ার সেন্টারে প্রেরণ করে সাময়িকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৮. **রোগীর জীবন ইতিহাস সংগ্রহ :** একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী অত্যন্ত সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে রোগীর রোগের জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করে থাকেন। আর এজন্য সে রোগী, রোগীর মা-বাবা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নিয়ে থাকেন।

৯. **হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ :** আমাদের দেশে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি থানা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব হাসপাতালে জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণে চিকিৎসা সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। চিকিৎসা সমাজকর্মী জনসাধারণকে হাসপাতালের সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে যথার্থ সংযোগ ঘটাতে সহায়তাকরণে সাহায্য করতে পারেন।

১০. **ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ :** চিকিৎসা সমাজকর্মী শুধুমাত্র রোগীকে নিয়ে কাজ করে না। তার পরিবেশ বিশেষ করে আর্থসামাজিক অবস্থার আলোকে রোগীকে সেবাপ্রদান করার বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর রোগ সম্পর্কে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজনদের অবহিত করার মাধ্যমে যেসব সামাজিক অবস্থা বা পরিস্থিতি তার রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী তা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়।

১১. চিত্তবিনোদনে সহায়তা করা : একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীর চিত্তবিনোদনজনিত চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি হাসপাতালে রোগীদের জন্য চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে থাকেন এসব চিত্তবিনোদন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ক্যারম খেলা, লুডু খেলা, পেপার পড়া ইত্যাদি।

১২. রোগী স্থানান্তর : অনেক সময় দেখা যায়, হাসপাতালে আগত রোগীর রোগ এবং হাসপাতালে প্রদত্ত সেবা একরকম নয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে তার রোগের সেবাপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত হাসপাতালে তাকে প্রেরণ করে থাকেন। অথবা রোগীকে সে হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দেন।

১৩. আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি : আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত অনেক লোক আছে, যারা দেশে প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে নেতিবাচক মানসিকতা পোষণ করে। তারা বিভিন্ন ধরনের ঝাড়ফুঁক, তাবিক-কবচ, ওঝা-বৈদ্যে বিশ্বাসী। উক্ত জনসাধারণকে তাদের এ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে মুক্তি দানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৪. প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা সেবায় উৎসাহিতকরণ : এদেশের জনসাধারণকে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণে সমাজকর্মী তথা পেশাদার সমাজকর্ম ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন– জনসাধারণকে হাসপাতাল, ক্লিনিক, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেবা গ্রহণের ব্যাপারে চিকিৎসা সমাজকর্মী উদ্বুদ্ধ করার কাজটি করতে সক্ষম।

১৫. কমিউনিটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন : কমিউনিটি বা সমষ্টির জনগণের জন্য স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ চিকিৎসা সমাজকর্মে সমাজকর্মী জনসাধারণকে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, তাদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন। আর এ কাজ করতে গিয়ে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা জনসাধারণের কাছাকাছি চলে আসেন। ফলে তারা জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র অঙ্কনে সক্ষম হন এবং জনসাধারণের জন্য একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হন। আমাদের দেশেও তাই জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়নে চিকিৎসা সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

১৬. চিকিৎসা কর্মসূচির সাথে পরিচিত করা : একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। একটি দেশের সরকার প্রতি বছরই দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। যেসব কর্মসূচি সম্পর্কে ঐ দেশের লোকজন খুব একটা জানতে পারে না, এসব চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৭. ফলোআপ : চিকিৎসা সমাজকর্মীর একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল রোগীর ফলোআপ করা। অর্থাৎ রোগী ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থাপত্র মেনে চলছে কি না, ঔষধপত্র খাচ্ছে কি না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো চিকিৎসা সমাজকর্মী ফলোআপের মাধ্যমে দেখে থাকে। এতে করে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

১৮. চিকিৎসা উত্তর সেবা : চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে হাসপাতাল ত্যাগের পরেও কিছু সেবা প্রদান করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করার পর আবার পূর্বের পরিবেশে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে, যে পরিবেশ তার রোগব্যাধি সৃষ্টির জন্য অনুকূল। আবার দেখা যায়, রোগী তার ব্যবস্থাপত্রে বর্ণিত ঔষধের ডোজ সম্পূর্ণ শেষ করে না। এক্ষেত্রে রোগীর পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোগীর এসব হাসপাতাল বহির্ভূত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে থাকেন চিকিৎসা সমাজকর্মী।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পেশাদার সমাজকর্মের সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ এ চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। সাধারণভাবে জনমনে এমন একটি প্রশ্ন রয়েছে যে, হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি না? কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা প্রয়োগ ও অনুশীলনের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে, যার যথার্থ এবং সার্থক প্রয়োগ একমাত্র চিকিৎসা সমাজকর্মীর পক্ষেই সম্ভব।

প্রশ্ন॥১৩॥ বাংলাদেশে সরকারি প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম বা কর্মসূচি আলোচনা কর।

অথবা, পঙ্গুদের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ কর। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত পঙ্গু কল্যাণ কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, সরকারী প্রতিবন্ধীকল্যাণ কার্যপদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রতিবন্ধী বলতে সাধারণত দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এসব ব্যক্তিরা তাদের পঙ্গুত্বের কারণে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। পঙ্গুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ বর্তমানে তাদেরকে প্রতিবন্ধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রতিবন্ধীদেরও মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। আর তাদেরই কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই সরকার বিভিন্ন প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধীর শ্রেণীবিভাগ : প্রতিবন্ধীত্বের কারণ ও প্রকারভেদ আলোচনা করলে প্রতিবন্ধী লোকদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে প্রতিবন্ধীদের এ শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. দৈহিক প্রতিবন্ধী : যাদের দেহে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই অথবা থাকলেও তা কাজের অনুপযোগী ঐসব ব্যক্তি এবং দৈহিকভাবে দুর্বল অথবা ঐ ব্যক্তি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– বোবা, অন্ধ, বধির, ল্যাংড়া, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং চরম পুষ্টিহীন ইত্যাদি।

২. মানসিক প্রতিবন্ধী : অস্বাভাবিক এবং ভারসাম্যহীন মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম তারাই মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। যেমন– পাগল, ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন, জড় ব্যক্তি, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি।

৩. সামাজিক প্রতিবন্ধী : যেসব লোক প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে অস্বাভাবিক, অরক্ষিত, লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত জীবনযাপনে বাধ্য হয় তারাই সামাজিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। যেমন– পতিতা, জেলফেরা কয়েদি, অবৈধ সন্তান, লাঞ্ছিতা নারী, অসহায় এতিম, পরিত্যক্ত শিশু প্রভৃতি।

৪. অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধী : যারা বিপর্যয়মূলক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আর্থিক অক্ষমতা এবং অসুবিধার জন্য সমাজে প্রত্যাশিত, রক্ষিত ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম তারাই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধী। যেমন– নিঃস্ব, ভিক্ষুক, ছিন্নমূল, ভবঘুরে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সরকারি প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ জনসংখ্যা প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের সচল এবং উৎপাদনমুখী জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বনির্ভর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা যায়। এজন্যই তৎকালীন পাকিস্তানে সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ ১৯৬২ সালে দৈহিক বিকলাঙ্গদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশেও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অধিদপ্তর বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রমগুলো আলোচনা করা হল :

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ : শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি : প্রতিবন্ধীদেরকে সম্মানজনকভবে সমাজে পুনর্বাসিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে একটি ঢাকার মিরপুরে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া এখানে ৩০ আসনবিশিষ্ট প্রতিবন্ধী কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদের একটি প্রশিক্ষণ কলেজ এবং একটি রিসার্স সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিসমূহ হল : ক. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুল ও একটি ছাত্রাবাস খ. শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুল ও ১টি ছাত্রাবাস গ. মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিদ্যালয় ও একটি ছাত্রাবাস। এখানে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বর্তমানে নিবাসীর সংখ্যা ১৩০ জন এবং বহিরাগত ৬০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এতে নরওয়ের তিনটি NGO ১৪ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান দিয়েছে। এ পর্যন্ত এখান থেকে ৪২০ জন প্রতিবন্ধী এবং ৩০ জন (বিএসএড) ডিগ্রী লাভ করেছে।

২. অন্ধ বিদ্যালয় : অন্ধ বিদ্যালয়ে অন্ধ শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্ধ ছেলেমেয়েদেরকে গানবাজনা শেখানো হয় এবং নানারকম চিত্রবিনোদনের সুযোগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ মোট পাঁচটি অন্ধ বিদ্যালয় পরিচালনা করছে যেখানে প্রতি বিদ্যালয়ে ১০০ জন করে শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুলের সাথে একটি করে ছাত্রাবাস আছে। এসব ছাত্রাবাসে সরকারি খরচে ১৬০ জন ছাত্রের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৩. মূক ও বধির বিদ্যালয় : বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় সদরে মূক ও বধির স্কুল রয়েছে। এছাড়া আরও তিনটি জেলায় এ ধরনের তিনটি স্কুল রয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে মোট সাতটি মূক ও বধির বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে মোট ৭০০ জন মূক ও বধির ছেলেমেয়েদেরকে তাদের উপযোগী বিশেষ পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখানো হয় এবং শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া এসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য নানারকম খেলাধুলা এবং ছবি আঁকার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। প্রতিটি মূক ও বধির বিদ্যালয়ের সাথে একটি করে ছাত্রাবাস রয়েছে। এসব ছাত্রাবাসে মোট ১৮০ জন সরকারি খরচে থাকা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। আনন্দের সংবাদ এ যে, বাংলাদেশের মূক ও বধির স্কুলের শিক্ষার্থীরা গত কয়েক বছর থেকে প্রতিবছরই জাপানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে আসছে।

৪. সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম : অন্ধ শিক্ষার উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তার সাধারণ স্কুলসমূহে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সাথে অন্ধ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৬৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে কতিপয় বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু করার পর আশানুরূপ ফল আসায় কার্যক্রমটিকে সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৪৭টি স্কুলে এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব স্কুলের প্রতিটিতে অন্ধদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে একজন করে 'রিসোর্স টিচার' নিয়োগ দেওয়া হয়।

৫. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র : দৈহিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল এবং কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টংগীতে এ কেন্দ্রটি বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির আবাসিক আসন সংখ্যা ৮০। অত্র প্রতিষ্ঠানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ কেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত মোট ১,৮৭৬ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৭. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের শেষ ভাগে গাজীপুর জেলার টংগীতে একটি 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে প্রতিভাবান দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ওয়েল্ডিং, ফিটিং, ছোটখাট যন্ত্র তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত এ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৮. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান : ১৯৯৫ সালে মানসিক প্রতিবন্দী শিশুদের জন্য চট্টগ্রামে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও পূর্ণবাসন কাযক্রম পরিচালিত হচ্ছে এ কেন্দ্রে । এটা ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান ।

১১. ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র : দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্রেইল পদ্ধতিতে মুদ্রণ ও সরবরাহের লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ সালের গাজীপুর জেলার টংগীতে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্রে ব্রেইল প্রেস স্থাপন, বধিরদের শ্রবণ সহায়ক উপকরণ উৎপাদন, অঙ্গহীনদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে তা সরবরাহ করা হয়।

৯. মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ত শিশুদের প্রতিষ্ঠান : মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য 'Society for the cares Education of the Mentality Relarted' নামক সংস্থা ঢাকায় ইস্কাটন গার্ডেনে সরকারের সহায়তায় ১০ কাঠা জমির উপর এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছে।

১০. মানসিক হাসপাতাল : দেশের ব্যাপক মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পাবনার হেমায়েতপুরে আবাসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্প্রতি পিরোজপুরে এ রকম আরও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতেও মানসিক বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্থানে মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা করা হয়।

৬. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদেরকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে একটি করে মোট চারটি কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি : শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে :

১. সংশোধন ও পুনর্বাসন প্রকল্প : অপরাধী প্রবেশন ও অপরাধীদের সংশোধনের জন্য প্রবেশন এবং জেল কয়েদিদের দীর্ঘদিন জেলভোগের পর আফটার কেয়ার সার্ভিস দেশের বড় ১১টি শহরে এবং ৪০০টি থানায় পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া গাজীপুর জেলার টংগীতে জাতীয় সংশোধনী ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ পর্যন্ত এখানে ৪,১৬১ জনকে সংশোধনের মাধ্যমে স্ব পরিবারে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. ভবঘুরে ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র : ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৪৩ সালের ভবঘুরে আইন অনুসারে সারাদেশে ১০টি ভবঘুরে ও ভিক্ষুক নিরোধ কর্মসূচি রয়েছে। তাছাড়া চরম দরিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিহীনতা, সামাজিক বঞ্চনা প্রভৃতির শিকার বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ছয়টি ভবঘুরে কেন্দ্র চালু আছে/ করা হয়েছে। এখানে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য চিকিৎসা, থাকা খাওয়া ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত এখান থেকে ৩০,৩৮৭ জন ভবঘুরে ও ভিক্ষুককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৩. দুঃস্থ মহিলাদের আর্থসামাজিক কেন্দ্র : ঢাকা ও রংপুরে ১৯৭৩ সালে দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সহায়তা করাই এ কেন্দ্রের লক্ষ্য। এখানে মহিলাদের বুনন, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পুতুল তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, প্রিন্টিং, চামড়ার কাজ ইত্যাদি শিখানো হয়। এখানে এ পর্যন্ত মোট ১২,৪০২ জন দুঃস্থ মহিলাকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৪. দুঃস্থ পরিত্যক্ত শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : পাঁচ বছরের কম বয়সী দুঃস্থ পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য ঢাকায় [illegible] আসনের একটি শিশু নিবাস আছে। পাঁচ বছর বয়স হলে এদেরকে সরকারি শিশু সদনে প্রেরণ করা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি একেবারেই অপ্রতুল। উপরে বর্ণিত এসব কর্মসূচির প্রায় সবগুলোই শহর কেন্দ্রিক। কাজেই প্রতিবন্ধীদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য শহর ও গ্রামের জনসমষ্টির জন্য আরও অধিকসংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

প্রশ্ন।১৪॥ BRDB-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কি কি? বিআরডিবি এর কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। [জা. বি.-২০১২]

অথবা, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক এর সমালোচনা কর।

অথবা, BRDB-এর উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক এর কর্মকৌশল মূল্যায়ন কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Development Board) পল্লি এলাকার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহত্তম সংস্থা। পল্লি এলাকার জনগণকে সমবায় এবং আনুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করা এর মূল লক্ষ্য। বিত্তহীন জনগোষ্ঠী, পল্লির পেশাজীবী শ্রেণী, মহিলা ও কৃষকদের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর উদ্দেশ্য : পল্লিউন্নয়নের মাধ্যমে বিশেষ করে পল্লির দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করে পল্লির জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ডের অন্যতম লক্ষ্য। এর অপরাপর উদ্দেশ্যসমূহ হল নিম্নরূপ :

১. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড প্রসারের মাধ্যমে লাভজনক কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের উৎসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ।

৪. পল্লি এলাকায় অফিস, বাজার, গুদাম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারখানা প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।

৫. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশীদারিত্বের প্রসার ঘটানো।

৬. সহায়ক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ডের মূলনীতি নিম্নে উল্লিখিত গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান করা। যথা :

ক. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ দরিদ্র্য নারী ও পুরুষ,

খ. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং

গ. গ্রামীণ গৃহকর্মী (প্রধানত কৃষি ও অকৃষিকাজে নিয়োজিত গরিব মহিলা)।

বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ :

i. সরেজমিন বিভাগ,

ii. দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প,

iii. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি,

iv. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণে পল্লিউন্নয়ন ও সমবায়ের ব্যবহার,

v. মহিলা বিষয়ক প্রকল্প,

vi. কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।

১. বিত্তহীন মহিলাদের কল্যাণ ও উন্নয়ন : বিআরডিবি বিত্তহীন মহিলাদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা জোরদারকরণ এবং নারী, শিশু এবং যুবকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উন্নয়ন : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ডের একটি অন্যতম দিক হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণ কর্মসূচি। এছাড়া তদারকি, ঋণদান এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে জনগণের নিজস্ব মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে বিআরডিবি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। BRDB এর ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উন্নয়নের জন্য ঋণ কর্মসূচির ফলে গ্রামের কৃষকগণ সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে।

৩. পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড এর পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীকে তাদের অবস্থার উন্নয়ন, তাদের সংখ্যা হ্রাস এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে অনেকটা সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

৪. অবকাঠামোগত উন্নয়ন : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড তার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদির মাধ্যমে একদিকে গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে অপরদিকে এসব ক্ষেত্রে বেকার যুব শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তারা আজ নির্ভরশীল শ্রেণী পর্যায়ে পড়ছে না।

৫. বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) বাজারজাতকরণ ও ব্যবসায় কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদেরকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করেছে।

৬. সেচ কর্মসূচি : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে সেচ কর্মসূচি সবচেয়ে সফল কর্মসূচি। বিআরডিবি এর Irrigation Management Programme সেচ ব্যবস্থার পদ্ধতিগত উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বর্তমানে এ Irrigation Management Programme এর আওতায় ৩৪ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদ চলছে। বর্তমানে কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন ও সেচ সম্প্রসারণের ফলে জমিতে ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. নেতৃত্ব সৃষ্টি : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) সমবায়ের যোগ্য কর্মী ও নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। যোগ্য কর্মী ও নেতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সমিতি সাফল্য লাভ করেছে।

খ. বিআরডিবি এর ব্যর্থতা : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড এর অনেক সাফল্য সত্ত্বেও পল্লিউন্নয়নে বৃহত্তর সামাজিক দিক হতে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এটা একটি ব্যয়বহুল ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। নিম্নে বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড এর ব্যর্থতার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল :

১. ধারাবাহিকতা নেই : কয়েকটি ভিন্নধর্মী বিদেশী দাতাদের অর্থ সাহায্যের উপর বিআরডিবি এর কর্মসূচিগুলো নির্ভরশীল বলে এর কর্মসূচিগুলোতে তেমন ধারাবাহিকতা নেই। সাহায্যদাতাদের ইচ্ছানুসারেই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করতে হয়।

২. ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি : বিআরডিবি কর্তৃক প্রদত্ত সেচ ব্যবস্থার সুযোগ, বীজ, ঋণ ও কীটনাশক ধনী কৃষকরাই গ্রহণ করে থাকে বেশি। এর ফলে BRDB বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

৩. পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা : বিআরডিবি উন্নয়নের একক হিসেবে গ্রামকে গ্রহণ করে নি, বরং গ্রামের অভ্যন্তরে একটি গ্রুপকে একক হিসেবে গ্রহণ করেছে, যা BRDB এর একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি।

৪. নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে নি : আদর্শ কৃষক ও ম্যানেজার সাধারণত বিত্তবান কৃষকদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হয়েছে। তাই গ্রামীণ নেতৃত্ব বিকাশে বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড তেমন ভূমিকা রাখতে পারে নি।

৫. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন নেই : বিআরডিবি কৃষিক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করলেও অকৃষিমূলক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় গুরুত্ব একেবারেই কম দেওয়া হয়েছে। এ কারণে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড তার কর্মসূচিগুলো যতটুকু সম্প্রসারিত করেছে তাতে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার সংখ্যা বেশি। কিন্তু BRDB এর অসংখ্য ব্যর্থতা সত্ত্বেও গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন॥১৫॥ বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি (BRDB) এর অবদান বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে BRDB-এর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে BRDB-এর তাৎপর্য আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি (BRDB) এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি (BRDB) এর ভূমিকা বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) দেশের পল্লিউন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের সর্ববৃহৎ সরকারি সংস্থা। সমন্বিত পল্লিউন্নয়ন কর্মসূচির নতুন নামকরণই হল বিআরডিবি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সমন্বিত পল্লিউন্নয়ন কর্মসূচি বলা হয়। কুমিল্লা উন্নয়ন একাডেমির গবেষণালব্ধ মডেলের উপর ভিত্তি করে এ কর্মসূচির উদ্ভব। এ কর্মসূচি ১৯৮২ সালে স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডের মর্যাদায় বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড নামক একটি জাতীয় সংস্থাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি এর ভূমিকা : বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড বহু কর্মসূচি চালু করেছে। নিম্নে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবির অবদান আলোচনা করা হল :

১. Rural Development Project : কর্মসূচিটি দেশের উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলার ২০টি থানায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলাগুলো হচ্ছে, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও গাইবান্ধা। এটি Local Government Ministry এবং Rural Development and Co-operatives এর আওতায় BRDB এর একটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, কৃষি ও অকৃষিখাতে লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের মাধ্যমে Target Group Member দের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। গ্রামীণ ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের বেঁচে থাকতে সর্বদা হওয়ার নিমিত্তে Seperate Economic Group সংগঠিত করা ইত্যাদি।

২. Rural Development Project : ১৯৯৬-৯৭ সালে এটি বৃহত্তর ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম ও মাদারীপুর জেলার ছয়টি থানায় কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি Productive Employment Project নামেও পরিচিত। এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে। এর মোট ব্যয় ৩,৮৭১ লাখ টাকা। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডগুলো হল ধান ভাঙা, কুটিরশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, রিকশা, ভ্যান চালক, বাঁশের কাজ, থলে তৈরি, মুদির দোকান প্রভৃতি।

৩. Rural Poverty alliviation Programme : এ কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থ বরাদ্দে ১৯৯৩-৯৪ সালে চালু হয় এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশের ২৩টি জেলার ১৪৫টি থানায় কাজ করে। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন লাভজনক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত ভূমিহীন দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রা তথা আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৬৬৫৬·০৭ লাখ টাকা।

৪. Productive Employment Project Kurigram : এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সুবিধার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা যারা কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবননির্বাহ করে তাদেরকে এর আওতায় সংগঠিত করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এ প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার পাঁচটি থানায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মোট ব্যয় হয়েছে ১০৬ লাখ টাকা।

৫. **Rural Bittaheen Programme :** এটি বিআরডিবি এর সর্ববৃহৎ প্রকল্প এবং RD-12 এর দ্বিতীয় পর্যায়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, RD-12 এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করা, গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন ও সম্পদহীনদের সমবায়ে সংগঠিত করা ও গতিশীল করা এবং লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং প্রশিক্ষণ, ঋণ, সামাজিক উন্নয়ন ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে তারা উন্নয়নের মূল ধারায় প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া সরকারি অনুমোদনক্রমে গ্রামীণ দরিদ্রদের উন্নয়ন কর্মসূচিকে Permanent institutional Structural এর পরিবর্তনে সাহায্য করাও এর উদ্দেশ্য। দেশের মোট ১৭টি জেলায় ১৩৯টি থানায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। এর প্রধান সুবিধাভোগী হল দরিদ্র ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলা, যারা জীবনধারণের জন্য শ্রম বিক্রির উপর নির্ভর করে এবং যাদের জমির পরিমাণ ০.৫০ একরের কম। এতে GO এবং Canadian CIDA অর্থ সংস্থান করে। এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১১,৮৫০ লাখ টাকা।

৬. **Rural Poor Co-operative Project :** বিআরডিবি এর Rural Poor Co-operative Project টি যশোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী জেলার ৮২টি থানায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি ১৯৯৩ সালে শুরু হয় এবং ১৯৯৭ সালে শেষ হয়। এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ১০,২১৭.৪৮ লাখ টাকা, যার মধ্যে ১,৬৮৩.৪০ লাখ টাকা সরকার সংস্থান করবে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, দু'স্তরবিশিষ্ট সমবায় যেমন– BSS এবং MBSS এর মাধ্যমে গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা এবং গ্রামীণ এলাকায় তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭. **Saving deposits and training activities :** এ প্রকল্পের আওতায় যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা হল পশুপালন ও মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ, সচেতনতা প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সমবায়ী নেতাদের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবস্থা প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৯০৩.৫৯ লাখ টাকা সঞ্চয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৯০ লাখ টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬১৫.৪৯ লাখ টাকা সঞ্চয় হয়। আর এর আওতায় BSS এবং MOSS এর সদস্যদের নিকট ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে ২,৪০০ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও ঋণ বিতরণ করা হয় ৬,০১৫.৮৩ লাখ টাকা।

৮. **Greater Noakhali Rural Poor Co-operative Support Project :** বৃহত্তর নোয়াখালীর তিনটি জেলা তথা লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নোয়াখালী জেলার ১৩টি থানায় এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মোট ব্যয় বরাদ্দ ২,৫০০ লক্ষ টাকা। এর আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ঋণ ১০২০ লাখ টাকা এবং প্রশিক্ষণ বাবদ ১৩৪.৪৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর আওতায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কৃষি ও অকৃষিজাত আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে নিয়োজিত করা হয়।

৯. **Primary Health Care Project :** এ প্রকল্পটি ১৯৯২ সাল হতে কাজ শুরু করে Directorate of health Service. এতে তিনটি বিভাগের তিনটি থানা অন্তর্ভুক্ত। থানাগুলো হল খুলনার ফকিরহাট, বরিশালের বাকেরগঞ্জ, চট্টগ্রামের হাটহাজারী। এতে ঋণ হিসেবে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬.০২ লাখ টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে ৯৩ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৩,৫৮,৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত সেবা সরবরাহ করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত করা।

১০. **Sharishabari Rural Development Project :** এ প্রকল্পটি জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানায় ২৫টি নির্বাচিত গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০.৩৩ লাখ টাকা। এটি ১৯৯৬ সালে শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালে শেষ হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লিখিত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে সচেষ্ট। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত, ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত সমবায় গঠন মজবুত হয়।

প্রশ্ন॥১৬॥ যুবকল্যাণ কাকে বলে? যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর। বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, যুবকল্যাণ বলতে কী বুঝ? যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর। বাংলাদেশে যুবকদের বাধাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, যুবকল্যাণের সংজ্ঞা দাও? যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর। বাংলাদেশে যুবকদের প্রতিবন্ধকতা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধাণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়, যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যামন। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হল যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই এ বিশেষ সময়ে তদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এবং গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে না পারলে এ সম্প্রাদায় স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের প্রতি চরম হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

যুবকল্যাণ : সাধারণভাবে যুবকল্যাণ বলতে যুবকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক তথা সার্বিক কল্যাণকে বুঝায়, যা তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে। অর্থাৎ যুবকল্যাণ এমন একটি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ যা যুবকদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভরশীল ও সৃজনশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এ কর্মসূচি তাদেরকে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য কাজের সাথে সাথে অবকাশকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের হতে পারে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে যুব কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হল :

Dr. Ali Akbar তাঁর, 'Elements of Social Welfare' গ্রন্থে বলেছেন, "By youth welfare we understand those governmental and voluntary youth services which are disigned to provide the youth, in their leisure time, with opportunities of various kinds, contemporary to those of home, formal education and work to enable them to discover and develop their personal resources of body, mind and spirit and thus better equip themselves to live the life mature, creati e and responsible members of the society."

Encyclopidea of Social Work in India এর ৪৩৮নং পৃষ্ঠায় যুবকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "Youth welfare services are a broad spectrum of activities which either in education institution or outside them care to the mental, moral and physicial needs of the young and so in areas which are not usually covered by formal schooling."

ভারতীয় সমাজকর্ম জ্ঞানকোষে যুবকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়, "We may therefore say taht youth welfare swrvices are a broad spectrum of activities which either in education institutions or outside them gater to the mental, moral and physical needs of the young and so in areas which are not usually covered by formal schooling."

যুবক বলতে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট বয়স স্তরকে বুঝায়। কোন দেশে কোন বয়সসীমা যুবক হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সংশ্লিষ্ট দেশই নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে অনেক দেশেই ১৮–৩৫ বয়স স্তরকে যুবক বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যুবক বলতে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়স সীমার লোককে যুববয়সী হিসেবে সরকারিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যুবকল্যাণ কার্যক্রম, যুব সম্প্রদায়কে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত রেখে তাদের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। নিম্নে যুবকল্যাণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করা হল।

ক. বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা।

খ. দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের সহায়তা করা।

গ. যুব সম্প্রদায়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচক্ষণ ও পরিণত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গঠনমূলক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

ঘ. অসামাজিক কার্যক্রম থেকে যুব সম্প্রদায়কে বিরত রাখা ও দূরে রাখা এবং জনকল্যাণমুখী কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ. যুবকদের মাঝে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা সৃষ্টি ও গুণাবলির বিকাশ সাধন করা।

চ. বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা।

ছ. যুবকদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, দলীয় চেতনা ও মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, পাস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক চেতনাবোধ, সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করা।

জাতীয় যুব নীতিমালা : যুবকল্যাণ তথা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূলভিত্তি হচ্ছে জাতীয় যুব নীতিমালা। যার আলোকে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক জাতীয় যুব নীতিমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত। জাতীয় যুব নীতিমালার মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. যুবশক্তির আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

২. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুবকদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করা।

৩. শ্রমের মর্যাদা অনুধাবনে যুবকদের উৎসাহিত করা।

৪. যুবক-যুবতীদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

৫. যুবসমাজের মধ্যে যথাযথ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং

৬. থানা পর্যায়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করা।

বাংলাদেশে যুবকদের সমস্যা : বাংলাদেশের যুবসমাজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য ও অস্থিতিশীল সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায় আজ দিশেহারা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শের অভাবে যুবসমাজ স্বীয় ভূমিকা নির্ধারণে ব্যয় হয়ে নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত

হয়ে পড়ছে তেমনি সৃষ্টি করছে অসংখ্য সমস্যার। বাংলাদেশের যুবসমাজের প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. **বেকারত্ব :** আমাদের দেশের এক তৃতীয়াংশ যুবক বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। কথায় বলে শূন্য মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা। কর্মহীন যুব সম্প্রদায় তাই তাদের মূল্যবান সময় বিভিন্ন অসামাজিক কাজে ব্যয় করে। নেতিবাচক আচণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদের ক্ষোভ।

২. **নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা :** ডায়গ্যানিসেস বলেছেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিত হল সে দেশের শিক্ষিত যুবসমাজ।" এলিজা কুকের মতে, "যুবসমাজের সঠিক শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মজবুত ভিত্তি।" কিন্তু আমাদের যুবসমাজের ব্যাপক অংশ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বলে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ বা ভূমিকা আশা করা মূল্যহীন।

৩. **মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ :** যুবসমাজ তাদের ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে পারে না। ফলে তাদের ক্ষোভ খুব অসন্তে যে রূপ নেয়।

৪. **হতাশা ও নৈরাশ্য :** হতাশা ও নৈরাশ্য জীবনযুদ্ধে ক্লিষ্ট মানুষকে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। গোটা সমাজের ন্যায় যুবকরাও নৈরাশ্য ও হতাশার আঘাতে মূহ্যমান। তাদের নেই শিক্ষা ও পর্যাপ্ত সুযোগ। ভালো চাকরি ও সুস্থ পরিবেশে পাওয়াপাওয়ার মধ্যে বিরাট গরমিল এ অনিশ্চয়তা স্বভাবতই তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

৫. **স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা :** বাংলাদেশের মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় না। ফলে অপুষ্টিজনিত কারণে যুব সম্প্রদায়ের শারীরিক ও মানসিক গঠন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীন মানুষ স্বভাবত শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে থাকে। ফলে এ অসুস্থতা তাদের কাজ কর্মে ও আচরণে প্রকাশ পায়।

৬. **নেতৃত্বের অভাব :** যুবকদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও যোগ্য নেতৃত্বের। এ ধরনের আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের বড়ই অভাব। ফলে লক্ষ্যহীন, দাঁড়হীন নৌকার মত অথবা নেতৃত্ব পেলেও আদর্শবর্জিত, অযোগ্য, নীতিহীন যা তাদের বিপদগামী হতে বাধ্য করছে।

৭. **বৈষম্য :** আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট। দেশের ৯০ ভাগ সম্পদ যার ১০ ভাগ লোক ভোগ করে। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। বলা যেতে পারে দেশের ৯০ ভাগ যুবকই এ ধরনের বৈষম্যের শিকার। ফলে সংগত কারণেই তাদের এ হয়ে উঠে বিদ্রোহী। প্রকারান্তরে যা যুব অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

৮. **আদর্শ শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব :** এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবা-মা এর পরেই শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতা রাজনৈতিক অস্থিতি, অস্থিরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা পালনে বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। এ ব্যর্থতাই সৃষ্টি করছে যুব বিশৃঙ্খলা।

৯. **রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার :** স্বাধীনতার উত্তরকালে যুবসমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করার প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যত রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আছে তার সবই রাজনৈতিক নেতারা তাদের দিয়ে করাচ্ছে। ফলে যুবকদের চরিত্র ও চেতনা কলুষিত হয়ে পড়ছে। চরিত্রের এ কলুষতাই তাদের অপরাধপ্রবণ করে তুলছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের যুবক শ্রেণী অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত যা তাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ করে দিচ্ছে। অথচ একটি দেশের যুব শ্রেণীই হল সকল আশা ভরসার কেন্দ্র স্থল। তাই দেশ ও জাতির সামগ্রিক জল্যাণের কথা চিন্তা করে যুবকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ যুবকল্যাণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন॥১৭॥ যুবকল্যাণের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি আলোচনা কর। [জা. বি.-২০০৯, ২০১১]

অথবা, যুবকল্যাণ কী? বাংলাদেশে যুবকদের বর্তমান সমস্যা নিরসনে তোমার সুপারিশ পেশ কর।

অথবা, যুবকল্যাণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর? বাংলাদেশে যুবকদের বর্তমান সমস্যা নিরসনে তোমার সুপারিশ পেশ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের জন্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই জাতির আশা-ভরসার প্রতীক। যুব সম্প্রদায় সাধারণত এমন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয় যাতে উদ্যমতা, বীরত্ব, বিপ্লবাত্মক, রোমাঞ্চকর প্রভৃতি ধরনের আবেগ ও অনুভূতি বিদ্যমান। যুবকল্যাণের লক্ষ্য হল যুবকদের অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত করা। তাদের সার্বিক কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে কোন দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই এ বিশেষ সময়ে তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এ সম্প্রদায় স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের প্রতি চরম হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

যুবকল্যাণ : সাধারণভাবে যুবকল্যাণ বলতে যুবকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক তথা সার্বিক কল্যাণকে বুঝায়, যা তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে। অর্থাৎ যুবকল্যাণ এমন একটি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ যা যুবকদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভরশীল ও সৃজনশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এ কর্মসূচি তাদেরকে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য কাজের সাথে সাথে অবকাশকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের হতে পারে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে যুব কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হল :

Dr. Ali Akbar তাঁর, 'Elements of Social Welfare' গ্রন্থে বলেছেন, "By youth welfare we understand those governmental and voluntary youth services which are disigned to provide the youth, in their leisure time, with opportunities of various kinds, contemporary to those of home, formal education and work to enable them to discover and develop their personal resources of body, mind and spirit and thus better equip themselves to live the life mature, creative and responsible members of the society."

Encyclopidea of Social Work in India এর ৪৩৮ নং পৃষ্ঠায় যুবকল্যাণকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "Youth welfare services are a broad spectrum of activities which either in education institution or outside them care to the mental, moral and physicial needs of the young and so in areas which are not usually covered by formal schooling."

অতএব, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যুবদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপকে যুবকল্যাণ বলা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের যুবকল্যাণ কর্মসূচি : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে যুবকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এ কার্যক্রম গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত সীমিত ছিল। স্বাধীনতার পর যুবসমাজের কল্যাণের জন্য একদিকে যেমন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় অন্যদিকে, পুরাতন কার্যক্রমের উন্নতি ও সম্প্রসারণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার যুবকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য যে কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : যুব সম্প্রদায়ের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৯-৮০ সালে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। এর মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য মোট ৮২টি কেন্দ্র চালু আছে।

২. থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প : গ্রামীণ, দরিদ্র-দুস্থ যুবক-যুবতীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩২টি থানায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হল গ্রামীণ দরিদ্র যুবসমাজকে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান।

৩. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প : কর্মক্ষম বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে ১০টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক. গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ১... প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস। হাঁসমুরগি পালন, গ... মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ২৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ মাস। চিংড়ি চাষ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৪. যুবকল্যাণ তহবিল : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান কাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সরকারি সাহায্যে একটি যুবকল্যাণ তহবিল গঠিত হয়েছে। যুবকদের বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার প্রেক্ষিতে এ টাকার প্রাপ্ত আয় থেকে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়া এ তহবিল থেকে যুবকল্যাণ সংগঠনগুলোকে অনুদান দেওয়া হয়।

৫. বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প : এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫টি জেলায় কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিপি, রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রভৃতি বিষয়ে যুব পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ মাস। এখানে যুবকদের কারিগরি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ. দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। অফিস আদালতে দপ্তরি কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গ. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। টাইপ, ফটোকপি, কম্পিউটার প্রোগ্রামস্ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঘ. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। পোশাক তৈরি, সেলাই, বোতাম লাগানো প্রভৃতি বিষয়ে যুব মহিলা পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এসব কেন্দ্র থেকে।

ঙ. উল বুনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। উলের সোয়েটার, চাদর প্রভৃতি তৈরি ও বুনন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৬. জাতীয় যুব কেন্দ্র : এটা মূলত একটি সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। জাতীয় যুব কেন্দ্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠান ছাড়াও দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পুস্তক, চলচ্চিত্র, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭. **JICA and KOICA :** জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা এবং কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে জাইকার ৪ জন এবং কোইকার ৪ জন স্বেচ্ছাসেবী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে জড়িত আছে।

৮. **কমনওয়েলথ Youth প্রোগ্রাম :** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ Youth প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি যেমন– সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ Youth প্রোগ্রাম এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ১৪২ জন কর্মকর্তা ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

৯. **লোকবল, উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :** এ প্রকল্পের অধীনে থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ যাবৎ ৮২৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মসূচি সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গবেষণার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

১০. **জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন :** বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে,

ক. নীতিনির্ধারণ ও জনসাধারণের মাঝে যুবসমাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। তাদের অধিকার ও কর্ম উদ্দীপনার স্বীকৃতি প্রদান।

খ. শান্তিশৃঙ্খলা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের যুব সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. যুবশক্তিকে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রবর্তন।

ঘ. যুব কর্মসূচি ও যুব নীতির মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন সাধন এবং

ঙ. শান্তি, শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সমঝোতার আদর্শে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ।

যেসব যুব সংগঠক আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প বা সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে 'জাতীয় যুব পদক' প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৪০ জন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পদক প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যুবকল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের মৌলিক সমস্যার সমাধান প্রতিটি দেশের জন্য অপরিহার্য। যুবক সম্প্রদায় দেশের প্রাণশক্তি। এ শক্তিকে টিকিয়ে রেখে কাজে লাগাতে হলে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

প্রশ্ন।১১। নারীকল্যাণ কি? বাংলাদেশে গৃহীত নারীকল্যাণ কার্যক্রমগুলো আলোচনা কর। [জা. বি.-২০১০]

অথবা, নারীকল্যাণের সংজ্ঞা দাও? এমন সমস্যা দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলো মূল্যায়ন কর।

অথবা, নারীকল্যাণের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর? এমন সমস্যা দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত চলমান কর্মসূচিগুলো মূল্যায়ন কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** বিশ্বের সকল সমাজেই নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। নারীকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের দিক থেকে নারীকল্যাণ বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল সমাজেই উন্নয়নের জন্য নারীদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। আর সকল পরিবারেই নারীদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশুর প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ, সৃজনশীল, আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নৈতিক ও মানসিক বিকাশ সাধন, সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো পুরুষদের তুলনায় নারীরাই ভালোভাবে করতে পারে। অর্থাৎ সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নারীকল্যাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

নারীকল্যাণ : নারীকল্যাণের সংজ্ঞায় সাধারণভাবে বলা যায়, নারীদের সার্বিক বিকাশ, উন্নয়ন, ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য যাবতীয় কর্ম প্রণালীই হল নারীকল্যাণ। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে নারীদের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য সকল সমস্যা সমাধানে কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি চালু ও প্রণয়ন করাকেই বলা হয় নারীকল্যাণ। নারীকল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **D. Ali Akbar** তাঁর 'Elements of Social Welfare' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "By women welfare we understand those socio-economic activities which are designed to solve the problems of women so that they may play their proper role in the family as well as in the society." অর্থাৎ, নারীকল্যাণ বলতে আমরা ঐসব আর্থসামাজিক পদক্ষেপকে বুঝি, যা একটি প্রক্রিয়ায় নারীদের সমস্যাবলি সমাধানের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার ও সামাজিক ভূমিকা পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সুতরাং উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে নারীকল্যাণের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, মানসিকসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে তাদের দৈহিক উন্নতি সাধন করে বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করাকেই বলা হয় নারীকল্যাণ।

বাংলাদেশে সরকারি নারীকল্যাণ কর্মসূচি : বাংলাদেশের নারীসমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অধিকাংশই মানবেতর জীবনযাপন করছে। অথচ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই তাদের বঞ্চিত ও নির্যাতিত রেখে কখনও দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। তাই দেশের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অগ্রগতি সাধনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবি। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের নারীরা ঘরেবাইরে সর্বত্র শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাই এ অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য সরকারিভাবে কিছু নারীকল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম এবং নগণ্য। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নারীকল্যাণ কর্মসূচিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল :

ক. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ : বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীকল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং দেশের ২৩৬টি উপজেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদের দ্বারা বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তার প্রকল্পের মাধ্যমে নারীকল্যাণমূলক যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে, তা হল :

১. মহিলাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান,
২. নারীদের সাথে ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণ করা,
৩. অল্প শিক্ষিত নারীদের হাতেকলমে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান,
৪. চাকুরিজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল এর ব্যবস্থা করা,
৫. দেশের অসহায় এবং নির্যাতিত মহিলাদের জন্য সাময়িক আশ্রয় প্রদান,
৬. নারীদেরকে আইনগত সহায়তা (Legal Aid) প্রদান,
৭. নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য নারীদের মাঝে সমতা আনয়ন করা এবং
৮. বাংলাদেশে জাতীয় নারী নীতি বাস্তবায়ন করা।

উল্লিখিত কার্যক্রমগুলোর মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

খ. বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নারীকল্যাণ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ : বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নারীকল্যাণ সম্পর্কিত প্রায় সকল কর্মসূচিই সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হতো। বর্তমানে নারীকল্যাণ বিষয়ক বেশিরভাগ কর্মসূচিই মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। মহিলা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ছাড়া নারীকল্যাণ বিষয়ক সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. সোশিও ইকোনোমিক সেন্টার (মহিলা) : উক্ত কর্মসূচি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এসব কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে এলাকার গৃহবধূ ও অন্যান্য যেসব নারীরা রয়েছেন তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন– এমব্রয়ডারি, পোশাক তৈরি, উল বুনন, বাঁশ ও বেতের কাজ, পুতুল তৈরি, ফুল তৈরি, চামড়াজাত দ্রব্যের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয় উপার্জনকারী কার্যাবলির সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে সহায়তা করতে পারে। নারীদের জন্য এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় ১৯৬০ সালে কিন্তু এসব কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধরনের দু'টি কেন্দ্র রয়েছে। এর একটি ঢাকার মীরপুরে এবং অন্যটি রংপুরে অবস্থিত। এসব কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে রয়েছে ক. দর্জি বিজ্ঞান, খ. উল বুনন, গ. বাটিক প্রিন্টিং, ঘ. ফুল তৈরির ক্লাশ, ঙ. চামড়া দ্বারা তৈরি জিনিসপত্র, চ. পুতুল তৈরি ইত্যাদি।

২. মাতৃকেন্দ্র : নারীকল্যাণের ক্ষেত্রে Mother Club সারা বাংলাদেশেই একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচি। বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৬০০ টি। গ্রামীণ সমাজসেবার আওতায় এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে নারীরা আয় উপার্জনের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা, শিশু পরিচর্যা, সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সামাজিক শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করে রোজগার করার সুযোগ পায়। এছাড়া নারী মর্যাদা এবং নারী অধিকার রক্ষারও মাতৃকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭৪ সালে পল্লি সমাজসেবা (RSS) কর্মসূচি চালু করার পরই গ্রামীণ মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পটি চালু হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত প্রতিটি 'পল্লি সমাজসেবা' প্রকল্পের সাথে রয়েছে কিছুসংখ্যক মাতৃকেন্দ্র। গ্রামীণ নারীদের সংগঠিত করে গ্রামীণ মাতৃকেন্দ্র নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে :

ক. নানারকমের কুটির শিল্প, সবজি বাগান, হাঁস-মুরগি পালন এবং অন্যান্য অর্থকরী কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা,

ধ. নারীদের অক্ষর জ্ঞান, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানদান করা।

এসব কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা করার মাধ্যমে মাতৃকেন্দ্র ...র নারীদের নিজ নিজ পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক ...স্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. দুস্থ মহিলা ও শিশু রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ...র্বাসন কেন্দ্র : স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের ...ক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে ...লাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের ৫৬টি কেন্দ্র চালু করা ...। তবে এসব নারীদের পুনর্বাসনের পর ১৯৮১ সালে এসব ...কেন্দ্রকে সরকারি শিশু সদনে রূপান্তরিত করা হয়।

৪. দুস্থ মহিলাদের তাঁত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : বাংলাদেশের ...র্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীর ...ত্তপাড়ায় এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে অসহায় ও ...স্থ নারীদের ছয় মাস মেয়াদি তাঁত শিল্প প্রশিক্ষণ প্রদান করা ...য়, যাতে করে তারা তাদের দুরবস্থা লাঘব করার জন্য কর্মে ...য়োজিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এক ...রিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এ কেন্দ্রে ২২৫ ...জন দুস্থ ও অসহায় নারী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাদের ...ধ্য থেকে ২৫ জন বিভিন্ন শিল্পকারখানার কর্মে নিয়ুক্ত আছেন।

৫. পরোক্ষ নারীকল্যাণ কর্মসূচি : উপরের বর্ণিত প্রত্যক্ষ ...নারীকল্যাণ কর্মসূচি ছাড়াও সমাজসেবা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ...নারীকল্যাণ সম্পর্কিত কতিপয় পরোক্ষ কর্মসূচি হল শহর সমাজ ...উন্নয়ন, গ্রামীণ সমাজসেবা, যুবকল্যাণ, শিশুকল্যাণ ইত্যাদি ...কর্মসূচির মাধ্যমেও পরোক্ষভাবে নারীদের কল্যাণ সাধন করা ...য়। এসব কর্মসূচিতে নারীদের সংগঠিত করা, অর্থনৈতিক ...কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, ...জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার ...জন্য নারী সমাজকর্মী নিয়োগ করা।

৬. অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান : নারীকল্যাণের সাথে ...সম্পৃক্ত অন্যান্য যেসব বেসরকারি ও স্বেচ্ছামূলক সংস্থা নারীদের ...কল্যাণে নিয়োজিত সেসব সংস্থাকে রেজিস্ট্রেশন, অর্থনৈতিক ...অনুদান, পরামর্শদান, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি পক্ষ ...থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে একথা ...সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ...প্রায় অর্ধেক যেখানে নারী সেখানে বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ...নারীকল্যাণ কার্যক্রম তাদের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল এবং ...সীমিত। অথচ নারীসমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে ...তাদেরকে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে না ...পারলে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি কখনও আশা ...করা যাবে না। কাজেই সরকারকে নারীদের সার্বিক কল্যাণ ...সাধনে ব্যাপক ভিত্তিক নারীকল্যাণ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসা ...উচিত।

প্রশ্ন॥১৯॥ সমবায়ের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে সববায়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, সমবায় বলতে কী বুঝ। বাংলাদেশে সববায়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, সমবায়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশে সববায়ের উপযোগিতা বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের বাস্তব কর্মসূচি হচ্ছে সমবায়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নের আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগঠন হচ্ছে সমবায়। সমবায়কে দরিদ্রদের নিজস্ব কর্মসূচি বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে উন্নয়নের অন্যতম মূল শ্লোগান হচ্ছে, উন্নয়নে সমবায়ের বিকল্প নেই। যা হতে বাংলাদেশে সমবায়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমবায়ের সংজ্ঞা : সম-উদ্দেশ্যে সংগঠিত একদল লোক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় যে উদ্যোগ বা কর্মসূচি গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় সমবায়। আর সমশ্রেণীর একাধিক লোক পারস্পরিক সাহায্যে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম-অধিকারের ভিত্তিতে যে সংগঠন পরিচালনা করে, তাকে সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি বলা হয়।

আধুনিক সমবায়ের জনক **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen) বলেছেন, "প্রতিযোগিতা মাত্রই এক প্রকার যুদ্ধ। যার পরিণতি হলো সবলের বিজয় ও দুর্বলের বিনাশ। পক্ষান্তরে, সমবায় হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার স্থান অধিকার করে নেয়।"

মনীষী কালভার্ট-এর মতে, "সমবায় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের আর্থিক উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সম-অধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে।"

অধ্যাপক সেলিগম্যানের মতে, "সমবায় অর্থ হচ্ছে উৎপাদন ও বণ্টন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার এবং সকল প্রকার মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন।"

অর্থনীতিবিদ প্লাংকেট-এর মতে, "সমবায় হলো সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।"

জি. আই. হলিওয়েক (G.I Holyoake) এর মতে, "স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গঠিত ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত একাধিক লোকের কর্ম প্রচেষ্টার নাম সমবায়।" প্রখ্যাত সমবায়ী সি.এফ. স্ট্রিকল্যান্ড (C.F. Strickland) এর মতে, "সমবায় হলো এমন একটি আন্দোলন, যা কতগুলো ব্যক্তির যৌথ উদ্যোগে বিশেষ একটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যা কারো একক প্রচেষ্টায় সাধন সম্ভব নয়।"

সমবায়ের মূলকথা হলো, একজন লোকের পক্ষে সীমিত শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা এককভাবে তার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ সমপর্যায়ের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সে তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ সাধনের সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়ে, সম্পদশালীদের মতো জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে সমবায়ের গুরুত্ব : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব ক্ষেত্রে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সব নিচে আলোচনা করা হলো–

১. ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা দূরীকরণ : বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের অন্যতম বাধা জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা। কৃষি ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা দূরীকরণে যৌথ সমবায় খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কৃষি আধুনিকীকরণে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১৯৭৯-৮০ সালে জমির সীমানা আইল বাবত ১৭ লাখ ৮ হাজার ১৬০ একর আবাদী জমি নষ্ট হচ্ছে। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আবাদী জমির শতকরা প্রায় দশ ভাগ আইল। একর প্রতি গড়ে এক টন উৎপাদন ধরা হলেও আইল যে পরিমাণ জমি গ্রাস করেছে তাতে এক কোটি লোকের বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা দূরীকরণ এবং বিপুল পরিমাণ আবাদী জমি উদ্ধারে সমবায় যৌথ খামারের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কৃষি ঋণের সরবরাহ : কৃষি এবং কৃষকদের উন্নয়নের মৌল উপকরণ হলো ঋণ। কৃষি ঋণের স্বল্পতা এবং প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জটিল প্রক্রিয়া দরিদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণ থেকে বঞ্চিত করছে। অথচ বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন, কৃষি ঋণের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। "কৃষি ঋণ দান সমবায় সমিতি" এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম। কুমিল্লা পদ্ধতির দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যা বর্তমানে পল্লি উন্নয়ন বোর্ড জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে।

৩. সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন : সেচের অপ্রতুলতা এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতার ফলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশে সময়োচিত সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে এককভাবে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সমবায় সেচ সমিতি এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম। বাংলাদেশে বিশেষ করে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের সমিতির সফলতা আশাব্যঞ্জক।

৪. কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ : ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা এবং মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সুবিধাভোগের বঞ্চনা থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে "সমবায় বাজার সমিতি" অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম।

উপসংহার : বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান গ্রামীণ দেশ। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জাপান, জার্মানি, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে সমবায়ের সফলতার আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায়। কারণ কৃষি হচ্ছে যৌথবদ্ধ কাজ। কিন্তু আমাদের কৃষি অর্থনীতির প্রধান সমস্যা সনাতন কৃষি পদ্ধতি, ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা, কৃষকদের নিরক্ষরতা, অদৃষ্টবাদিতা, সামাজিক সচেতনতার অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদি। এসব আর্থসামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এসব সমস্যা নিয়ন্ত্রণ বাহ্যিক সাহায্যের তথা সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে করা যায় না। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এসব সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়, যা সমবায়ের মাধ্যমে সম্ভব।

প্রশ্ন॥২০॥ বাংলাদেশে প্রচলিত সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে প্রচলিত সংশোধনমূলক কার্যক্রমগুলো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে প্রচলিত সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : অপরাধ সংশোধন পেশাদার সমাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। অপরাধীকে শাস্তি নয় বরং সংশোধনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে পুনর্বাসন করা সম্ভব এ ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক সংশোধনমূলক কার্যক্রম। এর মূলকথা হচ্ছে "অপরাধ কে ঘৃণা কর অপরাধীকে নয়।" পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সময় ব্যক্তিকে অপরাধী করে তোলে। তাই শাস্তির পরিবর্তে চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ : বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি রচিত হয় ১৯৬০ সালে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স জারির মধ্য দিয়ে। ১৯৬২ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের পদক্ষেপ হিসেবে প্রবেশন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিস চালু হয়। ১৯৭৪ সালে শিশু আইনের ভিত্তিতে কিশোর অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম শুরু হয়। নিচে বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

১. প্রবেশন : অপরাধ সংশোধনের আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে প্রবেশন। এটি অপরাধীর বিচারকার্য স্থগিত রেখে চরিত্র সংশোধনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। ১৯৬২ সাল থেকে প্রবেশন কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রবেশন অব অফেন্ডার্স মোতাবেক–

ক. কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ করলে,

খ. অপরাধী প্রথমবার অপরাধ করলে,

গ. শাস্তি যদি ২ বছরের অধিক কারাদণ্ডের যোগ্য না হয় তাহলে অপরাধীর বয়স, চরিত্র, ইতিহাস, দৈহিক, মানসিক অবস্থা এবং অপরাধের ধরন বিচারপূর্বক বিচার কার্যক্রম স্থগিত রেখে শর্তাধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মুক্তি দেওয়া।

ঘ. প্রবেশন প্রদানের শর্তসমূহ :

* ভবিষ্যতে অপরাধ না করার প্রতিজ্ঞা করা।

* প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকা।

* পাড়া পড়শীসহ সবার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

* কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

* অনুমতি ব্যতীত পেশা বা বাসস্থান পরিবর্তন না করা।

* চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

২. প্যারোল : অপরাধী এক-তৃতীয়াংশ শাস্তি ভোগ করার পর শাস্তি স্থগিত রেখে আদালত থেকে শর্তাধীনে মুক্তি দেয়া হলে তাকে প্যারোল বলে। এদেশে আদালত কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে অপরাধীর আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সাময়িক সময়ের জন্য তাকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। যদিও প্যারোল ব্যবস্থা বাংলাদেশে পুরোপুরি এখনো চালু হয়নি।

৩. মুক্ত কয়েদিদের সেবা কার্যক্রম : মুক্ত কয়েদিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স জারির মধ্য দিয়ে 'আফটার কেয়ার সার্ভিস' চালু করা হয়। ১৯৬২ সাল থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে প্রবেশন কার্যক্রমের অধীনে আফটার কেয়ার সার্ভিসকে যুক্ত করা হয়।

মুক্ত কয়েদিদের মুক্ত হওয়ার পর তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৩টি কেন্দ্রে প্রবেশন অফিসার বা আফটার কেয়ার সার্ভিস অফিসারের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম চলছে। তাছাড়া গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমেও সহায়তা করছে। মুক্ত কয়েদিকে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আফটার কেয়ার সার্ভিস ব্যবস্থা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

৪. জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান : বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের নাম জাতীয় কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র। ১৯৭৪ সালে প্রণীত শিশু আইনের আওতায় জাতীয় কিশোর/কিশোরী সংশোধনী কেন্দ্র অপরাধ প্রবণ কিশোরদের চরিত্র সংশোধন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের নিমিত্তে ১৯৭৬ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৫ সালে যশোরে স্থাপিত হয় ২০০ আসন বিশিষ্ট ২য় সংশোধনী কেন্দ্র। ২০০২ সালে কিশোরীদের জন্য স্থাপন করা হয় গাজীপুরের কোনাবাড়িতে। এর আসন সংখ্যা ১৫০টি। এছাড়াও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীতে আরো ৩টি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১০,২৫৪ জন কিশোর অপরাধীকে সংশোধনের মাধ্যমে স্ব-স্ব পরিবারে ফেরত পাঠানো হয়েছে। জাতীয় কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ৩টি করে বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো :

ক. কিশোর আদালত : একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারীর সমন্বয়ে কিশোর আদালত গঠিত হয়। অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে অপরাধীর পিতা-মাতা, সমাজকর্মী, শিক্ষক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয়। অপরাধীর ধরন ও চরিত্র সংশোধনই আদালতের মূল উদ্দেশ্য।

খ. কিশোর হাজত : এর আরেক নাম আটক নিবাস। আদালতে মামলার কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে এর নিষ্পত্তি পর্যন্ত কিশোর অপরাধীদের এ স্থানে রাখা হয়। এখানে অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে সমাজকর্মী কর্তৃক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য কিশোরদের কিশোর হাজতে রাখার বিধান রয়েছে।

গ. সংশোধনী প্রতিষ্ঠান : অপরাধীকে বিচারের পর থেকে সংশোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংশোধনাগারে রাখা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। যেমন : সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নৈতিক শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন প্রভৃতি। সমাজকর্মী ও অন্যান্য কর্মকর্তা কিশোর ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ, কেস রেকর্ডিং, শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনতে প্রচেষ্টা চালায়।

সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে থাকার ফলে কিশোরদের অপরাধীর মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং অপরাধ প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মরত রয়েছেন তারা হচ্ছে– প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, একজন সুপারভাইজার, সহকারী সুপারভাইজার, প্রবেশন অফিসার, সমাজকর্মী, জি. আর. এ ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

৫. নিরাপদ আবাসন : দেশের মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের জেলখানার পরিবেশ থেকে মুক্ত করে সুন্দর পরিবেশে থাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২০০২ সাল থেকে এ প্রকল্প চালু হয়। মহিলা, শিশু, কিশোরীদের সুস্থ রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য। ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা মোট ৬টি কেন্দ্রে নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রতিটিতে আসন সংখ্যা ৫০টি। এসব কেন্দ্রে বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মী স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় হেফাজতীদের আদালতে আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

৬. বোরস্টাল স্কুল : এ স্কুল বাংলাদেশে প্রবর্তিত প্রথম সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৯ সালে নারায়ণগঞ্জ এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহের ধলায় কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য দু'টি বোরস্টাল স্কুল স্থাপিত হয়। তবে বর্তমানে এগুলো বন্ধ রয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে সংশোধনী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে। তবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এজন্য সরকার ও কর্তৃপক্ষকে আরো সচেতন হতে হবে। কর্মসূচি ব্যাপকভাবে আরো বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন॥২১॥ সংশোধনমূলক কার্যক্রম কী? বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

অথবা, সংশোধনমূলক কার্যক্রম কাকে বলে? বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : অপরাধ সংশোধন পেশাদার সমাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। অপরাধীকে শাস্তি নয় বরং সংশোধনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে পুনর্বাসন করা সম্ভব এ ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক সংশোধনমূলক কার্যক্রম। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সময় ব্যক্তিকে অপরাধী করে তোলে। তাই শাস্তির পরিবর্তে চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সংশোধনমূলক কার্যক্রম : সাধারণভাবে, সংশোধনমূলক কার্যক্রম বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে অপরাধীকে শাস্তিদানের পরিবর্তে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য করা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন অপরাধ বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

মনীষী **L.P. Carney** এর মতে, অপরাধমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার জন্য অপরাধ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগের পেশাদার বিষয়কে সংশোধন বিজ্ঞান বলে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, সংশোধন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় কারারুদ্ধকরণ, প্যারোল, প্রবেশন ও আদর্শ শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন ভঙ্গকারী শাস্তি প্রাপ্ত অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

অধ্যাপক গফুর ও মান্নান মোল্লা বলেন, আধুনিক সংশোধনমূলক কার্যক্রম প্রধানত প্রথম ও কিশোর অপরাধীদের সমন্বয় করাকে বোঝায়। সংশোধন প্রক্রিয়া প্রশাসনের মাধ্যমে এমন পদ্ধতিতে শাস্তি বিধান করা হয় যেখানে অপরাধীরা সংশোধিত হয়।

মনীষী আচলার এর মতে, অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন, আচার-আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যে ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা হয় তাই সংশোধনমূলক কার্যক্রম।

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডুব-এর ভাষায়, অপরাধীদের চিন্তা চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যেসব বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলোকে সংশোধনমূলক কার্যক্রম বলে।

পরিশেষে বলা যায়, যে পন্থা বা পদ্ধতির সাহায্যে অপরাধীদের শাস্তির বদলে চরিত্র সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং এর ফলে ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসতে সক্ষম হয় তাকে সংশোধনমূলক কার্যক্রম বলে। এর প্রভাবে সমাজে অপরাধের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সমাজ ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্বসমূহ : সামাজিক সমস্যা তথা অপরাধমূলক কার্যক্রম দূর করতে হলে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্বসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. সামাজিক অনাচার রোধ : অপরাধীকে সংশোধন করার সুযোগ দিতে সে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। তাই সামাজিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. সমস্যার সমাধান : অপরাধীকে শাস্তি দিলে অপরাধী পুনরায় প্রতিশোধের স্পৃহায় অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। অথচ সংশোধনের সুযোগ দিলে সামাজিক সমস্যা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

৩. সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ : অপরাধী তার চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পেলে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এতে করে তার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার চেয়ে সংশোধনমূলক কার্যক্রম অপরাধীর মানসিক বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক।

৪. স্বনির্ভরতা অর্জন : অপরাধী সংশোধনরত অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ অবস্থায় তাকে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়ার ফলে সে সহজেই আয়-রোজগারের পথ খুঁজে পায়। ফলে সংশোধিত ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

৫. অপরাধ প্রবণতা হ্রাস : অপরাধীকে সংশোধন এর সুযোগ দেয়ার ফলে সমাজে অপরাধের পরিমাণ অনেক হ্রাস পায়। কেননা ব্যক্তি তখন অপরাধ করার চেয়ে স্বাভাবিক জীবনকে শ্রেয় মনে করে। যার ফলে সামাজিক সমস্যাও তখন অনেকাংশে কমে যায়।

৬. অর্থের অপচয় রোধ : অপরাধীকে সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করলে সরকারি প্রশাসনের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হয়। কেননা অপরাধীর স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ করার ফলে কা[রা] প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও অপরাধীদের ভরণ পোষণ বাবদ অনেক অর্থ বেঁচে যায়। এতে করে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ই উপকৃত হয়।

৭. বিপথগামিতা থেকে রক্ষা : বর্তমানে নেতিবাচক পরিবেশের প্রভাবে তরুণ ও যুব সমাজ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ এই যুব সমাজ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই বিপদগামিতা রোধ করার জন্য সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. মানসিক অবস্থার উন্নয়ন : অপরাধীকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সংশোধনই একমাত্র পথ। কেননা অপরাধী সমাজের চোখে ঘৃণার পাত্র। ফলে মানসিক দিক দিয়ে সে বিপর্যস্ত থাকে। শা[স্তি] ছিলে সে আরো অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সংশোধনের মাধ্যমে তার মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৯. অপরাধের ধরন জানা : অপরাধের ধরন জানা থাকলে অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়া যায়। সংশোধন পদ্ধতিতে অপরাধের কারণ, পরিবেশ, পরিস্থিতিতে, অপরাধীর চরিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে। ফলে অপরাধী সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সুযোগ পায়।

১০. পৃথক ব্যবস্থায় বিচার : সংশোধন পদ্ধতিতে কিশোর অপরাধীদের পৃথক বিচার ব্যবস্থায় বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয়। সে দাগী ও বড় অপরাধীদের ছোঁয়া থেকে রক্ষা পায়। ফলে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা সহজ হয়।

১১. সচেতন নাগরিক সৃষ্টি : সংশোধনমূলক পদ্ধতিতে অপরাধীর চরিত্রের পরিবর্তন হয়। এর ফলে সে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাই দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১২. পারিবারিক ভাঙন রোধ : অপরাধীকে শাস্তি দিলে তার পরিবার তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ আর্থসামাজিক নানা সমস্যায় পতিত হয় পরিবার। সংশোধনমূলক পদ্ধতি পরিবারের কার্যক্রমকে স্বাভাবিক রাখে।

১৩. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ : সংশোধনমূলক পদ্ধতিতে অপরাধী তার মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে সমাজে পুনর্বাসনের মাধ্যমে সে সহজেই সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়। নিজের জীবন বিকশিত করার সাথে সাথে সে তার পরিবারের প্রতিও তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

১৪. শিক্ষা লাভ : সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় অপরাধীকে বিভিন্ন শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে তাদের কারিগরি শিক্ষার বিকাশ হয়। এ ব্যবস্থায় অপরাধী গঠনমূলক আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও সচেতন হয়। যার ফলে অপরাধীর অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি ঘটে।

১৫. শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ভাবধারার বিকাশ : সংশোধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অপরাধীর বিচারব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। অপরাধী সংশোধনের সুযোগ পাওয়ার ফলে সে বিচারব্যবস্থা, আইন, শৃঙ্খলা, প্রশাসন প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে শিখে। এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অত্যধিক। এর ফলে শুধু অপরাধীই উপকৃত হয় না বরং সমাজও লাভবান হয়। সমাজে অপরাধের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সুশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে। বিজ্ঞানসম্মত এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে রাষ্ট্রের অর্থসাশ্রয় হয়। এককথায় দেশের কল্যাণে সংশোধনমূলক পদ্ধতির গুরুত্ব অতুলনীয়।

প্রশ্ন॥২২॥ বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার সমস্যা ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার সমস্যা ও তা দূরীকরণের তোমার সুপারিশসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার সীমাবদ্ধতা ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : হাসপাতাল সমাজসেবা আধুনিক সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটি বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তরের একটি বিশেষ কার্যক্রম। রোগীর রোগ নিরাময়ে তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল দিকই জড়িত এ কার্যক্রমের সাথে। রোগীকে সুস্থ করা থেকে শুরু করে তাকে সুস্থ পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ১৯৫৪ সালে এদেশে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু করে।

বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার সমস্যা : বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম চালু থাকলেও এর রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। ফলে সমাজসেবা কার্যক্রম প্রতিনিয়তই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা প্রকল্পের সমস্যা তুলে ধরা হলো :

১. তথ্যসংগ্রহের সমস্যা : রোগী সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা হাসপাতাল সমাজকর্মীর প্রধান কাজ। এছাড়া তথ্যসংগ্রহের জন্য গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় সমাজ কর্মীর পেশাদারী মনোবৃত্তি না থাকায় রোগীর প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না।

২. দ্বিমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা : দেশের অধিকাংশ হাসপাতালে দ্বিমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, চিকিৎসা বিভাগ, হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগ ও মনোচিকিৎসা বিভাগের মধ্যে কাজের কোনো সমন্বয় নেই। এই দ্বিমুখী প্রশাসনের কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অসুবিধা দেখা দেয়।

৩. অপেশাদার সমাজকর্মী : হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পেশাদার ও দক্ষ সমাজকর্মী। তারা চিকিৎসা সমাজকর্মের উপর পেশাদার জ্ঞান, যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরিলক্ষিত হয় না।

৪. স্বল্প অর্থ বরাদ্দ : প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হলো যথাযথ অর্থ। একদিকে ব্যাপক কর্মসূচি, অন্যদিকে, অপর্যাপ্ত অর্থ বাধা হিসেবে কাজ করে। ফলে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৫. পুনর্বাসনের অসুবিধা : অসংখ্য সামাজিক সমস্যার দেশ এই বাংলাদেশ। পুনর্বাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যায় জর্জরিত। এ অবস্থায় চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন ও সেবা বাস্তবায়ন করা জটিল ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফলে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এটি একটি সমস্যা।

৬. সীমিত সেবা কর্মসূচি : নানা কারণে হাসপাতাল সমাজসেবার কার্যক্রম বর্তমানে সীমিত আকারে চলছে। চিকিৎসক, আসন, নার্স প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় কম। অন্যদিকে রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এটি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি মৌলিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

৭. সমাজকর্মীর উপর্যুক্ত মর্যাদার অভাব : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের চিকিৎসা সমাজকর্মীদের যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয় না। এমনকি হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরাও সমাজকর্মীদের পরিপূর্ণভাবে সম্মান দেয় না। ফলে হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটি একটি প্রতিবন্ধক।

৮. সমন্বয়ের সমস্যা : এদেশের সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এটি বাধার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে পুনর্বাসনমূলক কাজ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাবে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৯. কর্মসূচি অনুধাবনে অসমর্থ : চিকিৎসক, নার্স, রোগী এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত হাসপাতাল সমাজ সেবা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। ফলে চিকিৎসা সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগ বাধার সম্মুখীন হয়।

১০. সম্পদের অপর্যাপ্ততা : দেশের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের অভাব রয়েছে। যা আছে তারও যথার্থ ব্যবহার করা হয় না। এর প্রভাব হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের উপর পড়ছে। ফলে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা সময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নানারকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমাজকর্মীকে আরো সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। এতে করে দরিদ্র রোগীরা উপকৃত হবে।

হাসপাতাল সমাজসেবার সমস্যা দূরীকরণের উপায় : বাংলাদেশ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের পথে নানাবিধ সমস্যা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এসব সমস্যা দূর করার মাধ্যমে এ কর্মসূচি সফল করা যায়। নিচে বাংলাদেশ হাসপাতাল সমাজসেবার সমস্যা দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করা হলো :

১. গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করা : চিকিৎসা সমাজকর্মের মূলকাজ হলো রোগীর কল্যাণ। চিকিৎসাপ্রার্থী রোগীদের কল্যাণার্থে এক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসা সমাজকর্মীকে গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় রোগীর প্রকৃত তথ্য জানার মাধ্যমে তাকে সহায়তা করা যায়।

২. পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগ : পেশাদার সমাজকর্মী হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিকিৎসা সমাজকর্ম বিভাগের কর্মসূচিকে পুরোপুরি সফল করার জন্য এই বিভাগে সমাজ কর্মীদের অবশ্যই দক্ষ, অভিজ্ঞ, যোগ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। কেননা এই কর্মসূচি সফল করতে পেশাদার দক্ষ সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রশাসনিক গতিশীলতা : হাসপাতালে চিকিৎসা বিভাগ, মনোচিকিৎসা বিভাগ ও চিকিৎসা সমাজকর্ম বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগে প্রশাসনিক কার্যক্রমের ত্রুটি দূর করে গতিশীলতা আনতে হবে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

৪. প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ : চিকিৎসা সমাজকর্ম বিভাগকে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। তাদের সময়মতো খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য এই বিভাগকে আরো তৎপর হতে হবে।

৫. কর্মসূচি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান : এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্পষ্ট ধারণা অত্যাবশ্যক। যেমন- চিকিৎসক, নার্স, রোগী, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সকলের জ্ঞান থাকতে হবে। এর ফলে এ প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হবে।

৬. পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ : এই কর্মসূচির অন্যতম সমস্যা হচ্ছে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব। চিকিৎসা সমাজকর্মের কর্মসূচিকে সফল করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের যোগান দেয়া অপরিহার্য।

৭. পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা : এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র রোগীরা সুস্থ হবার পর তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় না। যার ফলে উদ্বাস্তু দরিদ্র রোগীরা সুস্থ হবার পর নিশ্চিত পরিবেশ পায় না। তাই রোগীদের পুনর্বাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. কর্মসূচির সমন্বয় সাধন : যে কোনো কর্মসূচিতে সমন্বয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চিকিৎসা সমাজকর্মে কর্মসূচি বাস্তবায়নে হাসপাতাল কর্মসূচির সাথে প্রকল্পের কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করতে হবে। এর ফলে কর্মসূচির সফলতা পুরোপুরি আসবে।

৯. সমাজকর্মীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান : চিকিৎসা সমাজকর্মে সমাজকর্মীকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা প্রদান করা হয় না। অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশে সমাজকর্মীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তাই কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মীদের মর্যাদা প্রদান জরুরি।

১০. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বৃদ্ধি : হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হলো চিকিৎসক, নার্স ও আসন। এদেশের হাসপাতালে রোগীর তুলনায় চিকিৎসক, নার্স ও আসন সংখ্যা সবকিছুই অপর্যাপ্ত। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমস্যার সমাধান করতে হবে।

১১. সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকা : চিকিৎসা সমাজকর্মকে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও সফল করে তুলতে হবে। এর জন্য চিকিৎসা সমাজকর্মীকে আরো সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দরিদ্র রোগীরা যেন পরিপূর্ণ সেবা পায় এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

১২. কার্যকর ব্যবস্থাপনা : কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কর্মসূচির নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. দরিদ্র রোগীদের প্রয়োজন পূরণ : সাধারণত দরিদ্র রোগীর সংখ্যাই হাসপাতালগুলোতে বেশি হয়। তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। রোগীদের ঔষধ, চশমা, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ক্রাচ প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য প্রকল্পের অর্থ পর্যাপ্ত না হলে বাইরের সংস্থার সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

১৪. স্বাস্থ্য সম্পর্কীত শিক্ষা : হাসপাতালে ভর্তি ইচ্ছুক রোগীদের স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এজন্য সমাজকর্মীরা রোগীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে পারে। এজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে।

১৫. প্রচার : চিকিৎসা সমাজকর্ম কর্মসূচিতে প্রচার করতে হবে। এর কর্মক্রম সম্পর্কে রোগী, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। এজন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মিডিয়ায় প্রতিবেদন, প্রচার প্রভৃতির ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমস্যা দূর করা যায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, চিকিৎসা সমাজকর্মের অনুশীলন এদেশের দরিদ্র রোগীদের কল্যাণে একটি যথার্থ পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের কর্মসূচির বাস্তবায়নের পথে বাধাসমূহ দূর করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কার্যকারী সুফল পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন২৩। **প্রতিবন্ধী কারা? বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দাও।**

অথবা, **প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **প্রতিবন্ধী কারা? বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিগুলো ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : পঙ্গুদের প্রতি সম্মানার্থে তাদের প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধীদেরও মৌল চাহিদা পূরণ এবং স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। তা সমাজের জন্য কল্যাণকরও বটে। এ উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যাকে প্রতিবন্ধী সেবা কার্য বা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি বলে। আধুনিক কালে প্রতিবন্ধী ধারণার অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

প্রতিবন্ধী : প্রচলিত মত অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী বলতে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে অক্ষম ও দৈহিক বিকলাঙ্গ লোকদের বুঝায়। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবন্ধী বলতে সেসব ব্যক্তিদের বুঝায় যারা মনোদৈহিক কিংবা আর্থসামাজিক অক্ষমতা বা সমস্যার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত। এরা পরনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন হলো :

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "Disabled is a term used to describe an individual whose specific physical or mental condition or infinity limitis his or her ability to carry out certain responsibilities, The condition may be temporary or permanent, it may be partial or total." অর্থাৎ, প্রতিবন্ধিতা হলো ব্যক্তির নির্দিষ্ট শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থা অথবা অসমর্থতা যা তাঁর দায়িত্ব পালনের সামর্থ্যকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের অবস্থা স্থায়ী অথবা অস্থায়ী এবং আংশিক অথবা সম্পূর্ণ হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, প্রতিবন্ধীত্ব হচ্ছে কোনো কাজ যা একজন মানুষের জন্য স্বাভাবিক তা করার ক্ষেত্রে বাঁধা বা সামর্থ্যের অভাবকে বুঝায়।

ইউনিসেফ (UNICEF) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Disability is the difficulty in seeing, speaking, hearing, writing, walking, conceptualizing or in any other function within the range considerd normal for a human being." অর্থাৎ প্রতিবন্ধী বলতে দৃষ্টি, বাক শ্রবণ, লিখন, পদসঞ্চালন, বোধশক্তি বা অন্য যে কোনো ধরনের অসুবিধাকে বুঝায়, যেগুলো স্বাভাবিক জীবনের পরিপন্থি বা প্রতিবন্ধক।

Michael Oliver and **Colin Barnes** বলেন, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে এ ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে সেই ব্যক্তিকে বুঝাবে।"

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অশোক শর্মা প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "কোন মানুষ যখন তার শারীরিক কাঠামো, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাকশক্তি এবং মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে তার জীবনযাপনের স্বাভাবিক কর্মশীলতা সম্পন্ন করতে একজন স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বাধাগ্রস্ত হয় তখন ঐ ব্যক্তিকেই প্রতিবন্ধী বলা হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, যেসব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পীড়াদায়ক পরিস্থিতি যা স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাই হচ্ছে প্রতিবন্ধীত্ব এবং যারা এর শিকার তারা প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, শারীরিক অপূর্ণতা, মানসিক অসুস্থতা ও প্রতিকূল আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে যারা ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নির্ভরশীল ও অন্যের করুণা প্রার্থী হয়ে জীবনযাপন করে ও সমাজের নিকট বোঝাস্বরূপ মনে হয় তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলে। তাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের সমষ্টিকে প্রতিবন্ধী কল্যাণ বলা হয়।

দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিসমূহ : দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে সক্ষম করে তুলতে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হলো :

১. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৬২ সালে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রগুলো হলো : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা। এ সকল কেন্দ্রে অন্ধ, মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়।

২. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি : দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঢাকার মিরপুরে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কলেজ, ছাত্রাবাস ও একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। এর আসন সংখ্যা ১৩০। এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সার্ক দেশসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নরওয়ের তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ৬.০০ একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়।

৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় : ১৯৬২ সালে ৪টি এবং পরবর্তীতে আরো একটি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে অবস্থিত এসব অন্ধ স্কুলে মোট ৫০ জন অন্ধের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্ধ শিশুদের ব্রেইলী পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এখানে থাকা, খাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

৪. অন্ধ ও মূক বধির বিদ্যালয় : সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৬২ সালে ৪টি বিভাগীয় শহরে অন্ধ, মূক, বধিরদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এসব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও চলাফেরা প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৫. সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা : ১৯৬৯ সালে কতিপয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় বর্তমানে ৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০ এবং ১৫টিতে হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অন্ধদের সহায়তা দানের জন্য একজন করে রিসোর্স টিচার (Resource Teacher) নিয়োগ করা হয়।

৬. শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় : সরকার শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে ৭টি শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা মূক-বধিরদের শিক্ষা, কথা শেখানো ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এখানে ৭০০ জনের শিক্ষার পাশাপাশি হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। বিগত ৫ বছরে এসব বিদ্যালয়কে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. পঙ্গুত্ব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ : আমাদের দেশে নানা কারণে শিশুরা প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- শহর সমাজসেবা, পল্লি সমাজসেবা, হাসপাতাল সমাজসেবা, মাদার্স ক্লাব, মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে মায়েদের স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান দান করে সন্তানদের প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সহায়তা করা হয়।

৮. ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র : গাজীপুরের টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ ও অঙ্গহানীদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদনের জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা হয়েছে।

৯. জাতীয় আর্থোপেডিক হাসপাতাল : এটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে সরকারিভাবে বিদেশি অনুদানে ঢাকায় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে সকল আর্থোপেডিক রোগীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়। হাসপাতালটির বর্তমান আসন সংখ্যা ৪০০।

১০. প্রেসমেন্ট সার্ভিস : দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, পঙ্গু প্রভৃতি প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যেমন- মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, বাঁশ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি আরো নানাবিধ উপযোগী প্রশিক্ষণ। সফল প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় চাকরির মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়। চাকরি ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দেওয়ার কাজও করা হয়।

১১. গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র : টঙ্গীর মূল কেন্দ্রের উপকেন্দ্র হিসেবে বাগেরহাটের ফকিয়া হাট থানাধীন মূলঘর নামক স্থানে "গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র" ১৯৮৭ সালে স্থাপিত হয়। এ উপকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মেকানিক্যাল, ওয়ার্কশপ, দর্জি ও পশুপালনে বছরে ৩০ জন প্রতিবন্ধীকে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

১২. শিল্প উৎপাদন ইউনিট : প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত মৈত্রী শিল্প ইউনিট বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের শিল্প সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৯৮৩ সালে এটি চালু হয়। ১৯৯০ সাল থেকে এটি দৈহিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। ১৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবন্ধীর সংখ্যার তুলনায় এসব কার্যক্রমের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য। এসব কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধীরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন।৩০। বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরা ভূমিকা : পঙ্গুদের প্রতি সম্মানার্থে তাদের প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধীদেরও মৌল চাহিদা পূরণ এবং স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। তা সমাজের জন্য কল্যাণকরও বটে। এ উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যাকে প্রতিবন্ধী সেবা কার্য বা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি বলে। আধুনিক কালে প্রতিবন্ধী ধারণার অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি : অস্বাভাবিক এবং ভারসাম্যহীনতায় মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম তারাই মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। যেমন- পাগল, ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন জড় ব্যক্তি, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি প্রভৃতি। এদের স্বাভাবিক জীবনে সক্ষম করে তুলতে সমাজসেবা অধিদপ্তর এছাড়াও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা ও ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হলো :

১. মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং নরওয়ের ৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এ কেন্দ্রটিতে অন্ধ, বধির এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মানসিক প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিকভাবে পুনর্বাসন করাই এ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

২. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা : দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঢাকার মিরপুরে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কলেজ, ছাত্রাবাস ও একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। আসন সংখ্যা ১৩০। এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সার্ক দেশসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নরওয়ের তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ৬.০০ একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়।

৩. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রামের রউফাবাদে ১০০ আসন বিশিষ্ট এ প্রতিষ্ঠানটি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে সরকারের সহায়তায় মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ত শিশুদের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৪. মানসিক শিক্ষাবিকাশ সমিতি : মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত শিশুদের বিকাশের জন্য "মানসিক শিক্ষা বিকাশ" নামে একটি সংস্থা ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছে। এটি ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত। সরকারি সহায়তায় ১০ কাঠা জমির উপর এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। এ মানসিক শিক্ষা বিকাশ সমিতি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫. মানসিক হাসপাতাল : মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য পাবনায় স্থাপন করা হয়েছে মানসিক ব্যাধি হাসপাতাল। কয়েক বছর আগে পিরোজপুর জেলায়ও অনুরূপ একটি মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের সকল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মানসিক বিভাগ রয়েছে।

৬. গ্রামীণ পুনর্বাসন কেন্দ্র : গ্রামীণ মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ১৯৮৭ সালে "গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। টঙ্গীর মূল উপকেন্দ্র হিসেবে বাগেরহাট ফকির হাট থানাধীন মূলঘর নামক স্থানে এটি স্থাপিত হয়। এ উপকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, দর্জি ও পশুপালনে বছরে ৩০ জন প্রতিবন্ধীকে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

৭. শিল্প উৎপাদন ইউনিট : প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত মৈত্রী শিল্প ইউনিট বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৈত্রী শিল্প নামে একটি প্লাস্টিক কারখানা আছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের সামগ্রী উৎপাদনের পাশাপাশি শিল্প সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও প্রদান করা হয় এখানে। এ কেন্দ্রের আয় দিয়ে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৮. প্লেসমেন্ট সার্ভিস : মানসিক, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যেমন- ওয়ার্কশপ, বাঁশ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি আরো নানাবিধ উপযোগী প্রশিক্ষণ। সফল প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় চাকরির মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়। চাকরি ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের অগ্রগতি, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দেওয়ার কাজও করা হয়।

৯. সুইড বাংলাদেশ : "সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েল ফেয়ার অব দ্যা ইন্ট্যালেকচুয়ালি ডিজএ্যবলড- বাংলাদেশ (সুইড-বাংলাদেশ)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ৪৪টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার মাধ্যমে ৪৪২ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতন-ভাতার শতকরা ৬০ ভাগ বহন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি মানসিক প্রতিবন্ধীসহ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১০. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন : মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য এ বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ৭টি সংস্থার অনুদান ও ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানসিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে উপরিউক্ত পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে সমাজকর্ম শিক্ষার মাধ্যমেও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সুস্থতার জন্য চেষ্টা করা হয়। আর্থসামাজিক জটিলতা ছাড়াও বিভিন্ন বাহ্যিক চাপের কারণেও মানুষ মানসিক অসুস্থতার শিকার হচ্ছে। সুস্থ পরিবেশ ও পর্যাপ্ত সচেতনতার মাধ্যমে এ অসুস্থতা দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে না। সরকারি ও বেসরকারিভাবে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান উন্নয়নের জন্য। এসব কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধীরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন॥২৫॥ বাংলাদেশে প্রচলিত দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে প্রচলিত দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব কর্মসূচি রয়েছে তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে প্রচলিত দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব কর্মসূচি রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পঙ্গুদের প্রতি সম্মানার্থে তাদের প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধীদেরও মৌল চাহিদা পূরণ এবং স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও তাদের কল্যাণার্থে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মসূচিকে প্রতিবন্ধী সেবা কার্য বা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি বলে।

বাংলাদেশে প্রচলিত দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচিসমূহ : দৈহিক বিকলাঙ্গতার জন্য যারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম তাদের দৈহিক প্রতিবন্ধী বলে। যেমন– খোঁড়া, আতুর, অন্ধ, মূক, বধির প্রভৃতি। ১৯৬২ সাল থেকে এদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে সক্ষম করে তুলতে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিম্নে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : ১৯৬২ সালে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রগুলো হলো : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা। এ সকল কেন্দ্রে অন্ধ, মূক, বধির ছেলেমেয়েদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়।

২. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং নরওয়ের ৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রটিতে অন্ধ, বধির, পঙ্গু প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ প্রতিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর্থসামাজিকভাবে পুনর্বাসন করাই এ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

৩. অন্ধ বিদ্যালয় : ১৯৬২ সালে ৪টি এবং পরবর্তীতে আরো একটি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব বিদ্যালয়ে মোট ৫০ জন অন্ধের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্ধ শিশুদের জন্য ব্রেইলী পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এখানে থাকা, খাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

৪. মূক ও বধির বিদ্যালয় : ১৯৬২ সাল থেকে মূক ও বধির বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, ফরিদপুর, খুলনা ও চাঁদপুরে মোট ৭টি বিদ্যালয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মূক বধির ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ছবি আঁকা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ১০০জন শিক্ষার্থীর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিদ্যালয় থেকে ১৭২৮ জনকে বাইরে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৫. সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা : ১৯৬৯ সালে কতিপয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় বর্তমানে ৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০ এবং ১৫টিতে হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অন্ধদের সহায়তা দানের জন্য একজন করে রিসোর্স টিচার (Resource Teacher) নিয়োগ করা হয়।

৬. অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন : ১৯৮০ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অন্ধদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রে তাদের জন্য ওয়েল্ডিং, ফিটিং, ছোটখাটো যন্ত্র তৈরি প্রভৃতি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

৭. পঙ্গুত্ব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ : আমাদের দেশে নানা কারণে শিশুরা প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন– শহর সমাজসেবা, পল্লি সমাজসেবা, হাসপাতাল সমাজসেবা, মাদার্স ক্লাব, মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে মায়েদের স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান দান করে সন্তানদের প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা হয়।

৮. চাকরি পুনর্বাসন কেন্দ্র : বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ আইএলও এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির সহায়তায় কেন্দ্রটি চালু করেছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সব প্রতিবন্ধীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র : দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ ও অঙ্গহানিদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদনের জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা হয়েছে।

১০. জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল : এটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে সরকারিভাবে বিদেশি অনুদানে ঢাকায় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে সকল অর্থোপেডিক রোগীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়। হাসপাতালটির বর্তমান আসন সংখ্যা ৪০০।

বাংলাদেশের দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আরো ব্যাপক পরিসরে কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচিসমূহ : মানসিক অক্ষমতার জন্য যারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না তাদের মানসিক প্রতিবন্ধী বলে। যেমন– পাগল, ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রভৃতি। সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ কর্তৃক মানসিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং নরওয়ের ৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এ কেন্দ্রটিতে অন্ধ, বধির এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সংরক্ষণ শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মানসিক প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিকভাবে পুনর্বাসন করাই এ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

২. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র : দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে, ঢাকার মিরপুরে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কলেজ, ছাত্রাবাস ও একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। আসন সংখ্যা ১৩০। এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সার্ক দেশসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নরওয়ের তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ৬.০০ একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়।

৩. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রামের রউফাবাদে ১০০ আসন বিশিষ্ট এ প্রতিষ্ঠানটি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে সরকারের সহায়তায় মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ত শিশুদের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৪. মানসিক শিক্ষাবিকাশ সমিতি : মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত শিশুদের বিকাশের জন্য "মানসিক শিক্ষা বিকাশ" নামে একটি সংস্থা ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছে। এটি ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত। সরকারি সহায়তায় ১০ কাঠা জমির উপর এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে এ মানসিক শিক্ষা বিকাশ সমিতি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫. মানসিক হাসপাতাল : মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য এবং তাদের সুস্থজীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পাবনায় হেমায়েতপুরে স্থাপন করা হয়েছে মানসিক ব্যাধি হাসপাতাল। কিছু বছর পূর্বে ফিরোজপুর জেলায়ও অনুরূপ একটি মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের সকল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মানসিক বিভাগ রয়েছে।

৬. গ্রামীণ পুনর্বাসন কেন্দ্র : গ্রামীণ মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ১৯৮৭ সালে "গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। টঙ্গীর মূল উপকেন্দ্র হিসেবে বাগেরহাট ফকির হাট থানাধীন মূলঘর নামক স্থানে এটি স্থাপিত হয়। এ উপকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, দর্জি ও পশুপালনে বছরে ৩০ জন প্রতিবন্ধীকে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

৭. শিল্প উৎপাদন ইউনিট : প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত মৈত্রী শিল্প ইউনিট বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৈত্রী শিল্প নামে একটি প্লাস্টিক কারখানা আছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের সামগ্রী উৎপাদনের পাশাপাশি শিল্পসম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮. প্লেসমেন্ট সার্ভিস : মানসিক, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যেমন– ওয়ার্কশপ, বাঁশ ও বেতের কাজ প্রভৃতি। সফল প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা, দক্ষতা, মানসিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় চাকরির মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়।

৯. সুইড বাংলাদেশ : "সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েল ফেয়ার অব দ্যা ইন্ট্যালেকচুয়ালি ডিজএ্যাবলড- বাংলাদেশ (সুইড-বাংলাদেশ)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ৪৪টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার মাধ্যমে ৪৪২ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতন-ভাতার শতকরা ৬০ ভাগ বহন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি মানসিক প্রতিবন্ধীসহ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১০. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন : মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য এ বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ৭টি সংস্থার অনুদান ও ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ করা হচ্ছে। তবে দেশের প্রতিবন্ধীর তুলনায় এ কার্যক্রম খুবই কম। এছাড়া প্রায় সবগুলোই শহরকেন্দ্রিক। তাই দেশের সকল প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রাম ও শহর ভিত্তিক অধিকসংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন॥২৬॥ পরিবার পরিকল্পনা কী? বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : পরিবার পরিকল্পনা ধারণাটির উদ্ভব হয় মূলত জনসংখ্যা সমস্যাকে কেন্দ্র করে। সামাজিক কল্যাণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠন অপরিহার্য। এজন্য পরিবারের আয়তন প্রতিপালন ক্ষমতার মধ্যে রাখার স্বার্থে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার, বিলম্বে বিয়ে করা, আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জীবনমান উন্নয়ন, পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য পরিবার পরিকল্পনা ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি পরিকল্পিত উপায়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া।

পরিবার পরিকল্পনা : সাধারণভাবে, সুখী ও সমৃদ্ধশালী পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, সমাজ বিশ্লেষক, জনবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে পরিবার পরিকল্পনার ধারণা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি ধারণা তুলে ধরা হলো :

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "Family planning is making deliberate and voluntary decisions about reproduction." অর্থাৎ, সন্তান প্রজনন সম্পর্কে বিবেচনা প্রসূত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো পরিবার পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ ফার্টিলিটি রিসার্স কর্মসূচির পরিচালক ডা. হালিদা হানুম আখতার এর মতে, "একটি পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলা যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মতে, পরিবারের কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে দম্পতি যদি চিন্তাভাবনা করে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তবে তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে।

রবার্ট ম্যাকনামারা এর মতে, পরিবার পরিকল্পনা কোনো পরিবার ধ্বংসের নকশা নয়, বরং এটি পরিবারের মানুষের জন্য একটি নিরাপত্তার নিদর্শন।

৫. রধিনরটন বলেন, পরিবার পরিকল্পনা বলতে শিশুর জন্ম চাহিদা এ দুইয়ের সমন্বিত কার্যক্রমকে বুঝায়, যা সদস্যদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য কল্যাণকর।

মনীষী এইচ. ডি. ডিকিনসন এর মতে, পরিকল্পনা হলো সার্বিক অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচেতনভাবে গৃহীত প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যেমন– কি উৎপাদিত হবে, কতখানি উৎপাদিত হবে, কখন, কোথায় ও কিভাবে সেগুলো উৎপন্ন হবে এবং কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়; পরিবার পরিকল্পনা বলতে এমন এক প্রক্রিয়া ও কল্যাণকর কার্যক্রমকে বুঝায়, যা পরিকল্পিত পরিবার গঠনে বিশেষ করে সুখী, স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠনের প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিশু ও তার পিতামাতার স্বাস্থ্য, পরিবারের আয় এবং সীমিত আকারের পরিবারের গঠনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা : সমস্যা যেমন আছে, তেমনি তার সমাধানও রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। অপরদিকে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য রয়েছে নানা পদক্ষেপ। যা বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিহার্য। নিম্নে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর কার্যকরী ভূমিকা বর্ণনা করা হলো :

১. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন : পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে এদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতার পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে এর পক্ষে জনমত গঠনে সমাজকর্মী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২. অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ : অজ্ঞতা ও অশিক্ষা সমস্যার মূলে ইন্ধন যোগায়। তাই পরিবার পরিকল্পনার পথে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূরীকরণের ব্যাপারে সমাজকর্মীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমাজকর্মী দলীয় আলোচনা, উদ্বুদ্ধকরণ, কমিটি গঠন, স্বাক্ষরতা অভিযান প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে এ থেকে মুক্ত করে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আধুনিক সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্মীরা এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রচলন পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খুবই প্রয়োজন।

৪. আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি চালু : বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি; যেমন– সেলাই, মৎস্য চাষ, পশুপালন, হাঁসমুরগির খামার প্রভৃতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা দক্ষ। এ ধরনের কার্যক্রম জনগণকে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে অধিক সন্তান লাভের প্রবণতারোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫. নেতৃত্বের বিকাশ : পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় নেতৃত্ব অপরিহার্য। স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সমাজকর্মীরা অগ্রণী। সমাজকর্মীরা নেতা নির্বাচন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

৬. দারিদ্র্য বিমোচন : দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য। তাই সমাজকর্মী দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকে।

৭. সামাজিক আন্দোলন : সামাজিক আন্দোলন পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য খুবই জরুরি। সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রয়োজনে সামাজিক আইন প্রণয়নেও ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৮. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোনো কাজেই দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তাই পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে গ্রহণ পারেন।

৯. প্রচার : যে কোনো কাজের সফলতার জন্য প্রচার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রচারের মাধ্যমে জনগণ বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। তাই সমাজকর্মীগণ পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি : নারী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সমাজকর্মীরা তৎপর। নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর পরিবার পরিকল্পনার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সমাজকর্মীরা সহায়তা করে থাকেন।

১১. প্রণীত নীতির বাস্তবায়ন : পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা শাখা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমন্বয়ে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণীত হয়। সমাজকর্মী এ ব্যাপারে অবগত থাকেন। সমাজকর্মীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এসব পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। একজন সমাজকর্মীই পারেন নীতি প্রণয়নের সুফল জনসমক্ষে তুলে ধরতে। জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা মুখ্য।

১২. চাহিদা সম্পর্কিত সচেতনতা : মৌলিক চাহিদা ব্যতীত মানুষ সমাজে সঠিকভাবে জীবননির্বাহ করতে পারে না। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে অধিক সন্তান থাকার কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের মৌলমানবিক চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হয় না। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে ঐ পরিবারগুলোতে জনসংখ্যার আধিক্যের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। উন্নত জীবন মান সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে তিনি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে থাকেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অতুলনীয়। সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে জনগণকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তবে এ কর্মসূচির সফলতার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় দিক থেকে জোরদার ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন।২৭। **বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিবরণ দাও।**

[জা. বি. ২০১৫]

উত্তর। **ভূমিকা :** বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৬২ সালে। প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে সক্ষম করে তুলতে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি : নিম্নে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ তুলে ধরা হলো :

ক. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত কর্মসূচি :

১. অন্ধ বিদ্যালয় (Blind school) : ১৯৬২ সালে ৪টি এবং পরবর্তীতে আরো একটি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে অবস্থিত এসব অন্ধ স্কুলে মোট ৫০ জন অন্ধের পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্ধ শিশুদের ব্রেইলী পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এখানে থাকা, খাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

২. মূক ও বধির বিদ্যালয় (Deaf and dumb school) : ১৯৬২ সাল থেকে মূক ও বধির বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, ফরিদপুর, খুলনা ও চাঁদপুরে মোট ৭টি বিদ্যালয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মূক বধির ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ছবি আঁকা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ১০০জন শিক্ষার্থীর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিদ্যালয় থেকে ১৭২৮ জনকে বাইরে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৩. দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (Centre for education, training and rehabilitation of the physically handicapped) : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সদরে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে ৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সকল কেন্দ্রে অন্ধ ও মূক বধির ছেলেমেয়েদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৪. দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Training centre for the physically and mentally handicapped) : এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং নরওয়ের ৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রটিতে অন্ধ, বধির এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর্থসামাজিকভাবে পুনর্বাসন করাই এ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

৫. সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা (Integrated education for the blind) : ১৯৬৯ সালে কতিপয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় বর্তমানে ৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০ এবং ১৫টিতে হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অন্ধদের সহায়তা দানের জন্য একজন করে রিসোর্স টিচার (Resource Teacher) নিয়োগ করা হয়।

৬. অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন (Training and rehabilitation for the blind) : ১৯৮০ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অন্ধদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রে তাদের জন্য ওয়েল্ডিং, ফিটিং, ছোটখাটো যন্ত্র তৈরি প্রভৃতি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭. পঙ্গুত্ব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ (Preventive measures for the handicapped) : আমাদের দেশে নানা কারণে শিশুরা প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন– শহর সমাজসেবা, পল্লি সমাজসেবা, হাসপাতাল সমাজসেবা, মাদার্স ক্লাব, মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে মায়েদের স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান দান করে সন্তানদের প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সহায়তা করা হয়।

৮. চাকরি পুনর্বাসন কেন্দ্র (Employment rehabilitation centre) : বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ আইএলও এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির সহায়তায় কেন্দ্রটি চালু করেছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সব প্রতিবন্ধীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

খ. সামাজিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি : সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে এদেশে আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে :

১. ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র : ১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬টি ভবঘুরে কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব কেন্দ্র ঢাকা, ঢাকার পূবাইল, বেতিলা, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এবং ময়মনসিংহের ধলায় চালু রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে ভিক্ষুকদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর ধারণ ক্ষমতা ১৯০০। এছাড়া আরো ৫টি কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

২. মুক্ত কয়েদি সেবা কার্যক্রম : মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদিদের সামাজিক ঘৃণা ও অবহেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশে ২৩টি জেলা শহরে এবং সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

৩. প্রবেশন : অপরাধীদের বিচারকার্য স্থগিত রেখে আদালত থেকে শর্তাধীনে প্রবেশনের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধনের জন্য মুক্তি দেয়া হয়। দেশের ২৩টি প্রবেশন কেন্দ্র থেকে সকল জেলা ও উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

৪. কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র : অপরাধপ্রবণ কিশোর/কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য দেশে ৩টি সংশোধনী কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলো গাজীপুরের টঙ্গী, যশোরে এবং গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত। কিশোর/কিশোরী অপরাধীদের সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনাই এসব কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রগুলোতে ১টি কিশোর হাজত, ১টি কিশোর আদালত ও ১টি করে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব কেন্দ্রের আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৪০০, ২০০ ও ১৫০ জন।

৫. মহিলাদের আর্থসামাজিক কেন্দ্র : ঢাকা ও রংপুরে ১৯৭৩ সালে মহিলাদের জন্য ২টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করাই এর মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে বুনন, দর্জিবিজ্ঞান, কনফেকশনারি, বাঁশ বেতের কাজ, প্রিন্টিং, পুতুল তৈরি প্রভৃতি। এ পর্যন্ত উপকার ভোগীর সংখ্যা ১২৪০২ জন।

৬. পরিত্যক্ত শিশু পুনর্বাসন : পরিত্যক্ত শিশু যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে তাদের জন্য ঢাকায় ২৫ আসনের একটি বেবী হোম কেন্দ্র চালু আছে। বয়স ৫ বছর হলে এদেরকে শিশু সদনে প্রেরণ করা হয়।

৭. দুস্থ মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র : ১৯৭৮ সালে টঙ্গীর দত্তপাড়ায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য সেফ হোম, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রভৃতি কার্যক্রম চলছে।

৮. অন্যান্য কার্যক্রম : এছাড়া এতিম শিশুদের আবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য ৭৪টি শিশুসদন, দেশের প্রতিটি বিভাগে ১টি ছোটমনি নিবাস, দিবাযত্ন কেন্দ্র ঢাকায় ১টি, শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাঙ্গুনিয়ায় ১টি এবং গাজীপুরের কোনাবাড়িতে ৪০০ আসন বিশিষ্ট ১টি শিশুদের পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উপর্যুক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ করা হচ্ছে। তবে দেশের প্রতিবন্ধীর তুলনায় এ কার্যক্রম খুবই কম। এছাড়া প্রায় সবগুলোই শহরকেন্দ্রিক। তাই দেশের সকল প্রতিবন্ধীর জন্য গ্রাম ও শহরভিত্তিক আরো অধিকসংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যক্রম

Activities of Voluntary Social Welfare Agencies in Bangladesh

ক বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

কত সালে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম এনজিও (NGO) শব্দটি ব্যবহার করে?

উত্তর : ১৯৪৫ সালে।

কোন সংস্থা সর্বপ্রথম NGO শব্দটি ব্যবহার করে?

উত্তর : জাতিসংঘ।

NGO এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Non-Government Organization.

NGO এর বাংলা অর্থ কী?

উত্তর : বেসরকারি সংস্থা।

NGO না হলেও স্বেচ্ছাসেবী তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।

উত্তর : ক্লাব, সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন।

NGOগুলোর কয়েকটি আয়ের উৎসের নাম লিখ।

উত্তর : ব্যক্তিগত চাঁদা, সাহায্য, অনুদান, সদস্যদের চাঁদা, সরকারি ও বেসরকারি অনুদান ইত্যাদি।

NGO এর ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর : i. NGO ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন সংস্থা নয়। ii. মানুষের কল্যাণ সাধনই NGO এর লক্ষ্য। iii. বেসরকারি সংস্থা হলেও NGO গুলোকে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

ড. মুহাম্মদ সামাদ বাংলাদেশে কর্মরত NGOগুলোকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন?

উত্তর : পাঁচটি শ্রেণিতে।

ড. মুহাম্মদ সামাদ NGOগুলোকে যে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন তা উল্লেখ কর।

উত্তর : i. দাতা সংস্থা, ii. আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের এনজিও, iii. জাতীয় কার্যক্রমের এনজিও, iv. স্থানীয় কার্যক্রমের এনজিও এবং v. পরিসেবা এনজিও।

আবু মুহাম্মদ NGO গুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?

উত্তর : চারটি শ্রেণিতে।

কত শতকে এনজিও কর্মতৎপরতা শুরু হয়?

উত্তর : উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

১২. আবু মুহাম্মদ NGOগুলোকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন তা উল্লেখ কর।

উত্তর : i. ধর্মীয় সংস্থাসমূহ, ii. আয় বৃদ্ধিকারী সংস্থা, iii. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানকারী সংস্থা ও iv. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়োজিত সংস্থা।

১৩. মৌলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে NGO গুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর : চার ভাগে।

১৪. মৌলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে NGOগুলোকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর : i. দানকার্য পরিচালনারকারী এনজিও, ii. উন্নয়ন সেবা সংশ্লিষ্ট এনজিও, iii. অংশীদার এনিজও এবং iv. ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট এনজিও।

১৫. দানকার্য পরিচালনাকারী এনজিও কাকে বলে?

উত্তর : যেসব এনজিও দানশীলতার দর্শন নিয়ে কাজ করে সেসব এনজিওকে দানকার্য পরিচালনারকারী এনজিও বলে।

১৬. উন্নয়ন সেবা সংশ্লিষ্ট এনজিও কী?

উত্তর : যেসব এনজিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নে বিশ্বাস করে এবং মানুষের কল্যাণে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন সাধন করতে সচেষ্ট হয় সেগুলোকে উন্নয়ন সেবা সংশ্লিষ্ট এনজিও বলে।

১৭. ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট এনজিওর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যেসব এনজিও অনগ্রসর মানুষদেরকে তাদের জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করে তাদের ক্ষমতায়নে কাজ করে সেসব এনজিওকে ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট এনজিও বলে।

১৮. অর্থায়নের কর্মপরিধির ভিত্তিতে এনজিওগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : চার ভাগে।

১৯. ব্রাহ্মসমাজ কত সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তর : ১৮২৮ সালে।

২০. রামকৃষ্ণ মিশন কত সালে কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তর : ১৮৯৬ সালে।

২১. বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত এনজিও কোনটি?
উত্তর : পরিবার পরিকল্পনা সমিতি।

২২. পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৩ সালে।

২৩. ১৯৯৯ সালের তথ্যানুসারে এনজিও ব্যুরোতে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিও সংখ্যা কত?
উত্তর : ১,৩৫৩টি।

২৪. ১৯৯৯ সালের তথ্যানুসারে সমাজসেবা বিভাগের নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ২১,৪৯১টি।

২৫. স্বেচ্ছাসেবী এনজিওগুলোর প্রধানত উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : i. সংস্থার সদস্যদের আত্মোন্নয়ন বা তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। ii. সমাজস্থ সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

২৬. সোসাইটি রেজিস্ট্রি আইন কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৮৬০ সালের ২১ মে।

২৭. সোসাইটি রেজিস্ট্রি আইনে কি কি ধরনের সংস্থা গঠিত হতে পারে?
উত্তর : i. সাহিত্য সমিতি বা সংঘ, ii. বিজ্ঞান সমিতি বা সংঘ, iii. জ্ঞান প্রচার সমিতি বা সংঘ ও iv. দাতব্য সমিতি বা সংঘ।

২৮. ট্রাস্ট আইন কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৮৮২ সালে।

২৯. ট্রাস্ট আইনের আওতায় নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।
উত্তর : গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

৩০. কত সালে কোম্পানি আইন প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৯১৩ সালে।

৩১. কোম্পানি আইন কত সালে সংশোধিত হয়?
উত্তর : ১৯৯৪ সালে।

৩২. কোম্পানি আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।
উত্তর : i. উবিবীগ, ii. পিকেএসএফ (PKSF), iii. হরটেক্স।

৩৩. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৯৬১ সালে।

৩৪. DAM এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Dhaka Ahsania Misson.

৩৫. বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৯৭৮ সালে।

৩৬. NAB এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : NGO AFFAIRS BUREAU.

৩৭. এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো (NAB) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হ...
উত্তর : ১৯৯০ সালে।

৩৮. ১৯৯৯ সালের হিসাব মতে সমাজসেবা অধিদপ্তর ... ঢাকা বিভাগে কতটি এনজিও নিবন্ধিত হয়?
উত্তর : ৮,৫০৯টি।

৩৯. ১৯৯৯ সালের হিসাব মতে সমাজসেবা অধিদপ্তর ... সবচেয়ে বেশি নিবন্ধিত এনজিও কোন বিভাগে ... কতটি?
উত্তর : রাজশাহী বিভাগে, ৪,৮০২টি।

৪০. বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা কতটি?
উত্তর : প্রায় ৫৬,০০০ (ছাপ্পান্ন হাজার)।

৪১. JSC এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Joint Stock Company.

৪২. Joint Stock Company কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
উত্তর : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

৪৩. রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
উত্তর : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

৪৪. এনজিওর বাংলাদেশে কর্মরত কয়েকটি বিদেশি নাম লিখ।
উত্তর : World Vision, Care Banglade... Danida, Sida, The Asia Foundation, SWI... Agency for Development and Co-operati... Norad, Cida, Catias ইত্যাদি।

৪৫. PKSF কী?
উত্তর : সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ঋণ প্রদান... সংস্থা।

৪৬. ওয়াকফকৃত সম্পত্তি পরিচালনা করেন কে?
উত্তর : মোতাওয়াল্লি।

৪৭. দেবোত্তর প্রথার উপর গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান পরিচাল... দায়িত্বে থাকেন কে?
উত্তর : সেবায়েত।

৪৮. চ্যারিটি কী?
উত্তর : খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত দানকার্যকে চ্যা... বলা হয়।

৪৯. FNB এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Federation of NGO's Bangladesh.

৫০. FNB'র কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্যরা কত বছরের ... নির্বাচিত হন?
উত্তর : ২ বছরের জন্য।

৫১. ১৯৯৪-৯৫ সালের তথ্যানুসারে দেশে দাতা গোষ্ঠীর তহবিল সমর্থিত এনজিওর সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৯৮৬টি।

৫২. কারিতাস কী?
উত্তর : একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

৫৩. কারিতাসে কয় ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো বিদ্যমান?
উত্তর : ৫ ধরনের।

৫৪. CDF এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Credit and Development Forum.

৫৫. ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে কতটি NGO ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে?
উত্তর : ৭২১টি।

৫৬. ২০০৪ সালের হিসাব মতে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ উপকার ভোগীর সংখ্যা কত?
উত্তর : ১ কোটি ৬২ লক্ষ জন। (পুরুষ ০.২৪ কোটি, মহিলা ১.৩৮ কোটি)।

৫৭. ২০০৪ সালের হিসাব মতে ১.৬২ কোটি উপকারভোগীর মধ্যে কত কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়?
উত্তর : ৩৩,৮৬৩.৫৬ কোটি টাকা।

৫৮. আশা কত সালে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে?
উত্তর : ১৯৯১ সালে।

৫৯. এনজিওগুলো ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি আর যেসব কার্যাবলি পরিচালনা করে তার মধ্যে কয়েকটির নাম লিখ।
উত্তর : স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ মোকাবিলা, শিশু কল্যাণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ, যুবকল্যাণ ইত্যাদি

৬০. VHSS এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Voluntary Health Service Society.

৬১. WDP এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Woman Development Project.

৬২. ব্র্যাক কত সালে সর্বপ্রথম উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে?
উত্তর : ১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে।

৬৩. বর্তমানে বাংলাদেশে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৩৪,০০০টি।

৬৪. CAAP এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Confidential Approach to Aids Prevention.

৬৫. PC এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Population Control.

৬৬. TGA এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Target Group Approach.

৬৭. বাংলাদেশে কত সালের মধ্যে সমন্বিত সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি চালু হয়?
উত্তর : ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে।

৬৮. কত সালে London Society for Organizing Charitable Relief and Repressing Mendicancy গড়ে উঠে?
উত্তর : ১৮৬৯ সালে।

৬৯. ব্যাপটিস্টট মিশনারী সোসাইটি কী?
উত্তর : একটি পুরনো এনজিও।

৭০. ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৭৯৪ সালে।

৭১. রামকৃষ্ণ মিশন কত সালে কার্যক্রম শুরু করে?
উত্তর : ১৮৯৬ সালে।

৭২. দেশ বিভাগের সময় এদেশে কয়টি এনজিওর পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর : দেশি ৭টি এবং বিদেশি ২টি।

৭৩. CLP এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Continuous Learning Process.

৭৪. কত সালে সর্বপ্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৫ সালে।

৭৫. বিশ্বের কোন দেশে সর্বপ্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : মেক্সিকোতে।

৭৬. দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেলে ১৯৮০ সালে।

৭৭. তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয়।

৭৮. GBDA এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Gender Based Development Approach.

৭৯. GEP এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : General Education Project.

৮০. PHP এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : People and Health Project.

৮১. PKSF কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৯০ সালে।

৮২. PKSF এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Palli Karma Sahayok Foundation.

৮৩. ADAB এর পূর্ণ নাম লিখ।
উত্তর : Association of Development Agencies in Bangladesh.

৮৪. ADAB কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে।

৮৫. ADAB সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৮৬০ সালে।

৮৬. EC এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Executive Committee.

৮৭. FDRO এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Foreign Donations Regulation Ordinance.

৮৮. কত জন সদস্য নিয়ে ADAB এর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়?
উত্তর : ১৬ জন সদস্য নিয়ে।

৮৯. পরিবার পরিকল্পনার পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?
উত্তর : মার্গারেট সেংগার।

৯০. মার্গারেট সেংগার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
উত্তর : আমেরিকার।

৯১. সর্বপ্রথম কত সালে মার্গারেট সেংগার ও তার বোন এথেলবিরণে এবং ফানিয়াসিভেল ১টি ক্লিনিক চালু করেন?
উত্তর : ১৯১৬ সালের ১৬ অক্টোবর।

৯২. কত সালে Birth Control League প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯২১ সালে।

৯৩. BCL এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Birth Control League.

৯৪. জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : মার্গারেট সেংগার।

৯৫. কত সালে Birth Control League Research Bureau প্রতিষ্ঠা করা হয়?
উত্তর : ১৯২৩ সালে আমেরিকায়।

৯৬. ভারতীয় উপমহাদেশে কোথায় সরকারিভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচি চালু হয়?
উত্তর : মহীশুরে।

৯৭. কত সালে মহীশুরে জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক চালু করা হয়?
উত্তর : ১৯৩০ সালের ১১ জুন।

৯৮. বাংলাদেশে কত সালে প্রথম পরিবার পরিকল্পনা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ।

৯৯. IPPF এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : International Planned Parenthood Federation.

১০০. ড. হুমায়রা সাঈদ কে ছিলেন?
উত্তর : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রী... বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

১০১. ড. হুমায়রা সাঈদ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৯৫৬ সালে।

১০২. সর্বপ্রথম কত সালে পরিবার পরিকল্পনা সমিতির নির্... অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৭ সালে।

১০৩. পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কত সালে রেজিস্ট্রেশন লা... করে?
উত্তর : ১৯৬৪ সালে ১৫ মে।

১০৪. পরিবার পরিকল্পনার নতুন নামকরণ করা হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৭২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১০৫. পরিবার পরিকল্পনার নতুন নাম কী রাখা হয়?
উত্তর : বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি।

১০৬. কত সালে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি International Planned Parenthood Federation এর সহযোগী সদস্যের মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭৫ সালে।

১০৭. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির তিনটি উদ্দেশ্য লিখ।
উত্তর : i. যুবক-যুবতীদের দায়িত্বশীল পিতা-মাতা হ... প্রস্তুত করে তোলা।
ii. উন্নয়নে নারীদের সহায়তা প্রদান করা।
iii. সরকারকে জাতীয় জনমিতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জ... সহায়তা প্রদান।

১০৮. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কার্যনির্বা... কমিটির সদস্য কত জন?
উত্তর : ২৭ জন।

১০৯. NEC এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : National Executive Committee.

১১০. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কি ধরনে... সংগঠন?
উত্তর : একটি স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন।

১১১. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতিকে কয়ভাগে ভা... করা হয়েছে?
উত্তর : ২ ভাগে।

১১২. Clinical Method কে কী কী ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর : স্থায়ী পদ্ধতি এবং অস্থায়ী পদ্ধতি।

১১৩. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতিকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর : i. Clinical Method, ii. Non-clinical Method.

১১৪. স্থায়ী পদ্ধতি দুটি কী কী?

উত্তর : i. ভ্যাসেকটমি, ii. টিউবেকটমি।

১১৫. MDA এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Motor Driver Association.

১১৬. নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি কত সাল থেকে শুরু হয়?

উত্তর : ১৯৮৭ সাল থেকে।

১১৭. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কত সাল থেকে পল্লি এলাকায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তর : ১৯৮০ সাল থেকে।

১১৮. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কত সালে সর্বপ্রথম Family Development Centre চালু করে?

উত্তর : ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে।

১১৯. কোন সমিতি Family Development Centre চালু করে?

উত্তর : বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি।

১২০. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি Family Development Centre চালু রয়েছে?

উত্তর : ৮৩টি।

১২১. বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি কত সালে প্রশিক্ষণ বিভাগ চালু করে?

উত্তর : ১৯৭২ সালে।

১২২. বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের তিনটি উদ্দেশ্য লিখ।

উত্তর : i. বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

ii. প্রবীণদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

iii. সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১২৩. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সদস্য হতে হলে কত বয়স লাগে?

উত্তর : সর্বনিম্ন ৫৫ বছর।

১২৪. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সদস্য মূলত কয় প্রকার?

উত্তর : তিন প্রকার।

১২৫. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের তিন প্রকার সদস্যের উল্লেখ কর?

উত্তর : i. জীবন সদস্য, ii. সাধারণ সদস্য, iii. দাতা সদস্য।

১২৬. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সদস্যদের কত টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়?

উত্তর : ৫০০ টাকা।

১২৭. Family Development Centre যেসব কার্যাদি সম্পাদন করে তার মধ্যে তিনটির নাম লিখ।

উত্তর : i. প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও MCH সেবা।

ii. ফিডার স্কুল।

iii. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের ক্লিনিকে রেফার করা।

১২৮. জীবন সদস্যকে কত টাকা সদস্য ফি দিতে হয়?

উত্তর : ৪,০০০ টাকা।

১২৯. দাতা সদস্যকে এককালীন কত টাকা সদস্য ফি দিতে হয়?

উত্তর : ১০,০০০ টাকা।

১৩০. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ঢাকার আগারগাঁও এ।

১৩১. প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য কত সালে স্যাটেলাইট ক্লিনিক খোলা হয়েছে?

উত্তর : ১৯৯৭ সালে।

১৩২. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ থেকে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

উত্তর : প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা নামের একটি ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশিত হয়।

১৩৩. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ থেকে কি ধরনের পুরস্কার প্রদান করা হয়?

উত্তর : মমতাময় ও মমতাময়ী প্রবীণ সেবা পুরস্কার।

১৩৪. কত সাল থেকে মমতাময় ও মমতাময়ী পুরস্কার প্রদান করা হয়?

উত্তর : ২০০৩ সাল থেকে।

১৩৫. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : ড. এ. কে. এম. আব্দুল ওয়াহেদ।

১৩৬. IFA এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : International Federation of Ageing.

১৩৭. AAG এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Australia Association of Gerontology.

১৩৮. ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত?

উত্তর : মোট জনসংখ্যার ৭.২৯%।

১৩৯. UCEP এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Underprivileged Children's Educational Programs.

১৪০. UCEP কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়?

উত্তর : ১৯৭২ সালে।

১৪১. UCEP এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : লিনডসে অ্যালন চেনি।

১৪২. লিনডসে অ্যালন চেনি (Lindsay Allan Cheyne) কোন দেশের অধিবাসী?
উত্তর : নিউজিল্যান্ডের।

১৪৩. ইউসেফ কর্মসূচির তিনটি সাধারণ উদ্দেশ্য লিখ।
উত্তর : i. শহরে দরিদ্র জনসাধরণের আর্থসামাজিক উন্নতি বা উন্নয়ন সাধন করা।
ii. শহরে দরিদ্রদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।
iii. শহরে দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার পুরণে সাহায্য করা।

১৪৪. ইউসেফকে সহায়তা দানকারী তিনটি সংস্থার নাম লিখ।
উত্তর : i. DANIDA, ii. DEID, iii. SDC.

১৪৫. কত সালে ইউসেপ ট্রেনিং সেল স্থাপন করে?
উত্তর : ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে।

১৪৬. ILO এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : International Labour Organization.

১৪৭. ইউসেপ এর কয়টি প্যারা ট্রেড সেন্টার রয়েছে?
উত্তর : ৩টি প্যারা ট্রেড সেন্টার রয়েছে।

১৪৮. প্যারা ট্রেড কেন্দ্রে কতটি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়?
উত্তর : ৫টি।

১৪৯. গ্রামীণ ব্যাংক সর্বপ্রথম কত জন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে?
উত্তর : ৪২ জনকে।

১৫০. সরকার কত সালে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারি করে?
উত্তর : ১৯৮৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর।

১৫১. বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক কতটি গ্রামে তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে?
উত্তর : প্রায় ৮৪,০০০টি গ্রামে।

১৫২. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের হার কত?
উত্তর : ৯৮.৬৯%।

১৫৩. গ্রামীণ ব্যাংক কত সাল থেকে গৃহঋণ প্রদান করে আসছে?
উত্তর : ১৯৮৪ সাল থেকে।

১৫৪. কত সালে গ্রামীণ ব্যাংক উচ্চ শিক্ষা ঋণ চালু করে?
উত্তর : ১৯৯৭ সাল থেকে।

১৫৫. গ্রামীণ ব্যাংকের ষোল সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনটির উল্লেখ কর।
উত্তর : i. পরিবার ছোট রাখা।
ii. ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা।
iii. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।

১৫৬. জায়সাগর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছি গ্রামে।

১৫৭. ASA এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Association for Social Advancement.

১৫৮. কত সালে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে।

১৫৯. আশার প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : মোঃ শফিকুল হক চৌধুরী।

১৬০. জনাব শফিকুল হক চৌধুরী কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৯৪৯ সালে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬১. CCDB এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Christian Community Development of Bangladesh.

১৬২. আশার পূর্ব নাম কি ছিল?
উত্তর : সমাজপ্রগতি সংস্থা।

১৬৩. LPH এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Loan Programme Phase.

১৬৪. SLLP এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Small Lending Loan Programme.

১৬৫. আশার তিনটি আয়ের উৎসের নাম লিখ।
উত্তর : i. সার্ভিস চার্জ, ii. PKSF বাংলাদেশ, iii. DANIDA.

১৬৬. বন্ধন কোন দেশের ঋণদানকারী সংস্থা?
উত্তর : ভারতের পশ্চিম বঙ্গের।

১৬৭. কি কি কারণে সাধারণত ডায়াবেটিস হয়?
উত্তর : বংশগত, পরিবেশগত কিংবা অভ্যাসগত কারণে।

১৬৮. কত সালে ডায়াবেটিস সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি।

১৬৯. ডায়াবেটিস সমিতির প্রতিষ্ঠা কে?
উত্তর : জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোঃ ইব্রাহীম।

১৭০. সর্বপ্রথম কোথায় ডায়াবেটিস বহির্বিভাগ খোলা হয়?
উত্তর : ১৯৫৭ সালে সেগুনবাগিচায়।

১৭১. বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : বারডেম।

১৭২. বারডেম ঢাকার কোন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়?
উত্তর : শাহবাগ এলাকায়।

১৭৩. বারডেম এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিস এন্ডোক্রাইন এ্যান্ড মেটাবলিক ডিজঅর্ডার্স।

NIDN কত সালে কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তর : ১৯৯৬ সালে ১৫ জুন।

NDN এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : National Diagnostic Network.

RVTC এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Rehabilitation and Vocational Training Centre.

ডায়াবেটিস সমিতির তিনটি উদ্দেশ্য লিখ।

উত্তর : i. বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা।

ii. বহুমূত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে গবেষণা।

iii. বহুমূত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগ বিষয়ে জনসংযোগ ও প্রকাশনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি।

NHN এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : National Health Care Network.

NIHC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : National Institute of Health Care.

FPS এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Family Physitian Skim.

ইব্রাহীম মেডিক্যাল কলেজ ঢাকার কোন এলাকায় অবস্থিত?

উত্তর : সেগুন বাগিচায় অবস্থিত।

২. IDF এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : International Diabetic Federation.

৩. প্রশিকা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

৪. POB এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : People Organization Building.

৫. HDT এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Human Development Training.

৬. PSDT এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Practical Skill Development Training.

৭. UEP এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Universal Education Programme.

৮. UPDP এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Urban Poor Development Programme.

৯. IDPAA এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : Institute of Development Policy Analysis and Advocacy.

৯০. IDPAA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৯৪ সালে।

১৯১. LDP & FDP এর পূর্ণ অর্থ কী?

উত্তর : Livestock Development Programme and Fisheries Development Programme.

১৯২. BRAC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Bangladesh Rural Advancement Committee.

১৯৩. ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী ব্র্যাক এর উপকারভোগীর সংখ্যা কত?

উত্তর : ৮০,৫৪,৪১৫ জন।

১৯৪. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

১৯৫. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : ফজলে হাসান আবেদ।

১৯৬. ব্র্যাক এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ঢাকার মহাখালীতে।

১৯৭. ব্র্যাক এর কর্মসূচিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর : ৫ ভাগে।

১৯৮. ব্র্যাক এর তিনটি কর্মসূচির নাম লিখ।

উত্তর : i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি।

ii. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।

iii. স্বাস্থ্য কর্মসূচি।

১৯৯. কত সাল থেকে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তর : ১৯৭৪ সাল থেকে।

২০০. ২০১০ সালের হিসাব মতে ব্র্যাক কত টাকা ঋণ বিতরণ করে?

উত্তর : ৫০,৪৪৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

২০১. ব্র্যাক কত সালে MELA কর্মসূচি চালু করে?

উত্তর : ১৯৯৬ সালে।

২০২. কত সালে ব্র্যাক হাঁস-মুরগি ও পশুপালন কর্মসূচি চালু করে?

উত্তর : ১৯৮৩ সালে।

২০৩. ব্র্যাক শহর কর্মসূচি কত সালে চালু হয়?

উত্তর : ১৯৯২ সালে।

২০৪. ব্র্যাক ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর : ১৯৯০ সালে।

২০৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্র্যাক যে পাঁচটি কৌশল অবলম্বন করে তার তিনটির নাম লিখ।

উত্তর : i. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

ii. সম্পদ হস্তান্তর।

iii. সমাজ উন্নয়ন।

(খ) বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কি?

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কাকে বলে?

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর?

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যান সংস্থার সংজ্ঞা দাও?

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : এমন একদিন ছিল যখন সমাজকল্যাণ বলতে আমাদের দেশে প্রধানত স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণকেই বুঝানো হতো। ভারত বিভাগের পরই সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এদেশে প্রথম চালু হয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই সমাজকল্যাণ গড়ে উঠেছে বলে বেসরকারি তথা স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের গুরুত্ব কোনক্রমেই কমে যায় নি, বরং আধুনিক সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একক প্রচেষ্টায় সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা : এককথায় স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ হচ্ছে জনগণের স্বইচ্ছায় পরিচালিত স্বতঃস্ফূর্ত সমাজসেবা কার্যাবলির সমষ্টি। সমাজের কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণের স্বউদ্যোগে গড়ে উঠা সংগঠনই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা নামে পরিচিত।

পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সমাজকল্যাণ বিভাগের সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজের কোন স্বীকৃত ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংস্থাকে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

১৯৬১ সালের প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, "কোন সমাজসেবা বা কল্যাণমূলক কাজ করার লক্ষ্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছায় গঠিত সংগঠন, সমিতি বা কর্মকাণ্ডকেই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা বলে।"

১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার জারিকৃত 'দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮' এর সংজ্ঞানুযায়ী "স্বেচ্ছাসেবা হচ্ছে এমন কোন কাজ, যা কোন ব্যক্তি বা সংস্থা আংশিক অথবা পুরোপুরি বিদেশী সাহায্য নিয়ে করে থাকে।"

উপসংহার : সুতরাং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হল সেসব সংস্থা, যে সংস্থাগুলো নিজ নিজ দেশের সরকার, ট্রাস্ট এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সে অর্থ উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর সরকারি কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দলের কাছে হস্তান্তর করে।

প্রশ্ন॥২॥ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর গুরুত্ব লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর সংক্ষেপে প্রয়োজনীয়তা লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর তাৎপর্য লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বে অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা [illegible] সর্বাধিক আলোচিত এবং আলোড়িত বিষয়। বাংলাদেশের [illegible] দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে [illegible] স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিরাজমান বিপুল সংখ্যক সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। [illegible] সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং সমস্যাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে মোকাবিলার প্রয়োজনে কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব :

১. সরকারি কর্মসূচির পরিপূরক : বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন ও সমস্যা অনেক। [illegible] অর্থসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারি সমাজকল্যাণ [illegible] প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে। [illegible] করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশু ও যুব কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, চিত্ত বিনোদন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি [illegible] সরকারি পরিপূরক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের [illegible] অপরিসীম।

২. দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ : সমাজ পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা ও [illegible] প্রেক্ষিতে প্রচলিত কর্মসূচির রদবদল কিংবা নতুন কার্যক্রম [illegible] করা প্রয়োজন হতে পারে। অথবা কোন আকস্মিক দুর্যোগ [illegible] জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা [illegible] আবশ্যক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার দরুন জরুরি ব্যবস্থা [illegible] সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা দ্রুত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. এলাকাবিশেষের বিশেষ সমস্যার সমাধান : বাংলাদেশে সরকারি কর্মসূচি সাধারণত জাতীয় নীতির ভিত্তিতে গৃহীত [illegible] থাকে। ফলে কখনও কোন এলাকাবিশেষের বিশেষ সমস্যা সরকারি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো স্থানীয় প্রয়োজন বা সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকাভিত্তিক গড়ে উঠে। সুতরাং স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক।

৪. সমাজসংস্কার : বাংলাদেশে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা, কুসংস্কার, মানবতা বিরোধী রীতিনীতি ইত্যাদি উচ্ছেদের জন্য জনমত সৃষ্টিতে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার : স্বেচ্ছা সমাজকর্মীগণ নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করে থাকে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যয়ও যৎ সামান্য। সে কারণে এসব প্রতিষ্ঠান স্বল্পব্যয়ে সমাজের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করতে সক্ষম থাকে। সরকারের জন্য যা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে করা সম্ভব।

৬. সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়ক : বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় গড়ে উঠে এবং জনগণের অর্থ সামর্থ্যে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণের কাজে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব ও সফল্য সমাজের অন্যদের জন্যও উদাহরণ এবং অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে উঠে। এতে করে মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং তারা সমাজকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৭. সামাজিক উন্নয়নে : সামাজিক উন্নয়ন হল একটি তুলনামূলক প্রত্যয়, দু'টি সমাজের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরার জন্য স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন এ দু'খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত সুষম বন্টন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গণ অংশায়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

৮. সমস্যা চিহ্নিতকরণ : বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় অথচ উপেক্ষিত সমস্যাবলি চিহ্নিত করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে উন্নয়ন সংস্থার নাম উল্লেখ করা যায়।

৯. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশের বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ দু'টি উপায়ে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রথমত টার্গেট গ্রুপের লোকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দান করে সকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো নিজেরা বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে বেকারদের কর্মসংস্থান করেছে। এক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গবেষণার তথ্যানুযায়ী বিদেশী তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত বাংলাদেশে ১১৫টি সংস্থায় দেড় লাখ কর্মী নিয়োজিত।

১০. সংক্রামক ও দীর্ঘমেয়াদি রোগ নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশে অনেক সংক্রামক রোগ রয়েছে যেগুলোর জন্য বিশেষ ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন। এসব ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার সুযোগদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– বাংলাদেশের বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা প্রদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'বহুমূত্র সমিতি'ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কর্মরত। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুস্থ, দরিদ্র ও অক্ষম রোগীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– রোগী কল্যাণ সমিতি।

১১. দারিদ্র্য বিমোচন : বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, ব্র্যাক ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, দরিদ্র ও উন্নয়নগামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গবেষণার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থা ২০ হাজার গ্রামে বিস্তৃত।

প্রশ্ন।৩। **স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।**

অথবা, **স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ কর।**

অথবা, **স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

উত্তর। ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে উন্নত দেশগুলোতেও স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মূলত একটি দেশের জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশপাশি এসব স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ কখনও কোন একক ব্যক্তির মাধ্যমে আবার কখনও বা একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে দেখা যায়।

স্বেচ্ছামূলক/স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য : স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের সংজ্ঞার আলোকে এর কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেগুলো হল নিম্নরূপ :

১. স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত একটি কার্যক্রম।

২. এখানে সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনের পাশপাশি ভালোমন্দের বিষয়টি জড়িত।

৩. এটি জনগণের চাঁদা, দান, সরকারি অনুদান ও বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর।

৪. এগুলোর মূল লক্ষ্য হল সমাজকল্যাণ।
৫. এদের দার্শনিক ভিত্তি হল মানবতাবোধ এবং ধর্মীয় চেতনা।
৬. স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণে মুনাফা অর্জনের বিষয়টি গৌণ।
৭. এখানে প্রতিকারের চেয়ে উপশমধর্মী সেবার উপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়।
৮. এখানে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য টার্গেট নির্দিষ্ট করা হয়।
৯. এক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের তুলনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।
১০. এগুলোকে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
১১. এখানে প্রধানত বেতনভুক্ত কর্মচারী দ্বারা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রধানত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খেয়ালখুশিমতো পরিচালিত হয়। তবে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক অবস্থায় দেখা যায়, এর কার্যক্রম এখন অনেকটাই সংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক। আর বাংলাদেশের মত একটি স্বল্পোন্নত দেশ যেখানে জনগণের মাথাপিছু আয় ৪৭০ ডলার এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ৫% এর কাছাকাছি সেখানে সরকারের একটি যোগ্য পরিপূরক/সঙ্গী হিসেবে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব যে খুব বেশি তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন।৪। **বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দাও।**

উত্তর। **ভূমিকা :** বহুমূত্র রোগীদের দুরবস্থা ও এর সুষ্ঠু প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে ১৮৫৮ সালে 'ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতিই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি' নাম ধারণ করে।

ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ ডায়াবেটিস এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হল :

১. ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, সেবার ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন।
২. বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের ডাক্তার, প্যারামেডিকস ও সেবিকাদের ডায়াবেটিস ও তৎসংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।
৩. ডায়াবেটিস ও তৎসংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে গবেষণা।
৪. ডায়াবেটিস ও তৎসংক্রান্ত রোগ বিষয়ে বিভিন্ন জনসংযোগ ও প্রকাশনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি।
৫. ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।
৬. রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৭. দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা করা।
৮. চিকিৎসা লাভে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৯. চিকিৎসার ব্যবস্থাকে সহজতর করার লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা করা।
১০. অকাল মৃত্যু রোধ করা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস সমিতি রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৮১-৮৪ এ তিন বছরে এ সমিতির মাধ্যমে ১২,১২৫ জন রোগী উপকৃত হয়েছে। সুতরাং ডায়াবেটিস সমিতি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অকালে সামাজিক পঙ্গুত্বের হাত থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি রোগ সুষ্ঠুভাবে প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন।৫। **বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

উত্তর। **ভূমিকা :** বহুমূত্র রোগীদের দুরবস্থা ও এর সুষ্ঠু প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে ১৮৫৮ সালে 'ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতিই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি' নাম ধারণ করে।

ডায়াবেটিস সমিতির কার্যাবলি :

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, চিকিৎসামূলক কার্যক্রম, পুনর্বাসন কার্যক্রম ও গবেষণামূলক কার্যক্রম। ডায়াবেটিস এসোসিয়েশনের ব্যাপক উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল :

১. প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম : প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন জনসংযোগ যেমন– রেডিও, টিভি, পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমে ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা হয়। এছাড়া এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতি দেশের জনগণকে রোগের কারণ, ব্যাপকতা ও চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করে এবং সতর্কতা গ্রহণে উৎসাহিত করে।

২. চিকিৎসা কার্যক্রম : ডায়াবেটিস সমিতির সবচেয়ে বড় কার্যক্রম হল চিকিৎসা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় জটিল ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিরাময় নিবাস (Convalescent home) পরিচালনা করা হয়। চিকিৎসা রোগীদের নিয়মিত অনুসরণেরও (ফলোআপ) ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এ কার্যক্রমের আওতায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানসহ, ঔষধসহও খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

৩. **পুনর্বাসন কার্যক্রম :** দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের নৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য ডায়াবেটিস মিতি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে রোগীদের শক্তি র্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান করা হয় ং সমাজের উপার্জনক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত া হয়।

৪. **গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম :** ডায়াবেটিস রোগের রণ অনুসন্ধান, রোগমুক্তির উপায় উদ্ভাবন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার র্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ডায়াবেটিস সমিতি গবেষণা কার্যক্রম রিচালনা করছে। এরূপ গবেষণালব্ধ জ্ঞান সমিতির রোগ রাময়মূলক ভূমিকাকে অধিকতর কার্যকর ও সম্প্রসারিত করে ং রোগমুক্তির দিকনির্দেশনা দান করে।

৫. **পরামর্শমূলক কার্যক্রম :** ডায়াবেটিস রোগীদের রোগ ম্পর্কে সঠিক ধারণা দান, পরামর্শ দান ও প্রয়োজনমতো নোসামাজিক সমর্থন দান করতে ডায়াবেটিস সমিতি অনেক র্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এতে রোগীরা রোগ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে অনেকাংশে মুক্ত হতে পারে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস সমিতি রোগ নিরাময় ও তিরোধে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৮১-৮৪ এ ন বছরে এ সমিতির মাধ্যমে ১২,১২৫ জন রোগী উপকৃত য়েছে। সুতরাং ডায়াবেটিস সমিতি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অকালে সামাজিক পঙ্গুত্বের হাত থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি রোগ সুষ্ঠুভাবে প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন॥৬॥ বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯২০ এর অধীনে কিছু রদবদল সাপেক্ষে পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানেও এর একটি শাখা স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি পূর্ব পাকিস্তান শাখা বাংলাদেশের রেডক্রস সোসাইটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভের আবেদন জানায়। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশবলে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সাধারণভাবে কতকগুলো উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এ উদ্দেশ্যগুলো সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় বলে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। নিম্নে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হল :

১. **মানবতা :** রেডক্রস মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্তমানবতার সেবা মানুষে মানুষে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপন, বন্ধুত্ব এবং সব মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য।

২. **পক্ষপাতহীনতা :** বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে থেকে সবাইকে সাহায্য করা।

৩. **নিরপেক্ষতা :** বিশ্বের সব মানুষের আস্থা অর্জন করা এর আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য। সেজন্য রেডক্রস সোসাইটি রাজনৈতিক, বর্ণ, ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধীয় বিতর্কে না জড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করে।

৪. **স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য :** রেডক্রস স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। রেডক্রসের কার্যক্রমে যেমন রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হস্তক্ষেপ করে না তেমনি রেডক্রসও রাষ্ট্র বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাজে বাধার সৃষ্টি করে না।

৫. **স্বেচ্ছামূলক :** রেডক্রস একটি স্বেচ্ছামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬. **একতা :** একটি দেশে রেডক্রসের একটিমাত্র সংগঠন থাকে এবং দেশের সব জনসাধারণের জন্য এর সেবা কর্মসূচির দ্বার খোলা থাকে।

৭. **সর্বজনীনতা :** রেডক্রস একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, যা সব সমাজের মানুষের সমান অধিকার এবং একে অপরকে সাহায্য করার নীতিতে বিশ্বাসী।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় শেষে বলা যায় যে, আর্তমানবতার সেবাই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূল লক্ষ্য আর এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তারা বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

প্রশ্ন॥৭॥ বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পটভূমি লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উৎপত্তি সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির বিকাশ সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নাম সবার কাছেই পরিচিত। প্রথম দিকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কেবল যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা করত। এরপরে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দুর্যোগ, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও রোগব্যাধিকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রসারিত হতে থাকে।

বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পটভূমি : ১৯৪৯ সালে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি রেডক্রস সোসাইটি নামে গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের দেশ পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটিকে বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সোসাইটিতে পরিণত করে। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর এ দেশের সরকারের অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। পরে ১৯৭২ সালে ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় রেডক্রস সোসাইটি গড়ে উঠে। ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রেডক্রস সোসাইটির আদেশ জারি করে। ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি লীগ অব রেডক্রস সোসাইটিজের সদস্যপদ লাভ করে। পরে ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি' রাখা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কার্যকারিতার দিক হতে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি সরকারি কার্যক্রমকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। যেমন– দুর্যোগকালীন সময়ে কোন কোন সময় সরকারি সাহায্য পৌছার পূর্বেই রেডক্রিসেন্টের সেবা দুর্গত মানুষের দ্বারে পৌছে যায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন॥৮॥ ব্র্যাক কি? ব্র্যাকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

অথবা, ব্র্যাক কী সংক্ষেপে লিখ? ব্র্যাকের উদ্দেশ্যগুলো কি কি?

অথবা, ব্র্যাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ব্র্যাকের উদ্দেশ্যগুলো কি কি?

উত্তর॥ ভূমিকা : ১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর দেশে একটি রিলিফ অর্গানাইজেশন হিসেবে ব্র্যাকের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে দু'বছরের মধ্যেই দারিদ্র্য বিমোচন ও দারিদ্র্য ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়ে "বাংলাদেশ রুরাল এডভ্যান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)" নামে এ সংস্থার নতুন নামকরণ হয়।

ব্র্যাক : বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসমূহ বহুমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা হল ব্র্যাক। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্ধ-লক্ষাধিক মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্র্যাকের কর্মপরিধিভুক্ত ৭৫ হাজার গ্রাম সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ লাখ। ১২ লাখ শিশু ব্র্যাকের স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনগুলোর সদস্যরা সঞ্চয় করেছে ২শ ২৫ কোটি টাকা। সদস্যদের অধিকাংশই মহিলা, যারা ৯৮ সালে ৮শ ৪০ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা পেয়েছে। ব্র্যাকের বর্তমানের এ অর্জিত সাফল্য ২৭ বছরের অবিরাম কর্মতৎপরতার ফল। বর্তমানে ব্র্যাক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, স্বাস্থ্য, বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রাম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের জন্য ঋণ প্রদান ইত্যাদিতে কার্যক্রম প্রসারিত করেছে।

ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১৯৭৬ সালে 'Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee' পরিবর্তন করে হয় 'Bangladesh Rural Advancement Committee.' বাংলাদেশ পল্লি প্রগতি পরিষদ সংক্ষেপে ব্র্যাক গঠন করা হয়। পল্লির মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বহুমুখী এবং গতিশীল, গ্রামীণ দরিদ্র এবং শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে ব্র্যাকের বহুমুখী উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্র্যাকের মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা। এ দু'টি লক্ষ্যার্জনে ব্র্যাকের কর্মসূচির মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. দরিদ্রদের নিয়ে কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করা।
২. সহজলভ্য ঋণদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
৩. তাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

ব্র্যাক এর লক্ষ্য দলকেন্দ্রিক কার্যক্রম বহুমুখী উদ্দেশ্যাভিমুখী। এক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্যকে সাধারণ ও নির্দিষ্ট এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে এ দু'ধরনের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল :

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য :

১. গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে সচেতন করা।
২. গ্রামীণ মহিলাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা।
৩. দরিদ্র প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা।
৪. বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাবলম্বন অর্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে অনুঘটক বা প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন।
৫. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি এবং সম্পদ অর্জন প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৬. উন্নয়ন গতিধারাকে গতিশীল করা।

খ. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ :

১. গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্রদের চাহিদা, সম্পদ ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করা।
২. অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকালে সকর্মসংস্থানে প্রকল্প নির্বাচন।
৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের নকশা প্রণয়ন বাস্তব ক্ষেত্রে সহায়তা করা।
৪. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বস্তুগত সহায়তা প্রদান।
৫. দরিদ্রদের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নক্ষম করে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, ব্র্যাকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কর্মসূচির সারবস্তু হল বাংলাদেশের দরিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, **দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

অথবা, **দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের উপযোগী সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : ১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ফজলে হোসেন আবেদের উদ্যোগে একটি ছোট ত্রাণ সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এ সংস্থা গ্রামের দরিদ্র মানুষ তথা ভূমিহীন, দুস্থ নারী, দিনমজুর ও জেলে প্রভৃতি শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নে ২০-৩০ জনকে নিয়ে দল গঠন করে সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে ব্র্যাক আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা :

১. গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা : গ্রাম সংগঠনের সদস্যগণ প্রতি মাসে একবার আলোচনা সভায় মিলিত হয় এবং এ সভায় ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকের উপস্থিতিতে সদস্যগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। এ আলোচনার মধ্যে শিক্ষা, মানবাধিকার, স্যানিটেশন, নারী নির্যাতন, অন্যান্য অত্যাচার প্রভৃতি সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এ সভার মূল লক্ষ্য। এছাড়া ব্র্যাক যৌতুক, অবৈধভাবে তালাক প্রদান, নারী নির্যাতন, বহুবিবাহের মত সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকার নেতৃবর্গকে নিয়ে ওয়ার্কশপ বা কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এ যাবৎ ৮০০টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম : ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ব্র্যাক এর ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যারা ব্র্যাকের সঞ্চয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত, তারা জামানত ছাড়াই নিজেদের ভোগ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ঋণ পেয়ে থাকে। উপার্জনমুখী কার্যক্রমের মধ্যে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন অন্যতম। কৃষি ব্যাংক ও ডানিডার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ৩,৩৩,০০০ মহিলা সদস্যকে হাঁস-মুরগি চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মৎস্য চাষের আওতায় ১,১৪,০২৪ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৩. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম : ১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৩৪,০০০ এর বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুলের মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এদের মধ্যে ৬৬ ভাগই মেয়ে শিশু যারা কখনও স্কুলের গণ্ডিতে প্রবেশ করে নি এরাই ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থী। এসব শিশুদের চাহিদা মোতাবেক কাছাকাছি অবস্থানে সুবিধামতো সময় নির্ধারণ করে পড়ানো হয়, যাতে শিশুদের স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। শিক্ষার উপকরণসমূহ ব্র্যাক সরবরাহ করে। বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ৫ টাকা করে ব্র্যাককে পরিশোধ করতে হয়। বছরে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্র্যাকের ব্যয় হয় ১,০০০ টাকা। এসব স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ৯৭ ভাগই মহিলা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা। এদের বেশিরভাগ শিক্ষকই নবম শ্রেণী পাশ। ১৫ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণ ছাড়াও এদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যার কার্যক্রম : ডায়রিয়া বাংলাদেশের জন্য এক মহামারি। ১৯৮০ সালে ব্র্যাক এ মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লবণ ও গুড় দিয়ে কিভাবে শরবত বানাতে হয় তা শিখিয়ে দিয়ে আসে, যার ফলে আজ ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল শিশু ও মায়েদের রোগ-শোক এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে আনা, সে সাথে শিশুর জন্মহার কমানো, শিশু, বয়স্ক ও মহিলাদের পুষ্টিমান উন্নত করার মাধ্যমে দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য কায়েম করা।

৫. ব্র্যাক শহর উন্নয়ন কার্যক্রম : বর্তমানে শহরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ৬১% নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এদের দুরবস্থা দূর করতেও ব্র্যাক ১৯৯৮ সাল থেকে শহর উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করেছে। এর আগে ১৯৯২ সালে ১০টি স্কুল চালুর মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে ব্র্যাকের চালু স্কুলের সংখ্যা ১৩০০টিরও বেশি। এছাড়া ব্র্যাক ১৯৯৭ সাল থেকে ঋণ কার্যক্রমও চালু করেছে। ব্র্যাক শহর উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, সেসব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য উপাদান হল :

ক. অর্থনৈতিক কার্যক্রম, খ. স্বাস্থ্যসেবা,
গ. শিক্ষা কার্যক্রম, ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন ও
ঙ. পরামর্শ ও কার্যকরী সেবাদান কার্যক্রম ইত্যাদি।

নিম্নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

ক. অর্থনৈতিক কার্যক্রম : অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান, সঞ্চয় কার্যক্রম। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ ১৩৭০টি সংগঠন, ৪১,০০০ সদস্য ও ২২ মিলিয়ন টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩২ মিলিয়ন টাকা।

খ. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম : স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে রয়েছে মাতৃ শিশু স্বাস্থ্যসেবা, স্যালাইন তৈরি, ইপি আই কার্যক্রম, এইচ, আইভি, এইডস সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রভৃতি।

গ. শিক্ষা কার্যক্রম : শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৪টি মেট্রোপলিটন সিটিতে প্রায় ১৫০০টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এ শিক্ষাক্রমের আওতায় রয়েছে গার্মেন্টস থেকে প্রত্যাগত ১৪ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের জন্য প্রায় ২৮০০টি স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম : পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্নমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ময়লা আবর্জনা ফেলা ও পরিষ্কার, শহরের দরিদ্রদের সচেতন করে তোলা। ব্র্যাক সদস্যরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন বাড়ি ও এলাকা থেকে

ময়লা আবর্জনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে রাখে। এছাড়া ছড়িয়ে থাকা পলিথিন সংগ্রহ করে ড্রেনেজ সিস্টেমকে সচল রাখতেও ব্র্যাক সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. সহায়ক কার্যক্রম : ব্র্যাকের সহায়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আড়ং, দুগ্ধ প্রকল্প, ব্র্যাক প্রিন্টার্স প্রভৃতি। আড়ং প্রতিষ্ঠা করে ঢাকায় ১৯৭৮ সালে। বর্তমানে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম এবং সিলেটেও এর শাখা খোলা হয়েছে। এসব দোকানে ৩০ হাজারেরও বেশি দরিদ্র মহিলা ও গ্রামীণ কারুশিল্পীদের তৈরি দ্রব্য বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশেও এসব দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। ব্র্যাক এভাবে দরিদ্র গোয়ালাদের দুধের ন্যায্য দাম প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য ব্র্যাক দুগ্ধ প্রকল্প গড়ে তুলেছে।

উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, ব্র্যাক দরিদ্রতা দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার কার্যক্রমও যথাযথভাবে পালন করেছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ, মানবাধিকার ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রশ্ন॥১০॥ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মপরিসর সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করে সমাজকল্যাণ এর ক্ষেত্রে সরকারকে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দান এবং সমাজকল্যাণ নীতিনির্ধারণে সহায়তা দান করেন। ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য। সমাজকল্যাণ সরকারের সাথে জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টাকে জোরদার ও কার্যকরি করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণকে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করাই হল এ পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য।

সমাজকল্যাণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ যেসব দায়িত্ব পালন করে সেগুলো নিম্নে দেওয়া হল :

১. সরকারকে পরামর্শ প্রদান : সমাজকল্যাণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ, সাহায্য সহায়তা করে থাকে।

২. সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ : সমাজস্থ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জরিপ করা এবং তথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

৩. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান : জেলা এবং থানা পর্যায়ের সমাজকল্যাণ পরিষদসমূহের প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহ দান এবং সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কাজের উন্নয়নে উৎসাহ ও পরামর্শ দান করা।

৪. গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ : গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে নানারকম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, বিস্তার ও পরিবর্তনে সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান, সহায়তা করা।

৫. সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উৎসাহ প্রদান : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা।

৬. অনুদান কর্মসূচি প্রণয়ন : স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়ক অনুদান কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করা।

উপসংহার : পরিশেষে একথা বলতে পারি যে, সরকার উপরিউক্ত দায়িত্বগুলো জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হতে পালন করে আসছে। সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণ বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দান এবং আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন॥১১॥ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতিসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতিসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্ব মানবতার সেবায় যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে তন্মধ্যে রেডক্রস অন্যতম। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী স্যার হ্যানরি ডুনান্ট (Henri Dunant) নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির সদিচ্ছা ও চেষ্টায় বিশ্ব মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালে রেডক্রসের জন্ম হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থার নাম। অসহায়, দুস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নে রেডক্রস কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে এর নাম "রিডেক্রিসেন্ট সোসাইটি"।

বাংলাদেশ পটভূমি : পাকিস্তান আমলে 'পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি' গঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশ বলে 'বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি' গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তেহরান সম্মেলনে 'বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি' পূর্ণ স্বীকৃতি পায়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার পর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে রেডক্রস সোসাইটি এই নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি' নামকরণ করা হয়।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতিসমূহ : বিশ্বের সবচেয়ে সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হচ্ছে রেডক্রস। কিন্তু নীতিমালাকে সামনে রেখে রেডক্রস সোসাইটি সারা বিশ্বব্যাপী তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই মূলনীতিগুলো সমভাবে প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নাম নিয়ে এ সংস্থা একই মূলনীতি, আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নিচে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতিসমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

১. মানবতা : মানবতাবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। 'বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি' মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য যেসকল কাজ করে থাকে তা হলো আর্ত-মানবতার সেবা, মানুষে মানুষে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপন, বন্ধুত্ব ও সকল মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা। মূলত মানবিক মূল্যবোধের উপরই এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। এটি এর অন্যতম মূলনীতি।

২. পক্ষপাতহীন : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান চোখে দেখে। এটি পক্ষপাতে বিশ্বাস করে না। বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা করা এর মূল লক্ষ্য। এর অন্যতম নীতি হলো পৃথিবীর সব মানুষকে পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে সাহায্য করা।

৩. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অন্যতম মূলনীতি। এ নীতির কারণেই এটি কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করে না। আবার, কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানও এ সংস্থার কাজে বাধা সৃষ্টি করে না।

৪. স্বেচ্ছামূলক : অলাভজনক স্বেচ্ছাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা করা বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির অন্যতম মূলনীতি। এর মাধ্যমেই এটি তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রেডক্রিসেন্ট মানুষের সেবায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

৫. একতা : এক ও অভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সারা দেশে রেডক্রিসেন্টের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। দেশের সকল মানুষের জন্য এ কর্মসূচির দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সুতরাং একতা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির অন্যতম মূলনীতি।

৬. সর্বজনীনতা : সর্বজনীনতা বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির অন্যতম মূলনীতি। সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সহযোগিতা সহমর্মিতার বিকাশ করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকল্যাণে কাজ করা এই সংস্থার অন্যতম নীতিমালা। মানবকল্যাণে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অতুলনীয়।

৭. শান্তি : বিশ্ব শান্তির পাশাপাশি সকলেরই নিজের দেশের শান্তি কাম্য। কারণ অশান্তি মানবজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। দেশীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই 'যুদ্ধ নয় শান্তি', 'বিশৃঙ্খলা নয় সুশৃঙ্খল জীবনযাপন' এই নীতিই হলো বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতি। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকে এদেশের আর্ত-মানবতা তথা অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করে যাচ্ছে। আর্ত-মানবতার সেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, সমানাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনভাবে কাজ করা, এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করা, শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরিউক্ত মূল নীতিকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে এ সমিতি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন।১২। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির বিভিন্ন দিক উল্লেখ কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থার নাম রেডক্রস। অসহায়, দুঃস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এ সংস্থা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী স্যার হ্যানরি ডুনান্ট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির সদিচ্ছা ও চেষ্টায় বিশ্বমানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালে রেডক্রসের জন্মলাভ হয়। মুসলিম বিশ্বে এর নাম রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির বিভিন্ন দিক : বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হলো :

রেডক্রসের পটভূমি : ১৮৫৯ সালে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহু সৈন্য আহত ও নিহত হয়। সুইজারল্যান্ডের এক যুবক হেনরি ডুনান্ট যুদ্ধাহতদের করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ব্যথিত হন এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬২ সালে এই যুদ্ধের ভয়াবহতার স্মৃতি নিয়ে তিনি "A Memory of Solferino" বইটি লেখেন। এতে তিনি বিশ্ববাসীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, "আমরা কি পারি না প্রতিটি দেশে একটি সেবা সংস্থা গঠন করতে, যা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে আহতদের সেবা করবে?" তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৮৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক রেডক্রস। নিচে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো :

বাংলাদেশ পটভূমি : পাকিস্তান আমলে 'পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশ বলে স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় "বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি"। ১৯৭৩ সালে তেহরান সম্মেলনে বাংলাদেশে এটি পূর্ণ স্বীকৃতি পায়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার পর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে রেডক্রস নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'। এই নামেই এই সংস্থা বাংলাদেশে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতি : কিছু মূলনীতিতে আদর্শ ধরে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি আর্ত-মানবতার সেবায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। মূলনীতিগুলো হলো :

১. মানবতা : মানুষের মধ্যে মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য আর্ত-মানবতার সেবা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপন, বন্ধুত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি মানবতা প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করে।

২. পক্ষপাতহীনতা : পৃথিবীর সকল মানুষকে পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে সাহায্য করা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির অন্যতম মূলনীতি।

৩. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির অপর একটি মূলনীতি। এ সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করায় বিশ্বাস করে।

৪. স্বেচ্ছামূলক : এটি একটি অলাভজনক স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারা দেশে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাও এর মূলনীতি।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্যসমূহ : নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহকে কেন্দ্র করে এই সংস্থা তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যগুলো হলো :

ক. বাংলাদেশকে পুনরায় নির্মাণ করা বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির প্রধান লক্ষ্য।

খ. এদেশের দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন করা।

গ. অবাঙালি ও মায়ানমার থেকে আগত শরণার্থীদের সহায়তা করা।

ঘ. মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, মৎস্যচাষ প্রভৃতি কাজে সহায়তা করা।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম : নিচে এ সংস্থার কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

১. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি : বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী বন্টন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এ সংস্থার অন্যতম কাজ।

২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম : স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এ সংস্থার কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মাতৃকল্যাণ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট প্রতিষ্ঠা, পরিবার পরিকল্পনা, বিনামূল্যে ঔষধ, খাদ্য ও পথ্য সরবরাহ ইত্যাদি।

৩. এতিমদের পুনর্বাসন : এতিমদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ঢাকায় একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া পঙ্গু, বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনে এ সংস্থা ভূমিকা পালন করে আসছে।

৪. অনুসন্ধান কার্যক্রম : বিদেশে অবস্থানরত, নিখোঁজ বা বন্দি ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং বাংলাদেশে নিখোঁজ কোনো ব্যক্তিকে তার দেশে ফিরিয়ে দিতে এ সংস্থা কাজ করে।

৫. শিক্ষা : দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উপকূল অঞ্চলে আশ্রয়কেন্দ্র ও দ্বীপসমূহে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার : আরো বহুবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তার সেবা সহযোগিতা দেশে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এদেশের জনগণের কল্যাণে ও উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজে এ সংস্থার ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার।

প্রশ্ন।১৩। আশার বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, আশার বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, আশার বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর মধ্যে আশা অন্যতম। এটি দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে বিবেচিত। ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আশা। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন আনয়নের লক্ষ্যে আশার বাংলাদেশে গৃহীত কর্মসূচি খুবই প্রশংসনীয়।

আশার বিভিন্ন দিক : আশার বিভিন্ন দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো :

আশার পরিচয় : ১৯৭৮ সালে আশা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এর নাম ছিল, 'Association for Social Advancement–ASA'. কিন্তু ২০০১ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ASA (আশা)। আশা আর্থিক ক্ষমতায়নকে দারিদ্র্য বিমোচনের পূর্বশর্ত হিসেবে কৌশল গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালে আশা দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। গ্রুপভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকে আশা উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করে।

১৯৯৯ সালে আশা জাতিসংঘের Special Consultative Status লাভ করে। জাতিসংঘের অফিসে আশার অফিসিয়াল প্রতিনিধি মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা আশাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় আসীন করেছে। আশা একটি বিদেশি অনুদানমুক্ত স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ২৩০০টি শাখা রয়েছে। এর লক্ষ্যভুক্ত সদস্য সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

আশার উন্নয়ন মডেলের বৈশিষ্ট্য : বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. টার্গেট গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে সেবা প্রদান।

২. ১২০০ টাকার বেশি আয় নয় এমন জনগণই আশার সেবাগ্রহীতা হিসেবে গণ্য হবে।

৩. অল্প মূলধন দিয়ে ফান্ড গঠন ও ঋণপ্রদান করা।

৪. মহিলা অগ্রাধিকার পাবে।

৫. প্রায় ১০০% ভাগ ঋণ আদায় করা।

আশার লক্ষ্যসমূহ : আশার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। এছাড়াও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, সঞ্চয়, ঋণপ্রদান প্রভৃতি আশার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ হলো :

ক. সকল সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

খ. মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পদ সুযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান।

গ. বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা।

ঘ. দরিদ্র, ভূমিহীনদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদের ভেতর নেতৃত্বের বিকাশ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঙ. স্থানীয় মহাজনদের উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা।

আশার কার্যক্রম : আশা এদেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নিচে আশার বর্তমান কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

১. দলভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠন : আশা গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ে দল গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চায়। এজন্য কতিপয় কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

২. সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলা : আশার ঋণগ্রহণের পূর্বশর্তই হলো উন্নয়নমুখী শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনাবোধ জাগ্রত করা। এ লক্ষ্যে আশা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে শৃঙ্খলা সংহতি, স্বাস্থ্য যত্ন, নারীর মর্যাদা, শিশু লালন-পালন প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

৩. সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন : আশা থেকে ঋণপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো সঞ্চয়। দলভুক্ত সদস্যরা সপ্তাহে নির্দিষ্ট হারে সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের মূলধন গঠন করে থাকে। এ প্রক্রিয়া সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে।

৪. ঋণদান কার্যক্রম : আশার বৃহৎ কর্মসূচি হচ্ছে ঋণদান কার্যক্রম। এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। ঋণ গ্রহণ করতে কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।

৫. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : আশার রয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। আশা তার কর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এছাড়া গবেষক, বেকার প্রমুখকে আশা মডেলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আশার কার্যক্রম ব্যাপক। আশার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং তার বিশাল কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আশার পরিচয় ফুটে ওঠে। নারীদের ক্ষমতায়নে আশার প্রয়াস প্রশংসার দাবিদার। শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বব্যাপী আশা তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে সফলভাবে।

প্রশ্ন।১৪। প্রশিকার বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, প্রশিকার বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

অথবা, প্রশিকার বিভিন্ন দিক উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রশিকা। প্রশিকার এদেশের দরিদ্রদের উন্নয়নে প্রশিকার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিকার লক্ষ্যে রয়েছে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা হয় দিনমজুর, না হয় ক্ষুদ্র বা ভূমিহীন। এছাড়াও রয়েছে গ্রামের জেলে, তাঁতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি। তবে দরিদ্র মহিলাদের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রশিকার বিভিন্ন দিক : প্রশিকার বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রশিকার প্রতিষ্ঠা : এদেশের দরিদ্রদের উন্নয়নে ১৯৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিকার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট XXI ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত। বর্তমানে এ সংস্থাটির আওতায় রয়েছে দেশের প্রায় সব জেলা এবং ২৪ হাজারের বেশি গ্রাম। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪ মিলিয়ন। প্রশিকার অর্থের উৎস হচ্ছে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, কানাডিয়ান উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি।

প্রশিকার অর্থ : প্রশিকা মানে হলো প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কার্যক্রম। অর্থাৎ প্রশিকা প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।

প্রশিকার দর্শন : প্রশিকার দর্শন হলো এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেখানে অর্থনৈতিকভাবে সকল মানুষ সমান এবং উৎপাদনমুখী, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল এবং এমন এক উন্নত পরিবেশ যেখানে সত্যিকারভাবে সবাই গণতান্ত্রিক।

প্রশিকার মিশন : প্রশিকার মিশন হচ্ছে দরিদ্রের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ব্যাপক ও নিবিড় অংশগ্রহণমূলক টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা।

প্রশিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রশিকার অন্যতম লক্ষ্য। এর অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো :

১. নারীর মর্যাদার উন্নয়ন।

২. দারিদ্র্য বিমোচন।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন।

৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ।

৫. লক্ষ্যদলকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠন করা।

প্রশিকার কার্যক্রম : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে প্রশিকা বহুদিন যাবৎ এদেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। নিচে প্রশিকার বহুমুখী কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

১. জনগণের সংগঠন গড়ে তোলা : প্রশিকার মূল কাজ হলো জনগণের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা। কেননা, প্রশিকা সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করতে চায়। প্রথমে দরিদ্রদের প্রাথমিক দলে সংগঠিত করা হয় এবং পরবর্তীতে সেই দল নিয়ে দল ফেডারেশন গঠন করা হয়।

২. মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : প্রশিকার লক্ষ্যভুক্ত দলের সমদ্যসের দারিদ্র্যের কারণ, উৎপত্তি, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন করা, দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো, নেতৃত্বের বিকাশ ও তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। এজন্য দল ও গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

৩. ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : প্রশিকার লক্ষ্যভুক্ত দলের যেসব সদস্য ভিন্নতর কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি : মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিকা শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। প্রশিকা ৪ ভাবে সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমেই নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়তে প্রশিকা অঙ্গীকারবদ্ধ।

৫. অন্যান্য : এগুলো ছাড়াও প্রশিকার অন্যান্য কার্যক্রমগুলো হলো : দরিদ্র উন্নয়ন কর্মসূচি, কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম, পরিবেশগত কৃষি কর্মসূচি, পশুপালন উন্নয়ন কর্মসূচি, মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি, রেশম চাষ উন্নয়ন কর্মসূচি, পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি প্রভৃতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত নানাবিধ কার্যাবলির মাধ্যমে প্রশিকা এদেশের মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রশিকার কার্যাবলির মধ্য দিয়ে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এর মূল টার্গেট হচ্ছে এদেশের অসহায় মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা।

প্রশ্ন। **ঢাকা আহছানিয়া মিশনের বিভিন্ন দিক লিখ।**

অথবা, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

অথবা, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ কর।

উত্তর৷ ভূমিকা : বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'ঢাকা আহছানিয়া মিশন'। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সামাজিক ও মানবিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত করার চেষ্টা করা হয় এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত সংস্থা হচ্ছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের বিভিন্ন দিক : নিম্নে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

ঢাকা আহছানিয়া মিশন : উপমহাদেশের প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজকল্যাণ কর্মী হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা ১৯৫৮ সালে 'ঢাকা আহছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থার মূলমন্ত্র হলো "স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা"। হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা ১৯৩৫ সালে নিজ জন্মস্থান সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নাদতা গ্রামে মানবসমাজের সেবার মহান লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন আহছানিয়া মিশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ মিশন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আরমানিটোলায় খান বাহাদুর আহছানউল্লা-এর নেতৃত্বে 'ঢাকা আহছানিয়া' মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়। প্রাথমিক পুরস্কার ('৯১), সাক্ষরতা উন্নয়ন পুরস্কার ('৯৫), জাতীয় সাক্ষরতা পুরস্কার ('৯৮), স্বাধীনতা পুরস্কার ('০২), আন্তর্জাতিক পরিবেশ পুরস্কার ('০৪), ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ('০৩) প্রভৃতি।

আহছানিয়া মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করা এবং মানব সম্প্রদায়ের বৃহত্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

২. বিশ্বের মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্মূলের জন্য, ঐক্য, শান্তি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

৪. স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন সাধন করা।

৫. মাদকের অপব্যবহার রোধ করা।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কার্যক্রম : বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা : গত এক যুগ যাবৎ ঢাকা আহছানিয়া মিশন বিভিন্ন বয়সের ৩.২ মিলিয়ন মানুষকে নিরক্ষরমুক্ত করছে। সাক্ষর করার পর অনেককে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা উপকৃত হয়েছে।

২. শিশু শিক্ষা : ঢাকা আহছানিয়া মিশন শিশুদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। (০-৪) বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, মানবিক এবং আবেগিক উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে গ্রেড-১ এ ভর্তি করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রি-প্রাইমারি শিক্ষা দেওয়া হয়। (৬-১০) বছর বয়সি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে ঢাকা আহছানিয়া মিশন।

৩. নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার : নারী অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য মিশন কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে নারী নির্যাতন, লিঙ্গ বৈষম্য, অসম অর্থনীতি প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা চলছে। নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মিশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

৪. ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন : নিরাপদ পানি ব্যবহার এবং স্যানিটেশন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য রয়েছে মিশনের কর্মসূচি। এজন্য আহছানিয়া মিশন আর্সেনিক ও নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে।

৫. নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ : মিশন নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এজন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। তাছাড়া ভিকটিমকে উদ্ধার করে মিশনের শেল্টার হোমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

৬. পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ : এডভোকেসী এ্যাওয়ারনেস কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলা হয়। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। যেমন– বৃক্ষরোপণ, নার্সারি তৈরি, র‍্যালি, সভাসমিতি, সচেনতা প্রভৃতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কর্মক্ষেত্র বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আহছানিয়া মিশনের গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে দেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছে। অন্যদিকে, দেশের কল্যাণও ত্বরান্বিত হচ্ছে। ঢাকা আহছানিয়া মিশন মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রশ্ন ১৬॥ বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা এবং সমন্বয় সাধনকারী প্রতিষ্ঠান। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার লক্ষ্যে যেসব বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে সেসব সংস্থার সম্মিলিত ফোরাম এটি। এদেশে শিশু কল্যাণের জন্য অনেক সংস্থাই কাজ করছে। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের বিভিন্ন দিক : নিম্নে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম : ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধীকৃত। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম প্রতিষ্ঠিত। এদেশের ছিন্নমূল, শ্রমজীবী, ভাসমান, নির্যাতিত, অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত শিশুদের কল্যাণে শিশু অধিকার ফোরাম কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের অর্থের উৎস হচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা।

শিশু অধিকার ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মূল লক্ষ্য হলো জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন করা। এছাড়া অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো :

১. অবহেলিত, নির্যাতিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানো।

২. শিশুদের অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩. নির্যাতন বন্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।

৪. সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের মৌল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

৫. শিশু কল্যাণ প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারকে সহায়তা করা।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের কার্যক্রম : আমাদের দেশের শিশুদের কল্যাণ তথা অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে এর কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো :

১. শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা : এদেশের শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিশু অধিকার ফোরাম কাজ করে থাকে। বিশেষ করে ছিন্নমূল শিশুদের অধিকার রক্ষায় ফোরাম বদ্ধপরিকর। শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও নির্যাতন থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় এ সংস্থা।

২. সচেতনতা সৃষ্টি : শিশুদের অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ফোরামের অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে তারা প্রচারণা চালিয়ে থাকে। তাই জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তারা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৩. শিশুদের কল্যাণ ও প্রশিক্ষণ : এ সংস্থা সমাজের প্রতিবন্ধী ও এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করে থাকে। কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে ফোরাম।

৪. সমন্বয় সাধন : শিশু অধিকার ফোরামের মূল কাজ হলো সমন্বয় সাধন করা। শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সরকারের শিশু বিষয়ক কাজের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করে এই সংস্থা। এটি সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৫. আইনি সাহায্য প্রদান : ফোরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিশুদের আইনী সাহায্য দেওয়া। শিশু আইন বাস্তবায়নে ফোরামের ভূমিকা অতুলনীয়। এছাড়া আইন সংশোধন, পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানও শিশু অধিকার ফোরামের অন্যতম কাজ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম শিশুদের সমস্যা সমাধানে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে এর পুরোপুরি সফলতা নির্ভর করে ফোরামের সদস্যভুক্ত সংস্থাসমূহের কর্মতৎপরতার উপর। এজন্য শিশু অধিকার ফোরাম সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৭॥ বাংলাদেশের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, বাংলাদেশের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিভিন্ন দিক উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী মানব কল্যাণ সংগঠনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে পুরাতন ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের কল্যাণে শুরু থেকে অদ্যাবধি কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ প্রবীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানটি সকল শ্রেণির প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পুনর্বাসনমূলক সেবাদানের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য প্রজন্মকে বার্ধক্য বিষয়ে অবহিত, সংবেদন ও তৎপর করায় সচেষ্ট আছে।

বাংলাদেশের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিভিন্ন দিক : নিম্নে বাংলাদেশের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ : দেশের সর্বস্তরের প্রবীণদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করেন, 'Pakistan Association for the Aged'. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নামকরণ করা হয় 'Bangladesh

Association for the Aged and Institute of Geriatric Medicine.' বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁওতে এক ছয়তলা বিশিষ্ট নিবাস ও একটি চারতলা বিশিষ্ট ৫০ শয্যার প্রবীণ হাসপাতালরূপে সাবিবক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধনযুক্ত একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সোসাইটিজ এ্যাক্ট XXI ১৮৬০ এর অধীনে এবং এনজিও ব্যুরোতে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধনভুক্ত।

সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : প্রবীণরা যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্তিতে জীবনযাপনের মাধ্যমে দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে সে লক্ষ্যে নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে এ প্রতিষ্ঠান। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও যথাযথ সেবা প্রদান করা।

২. সক্ষম প্রবীণদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা।

৩. প্রবীণদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪. প্রবীণদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশের প্রবীণদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মকে বার্ধক্য সচেতন ও তৎপর করা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যসমূহকে কেন্দ্র করে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রম : প্রবীণদের কল্যাণে এই সংঘে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

১. প্রবীণ হাসপাতাল : প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে প্রবীণ হাসপাতাল। প্রবীণ হাসপাতালের বিভাগগুলো হলো : কার্ডিওলোজি, আল্ট্রাসনোগ্রাম, দন্ত, নাক-কান-গলা, চক্ষু, এক্স-রে, মেডিসিন, প্যাথোলজি ইত্যাদি চিকিৎসা ব্যবস্থা।

২. স্যাটেলাইট ক্লিনিক : প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করেছেন। সপ্তাহে একবার হাসপাতাল-এর অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী দেখেন। দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাও দেওয়া হয় এখানে।

৩. চিত্তবিনোদন : প্রবীণদের জন্য অবসর বিনোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনোদনের জন্য রয়েছে বনভোজন, পুনর্মিলনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। টেলিভিশন প্রভৃতি মিডিয়ার মাধ্যমেও প্রবীণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শাখাগুলোতেও অনুরূপ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

৪. পাঠাগার : প্রবীণদের চাহিদা মেটানোর জন্য পাঠাগার রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থ, উপন্যাস, জীবনী, সাময়িকী, গল্প, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি বই পাঠাগারটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ২০০ টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরি কার্ড সংগ্রহ করা যায়।

৫. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : প্রবীণদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলকে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রবীণদের সেবক প্রশিক্ষক তৈরি করা হয়। এতে বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা পরামর্শ জড়িত থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, প্রবীণদের জন্য প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি অনন্য সংস্থা। প্রবীণদের জন্য বাংলাদেশে যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্যে এ সংস্থা অন্যতম। প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই সংঘ প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সার্বিক সেবাদানের পাশাপাশি জনগণকে প্রবীণদের ব্যাপারে আরো সহমর্মী করার জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন।১৮। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা। এটি এদেশের সামাজিক সমস্যা নিরসনে বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলায় তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলা জেলায় সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং উপজেলায় উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে।

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ : নিচে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠা, গঠন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কার্যাবলির মাধ্যমে এর পরিচয় উপস্থাপন করা হলো :

প্রতিষ্ঠা : জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশক্রমে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণকে অনুপ্রাণিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় 'পাকিস্তান জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ'।

তারই ধারাবাহিকতায় পৃথক বিধানের মাধ্যমে প্রাদেশিক পর্যায়ে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ'। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয়।

১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে পরিষদের রেজুলেশনের পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। পূর্বের রেজুলেশন বাতিল করে ২০০ সালে আরেকটি রেজুলেশন করা হয়।

পরিষদের গঠন : বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ৮২ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। ৮২ জনের মধ্যে ৪ জন অফিস বেয়ারার, ১১ জন পদস্থ কর্মকর্তা পদাধিকার বলে এবং অবশিষ্ট ৬৭ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি। পরিষদের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। যার সভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব।

পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো পরিষদের কর্মপরিধি নির্দেশ করে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. সমাজকল্যাণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।

২. সামাজিক সমস্যা জরিপ করা এবং তথ্যাদি সরকারের নিকট পেশ করা।

৩. জেলা ও থানা পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান।

৪. অনুদানের জন্য জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা।

৫. সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও কর্মকাণ্ডের গবেষণা ও প্রণয়ন করা।

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলি : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। নিচে এই পরিষদের তৎপরতা বা কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

১. তথ্যসংগ্রহ : সমস্যার উপর তথ্যসংগ্রহ করা পরিষদের অন্যতম কাজ। কেননা, সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃত সমস্যা জানা অপরিহার্য। পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করে থাকে।

২. উৎসাহ প্রদান : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এদেশে নতুন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান সংস্থাগুলো কার্যক্রম তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

৩. পরামর্শ প্রদান : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অন্যতম কাজ হলো সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা। আর সহায়তা করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়ে থাকে।

৪. কর্মসূচি জোরদার করা : সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে পরিষদ সারাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৫. সমন্বয় সাধন : সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের সাথে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এই পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ পরিষদ দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে থাকে। আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রতিবছর চাঁদা দিয়ে থাকে। পরিষদ তার কাজের সুবিধার্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

প্রশ্ন।১৯। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়সমূহ লিখ।

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়সমূহ তুলে ধর।

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে তোমার সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। ভূমিকা : বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংগঠন বলতে অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বুঝানো হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি জনগণের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে এদের কার্যক্রমে গতি আনয়ন করা যায়।

সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়সমূহ : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারলে কার্যক্রমে আরো গতি আসবে এবং এনজিওগুলোর ভূমিকাও অর্থবহ হবে। নিম্নে সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো :

১. আইনগত পদক্ষেপ : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করেছেন। এসব অধ্যাদেশের দুর্বলতা দূর করে বাস্তবে এসব আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এনজিওসমূহের জটিলতা ও অনিয়ম দূর করা সম্ভব।

২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ : এনজিওতে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মীগণ দক্ষ হলে সংস্থার কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

৩. সমন্বয় সাধন : এনজিওগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ, আলাপ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা যায়।

৪. আর্থিক সহায়তা : সংস্থার আর্থিক দৈন্য দূরীকরণের জন্য চাঁদা, অনুদান, সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করে এর সীমাবদ্ধতা দূর করা যায়।

৫. অনুভূত চাহিদাকে প্রাধান্য দান : স্থানীয় চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এর ফলে সংস্থা স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং কর্মসূচিও বাস্তবমুখী হবে।

৬. প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন : এনজিওগুলোতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। এসব জটিলতা দূরীকরণের মাধ্যমে এসব সংস্থার সীমাবদ্ধতা নিরসন করা যায়।

৭. দুর্নীতি রোধ করা : দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে সমস্যায় ফেলে দিতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধ করে এসব সংস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করা যায়।

৮. দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ : এনজিওগুলোতে যত বেশি দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের কর্মকুশলতাও তত বৃদ্ধি পাবে।

৯. বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনা : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।

১০. গবেষণা ও মূল্যায়ন : সংস্থাকে স্বীয় লক্ষ্যার্জনে নিয়মিত গবেষণা ও মূল্যায়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এর ফলে সংস্থার দুর্বল দিক চিহ্নিত হয় এবং তা দূরীকরণের মাধ্যমে সংস্থা ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কতিপয় সীমাবদ্ধতা থাকলেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায় চিহ্নিতকরণ এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মকাণ্ডের সফলতা আনয়ন করা যায়।

প্রশ্ন॥২০॥ বহির্বিশ্বে ব্র্যাক এর ভূমিকা লিখ।

অথবা, বহির্বিশ্বে ব্র্যাক এর ভূমিকা তুলে ধর।

অথবা, বহির্বিশ্বে ব্র্যাক এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : ১৯৭২ সালে বিপর্যস্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ফজলে হাসান আবেদের উদ্যোগে একটি ছোট ত্রাণ সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এ সংস্থা গ্রামের দরিদ্র মানুষ তথা ভূমিহীন, দুঃস্থ নারী, দিনমজুর ও জেলে প্রভৃতি শ্রেণির ভাগ্যোন্নয়নে ২০-৩০ জনকে নিয়ে দল গঠন করে সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে ব্র্যাক আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশাল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বহির্বিশ্বে ব্র্যাকের ভূমিকা : ছোট পরিসর থেকে বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্বব্যাপী তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাক বহির্বিশ্বে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

নিম্নে বহির্বিশ্বে ব্র্যাক এর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. যুক্তরাজ্য : দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন এনে দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্যেই ব্র্যাক কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের বিবর্তনে দারিদ্র্যের বহুবিধ বাস্তবতাকে চিহ্নিত করে তাকে মোকাবিলা করার লড়াইয়ে ব্র্যাক অগ্রণী ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. হাইতি : ব্র্যাক ২০০৫ সাল থেকে হাইতিতে অধিকাংশ অরক্ষিত এবং অনগ্রসর মানুষের জীবন উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্র্যাক, হাইতির মাইক্রোফিনান্স প্রতিষ্ঠান, Fonkoge কে তার দরিদ্র কর্মসূচি পুনর্গঠন করতে প্রযুক্তিগত সহায়তা করে আসছে।

৩. উগান্ডা : উগান্ডায় ২০০৬ সালে ব্র্যাক এর কর্মসূচি সূচনালগ্ন থেকে ব্র্যাক দেশের বৃহত্তম উন্নয়ন সংস্থা এবং একটি প্রধান ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ৩৯টি জেলার ৮৯টি শাখায় ১,৫০,০০০ জনেরও বেশি সদস্যদের নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পালন করছে।

৪. তানজানিয়া : ২০০৬ সাল থেকে ব্র্যাক তানজানিয়া পূর্ব আফ্রিকায় ৪১ মিলিয়ন জনগণকে ঋণসেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে ৪৪টি বিভাগের ১০৪টি শাখায় ১,১১,৫০০ জনেরও বেশি ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের কর্মসূচি পালন করছে ব্র্যাক।

৫. সাউথ সুদান : ২০০৭ সাল থেকে দক্ষিণ সুদানে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থারূপে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দক্ষিণ সুদানে ৭টি রাষ্ট্রের ৩৮ টি শাখায় ২২,০০০ জনেরও বেশি সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালন করছে।

৬. আফগানিস্তান : ২০০২ সাল থেকে ব্র্যাক আফগানিস্তানে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আফগানিস্তান দেশের ৩৪টি প্রদেশের প্রায় ৪০০ অফিস এ একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাপক উন্নয়নের মডেল বাস্তবায়ন করছে।

৭. পাকিস্তান : ব্র্যাক ২০০৭ সালে পাকিস্তানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ব্র্যাক পাকিস্তানে এ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা কর্মসূচি চালাচ্ছে।

৮. শ্রীলঙ্কা : এশীয় সুনামির পরপর দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মোকাবিলার জন্য ব্র্যাক ২০০৫ সালে শ্রীলঙ্কায় কার্যক্রম শুরু করে। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি আফ্রিকা, সিয়েরালিওন, ফিলিপাইন এবং উপর্যুক্ত দেশসমূহে ব্র্যাক তার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যা কিনা বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

প্রশ্ন॥২১॥ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কর্মতৎপরতা সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কর্মতৎপরতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কর্মতৎপরতা তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : এদেশের প্রবীণদের অধিকাংশই হচ্ছে গ্রামীণ, দরিদ্র, আয় উপার্জনহীন ও দুর্বল স্বাস্থ্যের। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জন্য নেই তেমন সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষও তাদের ব্যাপারে অসতর্ক ও অপ্রস্তুত। এমতাবস্থায় প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বৃদ্ধদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

কর্মতৎপরতাসমূহ : প্রবীণরা যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্তিতে জীবনযাপনের মাধ্যমে দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে সে লক্ষ্যে নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে এ প্রতিষ্ঠান। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বৃদ্ধদের কল্যাণে নিম্নোক্ত কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে থাকে।

১. প্রবীণ হাসপাতাল : প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে প্রবীণ হাসপাতাল। প্রবীণ হাসপাতালগুলোর বিভাগগুলো হলো : কার্ডিওলজি, আল্ট্রাসনোগ্রাম, দন্ত, নাক-কান-গলা, চক্ষু, এক্সরে, মেডিসিন, প্যাথলজি, ফিজিওথেরাপি, মনোরোগ, হৃদরোগ, গাইনি ইত্যাদি। হাসপাতালে রয়েছে বহিঃর্বিভাগ ও আন্তবিভাগ চিকিৎসা ব্যবস্থা।

২. স্যাটেলাইট ক্লিনিক : ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকায় কয়েকটি স্থানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু আছে। সপ্তাহে একবার অভিজ্ঞ চিকিৎসক এখানে রোগী দেখেন। এখানে গরিব রোগীদের মধ্যে ব্যবস্থাপত্রসহ বিনামূল্যেঔষধ বিতরণ করা হয়।

৩. চিত্তবিনোদন : প্রবীণদের জন্য বিনোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে রয়েছে বনভোজন, পুনর্মিলনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বর্ষীয় অনুষ্ঠান, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমেও প্রবীণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। শাখাগুলোতে অনুরূপ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

৪. পাঠাগার : প্রবীণদের চাহিদা মিটানোর জন্য রয়েছে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। পাঠাগারে ধর্মীয় বই, জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের বই, গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি বই রয়েছে। ২০০.০০ টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরি কার্ড সংগ্রহ করে যে কোনো প্রবীণ এর সদস্য হতে পারে।

৫. প্রকাশনা : প্রবীণ সংঘের জার্নাল 'প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু দিন পূর্বে ৪১ তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকায় প্রবীণদের কর্মসূচি, তাদের অবস্থা, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৬. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রবীণদের জন্য আয়োজন করা হয় ভিন্নধর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে প্রবীণদের থেকে প্রশিক্ষক তৈরি করা হয়। বিশেষজ্ঞ ও রিসোর্স পার্সনরা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জড়িত।

৭. প্রবীণ নিবাস : সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণদের বসবাসের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রয়েছে ১টি প্রবীণ নিবাস। বর্তমানে এখানে ২৬ জন (১৫ জন পুরুষ + ১১ জন মহিলা) নিবাসে বসবাস করেন। এখানে প্রবীণদের জন্য সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা, নামাযের ঘর, লাইব্রেরি, টিভি, ইনডোর গেমস ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

৮. আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প : প্রবীণদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ২৬টি জেলা শাখার মাধ্যমে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যেমন : হাঁস-মুরগির খামার, গরু মোটা তাজাকরণ, গো খামার, ছাগল পালন, শাকসবজি চাষ ইত্যাদি প্রকল্প। এগুলোর মাধ্যমে প্রবীণরা আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে পাচ্ছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আজঅবধি কাজ করে যাচ্ছে। এ সংঘের মাধ্যমে প্রবীণদের জীবন আনন্দে, সচ্ছলতায় ভরে উঠছে। এর মাধ্যমেই দরিদ্র, অসহায় প্রবীণরা বাঁচার আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কর্মতৎপরতার জন্যই আজ এটি প্রবীণদের নিকট একটি "আশার" নাম।

প্রশ্ন॥২২॥ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহ লিখ।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহ তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে কার্যকর ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থ এটি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকে। পরিষদের অনুদানকৃত অর্থ গ্রহণ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করছে।

সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহ : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দেশের উন্নয়ন তথা কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথাপি এর কিছু সমস্যাও রয়েছে। নিম্নে এর সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। কেননা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাহী কমিটিতে রয়েছে বিভিন্ন আমলারা। তাদের কার্যক্রম ও মতবিভেদই জটিলতা সৃষ্টি করে।

২. আর্থিক দৈন্য : পরিষদের অন্যতম সমস্যা হলো আর্থিক দৈন্য। সঠিক সময়ে প্রায়ই যথাযথ অনুদান পাওয়া যায় না। ফলে পরিষদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৩. জনঅংশায়নের সুযোগ কম : পরিষদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়। অথচ পরিষদের কার্যক্রমে জনঅংশায়নের সুযোগ অত্যন্ত কম। এটি পরিষদের একটি নেতিবাচক দিক।

৪. কর্মসূচির অপ্রতুলতা : সময় উপযোগী কর্মসূচির অপ্রতুলতা রয়েছে পরিষদে। ফলে এটি পরিষদের জন্য একটি বাধা। এছাড়া বাস্তবায়নেও রয়েছে প্রতিবন্ধকতা।

৫. পরিষদের নিজস্ব আইন নেই : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিচালিত হচ্ছে শুধু একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে। ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। দেশের অন্য কোনো সংস্থা এভাবে দীর্ঘদিন রেজুলেশন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না।

৬. নিজস্ব ভবন নেই : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিজস্ব কোনো ভবন নেই। ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে প্রধান কার্যালয়ের স্থায়ী ঠিকানা আজও হয়নি।

৭. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব : সমাজকল্যাণ পরিষদ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। কিন্তু নিজস্ব কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নেই। ভাড়া করা অস্থায়ী সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

৮. দক্ষ জনশক্তির অভাব : পরিষদকে গতিশীল করার জন্য দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে। এছাড়াও কার্যক্রমে জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। সুতরাং দক্ষকর্মীর অভাব পরিষদের অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

৯. গণতন্ত্রের অপ্রতুলতা : এই পরিষদ মূলত আমলাদের নিয়ে পরিচালিত হয়। এখানে গণতান্ত্রিক চর্চা না হয়ে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটে। যা পরিষদের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

১০. প্রতিনিধিত্ব করার সীমাবদ্ধতা : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কর্মী প্রয়োজন। কিন্তু আমলা তান্ত্রিক জটিলতা, গণতন্ত্রের অভাব প্রভৃতির কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র গড়ে ওঠে না। ফলে এই সমস্যা অন্যান্য সমস্যারও কারণ হয়ে ওঠে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ পরিষদের নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। যেমন : কর্মচারীদের পেনশন না থাকা, সরঞ্জামাদির অভাব, বাসস্থানের অভাব, কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা প্রভৃতি। এগুলো পরিষদের কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করে। এসব সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে পরিষদের কর্মসূচিসমূহকে ফলপ্রসূ করা যায়।

প্রশ্ন॥২৩॥ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় লিখ।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে কার্যকর ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থ এটি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকে। পরিষদের অনুদানকৃত অর্থ গ্রহণ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যা সমাধানের উপায় : বাংলাদেশে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হলেও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিষদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. আমলাতান্ত্রিক জটিলতার নিরসন : পরিষদের সাংগঠনিক ও নির্বাহী কমিটি থেকে আমলাদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। কমিটিতে সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণির সদস্যদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এর ফলে আমলা তান্ত্রিক জটিলতা কমে যাবে। সাথে সাথে পরিষদের কার্যক্রমের গতি ফিরে পাবে।

২. আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন : পরিষদের কার্যক্রমে গতিবৃদ্ধি করার জন্য আমলাদের দৌরাত্ম্য হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দৈন্য দূর করতে হবে। এজন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে। অর্থসংগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমাধান আনা যায়।

৩. জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দান : দেশের সাধারণ জনগণকে পরিষদের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এর ফলে পরিষদের কার্যক্রমের সফলতা আরো বাড়বে। এতে করে সমস্যা অনেক কমে যাবে।

৪. কর্মসূচির সমন্বয় সাধন : পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়ের শূন্যতা দূর করতে হবে। এতে করে কাজের সুফল দ্রুত পাওয়া সম্ভব হবে।

৫. পরিষদের নিজস্ব আইন তৈরি : বর্তমানে পরিষদ চলছে রেজুলেশনের মাধ্যমে। অথচ পরিষদ পরিচালনার জন্য আইন তৈরি অত্যাবশ্যক। আশার খবর হলো পরিষদের নিজস্ব আইন তৈরির কাজ চলছে।

৬. নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : পরিষদের নিজস্ব ভবন ও স্থায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। তাই অনতিবিলম্বে সরকারকে সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ভবন নির্মাণ করতে হবে।

৭. বিশেষজ্ঞের সহায়তা : বিশেষজ্ঞ মানে জ্ঞান, দক্ষতা, অনুশীলন, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যক্তি। কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এরা পরিষদের কার্যক্রমকে বেগবান ও গতিশীল করতে পারে।

৮. নীতি ও পরিকল্পনা সেল গঠন : পরিষদকে আরো জোরালো করার জন্য সমাজকল্যাণের নীতি ও পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে একটি সেল গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদগণ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। যা কিনা সমস্যা সমাধানে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে।

৯. যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা : পরিষদের কার্যক্রমকে যথাযথভাবে ও সঠিক সময়ে মনিটরিং করতে হবে। কেননা মনিটরিং কার্যক্রমের দুর্বলতা প্রকাশ করতে সহায়তা করে। কর্মসূচির সঠিক মূল্যায়নের নিমিত্তে একটি তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শাখা খোলা যেতে পারে যা সমস্যা সমাধানের একটি অন্যতম উপায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যার সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব। এর মানে পরিষদের সম্ভাবনাময় অবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষদের কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এদেশের মানুষ আত্মনির্ভরশীল হবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কি? সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনা কর।

[জা. বি.-২০০৯, ২০১৩]

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কাকে বলে? সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রকৃতি আলোচনা কর।

অথবা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা দাও। এর উপযোগিতা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : এমন একদিন ছিল যখন সমাজকল্যাণ বলতে আমাদের দেশে প্রধানত স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণকেই বুঝানো হতো। ভারত বিভাগের পরই সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এদেশে প্রথম চালু হয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই সমাজকল্যাণ গড়ে উঠেছে বলে বেসরকারি তথা স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের গুরুত্ব কোনক্রমেই কমে যায় নি, বরং আধুনিক সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একক প্রচেষ্টায় সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা : এককথায় স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ হচ্ছে জনগণের স্বইচ্ছায় পরিচালিত স্বতঃস্ফূর্ত সমাজসেবা কার্যাবলির সমষ্টি। সমাজের কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণের স্বউদ্যোগে গড়ে উঠা সংগঠনই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা নামে পরিচিত।

পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সমাজকল্যাণ বিভাগের সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজের কোন স্বীকৃত ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংস্থাকে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

১৯৬১ সালের প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, "কোন সমাজসেবা বা কল্যাণমূলক কাজ করার লক্ষ্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছায় গঠিত সংগঠন, সমিতি বা কর্মকাণ্ডকেই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা বলে।"

১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার জারিকৃত 'দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮' এর সংজ্ঞানুযায়ী "স্বেচ্ছাসেবা হচ্ছে এমন কোন কাজ, যা কোন ব্যক্তি বা সংস্থা আংশিক অথবা পুরোপুরি বিদেশী সাহায্য নিয়ে করে থাকে।"

সুতরাং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হল সেসব সংস্থা, যে সংস্থাগুলো নিজ নিজ দেশের সরকার; ট্রাস্ট এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সে অর্থ উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর সরকারি কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দলের কাছে হস্তান্তর করে।

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবার প্রকৃতি : মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতেই সমাজে দুঃখ, শোক, অভাব, নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। প্রাকৃতিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আদিমকাল হতেই মানুষ পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় লিপ্ত ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে সমাজসেবা কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক ও পেশাদারি মর্যাদা অর্জন করেছে। বিবর্তনশীল আধুনিক জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবকল্যাণের চিরায়ত ধর্মীয় বিধিবিধান ও সামাজিক প্রথাগুলোকে যুগোপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা হতে সংগঠিত সমাজকল্যাণের উদ্ভব।

ক. মানুষ একে অপরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দেখাত। এখানে যেমন তার নিজের বিবেকের প্রশ্ন জড়িত ছিল, তেমনি ধর্মীয় চেতনাবোধও ছিল প্রখর। সমাজদরদি ব্যক্তিরা সর্বদাই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং নিজেদের উদ্যোগে দুস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। এছাড়া দুস্থ শিশুদের সহযোগিতার জন্য শিশু কল্যাণ, শিক্ষা বিস্তার, রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলাশয় খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমাজসেবী ব্যক্তিগণের অবদান এবং স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহের অবদান অপরিসীম, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

খ. মূলত সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণই ছিল অসহায়, দুস্থ, গরিব, বিপন্ন মানুষের আশার আলো, স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণই তাদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকল্যাণ এর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করা হল :

১. সরকারি পরিকল্পনার সম্পূরক : দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন ও সমস্যা অনেক। কিন্তু এসব দেশে অর্থসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারি সমাজকল্যাণ প্রয়োজনের তুলনায় নেই। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসে। যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশু ও যুব কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, চিত্তবিনোদন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি পরিপূরক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। যেমন– সমাজকল্যাণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা সরকারের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির কথা তুলে ধরা যায়, যা সর্বপ্রথম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই গ্রহণ করেছিল, পরে এটিকে সরকার এদেশে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে।

৩. দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ : সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রচলিত কর্মসূচির রদবদল কিংবা নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিংবা আকস্মিকভাবে কোন দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি প্রশাসনিক জটিলতার কারণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। অথচ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা কম থাকায় জীবনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৪. এলাকাভিত্তিক বিশেষ সমস্যার সমাধান : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমেই এলাকাভিত্তিক বিশেষ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। সরকারিভাবে সাধারণত জাতীয় নীতির ভিত্তিতে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সাধারণত স্থানীয় প্রয়োজন এবং সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই গড়ে উঠে। তাই এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. কর্মসূচির সহজ বাস্তবায়ন : স্থানীয় সংস্থাগুলো এলাকার জনগণের প্রয়োজন, রুচি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পদ ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করে বলে জনগণের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করা যায়। এজন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজ হয়। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

৬. সাধারণ জনগণের জন্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য : সাধারণত সমাজকল্যাণ কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মীগণকে জনগণের আস্থা লাভ করতে হয়, যা আমাদের দেশে খুবই কম। পেশাদার সমাজকর্মিগণ জনগণের সাথে বার্তাসুলভ আচরণই বেশি করে থাকে। এর ফলে তাদের সাথে জনগণের আস্থামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। অপরদিকে, স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের কর্মীগণ জনগণের সাথে খুব সহজেই মিশে যেতে পারে, ফলে তারা খুব সহজেই তাদের আস্থাভাজন হয়ে উঠে। এজন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সেবা সাধারণ জনগণের জন্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

৭. সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে : সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সংস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা, কুসংস্কার, অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি উচ্ছেদের জন্য জনমত সৃষ্টিতে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন কোন সময় জনগণের চাপের মুখে সরকার সমাজসংস্কারের জন্য আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। যেমন- ১৯৮৫ সালের নারী নির্যাতন ও যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য জনমত সৃষ্টিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৮. নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা : স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ নিঃস্বার্থভাবেই সমাজের সেবা করে থাকে। তারা সমাজের সাধারণ জনগণের নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ও যৎসামান্য কিন্তু সরকারের পক্ষে তা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

৯. সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়ক : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে গড়ে উঠে এবং জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়। অনেক সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব ও সাফল্য সমাজের অন্যদের জন্যও উদাহরণ এবং অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে উঠে। এতে করে মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং তারা সমাজকল্যাণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

১০. ভ্রাতৃত্বের ও মৈত্রীর সহায়ক : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশ বিদেশে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো মানবতার দূত হিসেবে কাজ করে থাকে। সুতরাং জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম।

১১. নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা থেকে শুরু করে এর পরিচালনা ও মূল্যায়ন তথা সকল দায়িত্বই স্বেচ্ছাসেবী কর্মীগণ সম্পন্ন করে থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকাণ্ডকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ যে কোন দেশ ও সমাজের উন্নয়ন সাধনে সরকারি প্রচেষ্টার সাথে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থারও গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে। তাই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার সম্প্রসারণ এবং কার্যকারিতা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

প্রশ্ন॥২॥ একটি অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও পরিধি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি নির্ধারণ কর।

অথবা, উন্নয়নশীল দেশের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ও অনুশীলনক্ষেত্র আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথা বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলো অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে দেখা যায়, এদেশে দু'ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্মরত রয়েছে। কতকগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেশীয় অর্থে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, কতকগুলো সাহায্য সংস্থা রয়েছে যেগুলো বিদেশী সাহায্যপুষ্টের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। যাহোক, একটি অনুন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম যেমন, তেমনি এর পরিধিও ব্যাপক।

একটি অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব : আমাদের ন্যায় অনুন্নত, দরিদ্র ও উন্নয়নগামী দেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. সরকারি কর্মসূচির প্রদর্শক : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো পরীক্ষামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে এগুলোর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা একটি অনুন্নত দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ কারণে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক জটিলতা, অনমনীয়তা, দীর্ঘসূত্রিতা না থাকার কারণে এসব সংস্থা সমস্যার প্রেক্ষিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের সহযোগিতা একটি অনুন্নত দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. সামাজিক আইন প্রণয়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ : একটি অনুন্নত দেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা, দুর্নীতি ও মানবতাবিরোধী রীতিনীতি উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন– ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৮৫ সালের নারী নির্যাতন ও যৌতুকবিরোধী আইন প্রণয়নে যথাক্রমে পাকিস্তান মহিলা পরিষদ ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. সরকারি কর্মসূচির পরিপূরক : দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের বহুমুখী সমস্যার প্রতি সরকারি পর্যায়ে দৃষ্টি দেওয়া তথা সরকারি কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা সম্ভব নয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারি কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। এসব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি কর্মসূচির পরিপূরক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর আইনগত অধিকার আদায় : একটি অনুন্নত দেশের অধিকারবঞ্চিত, অসহায়, অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা দানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. সংক্রামক ও দীর্ঘমেয়াদি রোগ নিয়ন্ত্রণ : অনেক সংক্রামক রোগ রয়েছে সেগুলোর জন্য বিশেষ ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন। একটি অনুন্নত দেশের জন্য এসব ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার সুযোগদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'বহুমূত্র সমিতি'ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশে কর্মরত।

৭. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : অনুন্নত দেশে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দু'টি উপায়ে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

প্রথমত, টার্গেট গ্রুপের লোকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দান করে সকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো নিজেরা বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে বেকারদের কর্মসংস্থান করেছে, যা একটি অনুন্নত দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৮. সম্পদের ব্যবহার : সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থেকে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে থাকে।

৯. দারিদ্র্য বিমোচন : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দরিদ্র ও ভূমিহীনদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। দারিদ্র্য বিমোচন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের পরিধি : সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান একটি সর্বাধিক আলোচিত এবং আলোড়িত বিষয়। আমাদের মত অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন, তেমনি সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে এগুলোর পরিধিও। ১৯৮৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৩৪টি বিদেশী সাহায্য সংস্থা ছিল। এগুলোর মধ্যে ৭৯টি সরাসরি বিদেশী সাহায্য সংস্থা এবং বাকি ১৫৫টি দেশীয় সংস্থা, যেগুলো বিদেশী তহবিলপুষ্ট। অর্থাৎ ৭৯টি বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

এনজিওগুলোর সাহায্য ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় সংস্থা হচ্ছে 'এডাব'। 'এডাব' সমগ্র বাংলাদেশকে ১৩টি অঞ্চলে ভাগ করে ৬২৩টি সংগঠন এর আওতায় এনেছে। এর মধ্যে ১৮৫টি সংগঠন এডাবের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সদস্য। সমন্বয়কারী অপর এনজিও হচ্ছে ভি. এইচ. এস. এস (Voluntary Health Service Society-VHSS) এবং এর আওতায় রয়েছে ১৫৩টি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গবেষণার তথ্যানুযায়ী দেশে নিবন্ধীকৃত NGO এর সংখ্যা ১৩শত। এর মধ্যে ৩৩৯টি বড় মাপের NGO রয়েছে। বিদেশী তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত NGO এর সংখ্যা হচ্ছে ১১৫টি। এগুলোতে নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার, বিশ হাজার গ্রামে NGO এর কার্যক্রম বিস্তৃত। বাংলাদেশে কর্মরত NGO গুলো প্রতি বছর ২'শ ৫০ মিলিয়ন ডলারের বিদেশী সাহায্য পেয়ে থাকে। এর শতকরা ৮০ ভাগ ৩০ থেকে ৩৫টি বড় এনজিও ব্যবহার করে থাকে, (দৈনিক আজকের কাগজ ২৭/১২/৯২) ১৯৯৫ সালের জুন মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী দারিদ্র্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে ১৩৩টি বিদেশী বেসরকারি সংস্থাসহ প্রায় ৯০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা–৯৫)।

একটি অনুন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর সদর দপ্তর এবং অসংখ্য শাখা অফিস রয়েছে। তবে এদের জাতীয় পর্যায়ে একটি অফিস রয়েছে, যদিও এগুলো নির্ভর করে এনজিও'র কর্মপরিধির উপর। যেমন– ১৯৮৮ সালের তথ্যানুযায়ী ব্র্যাকের অফিস সারাদেশে ১০৮টি, কেয়ারের ৫০টি, কারিতাসের ২৯টি, কুমিল্লা প্রশিকার ৫৬টি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বড় বড় এনজিওগুলোর কার্যক্রম বা প্রকল্প গৃহীত হওয়ার প্রেক্ষিতে শাখা অফিসের বা কেন্দ্রের সংখ্যাও পরিবর্তন হয়। তবে এদের মোট কর্মী সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য নেই। তবে ব্র্যাকের মতে, ৪৮টি বড় বড় এনজিও'র কর্মী সংখ্যা ৩০ হাজারের মত। বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর টাকার মূল উৎস হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকা, স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশসমূহ এবং সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ। এসব সম্পদশালী দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– ইউ.এস.এইড, সিডা, নোরডে ইত্যাদি এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাসমূহ যেমন– অক্সফাম (ব্রিটেন); কেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র), কনসার্ন (আয়ারল্যান্ড) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে এসব সংস্থা বিদেশ থেকে মোটা অংকের টাকা পেয়ে থাকে। এসব সাহায্য সরকারিভাবে প্রাপ্ত সাহায্যের বিকল্প নয়, সম্পূরক হিসেবে এনজিওগুলোকে দেওয়া হয়। ১৯৮৭ সালে এনজিওগুলো সাহায্য পেয়েছে ৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার, যা প্রায় ২৫০ কোটি টাকার মত। ১৯৮৮ সালের বন্যার কারণে সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এদেশে আর্থসামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় যত বাড়ছে, বিদেশী সাহায্যের সংস্থাগুলোর অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, এনজিওগুলোর মোট অর্থের শতকরা ৬০ ভাগই আসে বহুজাতিক বৃহৎ কোম্পানি ও সংস্থাসমূহ থেকে।

সুতরাং অনুন্নত দেশে কর্মরত এনজিওগুলোর পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের শতকরা পাঁচ ভাগ গ্রাম এবং পনেরো ভাগ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ, মোট প্রায় দশ হাজার গ্রাম এবং দেড় কোটি লোক এনজিও'র কর্মতৎপরতার আওতাভুক্ত (সাপ্তাহিক অর্থনীতি ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৮)।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, বর্তমানে উন্নয়ন ও কল্যাণের নতুন দর্শন হচ্ছে সরকার এবং জনগণের যৌথ প্রচেষ্টাতে সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। ফলে দরিদ্র ও উন্নয়নগামী দেশের সামগ্রিক কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব এবং পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গবেষণার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ২০ হাজার গ্রামে বিস্তৃত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শূন্যতা এবং ক্রমাগত সমস্যা সৃষ্টির ফলে অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ও পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন।৩। **বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর গুরুত্ব নির্দেশ কর। বর্তমানে এগুলো কি কি সমস্যার সম্মুখীন?** [জা. বি.-২০০৭, ২০১০]

অথবা, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার তাৎপর্য। উল্লেখপূর্বক এর প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর।। ভূমিকা : সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বে অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা একটি সর্বাধিক আলোচিত এবং আলোড়িত বিষয়। বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিরাজমান বিপুল সংখ্যক সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং সমস্যাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে মোকাবিলার প্রয়োজনে কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব : বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও উন্নয়নগামী দেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর গুরুত্ব নিম্নোক্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশ করা যায় :

১. সরকারি কর্মসূচির পরিপূরক : বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন ও সমস্যা অনেক। এদেশে অর্থসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশু ও যুব কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, চিত্ত বিনোদন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি পরিপূরক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ : সমাজ পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রচলিত কর্মসূচির রদবদল কিংবা নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন হতে পারে। অথবা কোন আকস্মিক দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার দরুন জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা দ্রুত বা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. এলাকাবিশেষের বিশেষ সমস্যার সমাধান : বাংলাদেশে সরকারি কর্মসূচি সাধারণত জাতীয় নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হয়ে থাকে। ফলে কখনও কোন এলাকাবিশেষের বিশেষ সমস্যা সরকারি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো স্থানীয় প্রয়োজন বা সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকাভিত্তিক গড়ে উঠে। সুতরাং স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক।

৪. সমাজসংস্কার : বাংলাদেশে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা, কুসংস্কার, মানবতা বিরোধী রীতিনীতি ইত্যাদি উচ্ছেদের জন্য জনমত সৃষ্টিতে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার : স্বেচ্ছা সমাজকর্মীগণ নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করে থাকে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যয়ও খুব সামান্য। সে কারণে এসব প্রতিষ্ঠান স্বল্পব্যয়ে সমাজের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করতে সক্ষম থাকে। সরকারের জন্য যা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে করা সম্ভব।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার সমস্যা : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। নিম্নে এগুলোর প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হল :

১. সরকারি অর্থ ও বিদেশী সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা : জনগণের আত্ম-সাহায্য, চাঁদাদান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে অতীতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠত। বর্তমানে জনগণের আর্থিক অসচ্ছলতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার ফলে স্বতস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। আর্থিক সমস্যার কারণে সরকারি ও বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি সাহায্য বন্ধ হলেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য সরকারি অনুদান বিদেশী সাহায্য প্রাপ্তির ত্রুটি অনেকটা দায়ী।

২. অর্থ-আত্মসাৎ করার প্রবণতা : জনগণের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত সংগঠনগুলোর অর্থের অপচয় বা আত্মসাৎ করার সুযোগ তেমন থাকে না। কারণ জনগণ এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি এবং তাদের অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ জনগণের নিকট জবাবদিহি বা হিসাবনিকাশ দানে বাধ্য থাকত। কিন্তু সরকারি সাহায্য নির্ভর প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ এরূপ জবাবদিহিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করেন। জনগণও এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। ফলে অর্থের অপচয়জনিত কারণে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

৩. সনাতন সমধর্মী কল্যাণমূলক কাজ : চিন্তা এবং পরিশ্রমবিহীন যেসব কাজ অতি সহজে করা যায়, যেমন– সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক ও নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি সমধর্মী কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে যতদিন সরকার অর্থ, সেলাই মেশিন, পড়ার উপকরণ ইত্যাদি সরবরাহ করে বা রিলিফ বন্টনের কাজ করে ততদিনই এসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। হুজুগ এবং উত্তেজনা করে গেলেই সব নীরব হয়ে যায়।

৪. সামাজিক খ্যাতি, যশ ও প্রতিপত্তি লাভের উপায় : বাংলাদেশে বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে সামাজিক মর্যাদা, নাম, যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের প্রবণতা কাজ করে থাকে। অবসর কাটানোর উপায় হিসেবে অনেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নিয়মিত দায়িত্ব বলতে কিছু থাকে না, কারণ তাদের মনোভাব হল, "বেতন যখন তারা নিচ্ছেন না তখন দায়িত্ব পালনের বাড়াবাড়ি তাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।" তাই মানবিকতাবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠায় এগুলো অকালেই বন্ধ হয়ে যায়।

৫. নেতৃত্বে কোন্দল : গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে এদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় না। ফলে স্বার্থ, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের বড়াই নিয়ে সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, হিংসা, রেষারেষী এবং কলহের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব এবং অমূলক প্রতিযোগিতা চলে। কখনও কখনও অধিকার রক্ষার্থে আইন, আদালত, মামলা-মকদ্দমা পর্যন্ত হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কোন্দলে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণমূলক লক্ষ্য এবং কার্যক্রম হারিয়ে গিয়ে সামাজিক সংঘাতে রূপ নেয়।

৬. রাজনৈতিক প্রভাব : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মানুষের স্বেচ্ছা প্রণোদিত হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উপায় হিসেবে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান মানব সেবার পরিবর্তে রাজনৈতিক সেবার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৭. সুষ্ঠু সমন্বয় ও যোগাযোগের অভাব : বর্তমান যুগে বিচ্ছিন্নভাবে ইচ্ছামতো সমাজসেবা করে সমাজের সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতা ছাড়া সম্পদের অপচয়রোধ এবং কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় একই ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ উপেক্ষা করে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অর্থহীন প্রতিযোগিতা, কাজের পুনরাবৃত্তি, সময় ও সম্পদের অপচয়জনিত কারণে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি অকালে বন্ধ হয়ে যায়।

৮. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি : বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় না। ফলে সফল ও গতিশীল নেতৃত্ব গড়ে উঠায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। জনগণের প্রয়োজনে, সমস্যা, চাহিদা এবং এসব পূরণের উপায় সম্পর্কে সচেতন নেতা তথা পরিচালকের অভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

৯. দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব : অর্থনৈতিক সংকট ও অসচ্ছলতার ফলে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারে না। ফলে কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে গঠিত বহু প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় না। এটি বাংলাদেশের প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সমস্যা।

১০. অনুভূত প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ কার্যক্রমই সরকারি সাহায্য লাভের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়। ফলে কর্মসূচিতে জনগণের অনুভূত চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন না ঘটায় জনগণ এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করে না। ফলে সংগঠন বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, দরিদ্র ও উন্নয়নগামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গবেষণার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থা ২০ হাজার গ্রামে বিস্তৃত। বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর দ্বারা অর্থায়িত প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় এক হাজারের মত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শূন্যতা এবং ক্রমাগত সমস্যা সৃষ্টির ফলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি এ প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লিখিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও গতিশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

প্রশ্ন।৫। **বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি কিভাবে দূর করা যায়?**

অথবা, **স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্যা দূরীকরণে তোমার মতামত পেশ কর।**

অথবা, **বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের উপায় উল্লেখ কর।**

উত্তর। **ভূমিকা :** যেসব প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের জন্য সেবামূলক কার্যে নিয়োজিত থাকে, সেসব প্রতিষ্ঠানকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা হয়। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের জনসাধারণকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে নিজেদের ও সমাজের উন্নয়ন আনয়নে সহায়তা করে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি দূর করার উপায় : পাকিস্তান আমল থেকেই বাংলাদেশে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা গঠন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে সক্রিয় সহযোগিতা লাভে নিশ্চয়তা বিধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে নতুন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন করে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর্থসামাজিক অবস্থার জটিলতার কারণে বাংলাদেশে সংখ্যাতীতভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও গুণগত দিক থেকে এর কার্যক্রম তেমন বৃদ্ধি পায় নি। সমাজসেবা বিভাগের রেজিস্টার্ড প্রায় ১১ হাজার দেশী বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তি, পুষ্টিহীনতা, খাদ্য, নিরক্ষরতা, অপরাধপ্রবণতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সমস্যা মোটেও কমে নি। সুতরাং সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেসব সমস্যা সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি দূরীকরণের উপায়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিকরণ : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে আর্থিক অসচ্ছলতা। এ কারণে জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোর কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। অনুদান না দিয়ে কার্যকর এবং সক্রিয় সংস্থাগুলোকে অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২. সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করানো : কেবলমাত্র আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক সংস্থার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, যদি সে অর্থ যথাযথ ব্যবহার করার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা না হয়। সমাজসেবা বিভাগ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার পূর্বে কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতি, নিয়ম ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ব্যাঙের ছাতার মত যেখানে সেখানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে না পারে।

৩. বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে সেজন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ অপরিকল্পিতভাবে সমাজসেবা করে সমাজস্থ বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

৪. কাউন্সিল গঠন : জাতিগঠনমূলক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন ও উন্নতি করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তার জন্য কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এ কাউন্সিলের মাধ্যমে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

ক. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন করা।

খ. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ও কর্মসূচির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা।

ঘ. প্রতি বছর যাকাত, ফেতরা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে আদায়কৃত বিভিন্ন রকম জরিমানার অর্থ সংগ্রহ করে জাতীয় তহবিল গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের ব্যয় বহন করা।

৫. সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন : সব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গঠনতন্ত্র অনুসারে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রেণীকরণ : স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর বহুমুখী কর্মসূচি বাতিল করে তাদের বিশেষ কতকগুলো বিভাগে যেমন– শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণ, ভিক্ষুক ও দুস্থ কল্যাণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আলাদা আলাদা জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছোট ছোট সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের দেখাশুনা ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে অর্থের অপচয় অনেকটা কমে আসবে।

৭. স্বাবলম্বন নীতি বাস্তবায়নে বাধ্য করা : স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশী বিদেশী বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও গণদারিদ্র্য মোটেও হ্রাস পায় নি, বরং বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার কার্যাবলির প্রভাবে পরনির্ভরশীল মানসিকতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে দরিদ্র জনগণ স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। এর ফলে সমাজের উন্নতি আনয়ন হবে।

৮. দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা : জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষতাসম্পন্ন সমাজকর্মী নিয়োগ করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয়।

৯. প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা : গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ ও নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং প্রতিষ্ঠানটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করতে পারে।

১০. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি আরোপ : নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কড়াকড়িভাবে আরোপ করতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো সমাজসেবার নাম করে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হতে না পারে। স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলো যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করতে পারে সেজন্য সরকারি পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষাকরণ : বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে তহবিল তছরূপ ও হিসাবনিকাশ সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাব। সরকারি পর্যায়ে নিয়মিত অডিট ও হিসাব নিরীক্ষণের মাধ্যমে এরূপ সমস্যার সমাধান করতে হবে, এর ফলে অনিয়ম অনেকাংশে দূর হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা হতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের উন্নতি নির্ভর করে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর। তাই উপরিউক্ত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি সমাধান করা অনেকাংশে সম্ভব। সুষ্ঠু ও কার্যকরী সংগঠন ছাড়া শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলেই দেশের তথা সমগ্র জাতির উন্নতি হবে। দূর হবে বেকারসমস্যা, মানুষের অভাব অনটন, সৃষ্টি হবে সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ।

প্রশ্ন। বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি কী কী?

অথবা, বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে লেখ।

উত্তর। ভূমিকা : বহুমূত্র রোগীদের দুরবস্থা ও এর দুঃখ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে ১৯৫৬ সালে 'ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতিটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি' নাম ধারণ করে।

ডায়াবেটিস সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ ডায়াবেটিস এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হল :

১. ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, সেবার ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন।
২. বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের ডাক্তার, প্যারামেডিক্স ও সেবিকাদের ডায়াবেটিস ও তৎসংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।
৩. ডায়াবেটিস ও তৎসংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে গবেষণা।
৪. ডায়াবেটিস ও তৎসংক্রান্ত রোগ বিষয়ে বিভিন্ন জনসংযোগ ও প্রকাশনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি।
৫. ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।
৬. রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৭. দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা করা।
৮. চিকিৎসা লাভে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৯. চিকিৎসার ব্যবস্থাকে সহজতর করার লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা করা।
১০. অকাল মৃত্যু রোধ করা।

ডায়াবেটিস সমিতির কার্যাবলি : বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি ১৯৭৭ সালে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সমিতি কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হল :

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, চিকিৎসামূলক কার্যক্রম, পুনর্বাসন কার্যক্রম ও গবেষণামূলক কার্যক্রম। ডায়াবেটিস এসোসিয়েশনের ব্যাপক উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল :

১. প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম : প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন জনসংযোগ যেমন– রেডিও, টিভি, পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমে ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা হয়। এছাড়া এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতি দেশের জনগণকে রোগের কারণ, ব্যাপকতা ও চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করে এবং সতর্কতা গ্রহণে উৎসাহিত করে।

২. চিকিৎসা কার্যক্রম : ডায়াবেটিস সমিতির সবচেয়ে বড় কার্যক্রম হল চিকিৎসা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় জটিল ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিরাময় নিবাস (Convalescent home) পরিচালনা করা হয়। চিকিৎসা রোগীদের নিয়মিত অনুসরণেরও (ফলোআপ) ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এ কার্যক্রমের আওতায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানসহ, ঔষধসহও খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

৩. পুনর্বাসন কার্যক্রম : দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য ডায়াবেটিস সমিতি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে রোগীদের শক্তি সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান করা হয় এবং সমাজের উপার্জনক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা হয়।

৪. গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম : ডায়াবেটিস রোগের কারণ অনুসন্ধান, রোগমুক্তির উপায় উদ্ভাবন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ডায়াবেটিস সমিতি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরূপ গবেষণালব্ধ জ্ঞান সমিতির রোগ নিরাময়মূলক ভূমিকাকে অধিকতর কার্যকর ও সম্প্রসারিত করে এবং রোগমুক্তির দিকনির্দেশনা দান করে।

৫. পরামর্শমূলক কার্যক্রম : ডায়াবেটিস রোগীদের রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান, পরামর্শ দান ও প্রয়োজনমতো মনোসামাজিক সমর্থন দান করতে ডায়াবেটিস সমিতি অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এতে রোগীরা রোগ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে অনেকাংশে মুক্ত হতে পারে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস সমিতি রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৮১-৮৪ এ তিন বছরে এ সমিতির মাধ্যমে ১২,১২৫ জন রোগী উপকৃত হয়েছে। সুতরাং ডায়াবেটিস সমিতি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অকালে সামাজিক পঙ্গুত্বের হাত থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি রোগ সুষ্ঠুভাবে প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন॥৬॥ ডায়াবেটিস সমিতি কি? স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডায়াবেটিস সমিতি যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

[জা. বি.-২০০৮]

অথবা, ডায়াবেটিস সমিতি কি? ডায়াবেটিস সমিতির কার্যক্রমের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, ডায়াবেটিস সমিতির বলতে কী বুঝ? এ সমিতির ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : ডায়াবেটিস রোগীদের সামগ্রিক কল্যাণে সহায়তা দানের লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীমের উদ্যোগে ১৯৬৫ সালের ১লা মার্চ ঢাকায় ডায়াবেটিস সমিতি অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে এ সমিতি রেজিস্ট্রেশন লাভের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি' নামকরণ করা হয়।

ডায়াবেটিস সমিতি : ডায়াবেটিস সমিতি হল এমন একটি সংস্থা যেখানে ডায়াবেটিস রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ, গরিব রোগীদের পুনর্বাসন, রোগের উপর গবেষণা, চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।

ছাব্বিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কাউন্সিল এ সমিতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। তিনজন সরকারি প্রতিনিধি ছাড়া বাকি সব সদস্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবী। এ সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও কর্মকর্তা ছাড়াও প্রায় ৪৫০ জন চিকিৎসক, সমাজকর্মী, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। সরকারি আধাসরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত অনুদান, লটারি আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে সমিতির তহবিল গড়ে উঠে।

নিম্নে ছকের সাহায্যে ডায়াবেটিস সমিতির ব্যবস্থাপনা কাঠামো দেখানো হল :
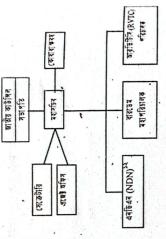
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডায়াবেটিস সমিতি যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে তা গুরুত্বসহ নিম্নে আলোচনা করা হল :

ক. বারডেম : রোগ নির্ণয়, গবেষণা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ১৯৮০ সালে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে উপদেশ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়ে থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বারডেমের মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ৫৫০ জন থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বারডেমের মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন ২০০-২৫০ জন রোগী সেবা পেয়ে থাকে।

খ. হাসপাতাল সেবা কর্মসূচি : আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়, ঔষধ সরবরাহ, দরিদ্র ও অক্ষম রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও পরামর্শদান এবং গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থ রোগীদের আবাসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ৫৫০ শয্যাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক ১৫ তলা ভবন হাসপাতালের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার কাজ ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এখানে ৫৫০টি

...দের মধ্যে ৬৮টি ফ্রি বেড রয়েছে। হাসপাতাল সমাজসেবার ...বর্তমান ৫০জন উপদেষ্টা, ২৮৬ জন মেডিকেল অফিসার ও ...২ জন নার্স জড়িত আছেন। প্রতি বছরই ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। নিম্নে এক পরিসংখ্যানে তথ্য তুলে ধরা হল :

রোগীর প্রকৃতি	১৯৯৩-'৯৪	১৯৯৪-'৯৫	১৯৯৫-'৯৬	১৯৯৬-'৯৭	১৯৯৭-'৯৮	১৯৯৮-'৯৯
নতুন রোগী	১৩,৬৮১	১৩,৯১৪	১৩,৭৬৯	১৮,২৩৯	১৭,৯৩০	১৬,৩০৯
মোট রোগী	১,৩৯,৬০৪	১,৫৩,৫১৮	১,৫৭,২৮৭	১,৮৫,৫২৬	২,০৩,৪৫৬	৭,১৩,৪৫৭

গ. গবেষণা কর্মসূচি : ডায়াবেটিস রোগের কারণ, উৎপত্তি, প্রভাব এবং চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা সমিতির নিয়মিত কর্মসূচির অন্যতম।

ঘ. সমাজকল্যাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম : পেশাদার সমাজকর্মীদের মাধ্যমে সমিতির সমাজকল্যাণ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগের কাজ হচ্ছে দ্রুত রোগ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সমিতি প্রদত্ত সেবা কর্মসূচি গ্রহণে রোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ দান। সমাজকল্যাণ বিভাগের কাজ হচ্ছে : ১. অনিয়মিত রোগীদের গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিয়মিত সমিতিতে এসে চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা, ২. গরিব রোগীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ৩. দরিদ্র, অসহায় রোগীদের জন্য ব্যক্তিগত সাহায্য ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, ৪. সমিতি পরিচালিত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দরিদ্র ডায়াবেটিস রোগীদের হস্ত শিল্প এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা। এছাড়া এ বিভাগ কর্তৃক যেসব সেবা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা হল :

ঙ. এনডিএন : এনডিএন এর অধীনে ডায়াবেটিস সমিতি ঢাকা শহরে সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী রোগীদের জন্য মোট ৭টি EHCC (Executive Health Check Centre) খুলেছে। এ কেন্দ্রগুলোতে অল্প সময়ে বেশি মূল্যে উন্নততর সেবা প্রদান করা হয়।

চ. প্রচার ও প্রকাশনা : ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ১. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলনের আয়োজন, ২. রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার, রোগের কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় প্রভৃতি তথ্য সংবলিত বই প্রকাশ, সংবাদপত্রে প্রচার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

ছ. প্রশিক্ষণ দান : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় গ্রামীণ পর্যায়ে মাধ্যমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়।

জ. পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র : ১৯৬৮ সাল থেকে বহুমুখ সমিতি ঢাকার জুরাইনে ফলিত পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। দরিদ্র জনগণের জন্য ন্যূনতম পুষ্টি গ্রহণের নিশ্চয়তা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধা দানই এ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

ঝ. পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এ কেন্দ্রের লক্ষ্য হল কমবয়সী ডায়াবেটিস রোগীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এর ফলে রোগীদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব হয়ে উঠে। এ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বারডেম হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। কেন্দ্রের অর্জিত মুনাফা দরিদ্র ডায়াবেটিস রোগীদের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হয়।

ঞ. ক্লিনিক্যাল সার্ভিস : ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের মাধ্যমে সকল রেজিস্টার্ড ডায়াবেটিস রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য জ্ঞান এবং সচেতনতা প্রদান করা হয়। রোগীদের পুষ্টি ও সামাজিক সামর্থ্য অনুযায়ী কখনও বিনামূল্যে অথবা কম মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

ট. বহির্বিভাগ চিকিৎসা সেবা : প্রতিদিন বহু নতুন ও পুরাতন ডায়াবেটিস রোগী বহির্বিভাগে ভিড় করেন। এদের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে চলছে। গত ১৯৯৮-'৯৯ সালে আগত রোগীদের তালিকা থেকে দেখা যায়, এখানে পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৩,২৬,৮৬৫ জন ছিল এবং নতুন রোগীর সংখ্যা ১৬,৩০৯ জন।

ঠ. খাদ্য ও পুষ্টি-বিভাগ : ডায়াবেটিস রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনকে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উপলক্ষে খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান দান করে থাকে। এছাড়াও বারডেম হাসপাতালের রান্নার তদারকি পরিকল্পনায় সহায়তা করে থাকে।

উপসংহার : বাংলাদেশে ডায়াবেটিস সমিতি উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়া আরও কতকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যেমন– দন্ত চিকিৎসক, চর্মরোগ, ফিজিওথেরাপী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সারাদেশে সমিতির ৩৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সমিতির সেবা কার্য পরিচালিত হচ্ছে। সমাজের অনেক গরিব দুস্থ মানুষ সেবা পাচ্ছে।

প্রশ্ন॥৭॥ বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি আলোচনা কর।

অথবা, যেসব মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠিত হয় সেগুলো আলোচনা কর। এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কি কি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে?

অথবা, বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিগুলো লেখ।

অথবা, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির বিবরণ দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯২০ এর অধীনে কিছু রদবদল সাপেক্ষে পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানেও এর একটি শাখা স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি পূর্ব পাকিস্তান শাখা বাংলাদেশের রেডক্রস সোসাইটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভের আবেদন জানায়।

১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশবলে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। অতঃপর ৩১ মার্চ ১৯৭৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি আদেশ, ১৯৭৩ জারি করেন। এ আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি রেডক্রসের তেহরান সম্মেলনে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি পূর্ণ স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'। এ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির রয়েছে নিজস্ব কিছু উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের জন্য রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকটা আলাদা।

বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সাধারণভাবে কতকগুলো উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এ উদ্দেশ্যগুলো সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় বলে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। নিম্নে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হল :

১. মানবতা : রেডক্রস মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্তমানবতার সেবা মানুষে মানুষে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপন, বন্ধুত্ব এবং সব মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য।

২. পক্ষপাতহীনতা : বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতের উর্ধ্বে থেকে সবাইকে সাহায্য করা।

৩. নিরপেক্ষতা : বিশ্বের সব মানুষের আস্থা অর্জন করা এর আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য। সেজন্য রেডক্রস সোসাইটি রাজনৈতিক, বর্ণ, ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধীয় বিতর্কে না জড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করে।

৪. স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য : রেডক্রস স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। রেডক্রসের কার্যক্রমে যেমন রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হস্তক্ষেপ করে না তেমনি রেডক্রসও রাষ্ট্র বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাজে বাধার সৃষ্টি করে না।

৫. স্বেচ্ছামূলক : রেডক্রস একটি স্বেচ্ছামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬. একতা : একটি দেশে রেডক্রসের একটিমাত্র সংগঠন থাকে এবং দেশের সব জনসাধারণের জন্য এর সেবা কর্মসূচির দ্বার খোলা থাকে।

৭. সর্বজনীনতা : রেডক্রস একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, যা সব সমাজের মানুষের সমান অধিকার এবং একে অপরকে সাহায্য করার নীতিতে বিশ্বাসী।

কর্মসূচি/কার্যক্রম : বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর সরাসরি এবং ইউনিটগুলোর মাধ্যমে যেসব কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তা হল :

১. ত্রাণ কর্মসূচি : টর্নেডো, বন্যা, নদী ভাঙন, অগ্নিকাণ্ড, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসন এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। ... ধরনের দুর্যোগে রেডক্রিসেন্ট যেসব ত্রাণকার্য পরিচালনা ... থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

i. উদ্ধার : দুর্যোগে আহত বা চাপা পড়া ও অসুস্থ লোক... উদ্ধার।

ii. প্রাথমিক চিকিৎসা : আহতদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎ... ব্যবস্থা করা।

iii. সীমিত সাধারণ চিকিৎসা : অসুস্থ ও আহতদের জ... সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

iv. খাদ্য : দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য... বিতরণ করা।

v. বস্ত্র : দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপ... বিতরণ।

vi. বাসন-কোসন : অসহায় লোকদের জন্য ব্যব... তৈজসপত্র সাহায্য প্রদান।

vii. অস্থায়ী আশ্রয় : আশ্রয়হীনদের জন্য সাময়িক... আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা।

viii. গৃহনির্মাণ প্রকল্প : আশ্রয়হীনদের স্থায়ীভাবে বসবাসে... জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। এছাড়া–

ক. পার্বত্য শরণার্থী প্রত্যাবাসন ত্রাণ কার্যক্রম : বিগত ... বছরে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য জেলাসমূহে... উপজাতীয় অধিবাসীদের মধ্য হতে ১০,৬১৯টি পরিবারের ... হাজারেরও অধিক উপজাতীয় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণা... হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমান সরকারের বাস্তব... পদক্ষেপের ফলে শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার এক কার্যক্র... বাস্তবায়িত করা হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ভার... প্রত্যাগত শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সরকারে... পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে সব মহলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

খ. মায়ানমার শরণার্থী ত্রাণ কার্যক্রম : ১৯৯২ সা... মায়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের জ... পরিচালিত মায়ানমার শরণার্থী ত্রাণ কার্যক্রমের আওতা... বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশ... অব রেডক্রস এন্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিজের সহায়তায় অত্যা... সাফল্য ও সুনামের সাথে এ ত্রাণকার্য পরিচালনা করে আসছে।

২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বা... কার্যক্রমের বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে–

ক. জরুরি চিকিৎসা কার্যক্রম : প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর... সময়ে আহত ও রোগাক্রান্তদের জরুরি চিকিৎসা প্রদান এ... বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধকল্পে প্রতিরোধমূ... ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

খ. নিয়মিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি... উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলো হল :

i. শহর ও গ্রামভিত্তিক ৪৭১ শয্যাবিশিষ্ট ৫টি জেনারে... হাসপাতাল।

ii. মা ও শিশুদের জন্য শহরভিত্তিক ১২৫টি শয্যাবিশিষ্ট ৭টি মাতৃসদন হাসপাতাল।

iii. গ্রামভিত্তিক মা ও শিশুদের জন্য ৫৫টি গ্রামীণ মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ হাসপাতাল।

iv. পেমই, প্রভাকরদি ও বিভিন্ন ইউনিট পরিচালিত বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র।

v. এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম।

vi. তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কর্মসূচি ছাড়াও নিয়মিতভাবে নিরাময়মূলক ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এছাড়াও এর আওতায় রয়েছে–

ক. নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য কার্যক্রম : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে–

i. গোপালগঞ্জ জেলায় টুঙ্গীপাড়ায় ৩৫ শয্যাবিশিষ্ট শেখ সাহেরা খাতুন রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল।

ii. গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জের ১০ শয্যাবিশিষ্ট শাহ কারফরমা রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল।

iii. দিনাজপুর ৫০ শয্যাবিশিষ্ট শহীদ জিয়াউর রহমান রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল।

iv. নেত্রকোনা জেলায় ১৫ শয্যাবিশিষ্ট তেলিগাতী রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল।

খ. প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক চিকিৎসা কার্যক্রম : বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুস্থ ও অসহায় মায়েদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় হাসপাতাল স্থাপন করে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করে। এসব হাসপাতালগুলো হল :

i. ঢাকার বাংলাবাজারে ২০ শয্যাবিশিষ্ট শহীদ ময়েজউদ্দিন রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল।

ii. চাঁদপুরে ২০ শয্যাবিশিষ্ট রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

iii. বরিশালে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট আমানতগঞ্জ রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল।

iv. সিলেটে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল।

v. ঝালকাঠিতে ৫ শয্যাবিশিষ্ট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল।

vi. ঢাকা জেলায় ১০ শয্যাবিশিষ্ট জিনজিরা রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল।

vii. চট্টগ্রাম ৩০ শয্যাবিশিষ্ট জেমিশন রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল।

এসব হাসপাতালে নৈমিত্তিক কর্মসূচি ছাড়াও শিশুদের রোগ প্রতিরোধকল্পে টীকাদান, অন্ধত্ব প্রতিরোধ করার জন্য ভিটামিন 'এ' বিতরণ ও সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

গ. বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত জাতীয় সদর দপ্তর ঢাকা, নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার পেমই গ্রামে অবস্থিত পেমই রেডক্রিসেন্ট বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানার প্রভাকরদি গ্রামে সাদুদুর রহমান রেডক্রিসেন্ট রুরাল ক্লিনিক নামে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে স্থানীয় রোগীদের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

ঘ. গ্রামীণ মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র : আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এসব লোকরা শহরের নানাবিধ সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এসব অবহেলিত রোগশোকে আক্রান্ত দুস্থ মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ৬০টি গ্রামীণ মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২ জন মিড-ওয়াইফ কর্মরত আছেন।

ঙ. পরিবার পরিকল্পনা : বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা সোসাইটির যৌথ কর্মসূচির অধীনে ৬টি মাতৃসদন হাসপাতাল, ৫৩টি মাতৃসদন কেন্দ্র এবং নগরবস্তি প্রকল্পে নিয়োজিত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিড ওয়াইফ, জুনিয়র মিড ওয়াইফ ও মহিলা প্যারামেডিক সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ সরবরাহ ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩. হলিফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল : হলিফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি সর্ববৃহৎ প্রকল্প। ক্রমবর্ধমান হারে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা ৩৫৫ তে উন্নীত হয়েছে। এ হাসপাতালের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ সাধারণ ও জটিল রোগের দ্রুত চিকিৎসার নিশ্চিতকরণ এবং বহির্বিভাগে নাক, কান, গলা, দন্ত, চক্ষু, চর্মরোগ, মানসিক ব্যাধির সর্বপ্রকার প্যাথলজিক্যাল টেস্টসহ গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ পরামর্শ ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এ হাসপাতালে সংক্রামক ও প্রতিরোধমূলক ৬টি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে শিশু ও মায়েদের বিভিন্ন ধরনের টিকা প্রদান করা হয়। অতি সম্প্রতি অভিজ্ঞ ও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা চিকিৎসকবৃন্দের সমন্বয়ে বহির্বিভাগে নিউরোসার্জারী ও করোনারী কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে।

৪. দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচি : ১৯৮৫ সালে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উড়ির চরে ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপুল প্রাণহানি ঘটাবার পর বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দেশের বিপদসঙ্কুল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কবলিত উপকূলের দূরবর্তী অঞ্চল ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহে বসবাসরত দরিদ্র অসহায় অধিবাসীদের দুর্যোগপূর্ণ, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর অসহায়ত্ব নিবারণার্থে ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এ কর্মসূচির প্রধান দু'টি দিক রয়েছে।

ক. ঘূর্ণিঝড় ও আশ্রয়কেন্দ্র : ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলের অসহায় জনগণ তাদের জীবন রক্ষার্থে যাতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যা এ কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা হল ১৪৯টি। এর ফলে দুর্যোগকালীন সময়ে প্রায় দেড় লক্ষ লোক আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. রক্তদান কর্মসূচি : 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান'-এ শ্লোগানের ভিত্তিতে রেডক্রিসেন্ট দেশের আপামর সক্ষম জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে থাকে। সংগৃহীত রক্ত দরিদ্র, মুমূর্ষু রোগীদের বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৯ সালে এ কর্মসূচির আওতায় ৯,১০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়, সংগৃহীত রক্তের প্রায় ৬০ ভাগ রক্ত বিভিন্ন হাসপাতালে ফ্রি বেডে অবস্থানরত রোগীদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিতরণ করা হয়। অবশিষ্ট রক্ত হাসপাতালের কেবিন, পেয়িং বেড ও প্রাইভেট ক্লিনিকের রোগীদের মধ্যে নামমাত্র সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সরবরাহ করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় শেষে বলা যায় যে, আর্তমানবতার সেবাই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূল লক্ষ্য আর এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তারা বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

প্রশ্ন॥৮॥ মানবসেবামূলক সংস্থা হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যাবলি লিখ।

অথবা, মানবকল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মসূচি আলোচনা কর।

অথবা, যেসব কর্মসূচির আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত হয় তা আলোচনা কর।

অথবা, মানবকল্যাণমূলক সংস্থা হিসাবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যাবলীগুলো কী কী? আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি রয়েছে সব দেশে। প্রাথমিক পর্যায়ে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যাবলি কেবল যুদ্ধে আহত সৈন্যদের জন্য সীমিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দুর্যোগ, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও রোগব্যাধির মোকাবিলা করার লক্ষ্যে প্রসারিত করা হয়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নাম বিশ্বের সবার কাছেই পরিচিত।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যাবলি : যুদ্ধ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি জাতীয় দুর্যোগময় মুহূর্তে বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নিম্নে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করা হল :

১. জরুরি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিকে দুর্যোগের বন্ধু বলা হয়। এ সংস্থাটি স্বাধীনতা সংগ্রামের পর থেকে দুর্যোগ কবলিত এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য জরুরিভিত্তিক খাদ্যসংস্থানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করে।

২. খাদ্যসংস্থান কর্মসূচি : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুস্থ, অসহায় মানুষের জন্য খাদ্যসংস্থানের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পেয়ে থাকে, যার সাহায্যে দরিদ্র জনগণের খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

৩. জরুরি চিকিৎসা কর্মসূচি : আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির জরুরি চিকিৎসা কর্মসূচি হিসেবে ৭টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট এবং ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবে জরুরি চিকিৎসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য আরও বেশকিছু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পদক্ষেপ নিয়েছে।

৪. এতিম পুনর্বাসন কার্যক্রম : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ১০০ এতিম শিশুদের লালনপালন ও পুনর্বাসনের জন্যে ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করছে। এ সোসাইটি ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আরও ৮টি এতিমখানা পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে এতিম শিশুরা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

৫. প্রাক দুর্যোগ পাইলট প্রকল্প : দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আশ্রয় লাভের জন্য এ সোসাইটি একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ১৯৬৯ সালে এ সোসাইটির উদ্যোগে কক্সবাজারে ১০ সি.এম. একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তাছাড়া রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সাহায্য দানের জন্য ত্রাণসামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৬. মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি : বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ২১টি মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে গড়ে ৫০ হাজার শিশু ও গর্ভবতী মহিলাকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

৭. এম্বুলেন্স সার্ভিস : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি হাসপাতালে রোগীদের আনা নেওয়ার সুবিধার্থে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮টি এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব এম্বুলেন্স ছাড়াও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাকি ২৭টি এম্বুলেন্স সোসাইটির ভ্রাম্যমাণ ইউনিট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮. ধাত্রীবিদ্যা ও ধাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব মাতৃসদনের মাধ্যমে ধাত্রীবিদ্যা ও ধাই সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করে চলছে।

৯. স্বাস্থ্য কর্মসূচি : এ দেশের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য এ সোসাইটি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ঢাকায় হলিফ্যামিলি হাসপাতাল ও হাসপাতাল সংলগ্ন নার্সিং স্কুলটি এ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া জনগণকে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সচেতন করে তোলা, পুষ্টিজ্ঞান দান ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে এ সোসাইটি কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দুর্যোগ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসহায় মানুষদের রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য তাদের পাশে এসে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রমমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী দুস্থ মানুষের সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন। এনজিওগুলোর ভাসমান অবস্থা বলতে কি বুঝ? এ প্রসঙ্গে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে আশার অবদান মূল্যায়ন কর।

অথবা, এনজিও'র ভাসমান অবস্থা কাকে বলে? দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আশার পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, এনজিওদের ভাসমান অবস্থা কী? দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে আশার ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, এনজিওদের ভাসমান অবস্থার পরিচয় দাও? দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে আশার তাৎপর্য আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বে সরকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে একশত ভাগ সক্ষম হচ্ছে না। তাই সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোই এনজিও বা বেসরকারি সংস্থা নামে পরিচিত। এসব বেসরকারি সংস্থা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেসব পরিকল্পনার গুরুত্ব বাংলাদেশের মত দেশে অপরিহার্য।

ভাসমান অবস্থা : বাংলাদেশে ছোট বড় নানা প্রকারের বিভিন্ন নামের এনজিও আছে। এনজিওগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই বিদেশী সাহায্য সহযোগিতায় গড়ে উঠে, আবার অনেক এনজিও নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের চাঁদা দান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব এনজিওগুলো সম্পূর্ণ উদ্যোক্তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। কারণ এসব এনজিওসমূহ বিদেশী সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই যেসব এনজিওগুলো নিজেদের সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভর করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং সাহায্য সহযোগিতা কোন কারণে দলীয় কোন্দলে যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়। এনজিও'র এরকম অবস্থাকেই ভাসমান অবস্থা বলে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে আশার অবদান : দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে আশার অবদান অপরিসীম। আশা কম সুবিধাগ্রস্তদের জন্য অক্ষরজ্ঞান দান, উন্নয়ন শিক্ষা, সেশনে মুক্ত আলোচনার মুক্ত সুযোগ দান, বিবেকবুদ্ধি জাগ্রতকরণ প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করে। সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল আর্থিক উন্নয়ন। তাই ১৯৯১ সালে এক ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে আশা তার কার্যক্রম ও কৌশলের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে।

আশার পদক্ষেপ : দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে আশার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হল :

১. অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
২. সর্বাপেক্ষা মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
৩. নেতৃত্বের বিকাশ ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কম সুবিধাভোগী মানুষদের ক্ষমতায়নের সুযোগ করে দেওয়া।
৪. বিকল্প আয়ের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন করা এবং আর্থিক সাহায্য করা।
৫. অব্যবহৃত ও কম ব্যবহৃত জনশক্তির জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও বেকার সমস্যার সমাধান করা।
৬. পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭. মহাজনদের উপর জনগণের নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কাজ করা।
৮. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা দেওয়া।
৯. জনগণকে নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

এছাড়াও আশা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে আশা যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল তৃণমূল পর্যায়ে দল গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে গ্রামের অসহায় দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে আশা দল গঠন করে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যাতে করে তারা,

ক. দলের আদর্শ ও নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে।
খ. সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে বিশ্বাস, আস্থা, জোরালো মানসিক সম্পর্ক সৃষ্টি, দলীয় বন্ধন ও দলীয় ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।
গ. দলীয় চেতনা ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।
ঘ. বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেন দলীয় সঞ্চয় ও ফান্ড গড়ে তোলার মাধ্যমে সবার আর্থিক সামর্থ্য সমভাবে অর্জিত হয়।
ঙ. ঝরে পড়া দলীয় সদস্য সংখ্যার হার কমিয়ে আনা।

২. দরিদ্র জনগণকে সচেতন করে তোলা : আশার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র, অসহায় জনগণকে সচেতন করে তোলা। উন্নয়নের শিক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা হয়। আশা থেকে ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে এ শিক্ষা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আশা সাপ্তাহিক দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়। এসব শিক্ষার মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলা, দলীয় সংহতি, স্বাস্থ্য যত্ন, মহিলাদের আর্থসামাজিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান দানের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা হয়।

৩. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা : আশা এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে। সঞ্চয়ের মাধ্যমেই সেবা গ্রহণকারীরা তাদের মূলধন গঠন করে এবং আশা থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়। সদস্যগণ সপ্তাহে ১০-২০ টাকা হারে সঞ্চয় করে। এভাবে আশা এ সঞ্চয় কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে চলছে।

৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের সুবিধা : আশা ১৯৯১ সাল থেকে ঋণ প্রদানের সুবিধা দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সেবাগ্রহীতাদের সঞ্চয় গঠনের অভ্যাস দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে প্রস্তুত। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে স্থানীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই এ ঋণ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, ভাসমান এনজিওগুলো হল নিজের অর্থায়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করে তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। কারণ তাদের জন্য প্রয়োজন আর্থিক সহযোগিতা, যাতে তারা তাদের কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তবে বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও আশা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন।১০। **ব্র্যাক কি? ব্র্যাকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মুখ্য কর্মসূচিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।**

অথবা, **ব্র্যাক কি? ব্র্যাকের উদ্দেশ্যগুলো কী কী? এর প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ দাও।**

অথবা, **ব্র্যাক বলতে কী বুঝ? ব্র্যাকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিগুলো কী কী?**

অথবা, **ব্র্যাকের পরিচয় দাও। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বর্ণনা কর।**

উত্তর। ভূমিকা : ১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর দেশে একটি রিলিফ অর্গানাইজেশন হিসেবে ব্র্যাকের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে দু'বছরের মধ্যেই দারিদ্র্য বিমোচন ও দারিদ্র্য ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়ে "বাংলাদেশ রুরাল এডভ্যান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)" নামে এ সংস্থার নতুন নামকরণ হয়।

ব্র্যাক : বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসমূহ বহুমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা হল ব্র্যাক। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্ধ-লক্ষাধিক মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্র্যাকের কর্মপরিধিভুক্ত ৭৫ হাজার গ্রাম সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ লাখ। ১২ লাখ শিশু ব্র্যাকের স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনগুলোর সদস্যরা সঞ্চয় করেছে ২শ ২৫ কোটি টাকা। সদস্যদের অধিকাংশই মহিলা, যারা ৯৮ সালে ৮শ ৪০ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা পেয়েছে। ব্র্যাকের বর্তমানের এ অর্জিত সাফল্য ২৭ বছরের অবিরাম কর্মতৎপরতার ফল। বর্তমানে ব্র্যাক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, স্বাস্থ্য, বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রাম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের জন্য ঋণ প্রদান ইত্যাদিতে কার্যক্রম প্রসারিত করেছে।

ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১৯৭৬ সালে 'Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee' পরিবর্তন করে হয় 'Bangladesh Rural Advancement Committee.' বাংলাদেশ পল্লি প্রগতি পরিষদ সংক্ষেপে ব্র্যাক গঠন করা হয়। পল্লির মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বহুমুখী এবং গতিশীল, গ্রামীণ দরিদ্র এবং শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে ব্র্যাকের বহুমুখী উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্র্যাকের মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা। এ দু'টি লক্ষ্যার্জনে ব্র্যাকের কর্মসূচির মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. দরিদ্রদের নিয়ে কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করা।
২. সহজলভ্য ঋণদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
৩. তাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

ব্র্যাক এর লক্ষ্য দলকেন্দ্রিক কার্যক্রম বহুমুখী উদ্দেশ্যাভিমুখী। এক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্যকে সাধারণ ও নির্দিষ্ট এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে এ দু'ধরনের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল :

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য :

১. গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে সচেতন করা।
২. গ্রামীণ মহিলাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা।
৩. দরিদ্র প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা।
৪. বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাবলম্বন অর্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে অনুঘটক বা প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন।

৫. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি এবং সম্পদ অর্জন প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. উন্নয়ন গতিধারাকে গতিশীল করা।

খ. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ :

১. গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্রদের চাহিদা, সম্পদ ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করা।

২. অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকালে সকর্মসংস্থানে প্রকল্প নির্বাচন।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের নকশা প্রণয়ন বাস্তব ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

৪. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বস্তুগত সহায়তা প্রদান।

৫. দরিদ্রদের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নক্ষম করে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।

ব্র্যাকের মুখ্য কর্মসূচিসমূহ : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক পল্লির মানুষের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এতে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র ঋণদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনে সহায়তা এবং কুটিরশিল্প উৎপাদন বিপণন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম প্রসারিত। সামগ্রিকভাবে এর মুখ্য কর্মসূচিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. আর. ডি. পি (Rural Development Program-RDP) : রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আর. ডি. পি) বা পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মূলত গ্রামের ভূমিহীন এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষকে ভিলেজ অর্গানাইজেশন (গ্রাম সংগঠন) এ সংগঠিত করা হয়। বাংলাদেশের ৫২ হাজার ৩৩টি গ্রামের আর. ডি. পি ৭৪ হাজার ৪শ ২৮টি গ্রামে সংগঠিত করেছে। একটি পরিবার থেকে মাত্র ১ জনকেই গ্রাম সংগঠনের সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। এ হিসেবে বাংলাদেশের ২৮ লাখ পরিবার ব্র্যাকের রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় এসেছে। এসব প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, রেশম চাষ, মাছ চাষ, বৃক্ষ রোপণ এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়মূলক ব্যবসায় যেমন— মুদির দোকান, রিকশা, ভ্যান, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। ব্র্যাকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে গ্রাম সংগঠনের সদস্যরা যাতে তাদের আয়মূলক প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে এজন্য ব্র্যাক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শও ব্র্যাক কর্মীরা প্রদান করে থাকে। আর. ডি. পি প্রোগ্রামের আওতায় যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা হল :

ক. আর. ডি. পি প্রোগ্রামের আওতায় গ্রাম সংগঠনে প্রধানত দরিদ্র পশ্চাৎপদ নারীশ্রেণী সংগঠিত হয়, এক্ষেত্রে ব্র্যাকের প্রাথমিক ভূমিকা হল এ পিছিয়ে পড়া মানুষের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। ব্র্যাক পরিচালিত প্রায় ৭৪ হাজার ৪শ, ২৮টি গ্রাম সংগঠনে ২৮ লাখ দরিদ্র মানুষ নিয়ে এবং এদের ৯৬ শতাংশই হচ্ছে মহিলা।

খ. আর. ডি. পি প্রোগ্রামের আওতায় ৩ হাজার ২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ ঋণগ্রহিতাদের ৯৪ শতাংশই মহিলা। ঋণগ্রহিতাকে ১৫ শতাংশ হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয়। বর্তমানে মাসিক ঋণ বিতরণের হার প্রতি মাসে ৭৮ কোটি টাকা। এ ঋণের আওতায় মহিলাদের মালিকানাধীন মুদির দোকানের সংখ্যা ৩ হাজার ৯শ, ৫৬টি এবং রেস্টুরেন্টের সংখ্যা ৮শ ৪৩টি।

গ. আর. ডি. পি এর অধীনে ইনকাম জেনারেশন ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। এটি বাংলাদেশ সরকার এবং ব্র্যাকের একটি যৌথ উদ্যোগ। এ প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল দরিদ্র মহিলা, যাদের জমি নেই, যারা বিভিন্নভাবে সমাজে অবহেলিত, স্বামী পরিত্যক্তা, সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যাদের অবস্থান তাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন ও আয় সংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানো।

ঘ. আর. ডি. পির অন্যান্য ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামের মধ্যে পোল্ট্রি প্রোগ্রাম, লাইভ স্টক বিয়ারস, ফিশারিজ, সামাজিক বনায়ন, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি রয়েছে। বর্তমানে আর. ডি. পি প্রোগ্রামের ৫০ শতাংশ অর্থায়নে ব্র্যাকের আয়মূলক প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হয়।

২. এন এফপিই (Non Formal Primary Education-NFPE) : ব্যাংকের নন-ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন (এনএফপিই) বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ব্র্যাকের সমিতিভুক্ত পল্লি অঞ্চলের মায়েদের অনুরোধে ১৯৮৫ সালে মাত্র ২২টি স্কুল নিয়ে এনএফপিই প্রোগ্রাম চালু হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় এনএফপিই এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এসব স্কুলে ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এখান থেকে প্রাইমারি শিক্ষাপ্রাপ্তদের ৮৫ ভাগ পরবর্তীতে ফরমাল স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এনএফপিই এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল খুব অল্প খরচে শিক্ষার্থীর কাছে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছিয়ে দেওয়া। ভাড়া করা জায়গায় খড় দিয়ে স্কুলের কাঠামো তৈরি করা হয় এবং এসব স্কুল দেখতে একই রকম হয়। এসব স্কুলে ৮ থেকে ১০ বছরের শিশুদের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১১ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের বেসিক এডুকেশন প্রদান করা হয়। ব্র্যাকের এসব স্কুল থেকে ড্রপ-আউটের হার শতকরা ৫ ভাগেরও কম। অভিভাবকরা স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৩. এইচ পিপি : ব্র্যাকের হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন প্রোগ্রাম বা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি চিকিৎসা বঞ্চিত বিপুলসংখ্যক দরিদ্র মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে প্রজনন স্বাস্থ্য রোগ নিয়ন্ত্রণ,

মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, টিবি নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা, পুষ্টি প্রোগ্রাম ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪০টি হেলথ সেন্টার ও ১২ হাজার ৫শ ৩৬টি কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। সাড়ে তিন কোটি মানুষ ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। ১৯৭২ সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে এইচপিপি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমানে তা ২৬ বছরে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ৯৭ লাখ মানুষের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছে। দি বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রেশন প্রোগ্রাম (বি আই এনপি) ২৭ লাখ মানুষকে পুষ্টি সেবা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা, বিশেষ করে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু, মহিলা ও বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত মেয়েদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা। এসেনসিয়াল হেলথ কেয়ার (ইএইচ সি) সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় প্রায় ২ কোটি মানুষ মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, দূষণমুক্ত পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা ইম্যুনাইজেশন সহায়তা পেয়ে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, ব্র্যাকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কর্মসূচির সারবস্তু হল বাংলাদেশের দরিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।

প্রশ্ন॥১১॥ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের অবদান আলোচনা কর।

অথবা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাক কী ভূমিকা পালন করে? বর্ণনা কর।

অথবা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্র্যাকের কার্যক্রম আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : ১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ফজলে হোসেন আবেদের উদ্যোগে একটি ছোট ত্রাণ সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এ সংস্থা গ্রামের দরিদ্র মানুষ তথা ভূমিহীন, দুস্থ নারী, দিনমজুর ও জেলে প্রভৃতি শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নে ২০-৩০ জনকে নিয়ে দল গঠন করে সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে ব্র্যাক আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা : ব্র্যাক পল্লির গরিব শোষিত মানুষের বঞ্চনার অবসানের জন্য গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘস্থায়ী, উপযোগী ও স্বনির্ভর কর্মসূচি, খাওয়া-পড়া, রোজগারের জন্য যারা শ্রম বিক্রি করে, তারা ব্র্যাকের গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির টার্গেট গ্রুপ, সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে ব্র্যাকের কার্যক্রম প্রসারিত হলেও ব্র্যাক মূলত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি, মৎস্যজীবী, তাঁতি ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে কাজ করে।

ব্র্যাক দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে তা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হল :
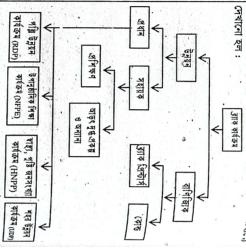
ব্র্যাক ১৯৮৬ সালে পল্লিউন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। ৪০-৪৫ জন সদস্য নিয়ে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এদের ৫০ শতাংশের কম জমি রয়েছে এবং বছরে অন্তত ১০০ দিন কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে। বর্তমানে সারা দেশে ৭৪,৪২৮টি গ্রাম সংগঠন কাজ করছে, যার অন্তর্ভুক্ত সদস্যের ৯৫ ভাগই মহিলা। সদস্যের ক্ষমতায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় তাদের সচেতন করে তোলার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ঘটানো এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা : গ্রাম সংগঠনের সদস্যগণ প্রতি মাসে একবার আলোচনা সভায় মিলিত হয় এবং এ সভায় ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকের উপস্থিতিতে সদস্যগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। এ আলোচনার মধ্যে শিক্ষা, মানবাধিকার, স্যানিটেশন, নারী নির্যাতন, অন্যান্য অত্যাচার প্রভৃতি সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এ সভার মূল লক্ষ্য। এছাড়া ব্র্যাক যৌতুক, অবৈধভাবে তালাক প্রদান, নারী নির্যাতন, বহুবিবাহের মত সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকার নেতৃবর্গকে নিয়ে ওয়ার্কশপ বা কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এ যাবৎ ৮০০টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম : ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ব্র্যাক এর ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যারা ব্র্যাকের সঞ্চয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত, তারা জামানত ছাড়াই নিজেদের ভোগ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ঋণ পেয়ে থাকে। উপার্জনমুখী কার্যক্রমের মধ্যে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন অন্যতম। কৃষি ব্যাংক ও ডানিডার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ৩,৩৩,০০০ মহিলা সদস্যকে হাঁস-মুরগি চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মৎস্য চাষের আওতায় ১,১৪,০২৪ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৩. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম : ১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৩৪,০০০ এর বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুলের মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এদের মধ্যে ৬৬ ভাগই মেয়ে শিশু যারা কখনও স্কুলের গণ্ডিতে প্রবেশ করে নি এরাই ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থী। এসব শিশুদের চাহিদা মোতাবেক কাছাকাছি অবস্থানে সুবিধামতো সময় নির্ধারণ করে পড়ানো হয়, যাতে শিশুদের স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। শিক্ষার উপকরণসমূহ ব্র্যাক সরবরাহ করে। বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ৫ টাকা করে ব্র্যাককে পরিশোধ করতে হয়। বছরে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্র্যাকের ব্যয় হয় ১,০০০ টাকা। এসব স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ৯৭ ভাগই মহিলা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা। এদের বেশিরভাগ শিক্ষকই নবম শ্রেণী পাশ। ১৫ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণ ছাড়াও এদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ বছরের কোর্স ব্র্যাক স্কুলে ৪ বছরে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী শ্রেণীতে উঠার জন্য কোন বার্ষিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না কারণ অবিরাম মূল্যায়নই শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট। এ যাবৎ ১.৫ মিলিয়ন শিশু ব্র্যাক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ৯০ ভাগ শিশু বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরেও ব্র্যাক কমিউনিটি ও স্কুল লাইব্রেরি কার্যক্রম, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭২৬০টি এবং কমিউনিটি লাইব্রেরির সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষের বেশি। দেশের ৪টি বিভাগীয় শহরে বর্তমানে প্রায় ১৫০০ স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যাক নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

৪. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যার কার্যক্রম : ডায়রিয়া বাংলাদেশের জন্য এক মহামারি। ১৯৮০ সালে ব্র্যাক এ মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লবণ ও গুড় দিয়ে কিভাবে শরবত বানাতে হয় তা শিখিয়ে দিয়ে আসে, যার ফলে আজ ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল শিশু ও মায়েদের রোগ-শোক এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে আনা, সে সাথে শিশুর জন্মহার কমানো, শিশু, বয়স্ক ও মহিলাদের পুষ্টিমান উন্নত করার মাধ্যমে দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য কায়েম করা।

৫. ব্র্যাক শহর উন্নয়ন কার্যক্রম : বর্তমানে শহরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ৬১% নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এদের দুরবস্থা দূর করতেও ব্র্যাক ১৯৯৮ সাল থেকে শহর উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করেছে। এর আগে ১৯৯২ সালে ১০টি স্কুল চালুর মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে ব্র্যাকের চালু স্কুলের সংখ্যা ১৩০০টিরও বেশি। এছাড়া ব্র্যাক ১৯৯৭ সাল থেকে ঋণ কার্যক্রমও চালু করেছে। ব্র্যাক শহর উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, সেসব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য উপাদান হল :

ক. অর্থনৈতিক কার্যক্রম, খ. স্বাস্থ্যসেবা,
গ. শিক্ষা কার্যক্রম, ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন ও
ঙ. পরামর্শ ও কার্যকরী সেবাদান কার্যক্রম ইত্যাদি।

নিম্নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

ক. অর্থনৈতিক কার্যক্রম : অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান, সঞ্চয় কার্যক্রম। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ ১৩৭০টি সংগঠন, ৪১,০০০ সদস্য ও ২২ মিলিয়ন টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩২ মিলিয়ন টাকা।

খ. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম : স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে রয়েছে মাতৃ শিশু স্বাস্থ্যসেবা, স্যালাইন তৈরি, ইপি আই কার্যক্রম, এইচ, আইভি, এইড্স সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রভৃতি।

গ. শিক্ষা কার্যক্রম : শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৪টি মেট্রোপলিটন সিটিতে প্রায় ১৫০০টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এ শিক্ষাক্রমের আওতায় রয়েছে গার্মেন্টস থেকে প্রত্যাগত ১৪ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের জন্য প্রায় ২৮০০টি স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম : পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্নমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ময়লা আবর্জনা ফেলা ও পরিষ্কার, শহরের দরিদ্রদের সচেতন করে তোলা। ব্র্যাক সদস্যরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন বাড়ি ও এলাকা থেকে ময়লা আবর্জনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে রাখে। এছাড়া ছড়িয়ে থাকা পলিথিন সংগ্রহ করে ড্রেনেজ সিস্টেমকে সচল রাখতেও ব্র্যাক সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. সহায়ক কার্যক্রম : ব্র্যাকের সহায়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আড়ং, দুগ্ধ প্রকল্প, ব্র্যাক প্রিন্টার্স প্রভৃতি। আড়ং প্রতিষ্ঠা করে ঢাকায় ১৯৭৮ সালে। বর্তমানে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম এবং সিলেটেও এর শাখা খোলা হয়েছে। এসব দোকানে ৩০ হাজারেরও বেশি দরিদ্র মহিলা ও গ্রামীণ কারুশিল্পীদের তৈরি দ্রব্য বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশেও এসব দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। ব্র্যাক এভাবে দরিদ্র গোয়ালাদের দুধের ন্যায্য দাম প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য ব্র্যাক দুগ্ধ প্রকল্প গড়ে তুলেছে।

উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, ব্র্যাক দরিদ্রতা দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার কার্যক্রমও যথাযথভাবে পালন করেছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ, মানবাধিকার ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রশ্ন ১২। **বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমের বিবরণ দাও।**

অথবা, **বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমসমূহ আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা দাও।**

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধনভুক্ত একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এটি সবচেয়ে পুরাতন ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রবীণদের কল্যাণে ১৯৬০ সালে ড. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ নিজ বাসভবনে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রম : এদেশের প্রবীণদের অধিকাংশই হচ্ছে গ্রামীণ, দরিদ্র, আয় উপার্জনহীন ও দুর্বল স্বাস্থ্যের। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জন্য নেই তেমন কোনো সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষও তাদের ব্যাপারে অসতর্ক ও অপ্রস্তুত। এমতাবস্থায় প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বৃদ্ধদের কল্যাণে নিম্নোক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।

১. প্রবীণ হাসপাতাল : প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে প্রবীণ হাসপাতাল। প্রবীণ হাসপাতালের বিভাগগুলো হলো কার্ডিওলোজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফ, দন্ত, নাক, কান, গলা, চক্ষু, এক্সরে, মেডিসিন, প্যাথোলজি, ফিজিওথেরাপি, মনোরোগ, চর্ম ও যৌন রোগ, হৃদরোগ, গাইনি প্রভৃতি। হাসপাতালে রয়েছে বহির্বিভাগ ও আন্তঃবিভাগ চিকিৎসা ব্যবস্থা।

ক. বহির্বিভাগ : সাপ্তাহিক সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বহির্বিভাগ প্রয়োজনীয় ঔষধসহ প্রবীণদেরকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকে। এতে মেডিসিন, নাক, কান, গলা, প্যাথোলজি, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগী দেখেন।

খ. আন্তঃবিভাগ : ৫০ শয্যার প্রবীণ হাসপাতাল চালু রয়েছে ১৯৯৯ সাল থেকে। হাসপাতালের আবাসিক কার্যক্রমে দৈনিক ৭০.০০ টাকা ফি দিয়ে সাধারণ বেডে এবং প্রতি ২০০ টাকা দিয়ে ক্যাবিনে রোগীরা থাকতে পারে। হাসপাতালে একজন দক্ষ সার্জন রয়েছে। নার্স ও ওয়ার্ড বয়ও রয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার সকল সুযোগ রয়েছে।

২. স্যাটেলাইট ক্লিনিক : প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করেছে। সপ্তাহে একবার হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী দেখেন। এখানে গরিব রোগীদের মধ্যে ব্যবস্থাপত্রসহ ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৩. চিত্তবিনোদন : প্রবীণদের জন্য অবসর বিনোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রবীণদের বিনোদনের জন্য রয়েছে বনভোজন, পুনর্মিলনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, টেলিভিশন প্রভৃতি মিডিয়ার মাধ্যমে ও প্রবীণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। শাখাগুলোতেও অনুরূপ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. পাঠাগার : এখানে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। পাঠাগারে ধর্মীয় বই, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, মনীষীদের আত্মজীবনী, কম্পিউটার সায়েন্স, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই, প্রকৌশল বিদ্যা, রচনাসমগ্র, সাময়িকী পত্র, পত্রিকা পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করেছে। ২০০ টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরি কার্ড সংগ্রহ করে যে কোনো প্রবীণ পাঠাগারের সদস্য হতে পারে।

৫. প্রকাশনা : প্রবীণ হিতৈষী সংঘের জার্নাল, প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে এর ৪১তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকায় প্রবীণদের কর্মসূচি, তাদের অবস্থা, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৬. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : প্রবীণদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সকলকে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রবীণদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে ভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে প্রবীণদের থেকে প্রশিক্ষক তৈরি করা হয়।

৭. প্রবীণ সেবা পুরস্কার : যারা তাদের জরাগ্রস্ত পিতা মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ি প্রমুখকে আন্তরিকভাবে স্নেহ, মমতা দিয়ে সেবা যত্ন, পরিচর্যা করেছেন তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এ প্রতিষ্ঠান থেকে মমতাময় ও মমতাময়ী প্রবীণ সেবা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে এই সংঘ।

৮. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন : প্রতিবছর ১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ২০০৬ সালে ১ অক্টোবর প্রবীণ দিবসের স্লোগান ছিল "Improving the Quality of life for older persons : Advancing UN Global strategies." UNFPA-এর সহায়তায় প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

৯. স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা : ১৯৮৮ সাল হতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। সকল পেশার মানুষ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এর ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা মাঠ পর্যায়ে পৌছানোর সুযোগ হয়েছে।

১০. আন্তর্জাতিক কার্যক্রম : প্রবীণ হিতৈষী সংঘ International Federation on Ageing এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। Australia Association of Gerontology, Help Age International ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথেও সংঘের কার্যকরী যোগাযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন Help Age International নামে একটি সংস্থার সাথে প্রতিষ্ঠান সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড করে আসছে।

১১. **প্রবীণদের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প :** প্রবীণদের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ২৬টি জেলার শাখার মাধ্যমে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পগুলো হচ্ছে হাঁস-মুরগির খামার, গরু মোটা তাজাকরণ, গো খামার, ছাগল পালন, শাকসবজি চাষ, রিক্সা-ভ্যান, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি। জেলা পর্যায়ে দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে পাচ্ছে।

১২. **যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম :** বর্তমানে প্রবীণ বিষয়টিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পেশাগত পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ সংঘে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রবীণদের অবস্থা জানার মাধ্যমে পেশাগত সাহায্য প্রদান করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্ররাও প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করছে।

১৩. **প্রবীণ নিবাস :** বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের তুলনায় শহরের প্রবীণদের সমস্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তারা প্রায়ই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণদের বসবাসের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রয়েছে একটি প্রবীণ নিবাস। বর্তমানে এখানে ২৬ জন নিবাসী বসবাস করেন। এখানে প্রবীণদের জন্য সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা, নামাজ ঘর, লাইব্রেরি, ক্যাবল সংযোগসহ টিভি, ইনডোর গেমস ইত্যাদি সুযোগ রয়েছে।

১৪. **অন্যান্য কার্যক্রম :** এর মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঠিক সম্পাদনের তত্ত্বাবধান করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, প্রবীণদের সেবা ও কল্যাণে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রবীণ সার্বিক কল্যাণার্থে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ।

১৫. **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি :** ভবিষ্যৎ কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

ক. জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লটারির ব্যবস্থা করা

খ. প্রবীণদের জন্য হোমকেয়ার সার্ভিস এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল প্রোগ্রাম চালু করা।

গ. দুই শিফটে হাসপাতাল কার্যক্রম চালু করা।

ঘ. সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ১০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প শুরু করা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণদের কল্যাণে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের শেষ পর্যায়। এ পর্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষই খুবই অসহায় আর নিঃসঙ্গ থাকে। তাই এ সময় তাদের প্রয়োজন হয় বিশেষ পরিচর্যার, সহমর্মিতার, বিনোদনের। বৃদ্ধদের এইসব দিক বিবেচনা করেই প্রবীণ হিতৈষী সংঘের আবির্ভাব। এ সংঘ বৃদ্ধদের কল্যাণে সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ, কার্যক্রম নির্ধারণ করে এবং তা প্রয়োগ করে। এতে করে বৃদ্ধরা উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রবীণদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন।১৩। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যা ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা কর।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যা ও তা দূরীকরণে তোমার সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যা ও তা সমাধানে সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে কার্যকর ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। পরিষদ তার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিবছর সরকারের কাছ থেকে আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ পেয়ে থাকে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যাসমূহ : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এটি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নিচে এর সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা :** জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে সবচেয়ে বেশি বাধার সৃষ্টি করছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাহী কমিটিতে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আমলা। তাদের কার্যক্রম ও মতভেদই জটিলতার সৃষ্টি করে।

২. **আর্থিক দৈন্যতা :** পরিষদের অন্যতম সমস্যা হলো আর্থিক দৈন্যতা। সঠিক সময়ে প্রায়ই যথাযথ অনুদান পাওয়া যায় না। ফলে পরিষদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৩. **জনঅংশায়নের সুযোগ কম :** পরিষদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। অথচ পরিষদের কার্যক্রমে জনঅংশায়নের সুযোগ অত্যন্ত কম এটি পরিষদের একটি নেতিবাচক দিক।

৪. **কর্মসূচির অপ্রতুলতা :** সময় উপযোগী কর্মসূচির অপ্রতুলতা রয়েছে পরিষদের। ফলে এটি পরিষদের জন্য একটি বাধা। এছাড়াও বাস্তবায়নে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা।

৫. **পরিষদের নিজস্ব আইন নেই :** জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিচালিত হচ্ছে শুধু একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে। ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। দেশের অন্য কোনো সংস্থা এভাবে দীর্ঘদিন রেজুলেশন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না।

৬. **নিজস্ব ভবন নেই :** এই পরিষদের নিজস্ব কোনো ভবন নেই। ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে প্রধান কার্যালয়ের স্থায়ী ঠিকানা আজও হয় নি।

৭. **প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব :** এই পরিষদ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। কিন্তু নিজস্ব কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নেই। ভাড়া করা অস্থায়ী সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

৮. দক্ষ জনশক্তির অভাব : পরিষদকে গতিশীল করার জন্য দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে। এছাড়াও কার্যক্রমে জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। সুতরাং দক্ষকর্মীর অভাব পরিষদের অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

৯. গণতন্ত্রের অপ্রতুলতা : এই পরিষদ মূলত আমলাদের নিয়ে পরিচালিত হয়। এখানে গণতান্ত্রিক চর্চা না হয়ে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটে। যা পরিষদের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

১০. প্রতিনিধিত্ব করার সীমাবদ্ধতা : এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো কর্মী প্রয়োজন। কিন্তু আমলা জটিলতা, গণতন্ত্রের অভাব প্রভৃতির কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র গড়ে ওঠে না। ফলে এই সমস্যা অন্যান্য সমস্যারও কারণ হয়ে ওঠে।

১১. সমন্বয় হীনতায় দুর্বলতা : যদিও বলা হয়ে থাকে যে, পরিষদ বিভিন্ন সংস্থার কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা খুব একটা লক্ষ করা যায় না। পরিষদ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করতে চায়।

১২. পেশাদার সমাজকর্মীর অভাব : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে পেশাদার সমাজকর্মী। কিন্তু এই পরিষদে সমাজকর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। যার ফলে পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধা প্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ পরিষদের নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। যেগুলো পরিষদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে পরিষদের কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করা যায়।

সমস্যা দূরীকরণে উপায়সমূহ : বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হলেও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। পরিষদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. আমলা জটিলতার নিরসন : পরিষদের সাংগঠনিক ও নির্বাহী কমিটি থেকে আমলাদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। কমিটিতে সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণির সদস্যদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এর ফলে আমলা জটিলতা কমে যাবে।

২. আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন : পরিষদের কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি করার জন্য আমলাদের দৌরাত্ম্য হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দৈন্যতা দূর করতে হবে। এজন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৩. জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দান : দেশের সাধারণ জনগণকে পরিষদের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এর ফলে পরিষদের কার্যক্রমে সফলতা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে সমস্যা অনেক কমে যাবে।

৪. কর্মসূচির সমন্বয় সাধন : পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়ের শূন্যতা দূর করতে হবে। এতে করে কাজের সুফল দ্রুত পাওয়া সম্ভব।

৫. পরিষদের নিজস্ব আইন তৈরি : বর্তমানে পরিষদ চলছে রেজুলেশনের মাধ্যমে। অথচ পরিষদ পরিচালনার জন্য আইন তৈরি অত্যাবশ্যক। আশার খবর হলো পরিষদের নিজস্ব আইন তৈরির কাজ চলছে।

৬. নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : পরিষদের নিজস্ব ভবন ও স্থায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। তাই অনতি বিলম্বে সরকারকে এ সমস্যার সমাধান কল্পে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্যও ভবন নির্মাণ করতে হবে।

৭. বিশেষজ্ঞের সহায়তা : বিশেষজ্ঞ মানে জ্ঞান, দক্ষতা, অনুশীলন, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যক্তি। কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এরা পরিষদের কার্যক্রমকে বেগবান ও গতিশীল করতে পারে।

৮. নীতি ও পরিকল্পনা সেল গঠন : পরিষদকে আরো জোরালো করার জন্য সমাজকল্যাণের নীতি ও পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে একটি সেল গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদগণ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। যা কিনা সমস্যা সমাধানে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে।

৯. যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা : পরিষদের কার্যক্রমকে যথাযথভাবে ও সঠিক সময়ে মনিটরিং করতে হবে। কেননা মনিটরিং কার্যক্রমের দুর্বলতা প্রকাশ করতে সহায়তা করে। কর্মসূচির সঠিক মূল্যায়নের নিমিত্তে একটি তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শাখা খোলা যেতে পারে। যা সমস্যা সমাধানে একটি অন্যতম উপায়।

১০. সমাজকর্মী নিয়োগ : পরিষদে পেশাদার সমাজকর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। কেননা সমাজকর্মী সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তাই সমস্যা সমাধানে বেশ করে পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগ দিতে হবে।

১১. গবেষণা ও প্রকাশনা : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তীব্রতর ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য গবেষণাধর্মী কাজের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এছাড়া একটি জ্ঞানকোষ প্রকাশ করা যেতে পারে।

১২. পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদির সরবরাহ : পরিষদে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব পরিলক্ষিত হয়। যা সমস্যাস্বরূপ। তাই পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বসার আসন সংখ্যা বাড়ানো, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, মাইক্রোফোন প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমস্যা দূর করা সম্ভব। এর ফলে পরিষদের সম্ভাবনা অবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। পরিষদের কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এদেশের মানুষ আত্মনির্ভরশীল হবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

✲✲✲✲✲✲✲✲

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

International co-operation for Social Welfare in Bangladesh

(ক) বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. কবে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটে?
উত্তর : যিশু খ্রিস্ট জন্মের পূর্ব হতেই আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটে।

২. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে?
উত্তর : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ।

৩. কোথায় গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করে?
উত্তর : গৌতম বুদ্ধ নেপালে জন্মগ্রহণ করে।

৪. গৌতম বুদ্ধ বিশ্ব মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে কী বলেন?
উত্তর : গৌতম বুদ্ধ বিশ্ব মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভিক্ষুগণ তোমরা বাহুর কল্যাণার্থে বিশ্বের প্রতি মমতাসহকারে মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে বের হয়ে যাও।

৫. বৌদ্ধধর্মের পরে কী ধর্মের প্রবর্তন ঘটে?
উত্তর : বৌদ্ধধর্মের পরে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন ঘটে।

৬. খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন ঘটে কবে?
উত্তর : খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন ঘটে আজ থেকে দুই হাজার একদশক পূর্বে।

৭. খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট কী বলেন?
উত্তর : খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট বলেন, "ঈশ্বরকে ভালোবাস, তোমার প্রতিবেশিকে ভালোবাস। প্রতিবেশী অর্থ স্বদেশবাসী নয়, বিশ্ববাসী; যারা একই ঈশ্বরের সন্তান।"

৮. খ্রিস্টধর্মে কী বিশ্বাস করা হয়?
উত্তর : খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করা হয়, "মানুষের সেবা করার মাধ্যমেই স্রষ্টার সেবা করা যায়।"

৯. খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম কে করেন?
উত্তর : খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করেন রোম সম্রাট কনস্টালটিন।

১০. কত খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়?
উত্তর : ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়।

১১. সপ্তম শতকে ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) যাকাতকে কী বলে ঘোষণা করেন?
উত্তর : সপ্তম শতকে ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) যাকাতকে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি বলে ঘোষণা করেন।

১২. কত সালে Baptist Missinary Society প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৭৭৪ সালে Baptist Missinary Society প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩. Baptist Missinary Society কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : Baptist Missinary Society লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪. কত সালে Young Men's Christain Association (YMCA) নামক বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠে?
উত্তর : ১৮৪৪ সালে Young Men's Christain Association (YMCA) নামক বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

১৫. কোথায় Young Men's Christain Association (YMCA) গড়ে উঠে?
উত্তর : লন্ডন শহরে Young Men's Christain Association (YMCA) গড়ে উঠে।

১৬. আমেরিকায় Young Men's Christain Association (YMCA) কত সালে গড়ে উঠে?
উত্তর : আমেরিকায় Young Men's Christain Association (YMCA) ১৯৬১ সালে গড়ে উঠে।

১৭. কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Young Men's Christain Association (YMCA)?
উত্তর : ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Young Men's Christain Association (YMCA)।

১৮. রেডক্রস প্রতিষ্ঠানটি কে গড়ে তোলেন?
উত্তর : রেডক্রস প্রতিষ্ঠানটি জ্যাঁ হেনরি ডুনান্ট গড়ে তোলেন।

১৯. কত সালে রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৮৬৩ সালে রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০. কোথায় রেডক্রস প্রতিষ্ঠিনটি গড়ে তোলা হয়?
উত্তর : সুইজারল্যান্ডে রেডক্রস প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়।

২১. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কোন দেশের একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন?
উত্তর : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের দেশের একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন।

২২. **কত সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩. **কত সালে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৮৯৭ সালে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪. **কত সালে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ এর কার্যক্রম শুরু হয়?**
উত্তর : ১৮৯৯ সালে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ এর কার্যক্রম শুরু হয়।

২৫. **কিসের আলোকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : রামকৃষ্ণের প্রচারিত ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৬. **কত সালে বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠিত করা হয়?**
উত্তর : ১৯০৭ সালে বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

২৭. **কে বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর : রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠা করেন।

২৮. **কত সালে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯০৫ সালে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৯. **কত সালে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস?**
উত্তর : ১৯১৯ সালে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস।

৩০. **কত সালে কেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালে কেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩১. **কত সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৫০ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩২. **ওয়ার্ল্ড ভিশন কোন আদর্শে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন?**
উত্তর : ওয়ার্ল্ড ভিশন খ্রিস্টানধর্মের আদর্শে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন।

৩৩. **কত সালে Oxfum প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৪২ সালে Oxfum প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৪. **বর্তমানে বিশ্বে কতটি দেশে অক্সফামের অফিস রয়েছে?**
উত্তর : বর্তমানে বিশ্বে ৭৭ টি দেশে অক্সফামের অফিস রয়েছে।

৩৫. **কত সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৬. **জাতিসংঘের সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : জাতিসংঘের সদরদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

৩৭. **জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাগুলো কী কী?**
উত্তর : জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাগুলো যেমন- ILO, HHO, IFAD, UNICEF, UNDP, UNHCR, WTO ইত্যাদি।

৩৮. **"আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলা হয়।" –উক্তিটি কার?**
উত্তর : মোঃ আতিকুর (২০০৫:১৬৯) বলেন।

৩৯. **"International social welfare means the welfare activities in the global level run by government or prinate agency or agencies."– উক্তিটি কার?**
উত্তর : Md. Shohidul Islam (2004) বলেছেন।

৪০. **আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**
উত্তর : আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

৪১. **আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো কী কী?**
উত্তর : আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো (i) আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারি সংস্থা (ii) আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেসরকারি সংস্থা (iii) জাতীয় সরকারি সংস্থা (iv) জাতীয় বেসরকারি সংস্থা।

৪২. **CARE এর পূর্ণ অর্থ কী?**
উত্তর : CARE এর পূর্ণ অর্থ Co-operation of American Relief Everywhere।

৪৩. **কত সালে সাবেক পাকিস্তান আমলে এদেশে কেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়?**
উত্তর : ১৯৪৯ সালে সাবেক পাকিস্তান আমলে এদেশে কেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়।

৪৪. **কত সালে কেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালে কেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৫. **কত সালে কেয়ার এদেশে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিশু খাদ্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে গুঁড়ো দুধ বিতরণ শুরু করে?**
উত্তর : ১৯৫৬ সালে কেয়ার এদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিশু খাদ্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে গুঁড়ো দুধ বিতরণ শুরু করে।

৪৬. **কত সালে কেয়ার প্রথম ঢাকায় অফিস স্থাপন করে?**
উত্তর : ১৯৬২ সালে কেয়ার প্রথম ঢাকায় অফিস স্থাপন করে।

৪৭. **কত সালে কেয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় কবলিতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে?**
উত্তর : ১৯৭০ সালে কেয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় কবলিতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে।

৪৮. **কেয়ার বাংলাদেশ এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষামূলক প্রকল্পে প্রদান উদ্দেশ্য দু'টি কী?**
উত্তর : কেয়ার বাংলাদেশ এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষামূলক প্রকল্পে প্রদান উদ্দেশ্য দু'টি যথা : (i) বন্যার কবল থেকে স্থানীয় সম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া এবং (ii) স্বল্প ব্যয়ে কারিগরি সহযোগিতায় গৃহনির্মাণ করে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বন্যার ক্ষতিকর অর্থনৈতিক প্রভাব কমিয়ে আনা।

৪৯. **স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টরের মূল লক্ষ্য কী?**

উত্তর : স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়ন এবং নারী ও শিশুদের জীবন পরিচর্যার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন।

৫০. **স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন উদ্যোগ প্রকল্পের কর্মসূচিগুলো কী কী?**

উত্তর : স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন উদ্যোগ প্রকল্পের কর্মসূচিগুলো (i) সাম্প্রতিক টিকা দান কর্মসূচি (ii) ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ (iii) পরিবার পরিকল্পনা (iv) ভিটামিন ও ক্যাপসুল বিতরণ।

৫১. **২০০৯ সালের মধ্যে সৌহার্দ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ১৮টি জেলার কয়টি দুঃস্থ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান করে?**

উত্তর : ২০০৯ সালের মধ্যে সৌহার্দ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ১৮টি জেলার ৪০,০০,০০০ লক্ষ্য দুঃস্থ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান করে।

৫২. **কত সালে World Vision তার কার্যক্রম শুরু করে?**

উত্তর : ১৯৫০ সালে World Vision তার কার্যক্রম শুরু করে।

৫৩. **কত সালে World Vision বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে?**

উত্তর : ১৯৭০ সালে World Vision বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে।

৫৪. **World Vision এর প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর : World Vision এর প্রতিষ্ঠাতা রিভারেন্ট বব পিয়ার্সন।

৫৫. **প্রতিষ্ঠাতা রিভারেন্ট বব পিয়ার্সন কোন দেশের নাগরিক?**

উত্তর : প্রতিষ্ঠাতা রিভারেন্ট আমেরিকার পিয়ার্সন কোন দেশের নাগরিক।

৫৬. **World Vision কত সালে আন্তর্জাতিক সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করে?**

উত্তর : World Vision ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করে।

৫৭. **কত সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় কার্যক্রম শুরু করে?**

উত্তর : ১৯৭২ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় কার্যক্রম শুরু করে।

৫৮. **World Vision কয়টি মূল্যবোধের আলোকে কাজ করে?**

উত্তর : World Vision ৬টি মূল্যবোধের আলোকে কাজ করে।

৫৯. **কত সালে World Vision বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কর্যক্রম শুরু করে?**

উত্তর : ১৯৭৩ সালে World Vision বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কর্যক্রম শুরু করে।

৬০. **World Vision কোন ৬টি মূল্যবোধের আলোকে কাজ করে?**

উত্তর : World Vision কোন ৬টি মূল্যবোধের আলোকে কাজ করে যথা : (i) আমরা খ্রিস্টান (ii) আমরা দারিদ্রদের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল (iii) আমরা মানুষকে শ্রদ্ধা করি (iv) আমরা বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করি (v) আমরা অংশীদার (vi) আমরা দায়িত্ববান।

৬১. **কোন সাল থেকে World Vision বাংলাদেশে শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকে?**

উত্তর : ১৯৭৫ সাল থেকে World Vision বাংলাদেশে শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকে।

৬২. **২০০৩ অর্থবছরে World Vision Bangladesh কত জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে?**

উত্তর : ২০০৩ অর্থবছরে World Vision Bangladesh. শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে।

৬৩. **World Vision শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহায়তায় কর্মসূচির আওতায় কোন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে?**

উত্তর : World Vision শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহায়তায় কর্মসূচির আওতায় যেসব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। যেমন— (i) নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ (ii) ভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন (iii) শিক্ষা উপরকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা।

৬৪. **ওয়ার্ল্ড ভিশন তার নিজস্ব উন্নয়ন এলাকাগুলোতে প্রধানত কয় ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে?**

উত্তর : ওয়ার্ল্ড ভিশন তার নিজস্ব উন্নয়ন এলাকাগুলোতে প্রধানত তিন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

৬৫. **ওয়ার্ল্ড ভিশন তার নিজস্ব উন্নয়ন এলাকাগুলোতে কী কী ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে?**

উত্তর : ওয়ার্ল্ড ভিশন তার নিজস্ব উন্নয়ন এলাকাগুলোতে যেসব ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে যথা : (i) প্রতিরোধ মূলক স্বাস্থ্য সেবা (ii) নিবারণমূলক স্বাস্থ্য সেবা (iii) এইচ আইভি/ এইডস প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি।

৬৬. **কত সালে Oxfum সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৪২ সালে Oxfum সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৭. **বাংলাদেশে অক্সফামের কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে?**

উত্তর : বাংলাদেশে অক্সফামের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭১ সালে।

৬৮. **কোন সাল থেকে অক্সফাম কাজ করে যাচ্ছে?**

উত্তর : ১৯৯৩ সাল থেকে অক্সফাম কাজ করে যাচ্ছে।

৬৯. **কত সালে Action AID সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৭২ সালে Action AID সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭০. **অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে কত সালে?**

উত্তর : অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে ১৯৮৩ সালে।

৭১. **ICDDRB এর পূর্ণ অর্থ কি?**
উত্তর : ICDDRB এর পূর্ণ অর্থ International Cholera and Diarrhoea Reserch, Bangladesh.

৭২. **ICDDRB কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : ICDDRB ঢাকা শহরে মহাখালিতে অবস্থিত।

৭৩. **কত সালে ঢাকায় পাকিস্তানি কলেরা গবেষণা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৬০ সালে ঢাকায় পাকিস্তানি কলেরা গবেষণা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭৪. **কমিউনিজম বিস্তার রোধে কত সালে গঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা?**
উত্তর : কমিউনিজম বিস্তার রোধে ১৯৬৬ সালে গঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা।

৭৫. **কে রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর : হেনরি ডুনান্টারেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৭৬. **কত সালে রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়?**
উত্তর : ১৮৬৩ সালে রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৭৭. **হেনরি ডুনান্ট কোন দেশের অধিবাসী?**
উত্তর : হেনরি ডুনান্ট সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী।

৭৮. **মুসলিম বিশ্বে রেডক্রস সোসাইটি কী নামে পরিচিত?**
উত্তর : মুসলিম বিশ্বে রেডক্রস সোসাইটি রেডক্রিসেন্ট নামে পরিচিত।

৭৯. **কত সালে বাংলাদেশে 'রেডক্রস সোসাইটি' তার কার্যক্রম শুরু করে?**
উত্তর : ১৯৪৯ সালে বাংলাদেশে 'রেডক্রস সোসাইটি' তার কার্যক্রম শুরু করে।

৮০. **কত সালে বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নামকরণ করা হয়?**
উত্তর : ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নামকরণ করা হয়।

৮১. **দেশ জাতি ধর্মভেদ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কয়টি নীতি বা আদর্শআছে?**
উত্তর : দেশ জাতি ধর্মভেদ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাতটি নীতি বা আদর্শআছে।

৮২. **দেশ জাতি ধর্মভেদে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতি বা আদর্শগুলো কী কী?**
উত্তর : দেশ জাতি ধর্মভেদে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতি বা আদর্শগুলো (ক) মানবতা (খ) একতা (গ) স্বাধীনতা (ঘ) সাম্য (ঙ) সর্বজনীনতা (চ) নিরপেক্ষতা (ছ) স্বেচ্ছামূলক।

৮৩. **আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটে কখন?**
উত্তর : যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে।

৮৪. **ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে?**
উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (স)।

৮৫. **কত খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দেন?**
উত্তর : ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে।

৮৬. **কত খ্রিস্টাব্দে চীন ও মধ্যপ্রাচ্যে হাসপাতালের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে?**
উত্তর : ৫৪২ খ্রিস্টাব্দে।

৮৭. **BMS এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : Baptist Missionary Society.

৮৮. **BMS কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৭৯৪ সালে।

৮৯. **BMS কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : লন্ডনে।

৯০. **YMCA এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : Young Men Christian Association.

৯১. **YMCA কত সালে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৮৪৪ সালে লন্ডনে।

৯২. **কত সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

৯৩. **জাতিসংঘের সদরদপ্তর কোথায়?**
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে।

৯৪. **জাতিসংঘের তিনটি বিশেষ সংস্থার নাম লিখ।**
উত্তর : ILO, FAO ও WHO.

৯৫. **ILO এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : International Labour Organization.

৯৬. **FAO এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : Food and Agricultural Organization.

৯৭. **WHO এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : World Health Organization.

৯৮. **IFAD এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : International Food and Agricultural Development.

৯৯. **UNDP এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : United Nations Development Programme.

১০০. **WTO এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : World Trade Organization.

১০১. **আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কাকে বলে?**
উত্তর : একটি সংস্থা দেশের আঙিনা পেরিয়ে অন্যান্য দেশে যখন তার সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলে।

১০২. **তিনটি আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার নাম লিখ।**
উত্তর : i. UNICEF, ii. WHO ও iii. UNDP.

লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও কর্মসূচি অনুসারে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
উত্তর : ৪ ভাগে।

CIDA এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Canadien International Development Agency.

ইউনিসেফ কী?
উত্তর : জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা।

কতসালে ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়।
উত্তর : ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর।

UNICEF কত সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়?
উত্তর : ১৯৬৫ সালে।

UNICEF কতটি কাউন্ট্রি অফিসের মাধ্যমে কাজ করে?
উত্তর : ২০০টির অধিক।

ইউনিসেফ এর নির্বাহী বিভাগ কয় সদস্য বিশিষ্ট?
উত্তর : ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট।

ইউনিসেফ কতটি দেশে শিশু কল্যাণ কাজ করছে?
উত্তর : ১৬১টি দেশে।

ইউনিসেফ- এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে।

ইউনিসেফ এর দুটি লক্ষ্য লিখ?
উত্তর : ১. শিশুদের জন্য সর্বোত্তম জীবন বিধানের নিশ্চিত করা, ২. শিশুদের পুষ্টির উন্নয়ন।

ইউনিসেফ এর দুটি ভূমিকা লিখ।
উত্তর : ১. শিশুদের পুষ্টির উন্নয়ন ও ২. রোগ প্রতিরোধে সহায়তা।

বিশ্বে প্রতিদিন কতজন শিশু HIV তে আক্রান্ত হচ্ছে।
উত্তর : ১,৬০০ জন (১৫ বছরেও কম বয়সী)

বিশ্বের কত কোটি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে?
উত্তর : ২৫,০০,০০,০০০ (পঁচিশ) কোটি শিশু।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ লিখ।
উত্তর : ১. শিক্ষামূলক কাজ ও ২. স্বাস্থ্য সুরকামূলক কাজ।

ইউনেস্কো (UNESCO) কী?
উত্তর : জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা।

কত সালে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর।

ইউনেস্কোর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।

ইউনেস্কোর প্রথম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদ কোনটি?
উত্তর : সাধারণ সম্মেলন ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদ।

১২২. ইউনেস্কোর ২টি লক্ষ্য কী?
উত্তর : ১. শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ও ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধন।

১২৩. বাংলাদেশে ইউনেস্কোর দুটি কার্যক্রম লিখ।
উত্তর : ১. শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম ও ২. ঐতিহ্য সংরক্ষণ

১২৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কী?
উত্তর : বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা।

১২৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
উত্তর : ১৯৪৮ সনের ৭ এপ্রিল।

১২৬. WHO-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে।

১২৭. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস কোনটি?
উত্তর : ৭ এপ্রিল।

১২৮. WHO-এর কয়টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।
উত্তর : ৬টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

১২৯. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৌশলগত দিক নিদের্শনা কয়টি?
উত্তর : ৪টি।

১৩০. বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দুটি কার্যক্রম লিখ।
উত্তর : ১. সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা ও ২. মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

১৩১. ILO-কবে গঠিত হয়?
উত্তর : ১৯১৯ সালে।

১৩২. বাংলাদেশ কত সালে আই এল ও'র সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭২ সালের ২২ জুন।

১৩৩. কত সালে শ্রমজীবী ইন্টারন্যাশনাল গঠিত হয়।
উত্তর : ১৯৬৪ সালে।

১৩৪. আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে কতজন প্রতিনিধি থাকে?
উত্তর : প্রতিটি দেশের ৪ জন করে।

১৩৫. আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস কোথায়?
উত্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে।

১৩৬. বাংলাদেশ আইএল ও (ILO) এর কততম সদস্য?
উত্তর : ১২৩ তম সদস্য।

১৩৭. বাংলাদেশে আইএলও'র দুটি কার্যাবলি উল্লেখ কর।
উত্তর : ১. পল্লী উন্নয়মূলক কাজ, ২. জনশক্তি পরিকল্পনা।

১৩৮. কত সালে FAO প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর।

১৩৯. বাংলাদেশ FAO এর কততম সদস্য?
উত্তর : ১২৮ তম।

১৪০. বাংলাদেশ কত সালে FAO এর পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭৪ সালের ১২ নভেম্বর।

১৪১. বাংলাদেশে FAO এর দুটি কাজ লিখ।
উত্তর : ১. কৃষির উন্নয়ন ও ২. খাদ্য নিরাপত্তামূলক কাজ।

খ বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মসূচি আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। আমাদের দেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির ক্রমবিকাশ ও প্রয়োগে আন্তর্জাতিক সংস্থার এরূপ ভূমিকা প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠাগুলোর কার্যক্রম : নিম্নে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. জাতিসংঘ : জাতিসংঘের মাধ্যমেই বাংলাদেশে প্রথম পেশাদার আধুনিক সমাজকর্মের প্রবর্তন হয়। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে আধুনিক পেশাদার নীতিমালা নির্ভর সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য দক্ষকর্মী তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ যেমন- UNICEF, ILO, WHO, FAO প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

২. রেডক্রস : দুস্থ মানবতার সেবায় বাংলাদেশের রেডক্রসের অবদান অপরিসীম। এ সংস্থাটি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় অসহায় মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। তাছাড়া রেডক্রস সোসাইটি চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রবর্তন, শিশু পরিচর্যা এবং মাতৃসদন পরিচালনা করে থাকে। রেডক্রস সোসাইটি শিশুদের খাদ্য সরবরাহ করা, ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পরিচালনা করা প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে।

৫. ইউনিসেফ : সমাজের অবহেলিত ও অসহায় শিশুদের উপার্জনক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইউনিসেফ নিজস্ব উদ্যোগে কতকগুলো বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান করতে এসব বিদ্যালয় শিশুদেরকে শক্তি সামর্থ্য লাভে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম।

৩. সার্ক : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকা ও ভুটান এ সাতটি দেশ মিলে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক গঠন করে। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা হল সার্কের মূল লক্ষ্য। সার্কের মাধ্যমে পল্লিউন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৪. কেয়ার : আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অবকাঠামো নির্মাণে কেয়ারের অবদান অপরিসীম। কাজের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচির মাধ্যমে কেয়ার রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে পল্লির মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। কেয়ারের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লিখিতভাবে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রশ্ন॥২॥ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। **ফ্রিডল্যান্ডার** এর ভাষায়, "International social work in its narrower sense comprises welfare activities under anspicies of international agencies government or voluntary bo[illegible] social services in foreign countries may also be called international social work."

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য : বিশ্বে যতগুলো দরিদ্র দেশ রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের স্থান সর্বপ্রথমে। এদেশের মানুষের সার্বিকভাবে উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সীমিত সম্পদ মোটেও যথেষ্ট পরিমাণ নয়। এজন্য প্রয়োজন হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতা। কেননা এদের সহযোগিতার মাধ্যমেই বস্তুগত সমৃদ্ধি এনে দরিদ্রতা দূর করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কারিগরি সাহায্য লাভে : জাতীয় প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সাধন, উন্নতমানের প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লাভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া সেবার মান উন্নয়নে দক্ষকর্মী তৈরি ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদানেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

৩. ফলপ্রসূ ও অর্থবহ সেবাকর্মের পথ নির্দেশনা লাভে : ফলপ্রসূ ও অর্থবহ সেবাকর্মের পথ নির্দেশনা লাভে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আন্তর্জাতিকভাবে সেবা কার্যক্রমসমূহে দক্ষ পেশাদার কর্মীর সুশৃঙ্খল সেবা পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুতরাং আমাদের দেশের অবহেলিত মানুষের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. তাৎক্ষণিক ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা : তাৎক্ষণিক ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারি, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগের সময় জাতীয় তৎপরতা খুবই সীমিত। সুতরাং বলা যায়, বাস্তবে জাতীয় তৎপরতার চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. পরিপূরক তৎপরতা হিসেবে : সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকারি তৎপরতার সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতাসমূহ সহায়ক ও পরিপূরক অবদান রাখে। ফলে জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনও সহজ হয়। এ কারণে সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. ছোটখাট সমস্যা মোকাবিলায় : বাংলাদেশের হাজারো ছোটখাট সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারের মনোযোগ দেওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। তাই এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে : বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব মানবসমাজের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। আর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতাই এক্ষেত্রে সুখশান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং অবহেলিত ও দুর্যোগ কবলিত মানুষের নিরাপত্তা বিধান করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা বিশ্ব মানবসমাজের মঙ্গলার্থে তথা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন।৩। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশে যেসব প্রকল্প পরিচালনা করছে সেগুলোর সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালিত প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে তা আলোচনা কর।

উত্তর।। ভূমিকা : পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাহায্য সংস্থা কেয়ার ১৯৪৯ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কেয়ারের ভূমিকা ও কর্মতৎপরতায় স্কুল ও স্কুল পূর্ব শিশুদের দুধ সরবরাহ এবং নির্মাণ কাজে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সালে সরকারের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে কেয়ার আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করে।

কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালিত প্রকল্প : আমাদের দেশে কেয়ার যেসব প্রকল্প পরিচালনা করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ল্যান্ডলেস ওউনড্, টিউবওয়েল ইউজারস্ সাপোর্ট (লোটাস), নারী উন্নয়ন প্রকল্প (ডব্লিউ ডি পি), রুরাল মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (আর এম পি), লোকাল ইনস্টিটিউটস ফার্মার্স ট্রেইনিং (লিফট), ওমেন ফর হেলথ এডুকেশন (ডব্লিউ এইচ ই), ট্রেনিং ইম্যুনাইজারস্ ইন দ্য কম্যুনিটি অ্যাপ্রোচ (টিসা) ইত্যাদি।

লোটাস, ডব্লিউ ডি পি, লিফট, ডব্লিউ এইচ ই ও টিসা আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। লোটাস হল ভূমিহীন কৃষকদের সেচ কাজে সহযোগিতামূলক একটি প্রকল্প। ডব্লিউ ডি পি প্রকল্প গ্রাম পর্যায়ে মহিলাদের প্রকল্প, এটি আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে কাজ করে থাকে। লিফট হল চাল ছাড়া অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রকল্প। কেয়ার এভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কেয়ার প্রায় ২৫ কোটি ডলারে কাজ করছে। ১৯৮৭ অর্থবছরে তাদের বাজেট প্রায় ৬ কোটি ডলার। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেয়ার ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে ১৭টি উপকেন্দ্র আছে। কেয়ারের ১২০০ দেশীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ১৬ জন আন্তর্জাতিক সদস্য রয়েছে, যারা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র লোকদের পাশে থেকে তাদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি হচ্ছে কেয়ারের সর্ববৃহৎ প্রকল্প। এতে ভূমিহীনদের প্রায় আড়াই কোটি শ্রমিককে দিবসের কাজে লাগানো হয়। রাস্তা, বাঁধ নির্মাণ এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রায় ৫০ লক্ষ ভূমিহীন এ কাজের সাথে সাময়িকভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে (ইউ এস এ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ লক্ষ)। ৪ কোটি ডলারের বাজেট এ প্রকল্পেই যুক্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৮০ লক্ষ ডলার দিয়েছে, বাকি ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার দিয়েছে ইউএসএইড। কেয়ার সক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৮ লক্ষ ডলারের প্রকল্প হল লোটাস প্রকল্প। এ প্রকল্প পরিচালিত হয় কেয়ার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে । এখানে তহবিল যোগান দিচ্ছে কেয়ার ইউ এস, কেয়ার ব্রিটেন এবং কৃষি ব্যাংক। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে যেসব স্থানে সেগুলো হল ধামরাই, টাঙ্গাইল, শ্রীপুর, শিবপুর, পার্বতীপুর ও রংপুরে। উপরিউক্ত স্থানগুলোতে লোটাস প্রকল্পের মাধ্যমেই কাজ করা হয়।

নারী উন্নয়ন প্রকল্পে ঢাকা, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় ৩১৬টি গ্রামের ৭৫,০০০ মহিলা যুক্ত রয়েছে। এখানে বাজেট হচ্ছে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্তভাবে পরিচালিত এ প্রকল্পে অর্থসাহায্য করছে কেয়ার ইউএস, নোরাড ও কেয়ার ফ্রান্স।

লিফট প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল, নরসিংদীর ১৩ হাজার প্রান্তিক ও ভূমিহীনদের মধ্যে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে অর্থ যোগান দেয় নেদারল্যান্ড সরকার, ইতালি সরকার এবং কেয়ার ইউ.এস.এ। যেসব দেশ থেকে অর্থের যোগান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে সুইডিশ, সিডা ইত্যাদি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, কেয়ার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নত ধনী রাষ্ট্র থেকে সাহায্য নিয়েই বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে, পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অনুদান দিয়ে থাকে। গ্রামীণ টার্গেট গ্রুপগুলোর আয় এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়ায় কেয়ার অনুমোদন করে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য সংস্থার মত কেয়ারের অবদানও প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন॥৪॥ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কি? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা দাও। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ব্যাখ্যা দাও। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, শ্রমিক চিকিৎসা, শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণসহ নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সদস্য। সদস্য হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের শ্রমিকদের উন্নয়নে নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণ, শ্রমিকদের অধিকার আদায়, চিত্তবিনোদন, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (International Labour Organization) হল, জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ILO জাতিসংঘের সাথে একীভূত হয়। যদিও এর জন্ম হয়েছিল ১৯১৯ সালে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার মূল কাজ হল শ্রমিকদের যাবতীয় উন্নয়ন সাধন। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মঙ্গল সাধনই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া সরকার মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নকে একত্রিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা ILO এর অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও শ্রমিকদের সমিতি করার স্বাধীনতা, শ্রম ঘণ্টা নির্ধারণ, বেতন নির্ধারণ, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, ছুটি নির্ধারণ, সামাজিক বীমা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও ILO এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিধিভুক্ত।

কার্যক্রম : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

১. শ্রমিকদের চাকরি, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম।
২. বিভিন্ন দেশের সরকারকে শ্রম মান নিরূপণে সহায়তা দানের জন্য ILO আন্তর্জাতিক শ্রম মান নিরূপণ করে। সে মান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার তাদের মান নির্ধারণ করবে।
৩. আন্তর্জাতিক শ্রম নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারকে নীতিমালা অনুসরণে সহায়তা করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. শ্রমিকদের কল্যাণে সমস্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, পঠনপাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ILO সুপরিচিত। ILO সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ ও যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে শ্রম সমস্যা ব্যাপক। তাই বাংলাদেশে ILO এর কাজ করার ক্ষেত্রও ব্যাপক। বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার আদায়, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য ILO বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এ সংস্থা আরও বেশি ভূমিকা পালন করবে শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য।

প্রশ্ন॥৫॥ বাংলাদেশে ILO এর কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে ILO এর কর্মকৌশল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে ILO এর কর্মসূচি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, শ্রমিক চিকিৎসা, শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণসহ নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সদস্য। সদস্য হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের শ্রমিকদের উন্নয়নে নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণ, শ্রমিকদের অধিকার আদায়, চিত্তবিনোদন, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে ILO এর কার্যক্রম :

১. গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি : বাংলাদেশে ILO প্রথম যে কর্মসূচি গ্রহণ করে তা হল গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি। এ কর্মসূচির সময়কাল হল ১৯৭৩-১৯৮৩। এটি গ্রামোন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করেছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

- ক. গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রামের পূর্ত কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও জোরদারকরণ।
- খ. গ্রাম এলাকায় কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটানো।
- গ. গ্রামের যুব সমাজকে হাঁস-মুরগি খামার গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
- ঘ. গ্রামীণ লোকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান।
- ঙ. গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এছাড়াও ঐ দশকে বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়নে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ :

- ক. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও তার উন্নয়ন সাধন।
- খ. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ উন্নয়নে কারিগরি সাহায্যদান।
- গ. জলসেচ পাম্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- ঘ. সড়ক পরিবহণ কর্মসূচিকে সহযোগিতা দান।

২. জনশক্তি পরিকল্পনা ও জনসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি : ১৯৭৩-৮৩ দশকে বাংলাদেশের জনশক্তি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয় ILO। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ক. কর্মসংস্থান Related Service Sector এর উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ করা।
- খ. পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- গ. বাংলাদেশের জনসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়ানো।

৩. ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি : ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল ILO. ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাহায্য দান ও উন্নতি সাধনে সক্ষম করে তোলা হয়। এটি বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে।

৪. জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষা কর্মসূচি : ILO বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এ কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ে শিক্ষা দান এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। এ লক্ষ্যে ২১টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন ও চার লক্ষ শ্রমিককে জনসংখ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ শেখানো হয়। এ কর্মসূচি শ্রমিকদের জন্য গঠিত ক্লিনিকের মান উন্নয়ন করেছিল। এ কর্মসূচি প্রথম শ্রমিকদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়।

৫. নারী উন্নয়ন কর্মসূচি : বাংলাদেশের অনগ্রসর নারী জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ILO বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের জন্য 'দক্ষতামুখী নারী প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি চালু করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি কেন্দ্র খোলা হয়। কেন্দ্রগুলো হল সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা ও যশোর। এ কেন্দ্রগুলো ছাড়াও ১২টি উপএলাকা ছিল। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও তাদের দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা হয় তা হল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও কারবার ব্যবস্থাপনা, বিপণন, বিক্রয় ও ডিজাইন। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ILO সুপরিচিত। ILO সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ ও যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে শ্রম সমস্যা ব্যাপক। তাই বাংলাদেশে ILO এর কাজ করার ক্ষেত্রও ব্যাপক। বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার আদায়, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য ILO বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এ সংস্থা আরও বেশি ভূমিকা পালন করবে শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য।

প্রশ্ন॥৬॥ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

অথবা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচয় দাও। বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO)। বিশ্বের মানুষের বিশেষ করে এর সদস্যভুক্ত দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। এরপর থেকেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি উন্নয়ন, সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এ সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ সংস্থা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization- WHO) হল জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। ১৯৪৬ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয় কার্যকরী পরিষদ ও সম্পাদকীয় দপ্তর নিয়ে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করার বাসনা নিয়ে জন্মলাভ করে। এ সংস্থা সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করে। এছাড়া নানা ধরনের রোগব্যাধি নির্মূলের জন্য এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

কার্যক্রম : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ১৯৭৭ সালে। এ কর্মসূচি সফল করার জন্য গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করে। গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদান।
২. প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পুষ্টি সরবরাহ।
৩. পানি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিরাপদে রাখা।
৪. পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা করা।
৫. সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা।
৬. স্থানীয়ভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।
৭. সাধারণ রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার ব্যবস্থা।
৮. প্রয়োজনীয় ও জরুরি ঔষধ হাতের কাছে রাখা ইত্যাদি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জন্মলাভ। জন্মলাভের পর হতে বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুষ্টি উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এ সংস্থার জুড়ি নেই। বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও এ সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রশ্ন।৭। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকৌশল সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization- WHO)। বিশ্বের মানুষের বিশেষ করে এর সদস্যভুক্ত দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। এরপর থেকেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি উন্নয়ন, সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এ সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ সংস্থা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৯ মে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। এরপর থেকে বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এদেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশে গৃহীত কর্মসূচিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল : বাংলাদেশে যেসব সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে তা নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সব ধরনের কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যাচ্ছে।

২. চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে সহযোগিতা : বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার মান তেমন উন্নত নয়। তাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বই পুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে।

৩. চিকিৎসা সুযোগ বৃদ্ধি কর্মসূচি : বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা খুবই কম। তাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এ দেশের মানুষের চিকিৎসার সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে থাকে।

৪. মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি : শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। আবার সুস্থ সবল শিশু পেতে হলে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে নানা ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

৫. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচি : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করে নি, বরং স্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবাকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

৬. **স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে পরামর্শদান :** বাংলাদেশের জনগণ ও দেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। এরপর তথ্য নিয়ে গবেষণা করেছে। গবেষণা হবে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। এছাড়াও প্রতি বছর স্বাস্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জন্মলাভ। জন্মলাভের পর হতে বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুষ্টি উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এ সংস্থার জুড়ি নেই। বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও এ সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রশ্ন॥৮॥ ইউনেস্কো কী? বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, ইউনেস্কো কাকে বলে? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে ইউনেস্কোর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, UNESCO সম্পর্কে লিখ। বাংলাদেশে UNESCO এর কর্মসূচিগুলো লিখ।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু বাংলাদেশের সম্পদ কম, কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই এত প্রকট সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, জাতিসংঘের কিছু বিশেষায়িত সংস্থা রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্প্রসারণ ও জোরদার করে থাকে। ইউনেস্কো তেমনই একটি সংস্থা, যা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইউনেস্কো : ইউনেস্কো হল জাতিসংঘের একটি সংস্থা। UNESCO এর পূর্ণরূপ হচ্ছে 'United Nations Education Scientific and Cultural Organization'. এর অর্থ হল জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত। এ সংস্থা পরিচালিত হয় একটি কার্যকরী পরিষদের দ্বারা। বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য হয় ১৯৭২ সালে।

বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য হওয়ার পর হতে এদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন রয়েছে, যা Bangladesh National Commission for UNESCO-BNCU নামে পরিচিত। এ কমিশনের সভাপতি হলেন শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিব এর সেক্রেটারী জেনারেল। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ এ কমিশনের সদস্য। এ কমিশন একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে কাজকর্ম পরিচালনা করে। কমিশনের একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ২২। শিক্ষামন্ত্রী এ স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি। এছাড়াও পাঁচটি সাব কমিশন আছে, যার সদস্য সংখ্যা ১১, সাব কমিশনগুলো নিম্নরূপ :

১. শিক্ষা,
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি,
৩. সংস্কৃতি,
৪. যোগাযোগ এবং
৫. সামাজিক বিজ্ঞান।

ইউনেস্কো শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। APEID কর্মসূচির মাধ্যমে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউনেস্কো শিক্ষার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (NIEAER),
২. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (JER),
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা,
৪. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং
৫. বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন একাডেমী (BARD)।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউনেস্কো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নে ইউনেস্কো গবেষণা সাহায্য করে যাচ্ছে। বিজ্ঞান যাদুঘরের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ইউনেস্কো দুই লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সেজন্য এশিয়ান আর্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করে ইউনেস্কো। সংস্কৃতির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ইউনেস্কো। সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে ইউনেস্কো।

সম্প্রতি ইউনেস্কো তাদের কার্যক্রমে এইডস বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশেও এইডস নির্মূল ও এইডস বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে।

তবে ইউনেস্কো শিক্ষা বিস্তারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ইউনেস্কো যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ দান,
২. নারী শিক্ষার উন্নয়ন,
৩. পরিবেশগত শিক্ষার সম্প্রসারণ,
৪. বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত শিক্ষা বিস্তার এবং
৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ একটি গরিব দেশ হলেও ইউনেস্কোর সদস্য। ইউনেস্কো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ইউনেস্কো বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে আমরা সে আশা করি।

প্রশ্ন॥৯॥ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে UNICEF এর কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা UNICEF বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কার্যক্রম পরিচালনা করে তা আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে UNICEF এর কর্মপদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, UNICEF এর কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে বর্তমানে সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এদেশে সামাজিক সমস্যাগুলো এত প্রকট যে, দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কারিগরি জ্ঞানেরও অভাব রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার সদস্য। তাই আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় বেশ জোরালো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইউনিসেফ অন্যতম। ইউনিসেফ মূলত বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফের পরিচয় : UNICEF এর পূর্ণরূপ হচ্ছে 'United Nations International Children's Fund' বা আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল। এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে এ সংস্থা। ১৯৪৬ সালে এটি গঠন করা হয়। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। যখন এটি গঠন করা হয় তখন এর নাম ছিল "The United Nations International Children Emergency Fund." ১৯৫০ সালে Emergency শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে এটি শিশু নিরাপত্তা, শিশু খাদ্য, শিশু ব্যবস্থা, শিশুশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের কার্যক্রম : বাংলাদেশে ইউনিসেফ শিশুদের ভাগ্য উন্নয়ন ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বেশকিছু কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের কথা নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম : ইউনিসেফ বাংলাদেশে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম অন্যতম। স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এদেশের শিশু মৃত্যুহার রোধ এবং মাতৃমৃত্যু রোধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্য মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের টিকা সরবরাহ করে থাকে। টিকাদানে মানুষকে উৎসাহিত ও সচেতন করেছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সহায়তা করেছে।

২. পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম : ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কারণ বাংলাদেশে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুরা পুষ্টিহীনতার শিকার। শুধু তাই নয়, তারা পুষ্টি সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাই পুষ্টিজ্ঞান বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য পুষ্টি প্রশিক্ষণদান কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। তাছাড়া পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা চালায় ইউনিসেফ। দুর্যোগকালীন শিশুদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে ইউনিসেফ।

৩. শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম : ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দু'ভাবে ইউনিসেফ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সূচি হল শিক্ষার পাশাপাশি বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের সরবরাহ কার্যক্রম। এছাড়া শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানও করে থাকে। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অশিক্ষিত যুবক, মহিলা ও পুরুষদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সহায়তা দান।

৪. মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান : ইউনিসেফ বাংলাদেশের মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য মাদার্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। মাদার্স ক্লাবের মাধ্যমে মহিলাদের বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে মহিলাদের সেলাই মেশিন, বুননযন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

৬. অন্যান্য কার্যক্রম : ইউনিসেফ বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় এ সংস্থা সাহায্য করে থাকে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে ইউনিসেফ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী সমস্যা। তাই নিজেদের সীমিত সম্পদ দিয়ে এ সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর সহায়তা নেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিশুদের যাবতীয় চাহিদা, তাদের উন্নয়ন, মহিলাদের উন্নয়নে ইউনিসেফের গৃহীত কার্যক্রম প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রশ্ন-১০। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে ইউ. এন. ডি. পি. এর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে ইউ. এন. ডি. পি. এর তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে ইউ. এন. ডি. পি. এর উপযোগিতা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে ইউ. এন. ডি. পি. এর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশ গঠনগতভাবে এশিয়ার দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি রাষ্ট্র। এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণ করতে সরকারি ও বেসরকারি মহল যেন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের যে সংস্থাগুলো সক্রিয় কার্যকর তার মধ্যে United Nations Development Programme (UNDP) অন্যতম একটি আন্তর্জাতিক জনকল্যাণ সংস্থা। UNDP এর কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে UNDP' এর ভূমিকা : UNDP এর ভূমিকা জানার আগে আমাদেরকে এ সংস্থা সম্পর্কে জেনে নেওয়া দরকার।

United Nations Development Programme : আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের যেসব সংস্থা বিশ্বব্যাপী সার্বিক সহযোগিতা ও কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে UNDP তন্মধ্যে অন্যতম। সম্মিলিত জাতি বর্ধিত কারিগরি সাহায্য কর্মসূচি (UNEPTA) এবং জাতিসংঘের বিশেষ তহবিল UNSF এর সমন্বয়ে UNDP গঠন করা হয় ১৯৬৫ সালের ২ নভেম্বর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ৪৮ সদস্য নিয়ে এর পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশ হতে ২৭ জন এবং উন্নত বিশ্ব থেকে ২১ জন সদস্য নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর প্রধান নির্বাহীকে প্রশাসক বা Administer বলা হয়। এ সংস্থার সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

দায়িত্ব : UNDP এর মূল দায়িত্ব হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রদত্ত কারিগরি ও কাঠামোগত সহায়তামূলক প্রকল্পের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হওয়া। বর্তমান বিশেষ সর্ববৃহৎ সহায়তা সংস্থা হিসেবে UNDP তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণে UNDP সমগ্র বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সংস্থার কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর।

বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে এর কার্যক্রম : বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে UNDP প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট মেরামত, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, গৃহায়ন ও পূর্ত কর্মসূচি, পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মসূচি প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা ১৯৯৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ : নিম্নে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প : এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের মধ্যে উদ্যোক্তার ভূমিকা জোরদার করার প্রচেষ্টা করা হয়। এখানে নারীদেরকে স্বাবলম্বী করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

২. কৃষি উন্নয়ন ডাটাবেজ প্রকল্প : কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্প নেওয়া হয়। এখানে প্রশিক্ষণ ও উন্নত সার, বীজ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৩. গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন লাইভ স্টক প্রকল্প : বাংলাদেশের মৎস্য শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে দেশের অর্থনীতিতে। এমতাবস্থায় মৎস্যকে যদি আরও সম্প্রসারিত করে নিজস্ব চাহিদা পূরণ ও বিদেশে রপ্তানি করা যায় এ উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৪. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার : দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে UNDP কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এখানে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করাই প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ শিক্ষা চালু করা হয়।

৫. স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প : প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা পায় বা Participalogy Management অত্যন্ত জরুরি। আর এ উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নগর দারিদ্র্যকে রোধ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প নেওয়া হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, UNDP বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রতিষ্ঠান যারা এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সার্বিক সহযোগিতায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এ সংস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তবে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

প্রশ্ন॥১১॥ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লিখ।

অথবা, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য কী কী?

অথবা, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির রয়েছে নিজস্ব কিছু উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের জন্য রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকটা আলাদা। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি রয়েছে সবদেশে। প্রাথমিক পর্যায়ে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যাবলি কেবল যুদ্ধে আহত সৈন্যদের জন্য সীমিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দুর্যোগ, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও রোগব্যাধির মোকাবিলা করার লক্ষ্যে প্রসারিত করা হয়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নাম বিশ্বের সবার কাছেই পরিচিত।

বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য : রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সাধারণভাবে কতকগুলো উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এ উদ্দেশ্যগুলো সমভাবে প্রয়োগ করা হয় বলে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। নিম্নে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হল :

১. মানবতা : এ সোসাইটি মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্তমানবতার সেবা করাই হল এ সোসাইটির লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন, বন্ধুত্ব এবং সব মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ সোসাইটির উদ্দেশ্য।

২. পক্ষপাতহীনতা : এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা করা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতের উর্ধ্বে থেকে সবাইকে সাহায্য করা। বিশ্বের সকল মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যেই এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত।

৩. নিরপেক্ষতা : বিশ্বের সব মানুষের আস্থা অর্জন করা এর আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য। সেজন্য রেডক্রস সোসাইটি রাজনৈতিক, বর্ণ, ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধীয় বিতর্কে না জড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে মানুষের সেবা করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করে।

৪. স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য : রেডক্রস স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। রেডক্রসের কার্যক্রমে যেমন রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হস্তক্ষেপ করে না, তেমনি রেডক্রসও রাষ্ট্র বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাজে বাধা প্রদান করে না।

৫. সেবামূলক : রেডক্রস একটি সেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

৬. একতা : একটি দেশে রেডক্রসের একটিমাত্র সংগঠন থাকে এবং দেশের সব জনসাধারণের জন্য এর সেবাকর্মসূচির দ্বার খোলা থাকে। এ সোসাইটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল একতা।

৭. সর্বজনীনতা : রেডক্রস একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, যা সব সমাজের মানুষের সমান অধিকার এবং একে অপরকে সাহায্য করার নীতিতে বিশ্বাসী।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আর্তমানবতার সেবাই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূল লক্ষ্য, আর এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তারা বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

প্রশ্ন॥১২॥ বাংলাদেশে UNFPA এর কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে UNFPA এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে UNFPA এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল। জনসংখ্যা ও তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ সংস্থা কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সহযোগিতা করার জন্য জাতিসংঘ এ সংস্থা গঠন করে। বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে এদেশে জনসংখ্যা সম্পর্কিত কার্যক্রম অনেক বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রমকে সহায়তা দানের জন্য এ সংস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। জনসংখ্যা সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার হার নির্ধারণ ও অন্যান্য কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম : বাংলাদেশে জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল বিভিন্নভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সংস্থা বাংলাদেশে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম : বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা এক নম্বর সমস্যা। তাই এ সমস্যা মোকাবিলা ও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর ও সীমিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সংস্থা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সরঞ্জামসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে এ সংস্থা সহায়তা করে থাকে।

২. যোগাযোগ ও শিক্ষা কার্যক্রম : বাংলাদেশে জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল যোগাযোগ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে। আর পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের বইগুলোতে এ বিষয় সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া স্কুল, কলেজ বহির্ভূত অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমেও যাতে জনগণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় সে ব্যবস্থাও করেছে এ তহবিল।

৩. **তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম :** জনসংখ্যা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য এ সংস্থা বাংলাদেশে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা হল জনসংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, নির্ভরশীলতার হার, পেশা ও শিক্ষার অবস্থা ইত্যাদি। এ সংস্থা এসব তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও গবেষণাও করে থাকে।

৪. **জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ কার্যক্রম :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য জনসংখ্যা তহবিল পরিচালনা করে থাকে। অর্থাৎ জনসংখ্যার গতি কি রকম; তা কোন দিকে ঝুঁকছে, আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে কি না ইত্যাদি যাচাই করে দেখার জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫. **জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম :** বাংলাদেশে জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল জনসংখ্যা নীতি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যে কোন দেশের যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করতে হলে তার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচি থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে এ সংস্থা সহযোগিতা করছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হল জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল। এ সংস্থাটি বিশ্বের জনসংখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এ সংস্থাটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। ভবিষ্যতে সংস্থাটি বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করবে বলে আমরা এ আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি।

প্রশ্ন॥১৩॥ ইউনিসেফের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

অথবা, ইউনিসেফের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ইউনিসেফের বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে জাতিসংঘের শিশু তহবিল অর্থাৎ ইউনিসেফ অন্যতম। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে শিশুদের খাদ্য, ঔষধ ও বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল গঠন করা হয়। বর্তমানে ইউনিসেফ শিশুদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফের বিভিন্ন দিক : নিম্নে ইউনিসেফের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো :

ইউনিসেফ : গঠন, প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিসেফের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে ইউনিসেফের পরিচয় বর্ণনা করা হলো :

জাতিসংঘের শিশু তহবিল : ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে শিশুদের খাদ্য, ঔষধ ও বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৫০ সালে "ইমারজেন্সী" কথাটি বাদ দিয়ে শুধু জাতিসংঘ শিশু তহবিল রাখা হয়। সংক্ষিপ্ত নাম ইউনিসেফ বহাল রাখা হয়।

কাঠামো : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিশ্বের ১০০ এরও বেশি দেশে সংস্থাটির শাখা কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফের মহাসচিব কর্তৃক নিয়োজিত একজন নির্বাহী পরিচালক ও ৪১ সদস্যের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী বোর্ডের মাধ্যমে ইউনিসেফের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

ইউনিসেফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ইউনিসেফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচির সম্প্রসারণ করা।

২. শিশু কল্যাণমূলক সংস্থাকে গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।

৩. সকল শিশুর মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

৪. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ও মা-শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ইউনিসেফের কার্যক্রম : মা ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ইউনিসেফ ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু কল্যাণসহ যেসব ক্ষেত্রে ইউনিসেফ অবদান রাখছে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. **স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম :** দরিদ্র পরিবারগুলো সঠিকভাবে মা ও শিশুদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই ইউনিসেফ মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ইউনিসেফ আন্তর্জাতিকভাবে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২. **শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি :** ইউনিসেফ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, খাতা, পেন্সিল সরবরাহ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, স্কুল স্থাপন করে থাকে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইউনিসেফের অবদান উল্লেখযোগ্য।

৩. **মহিলাদের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :** মহিলাদের উন্নয়নের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশসমূহের দরিদ্র মহিলাদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিসেফ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

৪. **অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা দান :** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাকেও ইউনিসেফ তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থার প্রশাসন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শ দান করে। তাছাড়াও অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তাও প্রদান করে।

৫. পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন : শিশু স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন অপরিহার্য। ইউনিসেফ এ সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া মাতৃত্ব, শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রেও সহায়তা করে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল শিশুর কল্যাণে ইউনিসেফ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমেই ইউনিসেফের পরিচয় ফুটে উঠে। শিশুদের সর্বোত্তম জীবনমান নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে ইউনিসেফ। বিশ্বের ১২১ টিরও বেশি দেশে এ সংস্থার কার্যক্রম চালু আছে।

প্রশ্ন॥১৪॥ UNFPA এর বিভিন্ন দিক লিখ।

অথবা, UNFPA এর বিভিন্ন দিক তুলে ধর।

অথবা, UNFPA এর বিভিন্ন দিক উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যা এক প্রকট আকার ধারণ করেছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA) বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত একটি সংস্থা। ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে এ সংস্থা যাত্রা শুরু করে। কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ সংস্থাটি সারা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের বিভিন্ন দিক : এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি এবং এর কার্যক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

প্রতিষ্ঠা : জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কথা চিন্তা করে ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই প্রথমে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে 'জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল' আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। এর কার্যক্রম ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত।

ইউএনএফপিএ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল মূলত বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

২. জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমের কারিগরি, কৌশলগত ও আর্থিক সহায়তা দান করা।

৩. জনসংখ্যা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. মৃত্যুহার রোধকল্পে বিভিন্ন ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা।

ক্ষেত্রসমূহ : জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের প্রধান কর্মক্ষেত্র হলো :

১. পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন স্বাস্থ্যসহ নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য খাত।

২. জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ খাত।

৩. নারীর সমতা উন্নয়নে উপদেষ্টা সেবা প্রদান।

৪. যোগাযোগ ও শিক্ষা কর্মসূচি।

৫. জনসংখ্যা নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৬. কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন।

ইউএনএফপিএ এর কার্যক্রম : ইউএনএফপিএ জনসংখ্যাবহুল দেশে জনসংখ্যার হার কমানোসহ জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করে থাকে :

১. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি : পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মাতৃসদন, পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা ও উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ধারণে ইউএনএফপিএ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২. শিশু মৃত্যুর হার রোধ : শিশু মৃত্যুর হার রোধ করার জন্য ইউএনএফপিএ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া শিশুর জন্ম পরবর্তীকালীন পরিচর্যা, পরিকল্পিত জন্ম প্রক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি সহায়তা করে থাকে।

৩. যোগাযোগ ও শিক্ষা কর্মসূচি : জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যোগাযোগ কাঠামোর উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক যেমন- বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষাদান কর্মসূচি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে।

৪. মা ও শিশু যত্ন কর্মসূচি : UNFPA এর মা ও শিশুযত্ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত কার্যক্রম হলো– গর্ভকালীন সেবা, শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, পরবর্তী যত্ন, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত এ সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ও সুষ্ঠু নীতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ, মৃত্যুহার রোধ, পরিবার পরিকল্পনা, জনসংখ্যা শিক্ষা, সচেতনতা কার্যক্রম প্রভৃতিতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইউএনএফপিএ এর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন॥১৫॥ শ্রম কল্যাণ কী?

অথবা, শ্রম কল্যাণ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, শ্রম কল্যাণ কাকে বলে?

উত্তর॥ ভূমিকা : শ্রম কল্যাণ ধারণাটির সূত্রপাত হয় মূলত শিল্পবিপ্লবের পর। শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিপতি শ্রেণি শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্যাতন চালায়। এ প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণার্থে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

শ্রম কল্যাণ : বর্তমান বিশ্বে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম কল্যাণ সংস্থা। আমাদের দেশে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রয়েছে শত শত ইউনিয়ন।

সাধারণভাবে, শ্রম কল্যাণ বলতে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে, শ্রম কল্যাণ বলতে শ্রমিকদের মনো-দৈহিক এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল ধরনের কার্যক্রমকে বুঝায়। এ ধরনের কর্মসূচি মূলত মজুরি বহির্ভূত হয়ে থাকে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রম কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

Encyclopaedia of Social Science এর সংজ্ঞানুযায়ী, "শ্রম কল্যাণ হচ্ছে প্রচলিত শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে মালিক পক্ষের স্বেচ্ছামূলক এমন এক কল্যাণমূলক কার্যাবলি যা শিল্প ব্যবস্থাপনা বা বাজারের অবস্থা বিচার না করে শ্রমিকদের কাজের এবং কতিপয় জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।"

Oxford Dictionary মোতাবেক, শ্রম কল্যাণ হচ্ছে শ্রমিকদের জীবন প্রাচুর্যময় করার প্রচেষ্টা।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, শ্রম কল্যাণ হচ্ছে শিল্প সংস্থার ব্যক্তি ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এর মতে, শ্রম কল্যাণ বলতে সেসব সুযোগ সুবিধার সমষ্টিকে বোঝায়, যেসব সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের শারীরিক কল্যাণ, অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োজিত। শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থ্য, কর্ম পরিবেশ, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বেতনভাতা, অধিকার, কাজের সময়, সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের সুসমন্বিত রূপই হলো শ্রম কল্যাণ।

এন.এম যোশী বলেন, "কর্মস্থলের ন্যূনতম মান রক্ষার স্বার্থে কারখানা আইনে যে বিধান রয়েছে এবং বার্ধক্য, বেকারত্ব, অসুস্থতা, দুর্ঘটনায় সামাজিক আইনের যেসব বিধান রয়েছে এবং অতিরিক্ত শ্রমিকদের কল্যাণে মালিক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বা প্রচেষ্টাসমূহই শ্রম কল্যাণ।"

ভারত সরকারের, Labour Investigation Committee' প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী, শ্রমিকদের যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক, নৈতিক এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োগকর্তা অথবা সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা প্রদত্ত ও পরিচালিত কার্যক্রম শ্রম কল্যাণ প্রত্যয়ের পরিধিভুক্ত।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, শ্রম কল্যাণ পদক্ষেপ বলতে বোঝায়, সরকার ও মালিক পক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রমিকরা পূর্বে যে নির্যাতনের শিকার হতো সে অবস্থা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে শ্রম কল্যাণ ধারণার উৎপত্তি হয়। এটি শ্রমিকদের সকল দিকের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার ক্ষমতার বিকাশ ও উন্নত জীবনপন্থা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

প্রশ্ন॥১৬॥ শ্রম কল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, শ্রম কল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, শ্রম কল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শ্রমিকদের মনোদৈহিক এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল ধরনের কার্যকে শ্রম কল্যাণ বলে। এটি শ্রমিকদের সকল দিকের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার ক্ষমতার বিকাশ ও উন্নত জীবনপন্থা অর্জনে সক্ষম করে তোলে। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়ন করাই শ্রম কল্যাণের মূল উদ্দেশ্য। শ্রমিকদের সুনিশ্চিত জীবন অর্জনের লক্ষ্যে এটি কাজ করে।

শ্রম কল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : শ্রমিক শ্রেণির নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, অনুকূল পরিবেশ, প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ কাজ করে থাকে। শ্রম কল্যাণের বহুমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো :

১. পেশাগত দক্ষতা আনয়ন করা : শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা শ্রম কল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে শ্রমিকরা কাজের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং তাদের সুযোগ সুবিধাও বেড়ে যায়।

২. শ্রমিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি : শ্রমিকদের দরিদ্রতা ও স্বল্প শিক্ষার কারণে তারা প্রতিষ্ঠানে যে শ্রম দেয় সে পরিমাণ মর্যাদা পায় না। তাই তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা শ্রম কল্যাণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. অমানবিক আচরণ প্রতিরোধ : শ্রম কল্যাণ শ্রমিকদের উপর নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও অমানবিক আচরণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালায়। অমানবিক আচরণ প্রতিরোধের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করাও এর লক্ষ্য।

৪. সামঞ্জস্য বিধান সহায়তা : শ্রমিকরা নতুন পরিবেশ, যন্ত্রপাতি, নিয়মকানুনের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারে না। শ্রম কল্যাণ শ্রমিকদের সামঞ্জস্য বিধানে সহযোগিতা করে।

৫. শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন : জিনিসপত্রের মূল্য ঊর্ধ্বগতির ফলে শ্রমিক শ্রেণি আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করতে পারে না। ফলে তাদের জীবনমান নিচের দিকে নেমে যায়। শ্রম কল্যাণ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে।

৬. উৎপাদন বৃদ্ধি : নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে শ্রমিকদের কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। তাই শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ প্রদানে শ্রম কল্যাণ সহায়তা করে।

৭. পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন : শ্রম কল্যাণের আরেকটি লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮. সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান : সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ব্যতীত শ্রমিকদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তাই শ্রম কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান করা।

৯. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কই পারে উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করতে। শ্রম কল্যাণ মালিক-শ্রমিক এর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে।

১০. শ্রমিকদের চাহিদা পূরণ : শ্রমিকদের অসংখ্য চাহিদা তাদের নিজেদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্যই শ্রম কল্যাণ শ্রমিকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রমিকদের জীবনের সার্বিক নিশ্চয়তা ও তাদের বিভিন্নমুখী চাহিদার লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ কাজ করে। মূলত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধার প্রসারণ ঘটানোই শ্রম কল্যাণের উদ্দেশ্য। এই শ্রম কল্যাণের কর্মকাণ্ডের কারণেই শ্রমিকরা নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে।

প্রশ্ন॥১৭॥ বাংলাদেশে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব তুলে ধর।

অথবা, বাংলাদেশে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব অত্যধিক। শ্রম কল্যাণের মাধ্যমে শ্রমিকদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। আর এ শ্রম কল্যাণ উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণ, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রম কল্যাণের বিকল্প নেই। নিম্নে বাংলাদেশে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

১. ন্যূনতম জীবন মান বজায় রাখা : স্বল্প মজুরি, উপযুক্ত বাসগৃহ, চিকিৎসা এবং চিত্তবিনোদনসহ যাবতীয় চাহিদা পূরণের মাধ্যমে ন্যূনতম জীবন মান অর্জনের জন্য শ্রম কল্যাণ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি : উৎপাদন বৃদ্ধি মালিক-শ্রমিক উভয়ের জন্যই মঙ্গলকর। শ্রমিকদের দিতে হবে সুযোগ সুবিধা। শ্রম কল্যাণ শ্রমিক শ্রেণিকে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে সক্রিয় করে তোলে।

৩. অনুকূল পরিবেশ : কাজের পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তাহলে শ্রমিকরা সবদিক থেকেই লাভবান হয়। এর ফলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রম কল্যাণ সহায়তা করে।

৪. সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা : শ্রমিকদের সৎ, সক্রিয় ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শ্রম কল্যাণের ভূমিকা অতুলনীয়।

৫. শ্রমিক বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ : মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৬. শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা : দেশের শিল্পকারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ব্যাপারে শ্রম কল্যাণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭. শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান : পেশাগত বিপদাপদ এবং ভবি ষ্যৎ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রম কল্যাণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করা : অজ্ঞ, অশিক্ষিত শ্রমিকরা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন থাকে। ফলে নির্যাতনের শিকার হয়। শ্রম কল্যাণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

৯. মানবিকতাবোধ বজায় রাখা : মানবিকতাবোধ বজায় রাখা বিশেষ করে মানুষ হিসেবে সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব অত্যধিক।

১০. জাতীয় উন্নয়ন : উৎপাদনের চাকা সচল রাখতে প্রয়োজন শ্রমিকদের সন্তুষ্টি বিধান। এজন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। এক্ষেত্রে শ্রম কল্যাণের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিল্পকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবন উন্নয়নে তথা কল্যাণে শ্রম কল্যাণ যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। শ্রম কল্যাণের মাধ্যমেই শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা হয় এবং সার্বিক কল্যাণ ত্বরান্বিত হয়। এদেশে শ্রমিকদের কল্যাণ কল্পে শ্রম কল্যাণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন॥১৮॥ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কী?

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কাকে বলে?

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে কী বুঝ?

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা গঠিত হয়। সমাজকল্যাণ কার্যাবলির মধ্যে 'আন্তর্জাতিক সমাজকর্ম' সবচেয়ে নবীন।

আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ : সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঐসব কল্যাণমূলক কার্যাবলি বুঝায় যেগুলো ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আর্তমানবতার সেবার মাধ্যমে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালায়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিশ্লেষক আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ প্রসঙ্গে যেসব সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছিলেন, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়টি উপস্থাপন করা হলো :

আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে W.A Friedlander বলেন, "আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বলতে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে বুঝানো হয়। তবে বিদেশি রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত সমাজসেবা কার্যক্রমকেও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বলে।

রবার্ট এল. বার্কার এর মতে, তিনি তাঁর Social Work Dictionary তে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে মূলত ৩টি বিষয়কে বুঝিয়েছেন। এগুলো হলো।

ক. যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমাজকর্ম পদ্ধতি ও সমাজকর্ম পেশার লোকদের ব্যবহার করে।

খ. সমাজকর্মে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং

গ. সমাজকর্মের পদ্ধতি ও জ্ঞান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্থানান্তর।

অধ্যাপক কুইন্সি রাইট বলেন, কতকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সমাজের গঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থাকেই আন্তর্জাতিক সংস্থা নামে অভিহিত করা হয়।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী,

"পেশাদার সমাজকর্মে আন্তর্জাতিক সমাজকর্ম ধারণাটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সমাজকর্ম পদ্ধতি ও সমাজকর্মীদের ব্যবহার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং পদ্ধতি ও জ্ঞান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্থানান্তর –এই তিনটি বিষয়কে বুঝানোর জন্য সাধারণ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা বা কার্যকলাপকে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলা হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণে সংঘটিত আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার কাজই হচ্ছে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ। এ সংস্থার কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্য ও জীবন মান নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রভৃতি।

প্রশ্ন॥১৯॥ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার শ্রেণিবিভাগ লিখ।

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রকারভেদ তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঐসব কল্যাণমূলক কার্যাবলি বুঝায় যেগুলো ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে আর্তমানবতার সেবার মাধ্যমে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালায়। সমাজকল্যাণ কার্যাবলির মধ্যে 'আন্তর্জাতিক সমাজকর্ম' নবীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়।

আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার শ্রেণিবিভাগ : আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ পরিষদ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে W.A Friedlander বলেন, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে বুঝানো হয়। তবে বিদেশি রাষ্ট্রের সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সমাজসেবা কার্যক্রমকেও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলা হয়।

সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে নিবেদিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে তাদের গঠন বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো অনুযায়ী W.A Friedlander তার "Introduction to Social Welfare" গ্রন্থে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

যথা : ১. আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারি সংস্থা,

২. আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেসরকারি সংস্থা

৩. জাতীয় সরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা এবং

৪. জাতীয় বেসরকারি সংস্থা।

নিম্নে শ্রেণিবিভাগসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারি সংস্থা : যেসব আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সেসব সংস্থাকে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারি সংস্থা বলা হয়। যেমন : জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, শ্রমসংস্থা, আন্তর্জাতিক কলম্বো পরিকল্পনা ইত্যাদি।

২. আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেসরকারি সংস্থা : যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের বেসরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তাদের আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা বলে।

যেমন - আন্তর্জাতিক রেডক্রস, আন্তর্জাতিক সমাজকর্ম সম্মেলন, OIWCA, আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ প্রভৃতি।

৩. জাতীয় সরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা : জাতীয় সরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা সরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। যেমন- কেয়ার, কানাডিয়ান উন্নয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন প্রভৃতি।

৪. জাতীয় বেসরকারি সংস্থা : জাতীয় বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। যেমন- চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, সুইডিস রেডক্রস, সুইস এইড টু ইউরোপ, ক্যাথলিক সমষ্টি সেবা কাউন্সিল প্রভৃতি।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ, সমাজকর্ম পদ্ধতি ও সমাজকর্মী, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং সমাজকর্মের পদ্ধতি ও জ্ঞান অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে স্থানান্তরকারী সংস্থাসমূহ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক সমাজ সংস্থা আর্তমানবতার সেবায় বিশ্বব্যাপী তাদের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এসব সংস্থার কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্য ও জীবন মান নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রভৃতি।

প্রশ্ন॥২০॥ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্বসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা বিশ্বের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, মানুষের সুখসমৃদ্ধি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা। বাংলাদেশের উন্নয়নেও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্বসমূহ : সমস্যাবহুল দেশ বাংলাদেশ। আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংস্থার তুলনা হয় না। নিম্নে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

১. কারিগরি সাহায্য লাভ : জাতীয় প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সাধন, উন্নতমানের প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সেবার মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। তাছাড়াও দক্ষকর্মী তৈরি, সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রসারণ এবং অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন : বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এসব সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

৩. দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অনেক আন্তঃসংগঠন কাজ করে থাকে। যেমন– ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি বিপর্যয়ে জাতীয় তৎপরতার তুলনায় আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৪. দারিদ্র্য দূরীকরণ : দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে হলে দরিদ্রতা দূর করতে হবে। অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে থাকে। যেহেতু দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সরকারের একার পক্ষে সফল করা সম্ভব নয় সেহেতু আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা অপরিহার্য।

৫. সহায়ক ও পরিপূরক : আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সরকারের সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারকে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। কেননা সরকারের একার পক্ষে সকল সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

৬. অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ : এসব মানুষের কল্যাণের জন্য বহু আন্তর্জাতিক সংগঠন কাজ করে থাকে। এসব সংগঠন আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। আমাদের দেশেও এ ধরনের বহু সংস্থা নিয়োজিত আছে।

৭. শিশু কল্যাণ : বাংলাদেশের শিশুরা নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অসহায় জীবনযাপন করছে। দেশীয় সংস্থা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের চাহিদাপূরণ ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা এসব সংস্থার মূল লক্ষ্য।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভূমিকা পালনে তৎপর। মানবসমাজের সুখশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব সংস্থা কাজ করে থাকে। তবে সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের পরিধি আরো বাড়ানো দরকার।

প্রশ্ন॥২১॥ জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলোর নাম লিখ।

অথবা, জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলোর নাম উল্লেখ কর।

অথবা, জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলোর নাম তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহের মধ্যে ব্যাপক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে জাতিসংঘ। এটি বিশ্ব মানবতার সমঝোতা, সহযোগিতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে কোনো সংগঠনই এত গভীরভাবে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে অবদান রাখে নি। বর্তমানে এটি The United Nations Systems নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাসমূহ : জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব সংস্থা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সেসব সংস্থাকে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা বলা হয়। জাতিসংঘের যে সকল সংস্থা আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে সেগুলো হলো :

১. আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা : জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, তথা শ্রমিকদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার উদ্ভব হয়। ১৯৪৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আইএলও। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থসংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সংস্থা বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে।

২. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গঠন করা হয় বিশ্ববাসীকে ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য। ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর কানাডার কুইবেকে অনুষ্ঠিত

...ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪২টি দেশের সমন্বয়ে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংবিধান গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশক্রমে ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ফাও জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইতালির রোমে এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত।

৩. **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা :** বিশ্বের সকল মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৪৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। বিশ্বব্যাপী জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা, স্বাস্থ্যমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যাবলি তদারকি ও মূল্যায়ন করার জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্ভব ঘটে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

৪. **ইউনেস্কো :** জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইউনেস্কো। ইউনেস্কো গণশিক্ষা অভিযান, মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৫. **ইউনিসেফ :** ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে শিশুদের খাদ্য, ঔষধ ও বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল' গঠন করা হয়। নিউইয়র্ক শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল শিশুর কল্যাণে ইউনিসেফ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬. **জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল :** বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কথা চিন্তা করে ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সদস্য দেশসমূহকে জনসংখ্যা কার্যক্রমে প্রযুক্তিগত তথা কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে 'জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল' যাত্রা শুরু করে।

৭. **জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি :** আর্থসামাজিক অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়নে UNDP বিশ্বের একটি বৃহৎ সংস্থা। জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা হিসেবে সারা বিশ্বে এর ভূমিকা অত্যধিক। আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নে এর অবদান অতুলনীয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ, মানব অধিকার অর্থাৎ বিশ্বমানবতার সামগ্রিক কল্যাণের নিমিত্তে জাতিসংঘের সৃষ্টি। জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলো দেশ, মানুষ, সমাজ সর্বোপরি পুরো বিশ্বের সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশেষায়িত সংস্থাগুলো মূলত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত হতে সাহায্য করে। বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসব সহযোগী সংস্থার অবদান অসামান্য।

প্রশ্ন॥২২॥ ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনেস্কো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে একটি অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো। বাংলাদেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ইউনেস্কো বিরাট অবদান রেখে চলছে।

উইনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : ইউনেস্কো শিক্ষার প্রসার, মানবাধিকার রক্ষা, প্রশিক্ষণ, বৈষম্য দূরীকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, মূল্যবোধকে উৎসাহিতকরণ, ন্যায় ও অশান্তি স্থাপন প্রভৃতির লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে উল্লেখ করা হলো :

১. **বিশ্বে ন্যায় ও শান্তি স্থাপন :** বিশ্বে ন্যায় ও শান্তি স্থাপন করা ইউনেস্কোর অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উপর বেশি জোর দিয়ে থাকে এই সংস্থা। এগুলোর মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি, ন্যায় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় ইউনেস্কো।

২. **শিক্ষাবিস্তার :** উন্নয়নমূলক সমস্ত কর্মসূচির সফলতার অন্যতম মাধ্যম হলো জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। তাই সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এলক্ষ্যে ইউনেস্কো স্বাক্ষরতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রসমূহে পরিচালিতও করে।

৩. **মানবাধিকার সংরক্ষণ :** জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে প্রতিটি দেশের মানুষের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এ সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। মানবিক অধিকার সংরক্ষিত না হলে মানুষ সুস্থভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে না। তাই মানুষের মানবিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ইউনেস্কো কাজ করে থাকে।

৪. **বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ :** বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা। তাই বিজ্ঞান এর ব্যবহার ও সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ লক্ষ্যে ইউনেস্কো এদেশের জতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের যন্ত্রপাতি ক্রয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যেমন– পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞান মনস্ক তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে থাকে।

৫. **বৈষম্য দূর করা :** ইউনেস্কোর অপর একটি লক্ষ্য হলো বৈষম্য দূর করা। এটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনশক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো অনেকটাই সফল।

৬. **বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ :** সদস্য দেশগুলোতে বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়নে উৎসাহিত করা এর অন্যতম লক্ষ্য। ইউনেস্কো শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তি এবং সে সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা, বইপুস্তক, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। যাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান সংস্কৃতি এ সংক্রান্ত অন্যান্য বস্তু, দ্রব্য ও তথ্যাদির আদান-প্রদানের মাধ্যমে দেশগুলোতে বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়ন সম্প্রসারিত হয়।

৭. **মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ :** মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনা জাগ্রত না হলে কোনোভাবেই তাদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই মানুষের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের মূল্যবোধ জাগ্রতকরণকে এ সংস্থা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে এটি ব্যাপক সচেতনতা প্রোগ্রাম গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং জাতীয় মূল্যবোধকে উৎসাহিত ও সংরক্ষণ করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

৮. **জ্ঞানের বিকাশ সাধন :** আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে দেশসমূহের বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বই, শিক্ষাকর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সংরক্ষণ করা এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য হলো এসব সংরক্ষণের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। সদস্য রাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ইউনেস্কো জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ইউনেস্কো একটি দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতিসংঘের একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিশ্বব্যাপী এটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ইউনেস্কো জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন॥২৩॥ কেয়ারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, কেয়ারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, কেয়ারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবকল্যাণে সারা বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে কেয়ার অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হচ্ছে কেয়ার। কেয়ার সমগ্র বিশ্বব্যাপী ত্রাণ তৎপরতা, দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কেয়ারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : কেয়ারের মূল উদ্দেশ্য মানব কল্যাণ। এ লক্ষ্যে কেয়ার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কেয়ার তার কর্মসূচি পরিচালনা করে সেগুলো হলো :

১. **দুর্যোগকালীন সহায়তা :** বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ বিপর্যস্ত, অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে দুর্যোগকালীন সহায়তা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়া কেয়ারের অন্যতম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য কেয়ার বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ, জরুরি খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

২. **কৃষকদের উন্নয়ন সাধন :** কৃষকদের জীবিকা অর্জনে কেয়ার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেয়ার এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. **নারীর ক্ষমতায়ন :** গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেয়ার কাজ করে থাকে। মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। কেননা কেয়ার মনে করে যে, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা মানবকল্যাণের পথে প্রথম ধাপ।

৪. **গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন :** গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কেয়ারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা আসে, সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। কেয়ার এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

৫. **পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ :** দরিদ্র দেশগুলোর মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা কেয়ারের অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্বে বেশির ভাগ অসুখের কারণ হচ্ছে পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকা আর বিশুদ্ধ পানীয়র অভাব। তাই জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সরবরাহ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাদানের লক্ষ্যে কেয়ার বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে।

৬. **লিঙ্গ সমতা আনয়ন :** নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা, নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন কেয়ার এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কেয়ার গুরুত্বের সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। সেসব কর্মসূচি লিঙ্গ সমতা আনয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৭. **স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উন্নয়ন :** জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং নারী, শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, মা ও শিশুর পরিচর্যার পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কেয়ার বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়ন করে। কেয়ার স্বাস্থ্য খাতে যেসব অব্যবস্থাপনা রয়েছে সেগুলো দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে কেয়ারের ভূমিকা অনবদ্য।

৮. **সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা :** দেশে দেশে সুশাসন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা কেয়ারের অন্যতম লক্ষ্য। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সৌহার্দমূলক কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, কেয়ার উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলোকে কেন্দ্র করে কর্মসূচি গ্রহণ করে। মানুষের কল্যাণের জন্য কেয়ার সেসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নও নিশ্চিত করে থাকে। বিশ্বব্যাপী দরিদ্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে কেয়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতার বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। আমাদের দেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির ক্রমবিকাশ ও প্রয়োগে আন্তর্জাতিক সংস্থার এরূপ ভূমিকা প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠাগুলোর কার্যক্রম : নিম্নে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. জাতিসংঘ : জাতিসংঘের মাধ্যমেই বাংলাদেশে প্রথম পেশাদার আধুনিক সমাজকর্মের প্রবর্তন হয়। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে আধুনিক পেশাদার নীতিমালা নির্ভর সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য দক্ষকর্মী তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ যেমন– UNICEF, ILO, WHO, FAO প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

২. রেডক্রস : দুস্থ মানবতার সেবায় বাংলাদেশের রেডক্রসের অবদান অপরিসীম। এ সংস্থাটি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় অসহায় মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। তাছাড়া রেডক্রস সোসাইটি চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রবর্তন, শিশু পরিচর্যা এবং মাতৃসদন পরিচালনা করে থাকে। রেডক্রস সোসাইটি শিশুদের খাদ্য সরবরাহ করা, ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পরিচালনা করা প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে।

৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন : পল্লির জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের উপায় উদ্ভাবন ও কর্মসূচি গ্রহণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন সক্রিয়ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে। বর্তমানে পল্লিউন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা, কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সমবায় আন্দোলন জোরদার করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

৩. সার্ক : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকা ও ভুটান এ সাতটি দেশ মিলে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক গঠন করে। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা হল সার্কের মূল লক্ষ্য। সার্কের মাধ্যমে পল্লিউন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৫. কলম্বো পরিকল্পনা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও প্রশাসনে কলম্বো পরিকল্পনা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকে। তাছাড়া পেশাদার কর্মীদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের ক্ষেত্রে কলম্বো পরিকল্পনার অবদান অপরিসীম।

৬. কেয়ার : আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অবকাঠামো নির্মাণে কেয়ারের অবদান অপরিসীম। কাজের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচির মাধ্যমে কেয়ার রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে পল্লির মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। কেয়ারের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৭. আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ সংস্থা : এ সংস্থা গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির সাথে যুক্তভাবে পারিবারিক আয় উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও শিশুকল্যাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছে।

৮. ইউনিসেফ : সমাজের অবহেলিত ও অসহায় শিশুদের উপার্জনক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইউনিসেফ নিজস্ব উদ্যোগে কতকগুলো বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান করতে এসব বিদ্যালয় শিশুদেরকে শক্তি সামর্থ্য লাভে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম।

৯. এস ও এস : এস ও এস ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম ঢাকার শ্যামলীতে অসহায় ও দুস্থ শিশুদের লালনপালনের জন্য একটি শিশুপল্লি প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এস ও এস অনুরূপ আরও শিশুপল্লি প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব শিশুপল্লিতে শিশুরা 'হাউজমাদার' এর তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে লালিতপালিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

১০. ওয়াই. এম. সি. এ এবং ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ : যুবকদের জন্য YMCA এবং মহিলাদের জন্য YWCA বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানে এ দু'টি সংস্থার ভূমিকা প্রশংসনীয়। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লিখিতভাবে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রশ্ন২। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কি? বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাৎপর্য আলোচনা কর?

অথবা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কি? বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো উপযোগিতা আলোচনা কর?

উত্তর। ভূমিকা : আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। ফ্রিডল্যান্ডার এর ভাষায়, "International social work in its narrower sense comprises welfare activities under anspicies of international agencies government or voluntary but social services in foreign countries may also be called international social work."

এ প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের অবহেলিত, দুর্যোগ কবলিত ও সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত সেবা কার্যক্রম। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, সাহায্য সহযোগিতা, পণ্য আদানপ্রদান, যোগাযোগ, মানব অধিকার সংরক্ষণ, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি বিনিময় প্রভৃতি যেসব কর্মধারা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানবীয় প্রয়োজন পূরণ, বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্য দান, মানবীয় মর্যাদা এবং অধিকার সংরক্ষণ, সহায় সম্বলহীন ও দুর্যোগ কবলিত মানুষের সাহায্য সহযোগিতার লক্ষ্যে সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : বিশ্বের একটি অন্যতম অনগ্রসর ও সমস্যাক্লিষ্ট দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জাতীয় কর্মতৎপরতা অপ্রতুল ও সীমিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া বিশ্ব মানবসমাজের সুখশান্তি ও নিরাপত্তা দানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশে যেসব দিকসমূহের জন্য মুখ্যভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য : বিশ্বে যতগুলো দরিদ্র দেশ রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের স্থান সর্বপ্রথমে। এদেশের মানুষের সার্বিকভাবে উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সীমিত সম্পদ মোটেও যথেষ্ট পরিমাণ নয়। এজন্য প্রয়োজন হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতা। কেননা এদের সহযোগিতার মাধ্যমেই বস্তুগত সমৃদ্ধি এনে দরিদ্রতা দূর করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কারিগরি সাহায্য লাভে : জাতীয় প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সাধন, উন্নতমানের প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লাভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া সেবার মান উন্নয়নে দক্ষকর্মী তৈরি ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদানেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

৩. ফলপ্রসূ ও অর্থবহ সেবাকর্মের পথ নির্দেশনা লাভে : ফলপ্রসূ ও অর্থবহ সেবাকর্মের পথ নির্দেশনা লাভে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আন্তর্জাতিকভাবে সেবা কার্যক্রমসমূহে দক্ষ পেশাদার কর্মী সুশৃঙ্খল সেবা পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুতরাং আমাদের দেশের অবহেলিত মানুষের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. তাৎক্ষণিক ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা : তাৎক্ষণিক ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারি, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগের সময় জাতীয় তৎপরতা খুবই সীমিত। সুতরাং বলা যায়, বাস্তবে জাতীয় তৎপরতার চেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. পরিপূরক তৎপরতা হিসেবে : সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকারি তৎপরতার সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতাসমূহ সহায়ক ও পরিপূরক অবদান রাখে। ফলে জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনও সহজ হয়। এ কারণে সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. ছোটখাট সমস্যা মোকাবিলায় : বাংলাদেশের হাজারো ছোটখাট সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারের মনোযোগ দেওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। তাই এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে : বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব মানবসমাজের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। আর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতাই এক্ষেত্রে সুখশান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং অবহেলিত ও দুর্যোগ কবলিত মানুষের নিরাপত্তা বিধান করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা বিশ্ব মানবসমাজের মঙ্গলার্থে তথা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন।৩। **আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশে যেসব প্রকল্প পরিচালনা করছে সেগুলোর আলোচনা কর।**

অথবা, **কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালিত প্রকল্পগুলোর বিবরণ দাও।**

অথবা, **কেয়ার বাংলাদেশ কী কী প্রকল্প পরিকালনা করেন।**

অথবা, **কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালিত প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম কী কী?**

উত্তর। **ভূমিকা :** পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাহায্য সংস্থা কেয়ার ১৯৪৯ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কেয়ারের ভূমিকা ও কর্মতৎপরতায় স্কুল ও স্কুল পূর্ব শিশুদের দুধ সরবরাহ এবং নির্মাণ কাজে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সালে সরকারের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে কেয়ার আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করে।

কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালিত প্রকল্প : আমাদের দেশে কেয়ার যেসব প্রকল্প পরিচালনা করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ল্যান্ডলেস ওউনড, টিউবওয়েল ইউজারস্ সাপোর্ট (লোটাস), নারী উন্নয়ন প্রকল্প (ডব্লিউ ডি পি), রুরাল মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (আর এম পি), লোকাল ইনস্টিটিউটস ফার্মার্স ট্রেইনিং (লিফট), ওমেন ফর হেলথ এডুকেশন (ডব্লিউ এইচ ই), ট্রেনিং ইম্যুনাইজারস্ ইন দ্য কম্যুনিটি অ্যাপ্রোচ (টিসা) ইত্যাদি।

লোটাস, ডব্লিউ ডি পি, লিফট, ডব্লিউ এইচ ই ও টিসা আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। লোটাস হল ভূমিহীন কৃষকদের সেচ কাজে সহযোগিতামূলক একটি প্রকল্প। ডব্লিউ ডি পি প্রকল্প গ্রাম পর্যায়ে মহিলাদের প্রকল্প, এটি আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে কাজ করে থাকে। লিফট হল চাল ছাড়া অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রকল্প। কেয়ার এভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কেয়ার প্রায় ২৫ কোটি ডলারে কাজ করছে। ১৯৮৭ অর্থবছরে তাদের বাজেট প্রায় ৬ কোটি ডলার। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেয়ার ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে ১৭টি উপকেন্দ্র আছে। কেয়ারের ১২০০ দেশীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ১৬ জন আন্তর্জাতিক সদস্য রয়েছে, যারা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র লোকদের পাশে থেকে তাদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি হচ্ছে কেয়ারের সর্ববৃহৎ প্রকল্প। এতে ভূমিহীনদের প্রায় আড়াই কোটি শ্রমিককে দিবসের কাজে লাগানো হয়। রাস্তা, বাঁধ নির্মাণ এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রায় ৫০ লক্ষ ভূমিহীন এ কাজের সাথে সাময়িকভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে (ইউ এস এ রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৫ লক্ষ)। ৪ কোটি ডলারের বাজেট এ প্রকল্পেই যুক্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৮০ লক্ষ ডলার দিয়েছে, বাকি ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার দিয়েছে ইউএসএইড। কেয়ার সক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৮ লক্ষ ডলারের প্রকল্প হল লোটাস প্রকল্প। এ প্রকল্প পরিচালিত হয় কেয়ার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে । এখানে তহবিল যোগান দিচ্ছে কেয়ার ইউ এস, কেয়ার ব্রিটেন এবং কৃষি ব্যাংক। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে যেসব স্থানে সেগুলো হল ধামরাই, টাঙ্গাইল, শ্রীপুর, শিবপুর, পার্বতীপুর ও রংপুরে। উপরিউক্ত স্থানগুলোতে লোটাস প্রকল্পের মাধ্যমেই কাজ করা হয়।

নারী উন্নয়ন প্রকল্পে ঢাকা, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় ৩১৬টি গ্রামের ৭৫,০০০ মহিলা যুক্ত রয়েছে। এখানে বাজেট হচ্ছে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্তভাবে পরিচালিত এ প্রকল্পে অর্থসাহায্য করছে কেয়ার ইউএস, নোরাড ও কেয়ার ফ্রান্স।

লিফট প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল, নরসিংদীর ১৩ হাজার প্রান্তিক ও ভূমিহীনদের মধ্যে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে অর্থ যোগান দেয় নেদারল্যান্ড সরকার, ইতালি সরকার এবং কেয়ার ইউ.এস.এ। যেসব দেশ থেকে অর্থের যোগান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে সুইডিশ, সিডা ইত্যাদি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, কেয়ার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নত ধনী রাষ্ট্র থেকে সাহায্য নিয়েই বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে, পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অনুদান দিয়ে থাকে। গ্রামীণ টার্গেট গ্রুপগুলোর আয় এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়ায় কেয়ার অনুমোদন করে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য সংস্থার মত কেয়ারের অবদানও প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন।৪। **আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কি? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাংলাদেশে এর কার্যক্রম আলোচনা কর।**

অথবা, **আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা কর।**

উত্তর। **ভূমিকা :** জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, শ্রমিক চিকিৎসা, শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণসহ নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সদস্য। সদস্য হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের শ্রমিকদের উন্নয়নে নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণ, শ্রমিকদের অধিকার আদায়, চিত্তবিনোদন, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (International Labour Organization) হল, জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ILO জাতিসংঘের সাথে একীভূত হয়। যদিও এর জন্ম হয়েছিল ১৯১৯ সালে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার মূল কাজ হল শ্রমিকদের যাবতীয় উন্নয়ন সাধন। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মঙ্গল সাধনই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া সরকার মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নকে একত্রিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা ILO এর অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও শ্রমিকদের সমিতি করার স্বাধীনতা, শ্রম ঘণ্টা নির্ধারণ, বেতন নির্ধারণ, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, ছুটি নির্ধারণ, সামাজিক বীমা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও ILO এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিধিভুক্ত।

কার্যক্রম : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

১. শ্রমিকদের চাকরি, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম।
২. বিভিন্ন দেশের সরকারকে শ্রম মান নিরূপণে সহায়তা দানের জন্য ILO আন্তর্জাতিক শ্রম মান নিরূপণ করে। সে মান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার তাদের মান নির্ধারণ করবে।
৩. আন্তর্জাতিক শ্রম নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারকে নীতিমালা অনুসরণে সহায়তা করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. শ্রমিকদের কল্যাণে সমস্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, পঠনপাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশে ILO এর কার্যক্রম : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন ILO এর সদস্য হয়। সদস্য হওয়ার পর থেকে ILO বাংলাদেশের শ্রমিক ও তাদের কল্যাণে বেশকিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এখনও বাংলাদেশে ILO এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নিম্নে এসব কার্যক্রমগুলো আলোচনা করা হল :

১. গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি : বাংলাদেশে ILO প্রথম যে কর্মসূচি গ্রহণ করে তা হল গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি। এ কর্মসূচির সময়কাল হল ১৯৭৩-১৯৮৩। এটি গ্রামোন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করেছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

ক. গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রামের পূর্ত কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও জোরদারকরণ।
খ. গ্রাম এলাকায় কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটানো।
গ. গ্রামের যুব সমাজকে হাঁস-মুরগি খামার গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
ঘ. গ্রামীণ লোকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান।
ঙ. গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এছাড়াও ঐ দশকে বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়নে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও তার উন্নয়ন সাধন।
খ. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ উন্নয়নে কারিগরি সাহায্যদান।
গ. জলসেচ পাম্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
ঘ. সড়ক পরিবহণ কর্মসূচিকে সহযোগিতা দান।

২. জনশক্তি পরিকল্পনা ও জনসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি : ১৯৭৩-৮৩ দশকে বাংলাদেশের জনশক্তি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয় ILO। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. কর্মসংস্থান Related Service Sector এর উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ করা।
খ. পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।
গ. বাংলাদেশের জনসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়ানো।

৩. ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি : ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল ILO. ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাহায্য দান ও উন্নতি সাধনে সক্ষম করে তোলা হয়। এটি বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে।

৪. জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষা কর্মসূচি : ILO বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এ কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ে শিক্ষা দান এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। এ লক্ষ্যে ২১টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন ও চার লক্ষ শ্রমিককে জনসংখ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ শেখানো হয়। এ কর্মসূচি শ্রমিকদের জন্য গঠিত ক্লিনিকের মান উন্নয়ন করেছিল। এ কর্মসূচি প্রথম শ্রমিকদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়।

৫. নারী উন্নয়ন কর্মসূচি : বাংলাদেশের অনগ্রসর নারী জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ILO বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের জন্য 'দক্ষতামুখী নারী প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি চালু করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি কেন্দ্র খোলা হয়। কেন্দ্রগুলো হল সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা ও যশোর। এ কেন্দ্রগুলো ছাড়াও ১২টি উপএলাকা ছিল। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও তাদের দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা হয় তা হল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও কারবার ব্যবস্থাপনা, বিপণন, বিক্রয় ও ডিজাইন। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ।

৬. উপদেষ্টা সরবরাহ কর্মসূচি : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপদেষ্টা সরবরাহ কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেসব বিষয়ে উপদেষ্টা সরবরাহ করেছে সেগুলো নিম্নরূপ :

... জনসংখ্যা প্রকল্প।

... গ্রামীণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

... সমবায় ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প।

...বাংলাদেশের শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও তা কমানোর ... দিকনির্দেশনা দান করে। এছাড়াও বাংলাদেশের ... জন্য সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ... ILO।

৭. অন্যান্য কার্যাবলি : বাংলাদেশে ILO উপরিউক্ত ... আরও কিছু কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা নিম্নে ... হল :

ক. বেকারত্ব রোধের জন্য কর্মসূচি।

খ. শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানমূলক কর্মসূচি।

গ. শিশু শ্রম বন্ধের জন্য গৃহীত কর্মসূচি।

ঘ. শ্রমিকদের নির্যাতন বন্ধের জন্য গৃহীত কর্মসূচি।

ঙ. পঙ্গু শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।

চ. শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন কর্মসূচি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ... জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ILO সুপরিচিত। ILO সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ ও ...টায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে শ্রম সমস্যা ব্যাপক। ...ই বাংলাদেশে ILO এর কাজ করার ক্ষেত্রও ব্যাপক। বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার আদায়, তাদের অর্থনৈতিক ও ...জিক কল্যাণ সাধনের জন্য ILO বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এ সংস্থা আরও ...শি ভূমিকা পালন করবে শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য।

প্রশ্ন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কী? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম কী? বাংলাদেশে এর কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, **জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কী? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম কী? বাংলাদেশে এর কর্মপদ্ধতি আলোচনা কর।**

অথবা, **জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কি? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম কি? বাংলাদেশে এর কর্মপ্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনার অন্যতম সংস্থা হল খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organization- FAO). বিশ্বের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ, বণ্টন, কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদন কাজে সহায়তা করে এ সংস্থা। বাংলাদেশ জাতিসংঘের এ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে। এরপর থেকে এ সংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। আজ অবধি বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ, কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থার অবদানের কারণেই বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়ন আধুনিকায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা : জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা হল খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। সংক্ষেপে এটি FAO নামে পরিচিত। ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং অনাহার থেকে বিশ্বের মানুষকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর কানাডার কুইবেকে এক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে এ সংস্থা জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর ইতালির রোমে অবস্থিত। এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে। একজন মহাপরিচালক ও কার্যকরী পরিষদের সমন্বয়ে এর সচিবালয় গঠিত।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. বিশ্বের মানুষদের ক্ষুধামুক্ত রাখা।
২. FAO এর সদস্যভুক্ত দেশের মানুষের পুষ্টি ও জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করা।
৩. FAO এর সদস্যভুক্ত দেশের কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।
৪. গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কার্যক্রম : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যথা :

১. খাদ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও তা প্রকাশ করা।
২. উপযুক্ত খাদ্যনীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।
৩. খাদ্য ও কৃষি উন্নয়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরামর্শদান ও একে অন্যকে সহযোগিতা দান।
৪. সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে খাদ্য ও কৃষি উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা দান।

বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কার্যক্রম : বাংলাদেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে। সদস্য হওয়ার পর হতে এ সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খাদ্য সহায়তা দানের জন্য FAO একটি খাদ্য নিরাপত্তা কমিশন গঠন করেছে। বাংলাদেশ এ খাদ্য নিরাপত্তা কমিশনের সদস্য। খাদ্য নিরাপত্তা কমিশন বাংলাদেশের খাদ্য উন্নয়নের কতকগুলো কৌশল হাতে নিয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।
২. অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতায় খাদ্য বিভাগীয় মহাপরিদপ্তর পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ।
৩. নেদারল্যান্ডের সহযোগিতায় খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি গ্রহণ।

এছাড়াও FAO বাংলাদেশের পল্লিউন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী সংস্থা গঠন করেছে। এ সংস্থাটি হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লিউন্নয়ন কেন্দ্র (Centre for Integrated Rural Development for Asia and the Pacific-CIRDAP)। এ সংস্থার অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো হল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনাম। এ সংস্থার সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া FAO বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকায়ন, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ, গো-সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনরাজির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল ইত্যাদি কারণে মারাত্মক খাদ্য সংকট দেখা দেয়। দুর্যোগকালীন এ সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রেও FAO অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থারও সদস্য। অন্যদিকে, বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিকায়ন সম্ভব হয় নি। তাই বাংলাদেশে FAO এর কার্যক্রম বেশি। বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়নে FAO গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ভবিষ্যতে আরও বেশি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে FAO বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

প্রশ্ন।৬। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কী? বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কাকে বলে? বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কাকে বলে? বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকৌশল সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO)। বিশ্বের মানুষের বিশেষ করে এর সদস্যভুক্ত দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। এরপর থেকেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি উন্নয়ন, সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এ সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ সংস্থা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization- WHO) হল জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। ১৯৪৬ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয় কার্যকরী পরিষদ ও সম্পাদকীয় দপ্তর নিয়ে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করার বাসনা নিয়ে জন্মলাভ করে। এ সংস্থা সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করে। এছাড়া নানা ধরনের রোগব্যাধি নির্মূলের জন্য এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

কার্যক্রম : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ১৯৭৭ সালে। এ কর্মসূচি সফল করার জন্য গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করে। গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদান।
২. প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পুষ্টি সরবরাহ।
৩. পানি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিরাপদে রাখা।
৪. পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা করা।
৫. সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা।
৬. স্থানীয়ভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।
৭. সাধারণ রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার ব্যবস্থা।
৮. প্রয়োজনীয় ও জরুরি ঔষধ হাতের কাছে রাখা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৯ মে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। এরপর থেকে বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এদেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশে গৃহীত কর্মসূচিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল : বাংলাদেশে যেসব সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে তা নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সব ধরনের কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যাচ্ছে।

২. চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে সহযোগিতা : বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার মান তেমন উন্নত নয়। তাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বই পুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে।

৩. **চিকিৎসা সুযোগ বৃদ্ধি কর্মসূচি :** বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা খুবই কম। তাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এ দেশের মানুষের চিকিৎসার সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে থাকে।

৪. **মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি :** শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। আবার সুস্থ সবল শিশু পেতে হলে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে নানা ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

৫. **স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচি :** বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করে নি, বরং স্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবাকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

৬. **স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে পরামর্শদান :** বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। এরপর তথ্য নিয়ে গবেষণা করেছে। গবেষণা হবে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। এছাড়াও প্রতি বছর স্বাস্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জন্মলাভ। জন্মলাভের পর হতে বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুষ্টি উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এ সংস্থার জুড়ি নেই। বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও এ সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রশ্ন॥৭॥ ইউনেস্কো কী? বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম আলোচনা কর।

অথবা, ইউনেস্কো কাকে বলে? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে ইউনেস্কোর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, ইউনেস্কোর পরিচয় দাও। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মকৌশল ইউনেস্কোর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, ইউনেস্কো সম্বন্ধে যা জান লিখ। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মপদ্ধতি ইউনেস্কোর ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু বাংলাদেশের সম্পদ কম, কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই এত প্রকট সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, জাতিসংঘের কিছু বিশেষায়িত সংস্থা রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্প্রসারণ ও জোরদার করে থাকে। ইউনেস্কো তেমনই একটি সংস্থা, যা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইউনেস্কো : ইউনেস্কো হল জাতিসংঘের একটি সংস্থা। UNESCO এর পূর্ণরূপ হচ্ছে 'United Nations Education Scientific and Cultural Organization'. এর অর্থ হল জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত। এ সংস্থা পরিচালিত হয় একটি কার্যকরী পরিষদের দ্বারা। বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য হয় ১৯৭২ সালে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ইউনেস্কো গঠিত হয় তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে। এছাড়াও মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিও ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইউনেস্কো শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্যও এ সংস্থা কাজ করে থাকে। এছাড়াও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনে পাইলট প্রকল্পও গ্রহণ করে ইউনেস্কো।

ইউনেস্কোর কার্যক্রম : ইউনেস্কো একজন মহাপরিচালকের অধীনে কাজ করে। এর কার্যক্রম তিনটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইউনেস্কোর কার্যক্রমকে মোট আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. শিক্ষা,
২. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান,
৩. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড,
৪. সমাজবিজ্ঞান,
৫. জনবিনিময়,
৬. জনসংযোগ,
৭. পুনর্বাসন এবং
৮. কারিগরি সহযোগিতা।

বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য হওয়ার পর হতে এদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন রয়েছে, যা Bangladesh National Commission for UNESCO-BNCU নামে পরিচিত। এ কমিশনের সভাপতি হলেন শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিব এর সেক্রেটারী জেনারেল। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ এ কমিশনের সদস্য। এ কমিশন একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে কাজকর্ম পরিচালনা করে। কমিশনের একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ২২। শিক্ষামন্ত্রী এ স্টিয়ারিং কমিটির

সভাপতি। এছাড়াও পাঁচটি সাব কমিশন আছে, যার সদস্য সংখ্যা ১১, সাব কমিশনগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষা,
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি,
৩. সংস্কৃতি,
৪. যোগাযোগ এবং
৫. সামাজিক বিজ্ঞান।

ইউনেস্কো শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। APEID কর্মসূচির মাধ্যমে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউনেস্কো শিক্ষার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (NIEAER),
২. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IER),
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা,
৪. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং
৫. বাংলাদেশ পল্লিউন্নয়ন একাডেমী (BARD)।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউনেস্কো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নে ইউনেস্কো গবেষণা সাহায্য করে যাচ্ছে। বিজ্ঞান যাদুঘরের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ইউনেস্কো দুই লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সেজন্য এশিয়ান আর্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করে ইউনেস্কো। সংস্কৃতির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ইউনেস্কো। সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে ইউনেস্কো।

সম্প্রতি ইউনেস্কো তাদের কার্যক্রমে এইড্স বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশেও এইডস নির্মূল ও এইডস বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে।

তবে ইউনেস্কো শিক্ষা বিস্তারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ইউনেস্কো যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ দান,
২. নারী শিক্ষার উন্নয়ন,
৩. পরিবেশগত শিক্ষার সম্প্রসারণ,
৪. বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত শিক্ষা বিস্তার এবং
৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ একটি গরিব দেশ হলেও ইউনেস্কোর সদস্য। ইউনেস্কো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ইউনেস্কো বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে আমরা সে আশা করি।

প্রশ্ন।৮। **আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে UNICEF এর কার্যক্রম আলোচনা কর।**

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা UNICEF বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কর্মসূচি পরিচালনা করে তা আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা UNICEF বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কর্মপরিকল্পনা পরিচালনা করে তা আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা UNICEF বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কর্মপরিসর পরিচালনা করে তা আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা UNICEF বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কর্মপদ্ধতি পরিচালনা করে তা আলোচনা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** বাংলাদেশে বর্তমানে সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এদেশে সামাজিক সমস্যাগুলো এত প্রকট যে, দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কারিগরি জ্ঞানেরও অভাব রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার সদস্য। তাই আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় বেশ জোরালো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইউনিসেফ অন্যতম। ইউনিসেফ মূলত বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফের পরিচয় : UNICEF এর পূর্ণরূপ হচ্ছে 'United Nations International Children's Fund' বা আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল। এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে এ সংস্থা। ১৯৪৬ সালে এটি গঠন করা হয়। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। যখন এটি গঠন করা হয় তখন এর নাম ছিল "The United Nations International Children Emergency Fund." ১৯৫০ সালে Emergency শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে এটি শিশু নিরাপত্তা, শিশু খাদ্য, শিশু ব্যবস্থা, শিশুশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : শিশুদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর জন্য এ সংস্থার উৎপত্তি হয়। বর্তমানে এটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে শিশুদের যাবতীয় চাহিদা ও অধিকার পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫৯ সালে সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার ঘোষণা করা হয়। শিশুদের এ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করাও এ সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশসহ বর্তমানে বিশ্বের একশ'রও বেশি দেশে এ সংস্থা শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের কার্যক্রম : বাংলাদেশে ইউনিসেফ শিশুদের ভাগ্য উন্নয়ন ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বেশকিছু কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের কথা নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. **স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম :** ইউনিসেফ বাংলাদেশে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম অন্যতম। স্বাধীন হওয়ার পর হতেই এদেশের শিশু মৃত্যুহার রোধ এবং মাতৃমৃত্যু রোধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্য মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের টিকা সরবরাহ করে থাকে। টিকাদানে মানুষকে উৎসাহিত ও সচেতন করেছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সহায়তা করেছে।

২. **পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম :** ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কারণ বাংলাদেশে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুরা পুষ্টিহীনতার শিকার। শুধু তাই নয়, তারা পুষ্টি সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাই পুষ্টিজ্ঞান বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য পুষ্টি প্রশিক্ষণদান কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। তাছাড়া পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা চালায় ইউনিসেফ। দুর্যোগকালীন শিশুদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে ইউনিসেফ।

৩. **শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম :** ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দু'ভাবে ইউনিসেফ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সূচি হল শিক্ষার পাশাপাশি বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের সরবরাহ কার্যক্রম। এছাড়া শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানও করে থাকে। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অশিক্ষিত যুবক, মহিলা ও পুরুষদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সহায়তা দান।

৪. **মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান :** ইউনিসেফ বাংলাদেশের মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য মাদার্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। মাদার্স ক্লাবের মাধ্যমে মহিলাদের বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে মহিলাদের সেলাই মেশিন, বুননযন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫. **অন্যান্য কার্যক্রম :** ইউনিসেফ বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় এ সংস্থা সাহায্য করে থাকে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে ইউনিসেফ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী সমস্যা। তাই নিজেদের সীমিত সম্পদ দিয়ে এ সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর সহায়তা নেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিশুদের যাবতীয় চাহিদা, তাদের উন্নয়ন, মহিলাদের উন্নয়নে ইউনিসেফের গৃহীত কার্যক্রম প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রশ্ন।১৭ **বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে UNFPA এর অবদান আলোচনা কর।**

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে UNFPA এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে UNFPA এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে UNFPA এর উপযোগিতা আলোচনা কর।

উত্তর৷ ভূমিকা : যুদ্ধবিগ্ন অসুস্থ বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে একটি কল্যাণমূলক এবং উন্নয়নশীল ও কল্যাণকর বিশ্ব সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় United Nation বা জাতিসংঘ। জাতিসংঘের কার্যক্রম আরও কয়েকটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যার একটি হল জাতিসংঘের আর্থসামাজিক পরিষদ। আর্থসামাজিক পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ তার সদস্য দেশসমূহের জন্য আর্থসামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা চালায়। এরূপ একটি প্রচেষ্টা হল জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল। বস্তুত বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সদস্য দেশগুলোকে যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে UNFPA।

UNFPA এর পরিচিতি : ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্য দেশগুলোকে জনসংখ্যা কার্যক্রমে প্রযুক্তিগত তথা কারিগরি সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনার ফলশ্রুতিতে 'ট্রাস্ট ফান্ড' নামে একটি ফান্ড গঠন করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে 'জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল' আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এর কার্যক্রম ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত। UNFPA এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

UNFPA এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জনসংখ্যাজনিত সমস্যার সমাধান করাই হল এ সংস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে সংস্থার আরও কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হল নিম্নরূপ :

১. বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করা,
২. বিশ্বের মৃত্যুর হার রোধ করা,
৩. সদস্য দেশগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ,
৪. জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান,

৫. শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান,
৬. যোগাযোগ ও শিক্ষা কর্মসূচির উন্নয়ন,
৭. জনসংখ্যার মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করা,
৮. জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ করা,
৯. জনসংখ্যা বিষয়ক নীতিনির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা প্রদান ও
১০. জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়নে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে UNFPA এর ভূমিকা বা অবদান : বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচির ক্ষেত্রে UNFPA যেসব ভূমিকা পালন করছে তা নিম্নে আলোচা করা হল :

১. পরিবার পরিকল্পনা : আমাদের দেশে পরিকল্পিত পরিবারের সংখ্যা একেবারেই কম। পরিবার পরিকল্পনা হল পরিবারের আয়ের সাথে সংগতি রেখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পরিবারের আয়তন ছোট রাখা। আর পরিবার পরিকল্পনা কি, এ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে UNFPA উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত UNFPA পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ৮ কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে।

২. শিশুমৃত্যু রোধ : আমাদের দেশে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি। বিশেষ করে শিশুদের জন্য পরবর্তীকালীন যত্ন ও পরিচর্যা, পরিকল্পিত ও উপযুক্ত জন্ম প্রক্রিয়া, শিশুদের জন্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধকরণ টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি ক্ষেত্রে UNFPA বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

৩. জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচি : সেই ১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে UNFPA বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। জনসংখ্যা বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সহযোগিতা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪. জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার trend নির্ধারণের ক্ষেত্রে UNFPA সরকারকে সাহায্য করে থাকে। বিশেষ করে সময়ের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কি পরিবর্তন হচ্ছে তা অবগত হতে সহায়তা করে। যেমন- কোন বছরে দেশের জনসংখ্যা কত ছিল, জনসংখ্যা কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি, এর ভবিষ্যৎ প্রভাব কি ইত্যাদি। শুধু তাই নয় এক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী গতিবিধির আলোকে জনসংখ্যা সম্পর্কে বাণী প্রদানের কাজও UNFPA করে থাকে।

৫. যোগাযোগ ও শিক্ষা কর্মসূচি : যোগাযোগ ও শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক অবকাঠামো যেমন- বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ের উপকরণ সরবরাহ, অনানুষ্ঠানিক এবং বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে UNFPA সহায়তা দিয়ে থাকে।

৬. জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ : UNFPA এর মূল কাজই হল জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যার সমাধান। আর কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে সে সমস্যা সম্পর্কে সর্বাগ্রে ভালোভাবে জানতে হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা কার্যক্রমে সহায়তা করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে UNFPA জনসংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

৭. জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য প্রচার : বাংলাদেশসহ যেসব দেশে UNFPA তার কার্যক্রম পরিচালনা করে সেসব দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তা প্রকাশকরণের ক্ষেত্রেও সাহায্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, সম্মেলন, তথ্য, প্রচার প্রচারনার কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দেয় UNFPA.

৮. জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচির সমন্বয় ও বাস্তবায়ন : বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ কাজ করে। পাশাপাশি বেসরকারি এবং স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থাও এক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব সরকারি কার্যক্রম/কর্মসূচির মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন, সরকারের সাথে বেসরকারি সংস্থার কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং সর্বোপরি কর্মসূচি বাস্তবায়নে UNFPA সহায়তা দিয়ে থাকে।

৯. প্রশিক্ষণ প্রদান : জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাহায্য দিয়ে থাকে UNFPA । এর মধ্যে রয়েছে ডাক্তার ও নার্সদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিবার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

১০. উপকরণ সরবরাহ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহের ক্ষেত্রে UNFPA বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী যেমন- কনডম, পিল, ইনজেকশন এবং অপারেশনের জন্য উন্নতমানের উপকরণ/যন্ত্র সরবরাহকরণ ইত্যাদি।

১১. মাতৃসদন ও পরিবার পরিকল্পনা : বাংলাদেশে মাতৃসদন জনিত সেবা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে জনসাধারণকে আগ্রহী করে তোলার জন্য পরিচালিত কর্মসূচিতে সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ ও উপকরণ সরবরাহ করে থাকে UNFPA।

১২. অন্যান্য কর্মসূচি : Specific ভাবে জনসংখ্যা কর্মসূচির বাইরে বাংলাদেশে শিশু, তরুণ, নারী, প্রবীণ, অসহায় এবং দরিদ্র শ্রেণীর জন্য UNFPA বিশেষভাবে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, জনসংখ্যা জনিত সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে UNFPA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের পরবর্তী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে UNFPA সব ধরনের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে আসছে। তবে বাংলাদেশে জনসংখ্যা কার্যক্রমে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অদক্ষতা এবং দুর্নীতির ফলে UNFPA এর কার্যক্রম সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয় নি। তাই বাংলাদেশে UNFPA এর প্রকল্প আরও সম্প্রসারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সততা ও নৈতিকতা জাগ্রত করতে হবে। এ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আরও বেশি করে প্রভাবিত করতে হবে, যাতে সংস্থাটি এদেশের জন্য আরও নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়।

প্রশ্ন।১০। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণে কেয়ারের ভূমিকা বর্ণনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে কেয়ার বাংলাদেশের উপযোগিতা আলোচনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে বাংলাদেশ কেয়ারের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে বাংলাদেশ কেয়ারের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে বাংলাদেশ কেয়ারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : সারা বিশ্বের অন্যতম সাহায্যকারী সংস্থা হল কেয়ার। কেয়ার বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। ঢাকায় এর প্রধান অফিস এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৭টি উপকেন্দ্র রয়েছে। কেয়ারে ১২০০ জন দেশীয় কর্মী ও ১৬ জন আন্তর্জাতিক সদস্য আছেন। বাংলাদেশে কেয়ার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ২৫ কোটি ডলারে কাজ করেছে। সমাজকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে কেয়ারের ভূমিকা অপরিসীম।

কেয়ারের ভূমিকা : বাংলাদেশে কেয়ারের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হল কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ল্যান্ডলেস ওউমেন্স, ইউজারস্ সাপোর্ট (লোটাস), নারী উন্নয়ন প্রকল্প (ডব্লিউ. ডি. পি), রুরাল মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (আর. এম. পি), লোকাল ইনস্টিটিউটস ফর ফার্মার্স ট্রেইনিং (লিফট), ওমেন্স হেলথ এডুকেশন (ডব্লিউ এইচ ই), ট্রেনিং ইম্যুনাইজারস ইন দ্য কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ (টিসা)। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম আলোচনা করা হল :

১. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি : বাংলাদেশে কেয়ারের যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে এটি হল সবচেয়ে বৃহৎ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় আড়াই কোটি ভূমিহীন লোকদের কাজে লাগানো হয়, যাতে তারা নিজেরা উপার্জন করে খেতে পারে। এ প্রকল্পের আওতায় যেসব কাজ করানো হয় তার মধ্যে রয়েছে রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণ কাজ, কালভার্ট নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ কাজ প্রভৃতি। এর জন্য চার কোটি ডলারেরও বেশি বাজেট ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ৫০ লক্ষ ভূমিহীন অসহায় মানুষ আয় উপার্জনের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। কেয়ারের এ কর্মসূচির জন্য বাংলাদেশ সরকার ৮০ লক্ষ ডলার দেয় এবং ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার দিয়ে থাকে ইউ এস এ।

২. লোটাস প্রকল্প : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ও কেয়ার এ ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে লোটাস প্রকল্প পরিচালিত হয়। এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় ৮ লক্ষ ডলার। লোটাস প্রকল্পে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে কেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র), কেয়ার (যুক্তরাজ্য) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। এ প্রকল্পের কাজ হল ভূমিহীন কৃষকদের কৃষিকাজে সহায়তা করা, যাতে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের নাম অব্যাহত থাকে। এজন্য কেয়ার চাষাবাদের সেচ ব্যবস্থায় সহযোগিতা, উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ, পাম্প ব্যবহার ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নমূলক কাজে সর্বোত্তম সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। লোটাস প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব স্থানে কাজ করা হয় তা হল ধামরাই, শ্রীপুর, টাঙ্গাইল, রংপুর ও পার্বতীপুর।

৩. নারী উন্নয়ন প্রকল্প : এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হয়। এ প্রকল্পের অধীনে ঢাকা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর জেলার ১৬টি গ্রামের ৭৫,০০০ মহিলা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। এসব মহিলারা আর্থসামাজিকভাবে যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমনি নিজেদের আত্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে সমাজের কাছে পরিচিত পেয়েছে। এ প্রকল্পের বাজেট ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে অর্থ যোগান দিচ্ছে কেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র), কেয়ার (ফ্রান্স), নোরাড। কেয়ার এভাবে বিভিন্ন নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৪. লিফট প্রকল্প : গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল ও নরসিংদীর ১৩ হাজার প্রান্তিক ও ভূমিহীন মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। এ প্রকল্পের সাহায্যে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় ও দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার জন্য ধান, চাল ছাড়া অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ভূমিহীন কৃষকরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেয়েছে। এসব পরিবার পারিবারিক সবজি বাগান থেকে উৎপাদিত সবজি বিক্রি করে সঞ্চয় করতে শিখেছে। এদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লিফট প্রকল্পে অর্থের যোগান দেয় নেদারল্যান্ড সরকার, ইতালি সরকার এবং কেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র) ও সিডা (সুইডিশ)।

৫. **ওমেন হেলথ এডুকেশন :** মহিলাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণও এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এর ফলে অপুষ্টি ও মাতৃত্বজনিত দুর্ঘটনা থেকে দরিদ্র, অসহায় মহিলারা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। কেয়ার এসব দুস্থ মহিলাদের বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। যাতে তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে কেয়ারের ভূমিকা অপরিসীম। কেয়ার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য ২৫ কোটি ডলারে কাজ করছে। ১৯৮৭ সালে কেয়ারের বাজেট ছিল ৬ কোটি ডলার। বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি। কেয়ারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও তত্ত্বাবধান হয় দেশজুড়ে ১৭টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে। কেয়ার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নত ধর্মীয় রাষ্ট্র থেকে সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অনুদান দিয়ে থাকে। গ্রামীণ টার্গেট গ্রুপগুলোর আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়াও কেয়ার অনুমোদন করে। সর্বোপরি বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে কেয়ারের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন॥১১॥ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কার্যক্রমসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কার্যক্রমসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, তথা শ্রমিকদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার উদ্ভব হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আওতাধীন জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের কল্যাণে নিয়োজিত। নিচে এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো :

১. **সামাজিক নিরাপত্তা :** শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা আন্তর্জাতিক শ্রমকল্যাণ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে এটি শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশি জোর দিচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যাতে তারা চাকরিকালীন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে।

২. **শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ :** শ্রমসংস্থার অপর একটি লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা। তাদেরকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। যাতে তারা নিজেরা নিজের অধিকার এবং প্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তাই এ সংস্থা শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৩. **শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন :** শ্রম সংস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করা। শ্রমিকরা যেন উন্নত জীবন ভোগ করতে পারে, আবাসিক সুবিধা পায়, উন্নতমানের মজুরি প্রাপ্তি, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতির লক্ষ্যে এই সংস্থা কাজ করে থাকে। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি প্রণয়ন করে থাকে।

৪. **শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা এ সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। শিশু শ্রম একটি অপরাধ। শিশুদের দিয়ে যাতে কাজ করানো না হয় সে লক্ষ্যে শ্রম সংস্থা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। শিশু শ্রম বন্ধ করার জন্য শ্রমসংস্থা কঠোর আইনও প্রণয়ন করেছে।

৫. **নির্যাতন থেকে রক্ষা করা :** প্রায়শই শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। তারা তাদের যোগ্য মর্যাদা পায় না। ফলে তাদের জীবন মানও উন্নত হয় না। তাই শ্রম সংস্থা অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতন থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. **সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :** সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা শ্রমসংস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কেননা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা পাবে। ফলে তারা আর অন্যায়, অত্যাচারের শিকার হবে না শিশু শ্রমও বন্ধ হবে।

৭. **সৌহার্দমূলক পরিবেশ সৃষ্টি :** শ্রমিকদের মাঝে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে সৌহার্দমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করাও শ্রমসংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের সাথে সৌহার্দমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শ্রমসংস্থা মালিক শ্রমিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

৮. **শ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয়। শ্রমসংস্থা আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন প্রণয়ন এবং সর্বস্তরে সেটার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম সংস্থা কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। কেননা আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ব্যতীত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে। শ্রমিকরা যেন শোষিত না হয়, তাদের অধিকার যেন রক্ষিত হয়, জীবনমান যেন উন্নত হয় শ্রমসংস্থা প্রভৃতি কল্যাণমূলক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। মূলত শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই সংস্থার আবির্ভাব।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ILO-এর সদস্যপদ লাভের পর থেকে এই পর্যন্ত শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। নিচে বাংলাদেশে এ সংস্থার কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান : আই এল ও এদেশের শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সংস্থা শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশের নিশ্চয়তা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে থাকে।

২. বেকারত্ব রোধ : জনবহুল এই দেশে অন্যতম একটি সমস্যা হলো বেকার সমস্যা। যে হারে মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই এ দেশে। তাই এদেশের শ্রমিকদের বেকারত্ব দূরীকরণ, কাজের শর্ত, বয়স, বেতন, কর্মঘণ্টা, ছুটি, ক্ষতিপূরণ সময় ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আই এল ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. শ্রমিক নির্যাতন রোধ : শ্রমসংস্থান শ্রমিক নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শ্রমসংস্থা শ্রমিকদের নির্যাতন রোধে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রম ব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রমিকদের বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান, মানবীয় ভোগান্তি ও বিদেশি শ্রমিক নির্যাতন বন্ধকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে আই এল ও বদ্ধপরিকর।

৪. শিশু ও মহিলা শ্রমিকদের কল্যাণ : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এদেশের শিশু ও মহিলা শ্রমিকদের উন্নয়নে ও তাদের কল্যাণে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। এগুলোর মধ্যে শিশু শ্রম আইন প্রণয়ন, শিশু শ্রম রোধ, অবিবাহিত মহিলা ও অবৈধ শিশুদের রক্ষা প্রভৃতি।

৫. দৈহিক পঙ্গুদের চাকরি ও পুনর্বাসন : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা দৈহিকভাবে পঙ্গুদের কল্যাণে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকে। এটি তাদের কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করছে। এজন্য এ সংস্থার ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার।

৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আনয়ন : শ্রমিক মালিকের যৌথ প্রচেষ্টায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই উপলব্ধি থেকে ILO এ কার্যক্রমে সহায়তা করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক বিমা, শিক্ষা, সরকারি সহায়তা ইত্যাদি।

৭. নীতি, আইন ও কনভেনশন : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা শ্রমিকদের কল্যাণার্থে নীতি প্রণয়ন, আইন প্রণয়ন, চুক্তি অনুমোদন করে থাকে। এসব শ্রমনীতি ও আইনে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষিত হয়। তাছাড়াও সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৮. শ্রমিক সংগঠন : আই এল ও আমাদের দেশে শ্রম সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা দিতে বদ্ধপরিকর। এ সংস্থার সাথে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। যা শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়োগ : আই এল ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়োগ করে আসছে। সাধারণত অনুরোধের ভিত্তিতে আই এল ও এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা সরবরাহ করে আসছে।

১০. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : ILO আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে শ্রমজীবীদের পড়াশুনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ইতালির তুরিন ও জেনেভাস্থ কেন্দ্রে কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যে কোনো সদস্য দেশের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।

১১. যৌথ কার্যক্রম : ILO অন্যান্য সংস্থার সাথে শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ে যৌথভাবে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। শ্রমিকদের কল্যাণে মূলত এ যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে, সামাজিক বিমা, শিশু ও নারী শ্রমবিষয়ক পারিবারিক ভাতা প্রভৃতি ব্যাপারে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে থাকে।

১২. শ্রমনীতি বাস্তবায়ন : ILO আন্তর্জাতিক শ্রমনীতি বাস্তবায়নে তৎপর। শ্রমিকদের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা বিচারপূর্বক তারা যেন যথাযথ পেশায় নিযুক্ত হতে পারে ILO সেই লক্ষ্যে কাজ করে। শ্রমনীতি বাস্তবায়নে ILO এর গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : ILO এর সাথে বাংলাদেশ চুক্তির মাধ্যমে 'International Programme on the Elimination of Child Labour'-IPECL এর সদস্য হন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার পোশাক রপ্তানিকারক সমিতির সাথে Memorandum of Understanding স্বাক্ষর করেন। ILO পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের প্রত্যাহার পূর্বক তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

প্রশ্ন।১২। ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দাও।

অথবা, ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। ভূমিকা : জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনেস্কো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে একটি অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা

ইউনেস্কো। ইউনেস্কো ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ইউনেস্কো বিরাট অবদান রেখে চলছে।

ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : ইউনেস্কো শিক্ষার সম্প্রসারণ, মানবাধিকার রক্ষা, প্রশিক্ষণ, বৈষম্য দূরীকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণকরণ, মূল্যবোধকে উৎসাহিতকরণ ন্যায় ও শান্তি স্থাপন প্রভৃতি লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। ইউনেস্কোর প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. বিশ্বে ন্যায় ও শান্তি স্থাপন : বিশ্বে ন্যায় ও শান্তি স্থাপন করা ইউনেস্কোর অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উপর বেশি জোর দিয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। তাই শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতিসমূহের সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি, ন্যায় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় ইউনেস্কো।

২. শিক্ষাবিস্তার : শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। উন্নয়নমূলক সমস্ত কর্মসূচির সফলতার অন্যতম মাধ্যম হলো জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। তাই সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে ইউনেস্কো স্বাক্ষরতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রসমূহে পরিচালিতও করে।

৩. মানবাধিকার সংরক্ষণ : জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি দেশের মানুষের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এ সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কেননা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কিছু অধিকার থাকা আবশ্যক। সেসব অধিকার সংরক্ষিত না হলে মানুষ সুস্থভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে না। তাই মানুষের মানবিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ইউনেস্কো কাজ করে থাকে।

৪. বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ : বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা। তাই বিজ্ঞান এর ব্যবহার ও সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ লক্ষ্যে ইউনেস্কো এদেশের জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের যন্ত্রপাতি ক্রয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন– পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, ভৌগোলিক আন্তঃসম্পর্কের প্রসার, ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৫. বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ : সদস্য দেশগুলোতে বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়নে উৎসাহিত করা এর অন্যতম লক্ষ্য। ইউনেস্কো শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তি এবং সে সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা, বই, পুস্তক, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। যাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, এ সংক্রান্ত অন্যান্য বস্তু, দ্রব্য ও তথ্যাদির আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশগুলোতে বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়ন সম্প্রসারিত হয়।

৬. মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ : মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনা জাগ্রত না হলে কোনোভাবেই তাদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই মানুষের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের মূল্যবোধ জাগ্রতকরণকে এ সংস্থা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে সে ব্যাপক সচেতনতা প্রোগ্রাম গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং জাতীয় মূল্যবোধকে উৎসাহিত ও সংরক্ষণ করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

৭. বৈষম্য দূর করা : ইউনেস্কোর অপর একটি লক্ষ্য হলো বৈষম্য দূর করা। এটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনশক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো অনেকটাই সফল।

৮. জ্ঞানের বিকাশ সাধন : আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে দেশসমূহের বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বই, শিক্ষা কর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস নিদর্শন, দর্শন প্রভৃতি সংরক্ষণ করা এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য হলো এসব সংরক্ষণের মধ্যমে এ সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। সদস্য রাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ইউনেস্কো জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইউনেস্কো একটি দেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর ভূমিকা অপরিসীম। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সফলতার সাথে পালন করে আসছে ইউনেস্কো। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষা কার্যক্রম : এদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ৫টি সাবকমিটি কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনগুলো হচ্ছে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যোগাযোগ, সংস্কৃতি ও মানবিকতা। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে কাজ করে যাচ্ছে।

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক কার্যক্রম : এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক কার্যক্রমে রয়েছে ইউনেস্কোর বিশেষ ভূমিকা। জাতীয় বিজ্ঞান জাদু ঘরের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এটি প্রদান করেছে ২ লক্ষ মার্কিন ডলার। এছাড়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে এর ব্যাপক ভূমিকা।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম : ইউনেস্কোর ৬৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিশন রয়েছে। কমিশনেব মাধ্যমে ইউনেস্কো এদেশে যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। কমিশন কর্মসূচি ও বাজেট পেশ করে।

৪. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে এ সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা, গণিত, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও ভৌগোলিক আন্তঃ সম্পর্ক প্রসারেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৫. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম : এ কার্যক্রমের মধ্যে ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সৃজনশীলতার বিকাশ, ভাষার উৎকর্ষ সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সাহিত্য উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ লক্ষ্যে বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার, জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়া এগুলো সংরক্ষণ তালিকায় অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছে।

৬. মানবীয় বিষয়ক কার্যক্রম : এ কার্যক্রমও ইউনেস্কো ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে থাকে। জাতিগত হিংসা বিদ্বেষের অবসান ঘটাতে এটি বদ্ধপরিকর। ইউনেস্কো সকল বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে চায়।

৭. যোগাযোগ : আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ইউনেস্কো গণযোগাযোগ ও গণসংযোগে বিশ্বাসী। এটি তথ্য বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. প্রকাশনা ও প্রতিবেদন প্রকাশ : ইউনেস্কোর প্রকাশনা বিষয়গুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি। এসব বিষয়ে ইউনেস্কো প্রতিবেদন প্রকাশে ব্যবস্থা করে থাকে। যা ইউনেস্কোর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৯. অনুদান প্রদান কার্যক্রম : এদেশের সরকার ইউনেস্কোকে অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থাও এ সংস্থাকে বিভিন্ন অনুদান প্রদান করে থাকে। যেসব বিষয়ে সংস্থাটি অনুদান প্রদান করে সেগুলো হলো শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি।

১০. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : এ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এজন্য কলেজ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করে। এ ধরনের কর্মসূচি মানব সম্পদ উন্নয়নে খুবই জরুরি।

১১. ঐতিহ্য সংরক্ষণ : দেশের পুরাকীর্তি বা ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইউনেস্কোর ভূমিকা রয়েছে। এসব সংরক্ষণে ইউনেস্কো অর্থ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। দেশের ময়নামতি, সোনারগাঁও এর পুরাকীর্তি সংরক্ষণে এর ভূমিকা অত্যধিক।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, এভাবেই ইউনেস্কো শিক্ষা, শান্তি, গণতন্ত্র প্রভৃতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিক্ষাখাতের অনেক সমস্যাই ইউনেস্কোর মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছে।

প্রশ্ন।১৩। বাংলাদেশে UNDP এর কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে UNDP এর কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দাও।

অথবা, বাংলাদেশে UNDP এর কার্যক্রমসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর। **ভূমিকা :** আর্থসামাজিক তথা মানবসম্পদ উন্নয়নে UNDP বিশ্বের একটি বৃহৎ সংস্থা। জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা হিসেবে সারাবিশ্বে এর ভূমিকা অত্যধিক। আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নে এর অবদান অতুলনীয়। জাতিসংঘের বর্ধিত কারিগরি সাহায্য কর্মসূচি ও জাতিসংঘের বিশেষ তহবিল সমন্বিত করে ১৯৬৫ সালে ২ নভেম্বর UNDP প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয় ৪৮ জন সদস্য নিয়ে। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

বাংলাদেশে UNDPএর কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশে UNDP বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে, যেমন– যাতায়াত ও যোগাযোগ, কৃষি, বনায়ন, খনিজ, গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, সমাজসেবা, জন প্রশাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। নিচে বাংলাদেশে UNDP এর কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

১. কৃষি উন্নয়ন ভটিকেজ প্রকল্প : কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে এ ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত সার বীজ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এর মূল কাজ।

২. দারিদ্র্য বিমোচন : বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের বেশির ভাগ প্রকল্পের মধ্যে UNDP এর ভূমিকা রয়েছে। যেমন– Poverty Reduction Strategy Paper PRSP প্রকল্পে এ সংস্থার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

৩. মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প : এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের মধ্যে উদ্যোক্তার গুরুত্ব সম্পর্কে জোরদার প্রচেষ্টা চালানো হয়। নারীদের স্বাবলম্বী করাই এর মূল উদ্দেশ্য। মহিলারা যেন পুরুষদের পাশাপাশি উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেলক্ষ্যে UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি পুনর্গঠন প্রকল্প : শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠনে নায়েম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য পুনর্গঠন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। UNDP নায়েমের এই পুনর্গঠন প্রকল্প কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

৫. আদমশুমারি ও গৃহ গণনা প্রকল্প -২০০১ : এ প্রকল্পের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যা ও গৃহের পরিমাণ প্রকল্পের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যা ও গৃহের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়। এর মাধ্যমে গৃহায়ন ও আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। কারণ সঠিক পরিসংখ্যান জানা থাকলে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

৬. নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প : প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। আর এ উদ্দেশ্য শহরাঞ্চলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নগর দারিদ্র্যকে রোধ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নকরণে UNDP কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

৭. বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন : বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী শিক্ষা একটি দেশের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে এর বিকল্প নেই। আর এ উদ্দেশ্যেই UNDP এ ধরনের প্রকল্প নিয়েছেন। যেমন– হস্তশিল্প উন্নয়ন প্রকল্প।

৮. গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন লাইভ স্টক প্রকল্প : দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ অবস্থায় মৎস্যকে আরো সম্প্রসারিত করে নিজস্ব চাহিদা পূরণ ও বিদেশে রপ্তানি করা সহজতর হবে। এজন্যই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৯. পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প : পরিবেশ উন্নয়নের জন্যও UNDP কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সংস্থার উদ্যোগ খুবই ফলপ্রসূ। বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি চালু করা হয়।

১০. স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচি : এদেশের স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে UNDP. এ লক্ষ্যে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে এইডস মোকাবিলায় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে UNDP সহায়তা করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেগুলোর বাস্তবায়নে ও UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১১. মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ : আমাদের দেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও মাদক ব্যবসা বন্ধে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এ UNDP সাহায্য করে থাকে। এমনকি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ও UNDP সহযোগিতা করে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত যে কোনো কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নেও UNDP তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১২. তথ্য প্রযুক্তি : তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও UNDP এর অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ, মানব উন্নয়নে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রেও UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৩. পরিকল্পনা প্রণয়ন : আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। এক্ষেত্রে UNDP এর অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন আর্থসামাজিক তথ্যসংগ্রহ, মানব উন্নয়নে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রেও UNDP সহায়তা করে। বিশেষ করে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪. জনপ্রশাসন : এদেশের জনপ্রশাসন সংস্কার সাধনে UNDP এর ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়ভাবে UNDP কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়াও প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা প্রভৃতি ব্যাপারে UNDP সহায়তা করে থাকে।

১৫. গবেষণামূলক কার্যক্রম : জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি এদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজে সহায়তা করে। কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা নিয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড UNDP পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া মানবাধিকার উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে গবেষণামূলক কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।

১৬. অন্যান্য কার্যক্রম : এছাড়া UNDP এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। স্থানীয় প্রশাসনের সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রকল্প বাংলাদেশে মানবাধিকার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে কর্মমুখী গবেষণা পরিচালনা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও অন্যান্য শিক্ষা ধারায় জনসংখ্যা শিক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, UNDP বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রশংসার দাবিদার। এদেশের সার্বিক উন্নয়নে এ সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন॥১৪॥ শ্রম কল্যাণ কী? বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচলিত শ্রমকল্যাণ কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা দাও।

অথবা, শ্রম কল্যাণ প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচলিত শ্রমকল্যাণ কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : শ্রমিক তারা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিয়ত যন্ত্রের সাথে যুদ্ধ করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের চাকা সচল রাখে। মেহনতি মানুষের কল্যাণার্থে শিল্পবিপ্লব কালে শ্রমকল্যাণের ধারণাটির উদ্ভব হয়। সেই সময় বিজ্ঞজনেরা শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শ্রমকল্যাণের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-নির্দেশ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমকল্যাণমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়ে থাকে।

শ্রমকল্যাণ : সাধারণভাবে শ্রমকল্যাণ বলতে, শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে শ্রমকল্যাণ বলতে শ্রমিকদের মনো-দৈহিক এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল ধরনের কার্যক্রমকে বুঝায়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : সমাজকর্ম অভিধান, সমাজ বিশ্লেষণ ও বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে শ্রমকল্যাণ ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "Labour welfare is programs in industrial organization to provide personnel and employment-related social services." অর্থাৎ, শ্রমকল্যাণ হচ্ছে শিল্প সংস্থার ব্যক্তি ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমাজসেবামূলক কর্মসূচি।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (International Labour Organization ILO) এর মতে, "শ্রমকল্যাণ বলতে সেসব সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিকে বুঝায়, যেসব সুযোগ-সুবিধা শ্রমিকদের শারীরিক কল্যাণ, অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োজিত। শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থ্য, কর্মপরিবেশ চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, বেতনভাতা, অধিকার, কাজের সময়, সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের সুসমন্বিত রূপই হলো শ্রমকল্যাণ।"

Oxford Dictionary মোতাবেক, "Efforts to make life worth living for worker." অর্থাৎ, শ্রমকল্যাণ হচ্ছে শ্রমিকদের জীবন প্রাচুর্যময় করার প্রচেষ্টা।

এন. এম. যোশী (N. M. Joshi) বলেন, "কর্মস্থলের ন্যূনতম মান রক্ষার স্বার্থে কারখানা আইনে যে বিধান রয়েছে এবং বার্ধক্য, বেকারত্ব, অসুস্থতা, দুর্ঘটনায় সামাজিক আইনের যেসব বিধান রয়েছে এবং অতিরিক্ত শ্রমিকদের কল্যাণে মালিক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বা প্রচেষ্টাসমূহই শ্রমকল্যাণ।"

Encyclopaedia of Social Science এর সংজ্ঞানুযায়ী, "শ্রমকল্যাণ হচ্ছে প্রচলিত শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে মালিক পক্ষের স্বেচ্ছামূলক এমন এক কল্যাণমূলক কার্যাবলি যা শিল্প ব্যবস্থাপনা বা বাজারের অবস্থা বিচার না করে শ্রমিকদের কাজের এবং কতিপয় জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।"

আর্থার জেমস টড এর মতে, শ্রমকল্যাণ হচ্ছে মজুরির বাইরে শ্রমিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আরাম ও উন্নয়নে প্রাপ্য যা শিল্পের জন্য অপরিহার্য নয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, শ্রমকল্যাণ পদক্ষেপ বলতে বুঝায়, সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রম। এটি শ্রমিকদের সকল দিকের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার ক্ষমতার বিকাশ ও উন্নত জীবনপন্থা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচলিত শ্রমকল্যাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচলিত শ্রমকল্যাণ কার্যক্রমসমূহ হলো– শ্রমনীতি, শ্রম আইন, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম চিত্তবিনোদন, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এ কার্যক্রমের সাথে দুটি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এগুলো হলো :

ক. শ্রম অধিদপ্তর : শ্রম অধিদপ্তর দেশের সার্বিক শ্রমকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম শিক্ষা, ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, শিল্প সম্পর্ক, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পরিচালনাও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে শ্রম পরিদপ্তর।

খ. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তর : দেশের শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের জন্য প্রণীত ৪৬টি শ্রম আইন সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন করা এ দপ্তরের প্রধান কাজ। শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কাজের সময় নির্ধারণ, স্বাস্থ্য কল্যাণ, চাকরির শর্তাবলি প্রভৃতি এ আইন অনুসারে সুষ্ঠুভাবে পালন হচ্ছে কি না তা তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রয়োজনবোধে আইন অমান্যকারীকে আদালতে সোপর্দ করাও এ দপ্তরের দায়িত্ব।

নিম্নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচলিত শ্রমকল্যাণ কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. শ্রমিক কল্যাণ : বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের কল্যাণের নিমিত্তে ১৯৬১ সালে ৫টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র ৫টি শিল্প এলাকায় স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত ২৯টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা বিভাগে ৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪টি, সিলেট বিভাগে ৮টি, খুলনা বিভাগে ৪টি, বরিশাল বিভাগে ১টি এবং রাজশাহী বিভাগে ৫টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক, সংগঠক, পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা প্রমুখ জনবল নিয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এসব কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে– শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দান, ওষুধ প্রদান, পরামর্শদান, সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি, বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা, বিনোদন, পাঠাগার প্রভৃতি। সমাজসেবা অধিদপ্তর শ্রমিকদের কল্যাণে কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকে।

২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : অজ্ঞ ও দরিদ্র শ্রমিকদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচলিত শ্রমকল্যাণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। শ্রমিকদের দক্ষ করতে, অধিকার, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে শ্রমকল্যাণ প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এজন্য টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে মোট ৪টি শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫১১৭ জন শ্রমিক ১৪৭টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে।

৩. পুনর্বাসন কার্যক্রম : শ্রমকল্যাণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অক্ষম ও বিকলাঙ্গ শিক্ষকদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। দুর্ঘটনার কারণে অনেকেই পঙ্গু হয়ে যায়। ফলে তাদের জন্য পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম অতি জরুরি হয়ে ওঠে। তাই তাদের জন্য ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এসব শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, মূলধন প্রদান, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক কাজের সাথে জড়িত করা হয়।

৪. সালিশি কার্যক্রম : ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক আইনের আওতায় সালিশি কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে শ্রমকল্যাণ। শ্রমিকদের নিজ নিজ বিরোধের নিষ্পত্তি এবং মালিক-শ্রমিক বিরোধের মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অনুকূল কর্ম পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সালিশি কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হয়। শ্রমিকদের আইনগত অধিকার আদায়ের জন্য এটি একটি যথাযথ পদক্ষেপ।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম : এদেশে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য নিরাপত্তামূলক আইনসমূহ হচ্ছে– ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন, ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃকল্যাণ আইন, অসুস্থতা ভাতা, গ্রাচুইটি প্রভৃতি। এসব আইনের মাধ্যমে পেশাগত দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্ব সুবিধা ও প্রভিডেন্টফান্ড প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬. শ্রম ও শিল্প আদালত : শ্রম আদালত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা বিশেষ করে তাদের চাকরির নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সারাদেশে ৬টি শ্রম আদালত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি শিল্প আদালত। শ্রম আইন বাস্তবায়নে এসব আদালত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৭. নিরাপত্তা জোরদার ও দুর্ঘটনারোধ কর্মসূচি : বাংলাদেশ সরকারের শ্রমকল্যাণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রয়েছে শ্রমকল্যাণের কার্যক্রম। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা যাতে নিরাপত্তার সাথে কাজ করতে পারে। এজন্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। একটি সমন্বিত কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এসব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

৮. শ্রমিকদের অংশগ্রহণ : শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। এ বোর্ডের সদস্যরা হলো– একজন সরকারি প্রতিনিধি, একজন পরিচালক প্রতিনিধি, একজন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং দু'জন শ্রমিক প্রতিনিধি। শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৯. জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি : এ কার্যক্রম শ্রমদপ্তরের অধীনে দেশের ২১টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে এবং শ্রীমঙ্গল চা শিল্প কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৭৪ সাল থেকে এ কার্যক্রম চালু হয়। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের পরিকল্পিত পরিবার গঠনে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করা।

১০. ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার : শ্রমিকদের স্বার্থ তথা অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর অধীনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৮৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সংশোধন করে আরো সুসংহত করা হয়।

১১. পরিদর্শক নিয়োগ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম : শ্রমিকদের নানান সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও সমাধান করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণির সুবিধার জন্য পুনর্নির্মাণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়। স্বল্পমূল্যে পুনর্নির্মাণ সামগ্রী শ্রমিকদের প্রদান করা এর মূল লক্ষ্য। নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শকগণ এ সকল কার্যক্রম ও পরিদর্শন করে থাকেন।

১২. আইনগত সুবিধা : শ্রমিকদের কল্যাণে প্রণীত হয়েছে অসংখ্য আইন বা অধ্যাদেশ। পরিবর্তনের মাধ্যমে এগুলো যুগোপযোগী করা হয়। এগুলোর কার্যকারিতা এখনো বলবৎ রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন হলো– শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন- ১৯২৩, এ শ্রমিক আইন- ১৯৩৪, মালিকদের দায়িত্ব আইন- ১৯৩৮, বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন- ১৯৩৯, দুর্ঘটনা আইন- ১৯৪৪, পূর্ববঙ্গ মাতৃকল্যাণ আইন ১৯৫০, কারখানা আইন- ১৯৬৫, কোম্পানির মুনাফা আইন- ১৯৬৮ প্রভৃতি। এ আইনগুলো এখনো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

১৩. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ : শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যন্ত্রের সাথে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা দুর্ঘটনার শিকার হন। অনেক শ্রমিক পঙ্গু এমনকি মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে হয়। এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক বা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন মোতাবেক কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেলে সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবে।

১৪. শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ : শ্রমিকদের সার্বিক স্বার্থরক্ষার জন্যই এই শ্রমকল্যাণ কার্যক্রম। তাদের স্বার্থরক্ষা ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার নিমিত্তে এ আইনের বিধান করা হয়। এর ফলে শ্রমিকদের কর্মসময়, ছুটি, চিকিৎসা, কারখানার তাপ নিয়ন্ত্রণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

১৫. চিকিৎসা কার্যক্রম : শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার নয়াবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি শ্রমজীবী হাসপাতাল। এছাড়া ঢাকার সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে শ্রমিকদের চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। যা শ্রমিকদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রমকল্যাণে পরিচালিত হয়। শ্রমিকদের কল্যাণে এগুলো ছাড়াও নানাবিধ কার্যক্রম শ্রমকল্যাণের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। যেগুলোর মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রচেষ্টা করা হয়। তবে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচি আরো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক।

✻✻✻✻✻✻✻✻

সমাজসেবা বিভাগের প্রশাসনব্যবস্থা এবং সমন্বয় পদ্ধতি
Administration and Coordination System of Department of Social services

(ক) বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. প্রশাসন কি?
উত্তর : সাধারণত সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো প্রশাসন।

২. প্রশাসনের ইংরেজী প্রতিশব্দ কি?
উত্তর : Administration.

৩. Administration শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?
উত্তর : ল্যাটিন শব্দ Administer শব্দ থেকে।

৪. Administration শব্দের অর্থ কি?
উত্তর : সেবা করা, পরিচালনা করা বা নির্বাহ করা।

৫. বাহ্যিক সমন্বয় কয় ধরনের?
উত্তর : দুই ধরনের।

৬. কয়টি পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বয় অর্জন করা যায় ও কি কি?
উত্তর : ২টি। i. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, ii. অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

৭. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে সরকারী কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : ১২৮ (১) অনুচ্ছেদে।

৮. Paper on the Science of Administration গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর : Luther Gullick -এর।

৯. ADAB এর পূর্ণরূপ লিখ?
উত্তর : Association of Development Agencies in Bangladesh.

১০. বাংলাদেশে কয় ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়ে থাকে।
উত্তর : দুই ধরনের।

১১. আলোচনা, সেমিনার, এগুলো কি ধরনের যোগাযোগ?
উত্তর : মৌখিক যোগাযোগ।

১২. তথ্য, রিপোর্ট, বুলেটিন, অফিস নির্দেশ, চিঠি এগুলো কি ধরনের যোগাযোগ?
উত্তর : লিখিত যোগাযোগ।

১৩. সমন্বয় কি?
উত্তর : বিস্তৃত জটিল বিভাগগুলোর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার একমাত্র উপায় হলো সমন্বয়?

১৪. James D. Mooney এর মতে সমন্বয় কি?
উত্তর : সমন্বয় হচ্ছে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে গোষ্ঠী কর্মপ্রচেষ্টার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

১৫. Ralf Davis এর মতে সমন্বয় কি?
উত্তর : সময় এবং কর্ম সম্পন্ন করার সাথে সংগঠনের কার্যাবলির সম্পর্কযুক্ত করাকে সমন্বয়সাধন বলে।

১৬. Henry Fayol (হেনরি ফেয়ল) এর মতে সমন্বয় কি?
উত্তর : সংগঠনের সমুদয় কার্য একত্রিত এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করার অর্থই সমন্বয়সাধন।

১৭. Dimock and Dimock সমন্বয়সাধনের কি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন?
উত্তর : প্রশাসনিক সংগঠনের বিভিন্ন অংশগুলোকে যথাযথভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত রাখার অর্থই হচ্ছে সমন্বয়সাধন।

১৮. হেকলার হাডসন সমন্বয় সাধনের কি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন?
উত্তর : কর্মের বিভিন্ন অংশগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে সমন্বয় বলে।

১৯. সমন্বয়কে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর : ২ ভাগে।

২০. সমন্বয়কে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর : i. অভ্যন্তরীণ সমন্বয় এবং ii. বাহ্যিক সমন্বয়।

২১. অভ্যন্তরীণ সমন্বয় কাকে বলে?
উত্তর : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগ ব্যক্তির কাজ এবং পরিকল্পনাকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার জন্য যে সমন্বয় তাকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় বলে।

২২. উলম্ব সমন্বয় কি?
উত্তর : ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ক্রম বা কাঠামো টি অনুসারে বিভিন্ন নির্বাহীদের মধ্যে যে সমন্বয় করা হয় তাকে উলম্ব সমন্বয় বলে।

২৩. নিম্নগামী সমন্বয় কি?
উত্তর : উর্ধ্বতন যখন অধস্তনদের সাথে কোন কাজ করার জন্য সরাসরি যোগাযোগ করে তখন তাকে নিম্নগামী সমন্বয় বলে।

২৪. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধানের পদবী কি?
উত্তর : মহাপরিচালক।

২৫. Mooney সংগঠনের কি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন?
উত্তর : কোন সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানবসংঘের অনুসৃত গঠনরীতিই হচ্ছে সংগঠন।

২৬. সংগঠন কি?
উত্তর : একটি যুক্তিসংগত, সুপরিকল্পিত কর্তৃত্ব কাঠামোকে সংগঠন বলে।

২৭. Luther Gullick সমন্বয় সাধনের কয়টি উপায় উল্লেখ করেছেন?
উত্তর : ২টি উপায়।

২৮. Papers on the Science of Administration গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর : Luther Gullick এর।

২৯. ADAB এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Association of Development Agencies in Bangladesh.

৩০. POSDCORB এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : Planning Organizing Staffing Direction co-ordination Reporting Budgetting.

৩১. 'POSDCORB' ফর্মূলার প্রবক্তা কে?
উত্তর : লুথার গুলীক।

৩২. 'Administration of Social Agencies' গ্রন্থটির প্রণেতা কে?
উত্তর : জন. সি. কিডনী।

৩৩. জন. সি. কিডনী সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যাবলিকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?
উত্তর : ৯ ভাগে ভাগ করেছেন।

৩৪. সমাজকল্যাণ অভিধানে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কয়টি মৌলিক কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : ৬টি।

৩৫. "সমন্বয় হলো কার্যাবলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা"– উক্তিটি কার?
উত্তর : বিভারস (Beavers)।

৩৬. সমন্বয়ের প্রধান লক্ষ্য কী?
উত্তর : সমন্বয়ের প্রধান লক্ষ্য হলো এজেন্সী ও প্রশাসনকে গতিশীল করা।

৩৭. সমন্বয়কে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
উত্তর : সমন্বয়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. বাহ্যিক সমন্বয় ও খ. অভ্যন্তরীণ সমন্বয়।

৩৮. সমন্বয়ের নীতিমালা কয়টি?
উত্তর : ৮টি।

৩৯. সমন্বয়ের পদ্ধতি কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ২ প্রকার। যথা– ক. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও খ. অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

৪০. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাকাল লিখ।
উত্তর : ১৯৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি।

৪১. সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো কী কী?
উত্তর : যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রভৃতি।

৪২. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কে?
উত্তর : মহাপরিচালক (DG)।

৪৩. উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম কে পরিচালনা করেন?
উত্তর : উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা।

৪৪. সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অপরিহার্য উপাদান কী?
উত্তর : এজেন্সী বা সংস্থা।

৪৫. প্রশাসক কাকে বলে?
উত্তর : যিনি প্রশাসন পরিচালনা করেন তাকে প্রশাসক বলে।

৪৬. বাংলাদেশে কখন প্রথম পৃথক সমাজকল্যাণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে?
উত্তর : পাকিস্তান আমলে।

৪৭. এদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির প্রশাসন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব কোন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পালন করছে?
উত্তর : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

৪৮. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর : চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৪৯. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মূল সমস্যা কী?
উত্তর : সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাব।

৫০. সমন্বয় বলতে কী বুঝ?
উত্তর : সমন্বয় বলতে সাধারণত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি বা কর্মসূচির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করাকে বুঝায়।

৫১. 'New Understanding of Administration' গ্রন্থের প্রণেতা কে?
উত্তর : H. B. Tracker.

৫২. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কখন গঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৬ সালে।

৫৩. চারটি পরিষদের নাম লিখ যারা সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।
উত্তর : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ, যুবকল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় মহিলা পরিষদ।

৫৪. ADAB-এর পরিপূর্ণ রূপ লিখ।
উত্তর : ADAB = Association of Development Agencies in Bangladesh.

৫৫. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে মূল সমস্যা কী?
উত্তর : সুষ্ঠ নীতি ও পরিকল্পনার অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা।

খ বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ প্রশাসনের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, প্রশাসন কী?

অথবা, প্রশাসনের পরিচয় দাও।

অথবা, প্রশাসন বলতে কি বুঝ?

অথবা, প্রশাসণ ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর?

উত্তর॥ ভূমিকা : সাধারণত সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হল প্রশাসন। কিন্তু সামাজিক নীতিকে সামাজিক কল্যাণে অথবা সমাজসেবায় নিয়োজিত করা হলে প্রক্রিয়াগত পথ পরিক্রমণ করতে হয়। আর এজন্য প্রশাসনকে দলীয় প্রচেষ্টার প্রাথমিক স্তর বলা চলে। বস্তুত একাধিক সংখ্যক মানুষের দলবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই প্রশাসন কলা পরিলক্ষিত হয়।

প্রশাসন : প্রশাসন হচ্ছে যৌথ কার্যক্রম ও মানুষের সহযোগিতাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার মূল শক্তি। মানুষের সমষ্টিগত কার্যাবলিকে পরিচালনা নির্বাহ করার নামই প্রশাসন। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং সে উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়।

অর্থগতভাবে প্রশাসন, প্রশাসনের ইংরেজি প্রতি শব্দ Administration. এ শব্দটি Administer নামক ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 'administer' শব্দের অর্থ সেবা করা (to serve)। আভিধানিক দিক থেকে 'administer' এর অর্থ হল পরিচালনা করা বা নির্বাহ করা। প্রশাসন এমন একটি চিন্তন, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যা সমগ্র এজেন্সির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এর মূল বিষয় লক্ষ্য নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন, দায়িত্ব বণ্টন, কর্মসূচি পরিচালনা ও সম্পাদিত কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য জনগণের সাথে কাজ করার প্রক্রিয়া[illegible]

[illegible] **সংজ্ঞা :** বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে [illegible]সনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের [illegible] উল্লেখ করা হল :

[illegible]ক নিউম্যান এর মতে, "প্রশাসন হচ্ছে একটি [illegible]দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত কোন জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা [illegible]জন্য তাঁদেরকে নেতৃত্ব, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।"

J. Warham এর মতে, "প্রশাসন হল এমন একটি [illegible]দ্ধতি, যার মাধ্যমে কোন সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের সমগ্র কার্যাবলি এর লক্ষ্যের দ্বারা পরিচারিত হয়।"

L.D. White বলেছেন, "প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি কলা যার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করা হয়।"

ম্যায়ো (Mayo) এর মতে, "প্রশাসন হচ্ছে এজেন্সির লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যাবলি নির্বাচন ও তার শ্রেণীবিন্যাস, নীতি ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রদান, কর্মচারী নির্বাচন, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণ এবং সম্ভাব্য ও যুক্তিযুক্ত সকল সম্পদ সমাবেশ ও সংগঠিত করা।"

Arlien Johnson প্রশাসনের সংজ্ঞায় বলেছেন, "Administration as a process and method by which objectives of a programmed are transformed into reality through a structure and mode of operation that make positive co-ordinate and unified work of people in the movement toward the defined objectives."

সুতরাং, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সামাজিক প্রশাসনকে সামাজিক উন্নয়নের অনুধ্যান হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় (Study of Developemt) যা বিভিন্ন Purpose এর আলোকে নীতি ও সামাজিক সেবার নিমিত্তে সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত। পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ হল একটি কর্মমুখী হাতিয়ার যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক কার্যক্রমে (Social action) পরিণত করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, প্রশাসন হচ্ছে মানুষের সহযোগিতা ও যৌথ কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার মূল চালিকাশক্তি। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। প্রশাসন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হলেও তারা পরস্পর জনকল্যাণের জন্য কাজ করে। জনপ্রশাসন, সামাজিক প্রশাসন ও ব্যবসায় প্রশাসন প্রক্যেকে প্রত্যেকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

প্রশ্ন॥২॥ সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের মানদণ্ড সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, শিল্পবিপ্লব তথা শিল্প উন্নয়ন নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং যে উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদা পরিপুরণে উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের। প্রত্যেক দেশের সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য : সমাজের কল্যাণ এবং সেবামূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন থেকে সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উৎপত্তি। সামাজিক প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণ সাধন। সমাজকল্যাণের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসন কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই সামাজিক প্রশাসন সমাজকল্যাণের অন্যান্য সহায়ক পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। নিম্নে এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. কল্যাণমুখী প্রশাসন : বাংলাদেশের সামাজিক প্রশাসন একটি কল্যাণমুখী প্রশাসন। এখানে কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। কল্যাণমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে সেবাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও করা হয়। অর্থাৎ, জনগণের কল্যাণকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়।

২. ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম : বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম। এখানে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সেবাগ্রহিতা সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। সকলে যদি নিজনিজ অবস্থানে থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তাহলে কল্যাণ কার্য ফলপ্রসূ হয়।

৩. নমনীয়তা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসন অনমনীয় নয়। জনগণের মতামত এবং পরামর্শ চাহিদার প্রতি এখানে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের নমনীয়তার কারণে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। সামাজিক প্রশাসন বিভিন্ন সমস্যা। পরিস্থিতি মোকাবিলার একটি উপায়। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক প্রশাসনকেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

৪. সমস্যার বিভক্তিকরণ : বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজেই সমস্যা বহুমুখী রূপ নিয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের সমস্যার ক্ষেত্রে বহুমুখিতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই সামাজিক প্রশাসনে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যাগুলোকে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে চাহিদামাফিক সেবা প্রদান করা হয়। সমস্যার শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে সেবার ধরন নির্ধারিত হলে তা নিশ্চিত কল্যাণমুখী হয়।

৫. দ্বিমুখী যোগাযোগ : সামাজিক প্রশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর দ্বিমুখিতা সামাজিক প্রশাসন জনকল্যাণমুখী সেবা নিশ্চিত করার জন্য সেবাদানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সেবা গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। দ্বৈত যোগাযোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনে দ্বিমুখী যোগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও মূল্যবোধের জন্য বেশিরভাগ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে উদ্দেশ্য পূরণের সচেষ্ট থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে অন্যান্য প্রশাসন থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র করেছে। যেমন– গণপ্রশাসন, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি হতে পৃথক সত্তা দান করেছে। সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের লোকদের সেবা দান করে সার্বিক কল্যাণসাধন করা। সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সুসংহত করার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন। তাই সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য জনহিতকর। এ কারণেই সামাজিক প্রশাসন সর্বজন বিদিত সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রশ্ন॥৩॥ সামাজিক প্রশাসনের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের মানদণ্ড সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের আলোচ্যবিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, শিল্পবিপ্লব, নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার সাথে সাথে বেড়ে চলছে প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদার পরিপূরণে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের। সামাজিক প্রশাসনের কতকগুলো মৌলিক উপাদান রয়েছে। এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সামাজিক প্রশাসনের উপাদানসমূহ : সামাজিক প্রশাসনের মৌল উপাদানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. কর্মসূচি : সঠিক ও নির্ভুল পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়নের উপর সমাজকল্যাণের সাফল্য নির্ভরশীল। সামাজিক প্রশাসনের মুখ্য ও প্রধান দায়িত্ব হল জনসমষ্টির পরিবর্তনশীল চাহিদা ও মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম পেশার সাথে সামঞ্জস্যশীল কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিচালনা বাস্তবায়ন কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অগ্রাধিকার ও কর্মচারী সকলের প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব নিয়ে সমান অংশগ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. অর্থ বাজেট : কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে অর্থনৈতিক বিষয়াবলি যার উপর প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভরশীল। নির্ভুল ও সুষ্ঠু কর্মসূচি, পরিকল্পনা গ্রহণ ফাইন্যান্সের সঠিক ধারণা ছাড়া অসম্ভব। তাই উদ্দেশ্যের আলোকে এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থের উৎস, অর্থের যোগান ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

৩. **কর্মচারী :** এটি সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজেন্সির উদ্দেশ্য অর্জন ও সুষ্ঠু প্রশাসন নির্বাহ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে, সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। কর্মীদের উন্নয়ন এবং সন্তুষ্টি অর্জনে যথাযথ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪. **দক্ষ সাংগঠনিক কাঠামো :** বৃহত্তর ও বলিষ্ঠ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করা হয়, কে কার কাছে দায়ী থাকবে এবং কে, কাকে কিভাবে তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করবে।

একই সাথে কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসও ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। 'Social Work Year Book' (1957 : 78–79) অনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামো থাকবে,

১. চূড়ান্ত প্রশাসক দল (কর্মকর্তা),
২. পরিচালনা পরিষদ,
৩. কর্মচারী,
৪. নির্বাহক/নির্বাহি কর্মকর্তা।

সমস্ত প্রশাসনিক অবকাঠামো যেন স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি দেওয়া এবং বিবেচনা করা আবশ্যক।

৫. **সম্পত্তি ও সাজসরঞ্জাম :** মনোরম এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে উপযুক্ত অফিসগৃহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি আসবাবপত্র, বিদ্যুৎ সংযোগ, অফিসিয়াল ফাইলপত্র ইত্যাদি এজেন্সির অত্যাবশ্যক উপাদান। এসব উপকরণ সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন।

৬. **গবেষণা :** গবেষণার জন্য সময়োপযোগী উদ্দেশ্য নির্ধারণ, সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এজেন্সি সেবার গুণগত ও সংখ্যাগত মানের অধিকতর উৎকর্ষ লাভের জন্য সামাজিক গেবষণা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বর্তমানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্মের মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

৭. **জনসংযোগ :** জনসংযোগ রক্ষা করাও সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম উপাদান। এ উপাদানের মাধ্যমেই সমাজে সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংগঠন ও সহযোগিতাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভ করা যায়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজজীবনের ব্যাপ্তি ও চাহিদার পরিপূরণে প্রয়োজনের তাগিদে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণের উৎপত্তি। সামাজিক প্রশাসনের উপাদানসমূহ বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভক্ত। সামাজিক প্রশাসন এবং লোকপ্রশাসন উভয় পদ্ধতিই জনকল্যাণের স্বার্থে গৃহীত কর্মপদ্ধতি কিন্তু তবুও উভয়ের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি এক ও অভিন্ন।

প্রশ্ন।৪। **সামাজিক প্রশাসনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক প্রশাসনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

অথবা, **কী কী উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক প্রশাসন পরিচালিত হয়।**

উত্তর।। ভূমিকা : বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্পবিপ্লব, নানাবিধ কলাকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। তার সাথে সাথে বেড়ে চলছে প্রশাসনের গুরুত্বও। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং যে উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদার পরিপূরণে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের।

সামাজিক প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

১. **সুসংগঠিত সেবা প্রদান :** সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসংগঠিত সেবা প্রদান করা। আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজসেবা ও প্রতিষ্ঠানের সুসংগঠিত পদ্ধতি। এ সংগঠন ছাড়া সুসংগঠিত সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, সুসংগঠিত সেবা প্রদানের জন্য সামাজিক প্রশাসন অত্যাবশ্যক।

২. **কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** সামাজিক নীতির আলোকে বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য। কেননা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। অন্য কোন মাধ্যমে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব।

৩. **কর্মী নির্বাচন :** সামাজিক প্রশাসনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল কর্মী নির্বাচন। কেননা, সংগঠন পরিচালনা, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী নির্বাচন করা আবশ্যক।

৪. **কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান :** নির্বাচিত কর্মীদের দক্ষ ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য এবং হাতেকলমে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা সামাজিক প্রশাসনের অত্যাবশ্যক কাজ। তাই বলা যায়, কর্মীদের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৫. **জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা :** জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেননা, সমাজকর্ম যেসব সংগঠনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে তাদের মূল উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

৬. **প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন :** বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজকল্যাণ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সামাজিক প্রশাসন এসব সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। এজন্য বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন সামাজিক প্রশাসনের বিশেষ উদ্দেশ্য।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক প্রশাসন সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ প্রক্রিয়া। এর অনুপস্থিতিতে সনমাজকল্যাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কখনও সম্ভব নয়। তাই সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর, সুসংগটিত সেবা প্রদান, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কর্মী নির্বাচন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বধান, সমন্বয় সাধন করা, নীতি ও পদ্ধতির সংশোধন ইত্যাদি কারণে সামাজিক প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়োজিত এবং তা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন৷৫৷ সামাজিক প্রশাসনের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি কী কী?

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কর্মকৌশলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর৷ ভূমিকা : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, শিল্পবিপ্লব, নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার সাথে সাথে বেড়ে চলছে প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদার পরিপূরণে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় বাস্তবায়িত করার সমষ্টিগত বা দলীয় প্রচেষ্টাকে সামাজিক প্রশাসন বলে।

সামাজিক বা সমাজিক প্রশাসনের কার্যাবলি : সমাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : সামাজিক প্রশাসনের প্রধান কাজ হচ্ছে এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া নির্ধারণ কোন প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. পলিসি বা নীতি নির্ধারণ : এজেন্সির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা সমাজিক প্রশাসনের অন্যতম কাজ। যে কোন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলির সুষ্ঠু পরিচালনার নির্দেশিকা হচ্ছে নীতি।

৩. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো প্রদান : সংস্থার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ, কর্মচারীদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. পরিকল্পনা প্রণয়ন : সমাজকল্যাণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ সমাজিক প্রশাসনের মৌলিক কাজ।

৫. কর্মসূচি প্রণয়ন : কর্মসূচি হচ্ছে সমাজকল্যাণ নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাহন। সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি সচেতন থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। এজেন্সি প্রদত্ত সেবামূলক কার্যক্রমই হচ্ছে কর্মসূচি, সেগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

৬. বাজেট প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আয়ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাই বাজেট। বাজেটের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদের উৎস এবং ব্যয়ের খাত নির্ধারণ। সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পূর্ব নির্ধারিত রূপরেখাই বাজেট। এটি অন্যান্য প্রশাসনের ন্যায় সমাজিক প্রশাসনেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৭. কর্মচারী নিয়োগ : প্রশাসনের অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং সে সাথে প্রত্যেক কর্মচারীর কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া। কর্মচারীদের ছুটি, পদোন্নতি, বেতন, কাজের সময়কাল, বদলি, প্রশিক্ষণ, অবসর চাকরিচ্যুতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আবশ্যক।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্টদের স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিভিন্ন প্রেরণামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে। সামাজিক প্রশাসন মানুষের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার এক অপরিহার্য মাধ্যম। সুতরাং, সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন৷৬৷ সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে কী বুঝ? [জা. বি.-২০১২]

অথবা, সমাজকল্যাণ প্রশাসন কাকে বলে?

অথবা, সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞা দাও?

অথবা, সংক্ষেপে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিচয় দাও?

উত্তর৷ ভূমিকা : সমাজকল্যাণ আধুনিক পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার একটি নতুন সংস্করণ যেখানে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে সমাজকে সাহায্য করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। সমাজকর্মী হচ্ছে সমাজকর্ম, বিশেষজ্ঞ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি, যিনি তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে সামাজিক সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সুতরাং, সমাজকর্মীকে একজন দক্ষ Practioner বলে অভিহিত করা যায়। তবে এসব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে প্রচুর জ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়। আর এ জ্ঞান বলা যায় অপরিহার্য।

সমাজকল্যাণ বা সামাজিক প্রশাসন : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সামাজ জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিতে সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করার সমষ্টিগত বা দলীয় প্রচেষ্টাই হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

D. Chowdhury বলেছেন, "Social work administration is a process by which apply professional competence to achieve certain goals. It is also called a process at transforming social policy into social action.

Russul H. Kurts এর মতে, "Social Administration is a process of transforming social policy into social services, involving the concomitant (সহগামী, আনুসঙ্গিক, সহবিদ্যমান) use of experience to modify policy or method."

Social Work Year Book এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Social welfare Administration is the process of transforming social policy into social services involving concomitant use of experience to modify policy or method."

মনীষী **Walter A. Friedlander** বলেছেন, "Social welfare administration is the process of organizing and directing of social agency." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। তাই এর মাধ্যমে মানব সমস্যা সমাধান ও তাদের প্রয়োজন পূরণে সামাজিক কার্য পরিচালনা করা হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংঘটিত ও পরিচালিত করার এমন এক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধন করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজকর্মীরা সামাজিক প্রশাসনের দক্ষ এজেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে, যা উক্ত কার্যাবলি সাধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরও গতিশীল ও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে সমাজকর্মীকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কাজ করতে হয়, যার জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা অপরিহার্য।

প্রশ্ন॥৭॥ সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কাকে বলে?

অথবা, সামাজিক প্রশাসন বলতে কী বুঝ?

অথবা, সংক্ষেপে সামাজিক প্রশাসণের পরিচয় দাও?

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : প্রশাসন প্রত্যয়টির অস্তিত্ব মানব ইতিহাসের ন্যায় সুপ্রাচীন। নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন থেকেই প্রশাসনের অগ্রযাত্রা। জনগণকে সংগঠিতকরণ, নির্বাহি নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফলাফল পরিমাপ, কর্মসূচির সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের জটিল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম সম্পাদনের প্রাচীন যৌথ উদ্যোগকে আরও সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ দার্শনিক ভিত্তি থেকে মানুষ যে সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে তাহল প্রশাসন। আর সামাজিক প্রশাসন হল সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি যা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করে।

সামাজিক প্রশাসন : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সমাজ জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিতে সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করার সমষ্টিগত বা দলীয় প্রচেষ্টাই হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

D. Chowdhury বলেছেন, "Social work administration is a process by which apply professional competence to achieve certain goals. It is also called a process at transforming social policy into social action.

Russul H. Kurts এর মতে, "Social Administration is a process of transforming social policy into social services, involving the concomitant (সহগামী, আনুসঙ্গিক, সহবিদ্যমান) use of experience to modify policy or method."

John C. Kidneingh বলেছেন, "Social Welfare administration is the process of transforming social policy into social services and the use of experience in evaluating and modifying social policy." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হয়।

Social Work Year Book এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Social welfare Administration is the process of transforming social policy into social services involving concomitant use of experience to modify policy or method."

মনীষী **Walter A. Friedlander** বলেছেন, "Social welfare administration is the process of organizing and directing of social agency." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। তাই এর মাধ্যমে মানব সমস্যা সমাধান ও তাদের প্রয়োজন পূরণে সামাজিক কার্য পরিচালনা করা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংঘটিত ও পরিচালিত করার এমন এক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধন করে থাকে।

প্রশ্ন॥৮॥ সামাজিক প্রশাসনের নীতিমালাগুলো কি কি?

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী কী নীতি অনুসরণ করে?

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী কী অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করে?

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করে?

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী কী কৌশল অনুসরণ করে?

উত্তর॥ ভূমিকা : বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্প বিপ্লব, নানাবিধ কলাকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে প্রশাসনের গুরুত্ব। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটছে সামাজিক প্রশাসনের।

সমাজকল্যাণ প্রশাসনের নীতিমালা :

১. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি : সমাজের প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মূল্য ও মর্যাদা লাভে সক্ষম। সমাজকল্যাণ প্রশাসন এ বিষয়ে সচেতন এবং এক্ষেত্রে নীতি হল ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা।

২. সিদ্ধান্তগ্রহণ নীতি : সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টা আবশ্যক। তাই সমাজকল্যাণ প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারী ও প্রদানকারীদের অংশগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

৩. সবার জন্য সমান সুযোগ : সমাজকল্যাণ প্রশাসন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী। তা সেবা গ্রহণকারীরই হোক আর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরই হোক।

৪. স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি : সমাজকল্যাণ প্রশাসন ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, চাহিদা, সমস্যা প্রভৃতিকে স্বাতন্ত্র্যীকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। অর্থাৎ, স্বাতন্ত্র্যীকরণ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম নীতি।

৫. জনসমর্থন নীতি : জনসমর্থন ছাড়া কোন কর্মসূচিই বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম নীতি হচ্ছে জনসমর্থন নীতি।

৬. সমন্বয় নীতি : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি, কর্মচারী, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, সংশ্লিষ্ট সম্পদ ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় সমাজকল্যাণ-প্রশাসন সমন্বয় নীতিতে বিশ্বাসী।

৭. নমনীয়তার নীতি : সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমস্যার ধরনও পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে তাই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের রদবদল করতে হয়। আর এ জন্যই সমাজকল্যাণ প্রশাসন নমনীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী।

উপসংহার : অতএব উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কতিপয় নীতিমালা প্রয়োজন যার মাধ্যমে প্রশাসন কার্যকরী হবে। আর একজন সমাজকল্যাণ প্রশাসককে প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য উপরিউক্ত কার্যাবলি গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসকের এসব যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকলেই প্রশাসন সঠিক নিয়মে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন॥৯॥ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কাঠামো সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ পরিকাঠামো সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনিক পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদের দেশে কি ধরনের এবং কিভাবে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রধানত দু'ধরনের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা :

১. সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :
   - ক. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি ও
   - খ. সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কার্যাবলি।

২. বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :
   - ক. দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ও
   - খ. আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক কাঠামো : আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন পররাষ্ট্র পরিকল্পনা, মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এসব সংস্থার নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিজস্ব প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসন স্ব স্ব মন্ত্রণালয় দ্বারা নির্ধারিত। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যত সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যাবলি অধিকাংশই সরাসরিভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেহেতু সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তর অনুসৃত প্রশাসন ব্যবস্থাকেই বুঝি।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আমরা প্রধানত চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি ঃ

১. কেন্দ্রীয় পর্যায়। ২. বিভাগীয় পর্যায়।
৩. জেলা পর্যায়। ৪. থানা পর্যায়।

১. কেন্দ্রীয় পর্যায় : সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক। তিনিই সমগ্র বাংলাদেশে পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তার কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছে তিনজন পরিচালক। যেমন- ক. পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), খ. পরিচালক (প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম) ও গ. পরিচালক (সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম)। পরিচালকদের সাহায্য করেন অতিরিক্ত পরিচালক। বেশ কয়েকজন উপপরিচালক অতিরিক্ত পরিচালকদের সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। আরও নিচে রয়েছেন অসংখ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাধারণত সমাজকল্যাণ নীতি কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট প্রণয়ন এবং কর্মসূচির বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২. বিভাগীয় পর্যায় : সমগ্র বাংলাদেশকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন ছয় বিভাগের ছয়জন সিনিয়র উপপরিচালক। দু'জন সহকারী পরিচালক এবং কয়েকজন সিনিয়র সমাজসেবা অফিসার উপপরিচালকের কাজে সহায়তা করে থাকেন। বিভাগের আওতাভুক্ত সকল জেলার সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সিনিয়র উপপরিচালক এবং তার সহযোগী কর্মকর্তারা করে থাকেন।

৩. জেলা পর্যায় : বাংলাদেশের সাবেক জেলা পর্যায়ে একজন উপপরিচালক প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজসেবা অফিসার উপপরিচালককে সহায়তা করেন।

৪. থানা পর্যায় : একজন সমাজসেবা অফিসার থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল দায়িত্বে রয়েছেন। বর্তমানে সারাদেশে ৫৩৭টি থানায় সমাজকল্যাণ কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে। একজন সুপারভাইজার, তিন জন ইউনিয়ন সমাজসেবা কর্মী এবং কিছু গ্রামীণ সমাজকর্মী থানা পর্যায়ে সহায়তা করেন।

গ্রামীণ পর্যায়ে রয়েছে একটি 'গ্রাম সমাজসেবা কমিটি'। এ কমিটির উদ্দেশ্য হল :

ক. গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
খ. গ্রামভিত্তিক সেবামূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
গ. স্বেচ্ছাভিত্তিক সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা।

গ্রাম কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি ১ জন।
সহসভাপতি ২ জন।
সম্পাদক ১ জন।
সহসম্পাদক ১ জন।
কোষাধ্যক্ষ ১ জন।

সংশ্লিষ্ট কর্মীসহ গ্রাম কমিটিতে সর্বাধিক ১১ জন সদস্য থাকবে।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বিভাগীয়, জেলা এবং থানা পর্যায়ে পৌঁছানো এবং বাস্তবায়নের জন্য কিংবা নিচ থেকে উপরে এবং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রশাসনিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে দু'ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যথা :

১. লিখিত প্রক্রিয়া ও
২. মৌখিক প্রক্রিয়া।

১. লিখিত প্রক্রিয়া : তথ্য, বুলেটিন, চিঠি, রিপোর্ট, অফিস নির্দেশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লিখিত প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

২. মৌখিক প্রক্রিয়া : আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ পরিদর্শন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন মৌখিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক কাঠামো কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয়, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ পর্যায়ে বিস্তৃত। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রধান বিভিন্ন লোক হয়ে থাকেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পেশাদার এবং স্বেচ্ছামূলক উভয় ধরনের কর্মীর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্ন॥১০॥ সমন্বয় বলতে কি বুঝ?

অথবা, সমন্বয়ের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, সমন্বয় কাকে বলে?
অথবা, সমন্বয় কী?
অথবা, সমন্বয়ের পরিচয় দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য শ্রমবিভাগ ও কার্যের বণ্টন অপরিহার্য। কাজের বিভাগীয়করণ যত অধিক হবে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও তত বাড়বে এবং কাজের তদারকিকরণ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন তত বেশি হয়ে পড়বে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক। সেদিক থেকে সমন্বয় সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যখন দু'ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে একত্রিত করে তখনই সমন্বয় নীতির আবির্ভাব ঘটে।

সমন্বয় : সংগঠনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। নেতিবাচক অর্থে সমন্বয় প্রশাসনে দ্বন্দ্ব কোন কর্মের পুনরাবৃত্তি দূর করতে সাহায্য করে। ইতিবাচক অর্থে সমন্বয় সংগঠনের কর্মচারীর মধ্যে গোষ্ঠী ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করে। সমন্বয় একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যা কোন সংগঠনের সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাঠামোগত এবং যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমন্বয়কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাগুলো প্রদান করা হল :

Luther Gullick (লুথার গুলিক) এর মতে, "If division of work is inescapable co-ordination becomes mandatory." অর্থাৎ, শ্রমবিভাজন যদি অপরিহার্য হয় তাহলে সমন্বয় অবশ্যকরণীয়।

James D. Mooney (জেমস ডি. মুনে) বলেছেন, "Co-ordination is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose." অর্থাৎ, সমন্বয় হচ্ছে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে গোষ্ঠী কর্মপ্রচেষ্টার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

Ralf Davis (রালফ ডেভিস) এর ভাষায়, "The function of relating activities with respect to time and order of performance is called co-ordination." অর্থাৎ, সময় এবং কর্ম সম্পন্ন করার সাথে সংগঠনের কার্যাবলির সম্পর্কযুক্ত করাকে সমন্বয় সাধন বলে।

Henry Fayol (হেনরী ফেয়ল) যথার্থই বলেছেন, "To co-ordinate means to unite and co-ordinate all activities." অর্থাৎ, সংগঠনের সমুদয় কার্য একত্রিত এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করার অর্থই সমন্বয় সাধন।

অবশেষে বলা যায়, সমন্বয় হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সে পদক্ষেপ যা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির বিভিন্ন অংশকে একত্রীকরণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ কর্মসূচির পৃথক পৃথক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত ও সার্বিক লক্ষ্যার্জন করা হয়। তাই এসব লক্ষ্য ও দায়িত্বের মাঝে সমন্বয় একান্ত আবশ্যক।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আধুনিক বৃহৎ জটিল সাংগঠনিক ব্যবস্থায় সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এ সমন্বয় অর্জনে আলোচিত দু'পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলত এ দু'টি পদ্ধতি পরস্পর পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়। সংগঠনকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য এবং সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য উভয় পদ্ধতিই অপরিহার্য।

প্রশ্ন॥১১॥ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধিসমূহ লিখ।

অথবা, সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধিসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : কোনো এজেন্সির প্রশাসন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাকে প্রশাসনিক কার্যক্রম বলে। সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উৎপত্তি। জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করাই সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধি নিম্নে আলোচনা করা হলো। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। যেমন :

১. এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রধান কাজ এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়।

২. নীতি নির্ধারণ : প্রতিষ্ঠানের সাথে নীতি শব্দটি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এজেন্সির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম কাজ। যেকোনো সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলির সুষ্ঠু পরিচালনার নির্দেশিকাই হচ্ছে নীতি।

৩. পরিকল্পনা প্রণয়ন : পরিকল্পনা প্রণয়ন সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধিভুক্ত। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়। বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মৌলিক কাজ।

৪. কর্মসূচি প্রণয়ন : কর্মসূচি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। সমাকল্যাণ প্রশাসন সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি সচেতন থেকেই কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। কর্মসূচিগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

৫. বাজেট প্রণয়ন : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অপর একটি পরিধিভুক্ত বিষয় হচ্ছে বাজেট প্রণয়ন। বাজেটে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদের উৎস ও ব্যয়ের খাত নির্ধারণ। এটি সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৬. কর্মচারী নিয়োগ : প্রশাসনের অন্যতম কাজ হচ্ছে যোগ্যকর্মচারী নিয়োগ। তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করা। কর্মচারীদের ছুটি, পদোন্নতি, বেতন, কাজের সময়, বদলি, প্রশিক্ষণ, অবসর প্রভৃতি সামগ্রিক কার্যাবলি প্রশাসনের আওতাভুক্ত।

৭. নির্দেশনা ও পরিচালনা : প্রশাসক কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া ও পরিচালনা করে থাকেন। সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহায়তা দান বহুমুখী কার্যাবলির অপরিহার্য অঙ্গ।

৮. যোগাযোগ : কল্যাণমূলক কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সহায়তা প্রয়োজন। এজন্য সুষ্ঠু ও কার্যকর যোগাযোগ বা জনসংযোগকে সমাজকল্যাণের পরিধিভুক্ত করা হয়ে থাকে। মূলত সমাজকল্যাণ প্রশাসনের যাবতীয় কার্যাবলিই যোগাযোগ ভিত্তিক।

৯. রেকর্ড সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা : তথ্যাদি সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করা প্রশাসনের পরিধির মধ্যে পড়ে। কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। এটি অতীত কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

১০. প্রেষণা দান : কাজের সাথে প্রেষণার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যাদের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, উৎসাহ, প্রেরণা দানের জন্য প্রশাসনকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। কারণ উপযুক্ত প্রেষণা ছাড়া মানুষ কর্মে উজ্জীবিত হয় না। সুতরাং প্রেষণাও প্রশাসনের পরিধিভুক্ত বিষয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি গ্রহণ, যোগাযোগ রক্ষা করা থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়াই এর পরিধিভুক্ত।

প্রশ্ন॥১২॥ সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

অথবা, সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমন্বয় প্রত্যয়টি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এটি প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিশ্লেষণ ও তাদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের প্রক্রিয়া। বস্তুত সমাজ তথা রাষ্ট্র সবকিছুই সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে।

সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ : সমন্বয় বলতে বোঝায়, এটি হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সুশৃঙ্খল দলীয় প্রচেষ্টা এবং কার্যক্রমের ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়া। সমন্বয়ের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. গুরুত্বপূর্ণ উপাদান : সমন্বয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা সমন্বয় যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান। সমন্বয় ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়।

২. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন : বিভিন্ন বিভাগ, কর্মী, কর্মসূচির সমন্বয়ের মাধ্যমেই কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা সমন্বয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এটি একদল লোকের কার্যাবলিকে ঐক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া।

৩. সমতা বিধান : সংগঠনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভারসাম্য ও সমতা বিধান করা সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সংগঠনে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখার জন্য ভারসাম্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিষ্ঠানের সমতা আনয়ন ও রক্ষা করা সমন্বয়ের মাধ্যমেই সম্ভব।

৪. শৃঙ্খলা রক্ষা : প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা শুধু একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এটি সম্ভব। আর সমন্বয়ই পারে দলীয় প্রচেষ্টায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

৫. দ্বন্দ্ব নিরসন : প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব বজায় থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানই তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারে না। তাই প্রতিটি স্থানেই সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এই সমন্বয়ই পারে দ্বন্দ্ব নিরসন করে স্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করতে।

৬. পুনরাবৃত্তি ও অপচয় রোধ : প্রতিষ্ঠানের সম্পদের অপচয় রোধ এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সমন্বয়। পুনরাবৃত্তি ও অপচয় রোধ সমন্বয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপচয় রোধ করে এটি কর্মসূচিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

৭. সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি : সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি সমন্বয়ের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এটা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত জরুরি। অযথা জটিলতা সৃষ্টি না করে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে একমাত্র সমন্বয়ই পারে।

৮. সুসম্পর্ক তৈরি : সমন্বয় একাধিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের কর্মী, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে এটি। যার ফলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের ভেতর সাহায্যমূলক চেতনার সৃষ্টি হয়।

৯. নির্দেশ প্রদান : নির্দেশ প্রদান করা সমন্বয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এটি অধস্তন কর্মীদের নির্দেশ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এর অধস্তন কর্মচারীদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

১০. সঠিক সময়ে সম্পাদন : প্রতিষ্ঠানে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তাহলে কর্মসূচি সঠিক সময়ে সম্পাদিত হতে পারে না। সমন্বয় একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ফলে বিভিন্ন কার্য সঠিক সময়ে সমন্বয়ের মাধ্যমেই সম্পাদন করা যায়।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমন্বয় একটি সংস্থার প্রাণ হিসেবে কাজ করে। সমন্বয়হীন প্রতিষ্ঠান নাবিক বিহীন জাহাজের মত। সমন্বয়ের মাধ্যমেই কোনো প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তাই যেকোনো প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত সকল বৈশিষ্ট্য যুক্ত সমন্বয় অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন॥১৩॥ সমন্বয়ের প্রকারভেদ লিখ।

অথবা, সমন্বয়ের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয়ের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমন্বয় প্রত্যয়টি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এটি প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিশ্লেষণ ও তাদের মধ্যে ভারসাম্য বা ঐক্য স্থাপনের প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সম্পদের অপচয় রোধ, সেবার পুনরাবৃত্তি রোধ, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের তাৎপর্য অপরিসীম। বস্তুত সমাজ তথা রাষ্ট্র সবকিছুতেই সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সমন্বয়ের প্রকারভেদ : যেকোনো প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, সংস্থা প্রভৃতি যেকোনো দলীয় কর্মকাণ্ডে সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমন্বয়কে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে সমন্বয়ের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো :

সমন্বয়কে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. অভ্যন্তরীণ সমন্বয় : এটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যক্রম ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা, প্রশাখা এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় ঘটে থাকে। অর্থাৎ কর্মচারী, ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীদের মধ্যে এর মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান হয়।

২. বাহ্যিক সমন্বয় : প্রতিষ্ঠানের বাইরে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বাহ্যিক সমন্বয় বলে। একে কাঠামোগত সমন্বয়ও বলে। প্রতিষ্ঠানের বাইরে সরকার জনগণ, বিভিন্ন সংস্থা প্রভৃতির সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটে থাকে।

সমন্বয়কারী ও সমন্বয়ের বিষয়ের ভিত্তিতে সমন্বয়কে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. সমান্তরাল বা একটি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় : প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের কর্ম প্রচেষ্টা, বিভাগ, উৎপাদন, গবেষণা প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয়। (i) যেমন – কর্মীদের মধ্যে, (ii) পর্ষদের বিভিন্ন উপকমিটির মধ্যে, (iii) পর্ষদ ও কর্মীদের মধ্যে।

২. উল্লম্ব/ পূর্বাপর সমন্বয় : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপর্যায় থেকে নিম্নপর্যায়ের কর্মচারী এবং নিম্নপর্যায় থেকে শীর্ষস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া :

ক. নিম্নগামী সমন্বয় : উচ্চপর্যায় থেকে নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া। যেমন – মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সহকারী সচিব ও তার নিচের কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

খ. ঊর্ধ্বগামী সমন্বয় : নিম্নস্থানীয় কর্মী থেকে শীর্ষস্থানীয় কর্মী পর্যন্ত শুরু করে সচিব পর্যন্ত সমন্বয়সাধন।

৩. পার্শ্বগামী সমন্বয় : একই পদের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হলে তাকে পার্শ্বগামী সমন্বয় বলে।

৪. বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় : এটি দুইভাবে হয়ে থাকে। যথা –

১. কার্যগত সমন্বয় : সমষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা কর্মরত থাকে কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেগুলো সমপ্রকৃতির। সমাজকল্যাণ, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকারখানা প্রভৃতি একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। যেমন – সমাজকল্যাণে কর্মরত শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, আর্থসামাজিক কেন্দ্র, গ্রামীণ মাতৃকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি।

২. ভৌগোলিক সমন্বয় : একটি সমষ্টি বা ভৌগোলিক এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন খুবই প্রয়োজন। যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও নারীকল্যাণ প্রভৃতি সব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পিত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যু বিষয়গুলো সমন্বয়ের শ্রেণিবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সমন্বয় যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সমন্বয় ব্যতীত কোনো কর্মসূচিই সঠিক সময়ের মধ্যে সফল হতে পারে না। তাই এটির প্রয়োজন অত্যধিক।

প্রশ্ন॥১৪॥ উত্তম সমন্বয়ের পূর্বশর্তসমূহ লিখ।

অথবা, উত্তম সমন্বয়ের পূর্বশর্তসমূহ কী কী?

অথবা, উত্তম সমন্বয়ের পূর্বশর্তসমূহ তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমন্বয় প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং একটি জটিল প্রক্রিয়া। কেননা কার্যকর সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সমন্বয়ের সফলতা ও কার্যকারিতা কতকগুলো পূর্বশর্তের উপর নির্ভর করে।

উত্তম সমন্বয়ের পূর্বশর্তসমূহ : সমন্বয়ের পূর্বশর্তগুলো এর উপাদান হিসেবেও বিবেচিত। এসব উপাদান প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি, দল ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপন করে। সমন্বয়ের পূর্বশর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. সময়ের যথার্থতা : সমন্বয়কে ফলপ্রসূ করার জন্য সময়ের যথার্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাম্য সময়ের প্রয়োজন। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ সম্পাদন করা সমন্বয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত।

২. সাংগঠনিক কাঠামো : যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো অত্যাবশ্যকীয়। সমন্বয় ব্যবস্থায় সহজেই সম্পাদিত করার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো নমনীয় হওয়া চাই। এটি সমন্বয়ের অন্যতম পূর্বশর্ত।

৩. সামঞ্জস্যপূর্ণতা : যেকোনো প্রতিষ্ঠানই নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এসব নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সমন্বয় ব্যবস্থায় এসবের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা অত্যাবশ্যক।

৪. স্বতঃস্ফূর্ত ও আনুষ্ঠানিক সমন্বয় : প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ততা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের মানসিকতা উত্তম সমন্বয়ের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ততা সমন্বয় ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

৫. সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা : সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উন্নত ও কার্যকরী যোগাযোগ। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই। তাই সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বয়ের পূর্বশর্ত।

৬. কার্যকর তত্ত্বাবধান : প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঠিক তত্ত্বাবধান ছাড়া কার্যকর সমন্বয় আশা করা যায় না। কর্মসূচি বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধান আবশ্যকীয় বিষয়। তাই এটি সমন্বয়ের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত।

৭. গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি : প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি প্রয়োগ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট নীতির আলোকেই কর্মসূচি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য সাধারণ প্রথা বা রীতিনীতির উন্নয়ন করা অত্যাবশ্যক।

... অন্যান্য : এছাড়া আরো যেসব উপাদান উত্তম সমন্বয়ের ... বিবেচিত সেগুলো হলো বিভিন্ন কমিটির ব্যবহার, ... কার্যক্রমের প্রতি কর্মীদের মনোনিবেশ, আলাপ ... সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণ প্রভৃতি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত শর্ত বা ...সমূহের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে। তাই এর কোনো একটির অনুপস্থিতি সমন্বয় ব্যবস্থাকে ... করতে পারে। প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠু সমন্বয় অপরিহার্য এবং এজন্য সমন্বয়ের পূর্বশর্তসমূহ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন।১৫। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যাগুলো লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যাগুলো কী কী?

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যাগুলো তুলে ধর।

উত্তর। ভূমিকা : যেকোনো কার্যক্রমের সফলতার জন্য সমন্বয় সাধন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটি একটি কঠিন ও জটিল ব্যাপার। এদেশে প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের রয়েছে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা। সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের রয়েছে অর্থসংকটসহ সীমাহীন অনিয়ম।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়। যেসব সমস্যাগুলো সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে দুর্বল করে দেয়। নিম্নে সমন্বয় সাধনে সমস্যা বা বাধাগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাব : যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ব্যবস্থা নির্ভর করে সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার উপর। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলোতে বাস্তবমুখী সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাব থাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এদেশে সমন্বয় সাধন ব্যবস্থা দুর্বল।

২. প্রশাসনিক দুর্বলতা : এদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় রয়েছে নানারকম দুর্বলতা। প্রশাসনিক বিচ্ছিন্নতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রভৃতি প্রশাসনের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রশাসনের কার্যক্রমের সফলতাও অনেকাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে।

৩. অর্থ সংকট : এদেশে সমন্বয় সাধনে বড় বাধা হলো অর্থ সংকট। বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী ও দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগের জন্য যথেষ্ট আর্থিক বরাদ্দ থাকতে হয়। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে এদেশে প্রশাসনের সমন্বয় ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা যাচ্ছে না।

৪. কর্মসূচির স্থায়িত্বের অভাব : এদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচিগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয় না। সরকার পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির ফলে কর্মসূচির স্থায়িত্ব কম হয়। স্থায়িত্বের দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে প্রশাসনের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

৫. সমঝোতার অভাব : কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভেতর দ্বন্দ্ব, অন্তঃকলহ, বিবাদ, রেষারেষি লেগেই থাকে। দূর থেকে এটা প্রতিযোগিতা মনে হলেও ফল প্রায়ই নেতিবাচক হয়ে থাকে। এতে করে কর্মসূচিতেও সফলতা আসে না, অন্যদিকে সমন্বয় সাধনেও দুর্বলতা থাকে।

৬. গবেষণার অভাব : সমন্বয় ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর গবেষণা। কিন্তু এদেশে কার্যকর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও দক্ষ লোকের বড়ই অভাব। ফলে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ঠিকভাবে সমন্বয় করা যাচ্ছে না।

৭. নেতিবাচক মানসিকতা : নেতিবাচক মনোভাব এদেশের মানুষের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিকট সমন্বয় গুরুত্বহীন। ফলে সমন্বয় সাধনের প্রতি এটি একটি প্রতিবন্ধক।

৮. আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব : সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বিভাগসমূহের মধ্যে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা। এটি সমন্বয় ব্যবস্থায় একটি নেতিবাচক দিক।

৯. অস্থিতিশীল কর্মসূচি : প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের কর্মসূচির মধ্যে যদি স্থিতিশীলতা না থাকে তাহলে সমন্বয় সাধনে জটিলতা আসবে। বিভিন্ন কারণে সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বাভাবিক পরিবেশ আনা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমন্বয় ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।

১০. সময়ের পার্থক্য : সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একেক প্রতিষ্ঠানের একেক রকম সময় ব্যয় হয়। কেউ দ্রুত, আবার কেউ বা ধীর গতিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে। এরূপ সময়ের ভিন্নতার কারণে সমন্বয় ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ দেখা যায়। এসব বাধার কারণে কার্যক্রম তেমনভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাই সমন্বয় ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে নতুবা সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে অফুরন্ত সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন।১৬। সমন্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

অথবা, সমন্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধর।

অথবা, সমন্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর। ভূমিকা : সমন্বয় প্রত্যয়টি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এটি প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিশ্লেষণ ও তাদের ভারসাম্য বা ঐক্য স্থাপনের প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

সমন্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ : সমন্বয় কতকগুলো বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। সমন্বয়ের এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠান তার সফলতা আনয়নে সচেষ্ট হয়। সমন্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. সুসম্পর্ক স্থাপন করা : সমন্বয়ের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কর্মকর্তাদের মধ্যে, কর্মচারীদের মধ্যে, শ্রমিকদের সাথে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সমন্বয় কাজ করে। সুসম্পর্ক স্থাপিত হলেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

২. গতিশীলতা আনয়ন : এজেন্সি ও প্রশাসনকে গতিশীল করা সমন্বয়ের অন্যতম লক্ষ্য। কর্মে গতিশীলতা না থাকলে প্রতিষ্ঠান স্থবির হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত রাখতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে গতিশীলতা আনতে সমন্বয় ভূমিকা রাখে।

৩. পুনরাবৃত্তি রোধ : প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তিরোধ করা এবং কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করাও সমন্বয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। একই কাজ বা কর্মসূচি বার বার গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের অগ্রসর হবে না। তাই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সমন্বয় পুনরাবৃত্তি রোধে সাহায্য করে।

৪. অনুকূল পরিবেশ গঠন : প্রতিষ্ঠানে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সমন্বয় অত্যাবশ্যকীয়। সমন্বয়ের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কলহ দূরীভূত হয়। যাবতীয় দ্বন্দ্ব দূরীভূত করা, প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সমন্বয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

৫. গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি : প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় থাকলে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুস্থ থাকে। কর্মকর্তারা, কর্মীরা নিজেদের মত দিতে পারে। ফলে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

৬. সংহতি স্থাপন : প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও সদস্যদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান ও সংহতি স্থাপন করা সমন্বয়ের আরেকটি লক্ষ্য। সংহতি স্থাপনের জন্য সংস্থার সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যার্জন করতে পারে।

৭. শৃঙ্খলা আনয়ন : দলীয় প্রচেষ্টায় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আনয়ন করা সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আর শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশই পারে প্রতিষ্ঠানকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দিতে।

৮. কার্যকর কর্মসূচি : কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানের কাজ। কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ও ফলপ্রসূ করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হয়। প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা সমন্বয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠান এর মূল লক্ষ্য হয় কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন করা। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। আর এই অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয় সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে। সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যই নির্ভর করে সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর। সমন্বয়ের উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠান তার সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন॥১৭॥ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা সমাধানের সুপারিশসমূহ তুলে ধর।

উত্তর॥ ভূমিকা : যে কোনো কার্যক্রমের সফলতার জন্য সমন্বয় সাধন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটি কঠিন ও জটিল ব্যাপার। এদেশে প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের রয়েছে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় সাধনে বিদ্যমান সমস্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যাসমূহ দূরীকরণের উপায় নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে কর্মীরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে। এতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহজ হবে। ফলে সমন্বয় সাধনে বাধা দূর হবে।

২. সমঝোতার ব্যবস্থা করা : বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া গড়ে উঠবে। এর ফলে সমন্বয় সাধনও সহজতর হবে।

৩. সুষ্ঠু যোগাযোগ প্রক্রিয়া : এক প্রতিষ্ঠানের সাথে আরেক প্রতিষ্ঠানের এবং উর্ধ্বতন থেকে অধস্তনদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে সকলের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। সমন্বয় ব্যবস্থাও জোরদার হবে।

৪. নির্দিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া : প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হতে হবে। অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রক্রিয়ার ফলে কর্মীগণ স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। এর ফলে সমন্বয় প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়।

৫. বাস্তবসম্মত কর্মসূচি প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি হতে হবে বাস্তবসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলে কর্মীরা সহজেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। তাদের মধ্যে কোনো ভুল বুঝাবুঝি হবে না এবং সমন্বয় সাধনও সম্ভব হবে।

৬. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি : কর্মকর্তা, কর্মচারী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে অপেশাদার ও অদক্ষকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে সমন্বয়ের ত্রুটিও দূরীভূত হবে।

৭. গবেষণা ও মূল্যায়ন : সমন্বয়ধর্মী কার্যক্রমকে সফল করার জন্য এলাকাভিত্তিক জনগণের অনুভূত প্রয়োজন ও সম্পদ অনুযায়ী গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। এর ফলে জনগণের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা যাবে। এতে করে কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করাও সহজ হবে।

৮. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা : প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের উপর কর্মীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তাতে করে কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে সমন্বয় ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। এজন্য প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় যতবেশি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে সমন্বয় ব্যবস্থায়ও তত জোরদার হবে। যা সমন্বয় সাধনের পথে বাধাসমূহ দূরীভূত করবে সহজেই।

প্রশ্ন।১৮। **সমন্বয়ের পদ্ধতি লিখ।**

অথবা, সমন্বয়ের উপায় তুলে ধর।

অথবা, সমন্বয়ের কৌশলসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর। **ভূমিকা** : সমন্বয় প্রত্যয়টি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এটি প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরেই সমন্বয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমন্বয়ের কতিপয় পদ্ধতি বা উপায় রয়েছে।

সমন্বয়ের পদ্ধতি : সমন্বয় একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। এর পরিধি প্রতিষ্ঠানের সকল স্তর ও কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণভাবে, দুটি ভিন্ন উপায়ে সমন্বয় অর্জন করা যায়। যথা :

ক. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি

খ. অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

নিম্নে পদ্ধতি দুইটি আলোচনা করা হলো :

ক. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি : প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশল, সাংগঠনিক কাঠামো, সঠিক ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

১. প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশল : আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশল রয়েছে। যেগুলো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অপরিহার্য। এগুলো হচ্ছে – আলোচনা, সভা, সিম্পোজিয়াম, অধিবেশন, পর্যালোচনা, সম্মেলন, নেতৃত্ব প্রদান, কমিটি গঠন প্রভৃতি।

২. যোগাযোগ ব্যবস্থা : সঠিক ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বয়ের আরেকটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ও কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই। তাই কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বয়ের অন্যতম পদ্ধতি।

৩. সাংগঠনিক কাঠামো : সাংগঠনিক কাঠামো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সমন্বয়কে সহজেই সম্পাদিত করার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে পড়ে কর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য, নীতিমালা, কার্যক্রম ইত্যাদি।

৪. সমর্থন দান : প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দান আবশ্যক। সেই সাথে নীতি ও শর্তের বিকাশ সাধনও অপরিহার্য। এর প্রধান লক্ষ্য গ্রথিত করা, নীতি অনুযায়ী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা।

৫. ঐক্য ও সংহতি : সমন্বয়ের মাধ্যমেই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐক্য ও সংহতি অবলম্বনের মাধ্যমে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং বাস্তবায়ন করা যায়। তাছাড়া গ্রহণযোগ্য রীতিনীতির উন্নয়ন ও প্রবর্তন করাও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি : অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি বা উপায়সমূহ নিম্নরূপ :

১. যথার্থ সময় নিরূপণ : সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সম্পন্ন করা সমন্বয়ের অন্যতম অনানুষ্ঠানিক কাজ। সময়ের কাজটি সময়েই করতে হয়। না হলে সেটির মাহাত্ম্য থাকে না।

২. অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে উৎসাহ দান : যোগাযোগে উৎসাহদান অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় পদ্ধতি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কিংবা চাহিদাভুক্তদের সাথে প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দান, বিশ্লেষণ করা, গ্রহণযোগ্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা, সমন্বয়কারী নিয়োগ দেওয়া প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. কমিটি গঠন : কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করা। যেমন- উৎপাদন কমিটি, সমাজসেবা কমিটি, পরামর্শ দান কমিটি ইত্যাদি সমন্বয়কে সফল করার উপায়।

৪. গ্রহণযোগ্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ : প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য থাকে জনগণের অনুভূত চাহিদা মেটানো। পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করার মাধ্যমে সমন্বয়কে সফল করা যায়। এটি সমন্বয়কে সফল করার কার্যকরী উপায়।

৫. বিবিধ : তাছাড়া সমন্বয়ের আরো কিছু পদ্ধতি বা উপায় রয়েছে। যেগুলো সমন্বয়কে সফল করে তোলে। যেমন– ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সুসম্পর্ক স্থাপন, তথ্য প্রদান, বাজেট, নিরীক্ষা প্রভৃতি সমন্বয়ের কৌশল হিসেবে বিবেচিত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, দুই ধরনের পদ্ধতির অন্তরালে রয়েছে সমন্বয়ের নানাবিধ উপায় বা কৌশল। যেগুলো প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে পাথেয় হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠান গঠন থেকে কর্মসূচি নির্ধারণ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, লক্ষ্য অর্জন এই পুরো যাত্রা পথে সমন্বয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রশ্ন॥১৯॥ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের তাৎপর্য আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উৎপত্তি মূলত সমাজসেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে। এটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করে তার মূল্যায়ন ও সংশোধন করার সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্বসমূহ : বাংলাদেশর মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী হতে শুরু করে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত দীর্ঘ কর্মপ্রবাহ পরিচালনা করে থাকে সমাজকল্যাণ প্রশাসন। নিম্নে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা : সমাজের কল্যাণের জন্য যেকোনো কর্মসূচি ও কার্যক্রম কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত হয়। কেননা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো সংগঠন গড়ে ওঠে না। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন : সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে উত্তম পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের মতো দরিদ্রতম দেশের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মাধ্যমে যে কোনো পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা যায়। তাই বাংলাদেশের জনগণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. গতিশীল ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ : বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমুখী কর্মসূচি। জনগণের অনুভূত চাহিদার উপর ভিত্তি করে কর্মসূচি প্রণয়ন করলে তা কল্যাণ বয়ে আনে। পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ : সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে যে কোনো পদক্ষেপ বা কর্মসূচি গ্রহণ করলে তা জনকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বিভিন্নমুখী জটিলতার কারণে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের অভাবে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে না। এক্ষেত্রে সমস্যা, সমাধান, সম্পদ, মানব সম্পদ প্রভৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণে সমাজকল্যাণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

৫. সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি : প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ সাংগঠনিক কাঠামো অপরিহার্য। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে হয়। উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টনে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৬. সমন্বয়সাধন : এদেশে জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। একই লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। সমন্বয়সাধন করা হয় না কর্মসূচিগুলোর মধ্যে। যার ফলে কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হয় না। এরই প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করে থাকে। এক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি : সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের অসফলতা ও দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব। প্রশাসনের বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা, নৈপুণ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। এজন্য সমাজকল্যাণ প্রশাসন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

৮. সম্পদের সদ্ব্যবহার : বাংলাদেশ সীমিত সম্পদের দেশ, কিন্তু এখানে সমস্যা অসীম। অসীম সমস্যার সমাধানের জন্য সসীম সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য। এজন্য সমাজকল্যাণ প্রশাসন সকল বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপচয় রোধ করে সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে যদি সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার ও প্রতিরোধের পরিবহণের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে সে পরিবহণের চাকার সাথে তুলনা করা যায়। বাংলাদেশের জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে কার্যকর নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধন, কর্মীর দক্ষতাবৃদ্ধি, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

গ বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ প্রশাসনের সংজ্ঞা দাও। প্রশাসন কত প্রকার ও কী কী? সামাজিক প্রশাসনের সাথে জনপ্রশাসনের সম্পর্ক আলোচনা কর।

অথবা, প্রশাসন বলতে কী বুঝ? জন প্রশাসন ও সামাজিক প্রশাসনের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

অথবা, প্রশাসন কাকে বলে? জন প্রশাসন ও সামাজিক প্রশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাও।

অথবা, প্রশাসনের ব্যাখ্যা দাও? জন প্রশাসন ও সামাজিক প্রশাসনের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : সাধারণত সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হল প্রশাসন। কিন্তু সামাজিক নীতিকে সামাজিক কল্যাণে অথবা সমাজসেবায় নিয়োজিত করা হলে প্রক্রিয়াগত পথ পরিক্রমণ করতে হয়। আর এজন্য প্রশাসনকে দলীয় প্রচেষ্টার প্রাথমিক স্তর বলা চলে। বস্তুত একাধিক সংখ্যক মানুষের দলবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই প্রশাসন কলা পরিলক্ষিত হয়।

প্রশাসন : প্রশাসন হচ্ছে যৌথ কার্যক্রম ও মানুষের সহযোগিতাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার মূল শক্তি। মানুষের সমষ্টিগত কার্যাবলিকে পরিচালনা নির্বাহ করার নামই প্রশাসন। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং সে উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়।

অর্থগতভাবে প্রশাসন, প্রশাসনের ইংরেজি প্রতি শব্দ Administration. এ শব্দটি Administer নামক ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'administer' শব্দের অর্থ সেবা করা (to serve)। আভিধানিক দিক থেকে 'administer' এর অর্থ হল পরিচালনা করা বা নির্বাহ করা। প্রশাসন এমন একটি চিন্তন, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যা সমগ্র এজেন্সির সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এর মূল বিষয় লক্ষ্য নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন, দায়িত্ব বণ্টন, কর্মসূচি পরিচালনা ও সম্পাদিত কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য জনগণের সাথে কাজ করার প্রক্রিয়া।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

অধ্যাপক **নিউম্যান** এর মতে, "প্রশাসন হচ্ছে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত কোন জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা লাভের জন্য তাদেরকে নেতৃত্ব, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।"

J. Warham এর মতে, "প্রশাসন হল এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোন সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের সমগ্র কার্যাবলি এর লক্ষ্যের দ্বারা পরিচারিত হয়।"

L.D. White বলেছেন, "প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি কলা যার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করা হয়।"

ম্যায়ো (Mayo) এর মতে, "প্রশাসন হচ্ছে এজেন্সির লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যাবলি নির্বাচন ও তার শ্রেণীবিন্যাস, নীতি ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রদান, কর্মচারী নির্বাচন, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণ এবং সম্ভাব্য ও যুক্তিযুক্ত সকল সম্পদ সমাবেশ ও সংগঠিত করা।"

এইচ. বি. ট্রেকার (H. B. Tracker) এর মতে, "Administration is the creative process of thinking, planning and action inextricable bound up with the whole agency-a process of working with people to set goals, to build organizational relationship, to distribute responsibilities, to conduct programmers and to evaluate accomplishments." অর্থাৎ, প্রশাসন হচ্ছে চিন্তন, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যা সমগ্র এজেন্সির সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত এবং লক্ষ্য নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন, দায়িত্ব বণ্টন, কর্মসূচি পরিচালনা ও সম্পাদিত কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য জনগণের সাথে কাজ করার প্রক্রিয়া।

সুতরাং, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সামাজিক প্রশাসনকে সামাজিক উন্নয়নের অনুধ্যান হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় (Study of Developemt) যা বিভিন্ন Purpose এর আলোকে নীতি ও সামাজিক সেবার নিমিত্তে সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত। পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ হল একটি কর্মমুখী হাতিয়ার যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক কার্যক্রমে (Social action) পরিণত করে।

প্রশাসনের প্রকারভেদ : প্রশাসন হল কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির, নীতিনির্ধারণ, কার্যকর কাঠামো সৃষ্টি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। প্রশাসনকে তিনটি ধারার উপর ভিত্তি করে একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হল : ১. সমাজকল্যাণ বা সামাজিক প্রশাসন, ২. লোকপ্রশাসন এবং ৩. ব্যবসায় প্রশাসন।

সামাজিক প্রশাসনের সাথে জনপ্রশাসনের সম্পর্ক : সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়োজিত তাই Public Administration বা জনপ্রশাসন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ, সরকার কি করতে চায়, কিভাবে করতে চায় এ দু'টি বিষয়ই জনপ্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এদের সমন্বয়ে জনপ্রশাসন গঠিত হয়। জনপ্রশাসন Legislative, Judiciary, Executive এ তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে হলেও কেউ কেউ শুধুমাত্র Executive কার্যক্রমকে জনপ্রশাসনের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান।

অন্যদিকে, সামাজিক প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হয়। সুতরাং, জনপ্রশাসন, সামাজিক প্রশাসন এ দু'টির পারস্পরিক সম্পর্ক ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হল :

নং	জনপ্রশাসন	সামাজিক প্রশাসন
১.	জনকল্যাণমূলক ধারণা থেকে লোকপ্রশাসনের উৎপত্তি।	সমাজ সেবামূলক এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা হতে সামাজিক প্রশাসনের উৎপত্তি।
২.	সরকারি নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসনের গতিশীলতা বজায় রাখা জনপ্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।	সামাজিক নীতিকে সমাজ সেবায় পরিণত করা, মানবসম্পদের উন্নয়ন, সামাজিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নীতিকে পরিবর্তন করা সামাজিক প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
৩.	প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে এটা কাজ করে।	এটা মূলত একটি দলীয় প্রক্রিয়া। জনগণের অনুভূতি, চাহিদা ও সম্পদ নিয়ে কাজ করে।
৪.	প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে এটা কাজ করে। সরকারি নীতি বাস্তবায়ন, কর্মসূচির তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, কার্যকর রিপোর্ট সংরক্ষণ, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং সরকারি নীতির সাথে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন এর অন্যতম কাজ।	তথ্য অনুসন্ধান, সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য উপযুক্ত সেবা, লক্ষ্যে পৌছার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেবাকে বণ্টন করা, সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা ইত্যাদি সামাজিক প্রশাসনের কাজ।
৫.	জনপ্রশাসন নীতিনির্ধারণ, সামাজিক প্রশাসন ও ব্যবসায় প্রশাসনকে বিবেচনায় রাখে।	এটা জনপ্রশাসন ও ব্যবসায় প্রশাসনের নীতি ও কৌশল অনুসরণ করে।
৬.	এখানে অধিকাংশ ক্ষমতা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকে বলে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।	এটা সুসংগঠিত নয় এবং এর তাত্ত্বিক কাঠামো পদ্ধতি, জ্ঞানভাণ্ডার তেমন পরীক্ষিত ও সুসংগঠিত নয়।
৭.	এটা রাজনৈতিক নির্দেশনার সাথে জড়িত, এর পরিধি ব্যাপক, এটা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ।	প্রশাসন নমনীয়তা, স্বাতন্ত্র্যীকরণ, দ্বিমুখী যোগাযোগ, গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৮.	নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান, জনগণের মর্যাদার স্বীকৃতি, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছ প্রশাসন, জরুরি ভিত্তিতে জনচাহিদা পূরণ, সার্বজনীন মঙ্গল সাধন ইত্যাদি নীতিমালাকে সামনে রেখে এ প্রশাসন কাজ করে।	সেবা গ্রহীতাদের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, সকলের জন্য সমান সুযোগ, স্বাতন্ত্র্যীকরণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সমন্বয় সাধন, দ্বিমুখী যোগাযোগ, নমনীয়তা, মূল্যায়ন ইত্যাদি নীতিমালা অনুসরণ করে এ প্রশাসন কাজ করে।
৯.	মন্ত্রনালয়, বোর্ড, সেক্রেটারি, জেলা প্রধান, থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রধান, Line ও Staff নিয়ে এ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত।	বোর্ড ও কমিটি, সাম্প্রদায়িক দল, এজেন্সির সদস্য, পেশাদার কর্মচারী, অপেশাদার কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক ও ডিরেক্টর ইত্যাদির সমন্বয়ে সামাজিক প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, প্রশাসন হচ্ছে মানুষের সহযোগিতা ও যৌথ কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার মূল চালিকাশক্তি। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। প্রশাসন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হলেও তারা পরস্পর জনকল্যাণের জন্য কাজ করে। জনপ্রশাসন, সামাজিক প্রশাসন ও ব্যবসায় প্রশাসন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

প্রশ্ন॥২॥ সামাজিক প্রশাসন বলতে কী বুঝ? সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী? বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ প্রশাসনের স্বতন্ত্র মানদণ্ড আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসণের সংজ্ঞা দাও? বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ প্রশাসনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, শিল্পবিপ্লব তথা শিল্প উন্নয়ন নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং যে উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের। প্রত্যেক দেশের সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সামাজিক প্রশাসন : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সামাজ ...র ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিতে সামাজিক চাহিদা ...পূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের উদ্ভব ও বিকাশ ...। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করার ...গত বা দলীয় প্রচেষ্টাই হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন বা ...কল্যাণ প্রশাসন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ...জিক প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের ...কটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

D. **Chowdhury** বলেছেন, "Social work ...ministration is a process by which apply ...fessional competence to achieve certain goals. It ...also called a process at transforming social policy ...o social action.

Russul H. Kurts এর মতে, "Social ...ministration is a process of transforming social ...licy into social services, involving the ...ncomitant (সহগামী, আনুসঙ্গিক, সহবিদ্যমান) use of ...perience to modify policy or method."

John C. Kidneingh বলেছেন, "Social Welfare ...ministration is the process of transforming social ...licy into social services and the use of experience ...evaluating and modifying social policy." অর্থাৎ, ...জকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় ...ন্তরের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আলোকে ...মাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হয়।

মনীষী **Walter A. Friedlander** বলেছেন, "Social ...elfare administration is the process of organizing ...d directing of social agency." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ ...শাসন হচ্ছে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা ...র প্রক্রিয়া। তাই এর মাধ্যমে মানব সমস্যা সমাধান ও ...দের প্রয়োজন পূরণে সামাজিক কার্য পরিচালনা করা হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ ...শাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংঘটিত ও পরিচালিত করার ...মন এক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় ...পান্তরিত করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি ...সংশোধন করে থাকে।

বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য : সমাজের ...ল্যাণ এবং সেবামূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন থেকে সামাজিক ...শাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উৎপত্তি। সামাজিক ...শাসনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ...ল্যাণ সাধন। সমাজকল্যাণের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে ...াংলাদেশে সামাজিক প্রশাসন কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ...বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই সামাজিক প্রশাসন ...সমাজকল্যাণের অন্যান্য সহায়ক পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। নিম্নে ...এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. কল্যাণমুখী প্রশাসন : বাংলাদেশের সামাজিক প্রশাসন একটি কল্যাণমুখী প্রশাসন। এখানে কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। কল্যাণমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে সেবাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও করা হয়। অর্থাৎ, জনগণের কল্যাণকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়।

২. ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম : বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম। এখানে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকতা, কর্মচারী এবং সেবাগ্রহিতা সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। সকলে যদি নিজনিজ অবস্থানে থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তাহলে কল্যাণ কার্য ফলপ্রসূ হয়।

৩. নমনীয়তা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসন অনমনীয় নয়। জনগণের মতামত এবং পরামর্শ চাহিদার প্রতি এখানে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের নমনীয়তার কারণে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। সামাজিক প্রশাসন বিভিন্ন সমস্যা। পরিস্থিতি মোকাবিলার একটি উপায়। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক প্রশাসনকেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

৪. সমস্যার বিভক্তিকরণ : বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজেই সমস্যা বহুমুখী রূপ নিয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের সমস্যার ক্ষেত্রে বহুমুখিতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই সামাজিক-প্রশাসনে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যাগুলোকে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে চাহিদামাফিক সেবা প্রদান করা হয়। সমস্যার শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে সেবার ধরন নির্ধারিত হলে তা নিশ্চিত কল্যাণমুখী হয়।

৫. দ্বিমুখী যোগাযোগ : সামাজিক প্রশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর দ্বিমুখিতা সামাজিক প্রশাসন জনকল্যাণমুখী সেবা নিশ্চিত করার জন্য সেবাদানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সেবা গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। দ্বৈত যোগাযোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনে দ্বিমুখী যোগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও মূল্যবোধের জন্য বেশিরভাগ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে উদ্দেশ্য পূরণের সচেষ্ট থাকে।

৭. সমাজকর্ম বিষয়ক জ্ঞান : সামাজিক প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমাজকর্ম বিষয়ক জ্ঞান। এ জন্য বাংলাদেশে উপযুক্ত সমাজকর্মী সৃষ্টির জন্য শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮. বিকেন্দ্রীকরণ : বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসক ও কর্মীদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পদমর্যাদা অনুযায়ী সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকৃত হলে কর্মকর্তা ও কর্মীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৯. সমন্বয় : বাংলাদেশ সামাজিক প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এজেন্সির বিভিন্ন বিভাগ ও কাজের মধ্যে সমন্বয়। সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দ্রুত ও সহজভাবে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মরত বিভিন্ন এজেন্সির কাজের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে।

১০. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা : বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে। এসব সংস্থা সামাজিক প্রশাসনের সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করে যাচ্ছে। সামাজিক প্রশাসনের সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কার্যক্রম পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

১১. গবেষণা ও মূল্যায়ন : সমাজসেবা বিভাগের সেবামূলক কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য সদরদপ্তরের নীতিনির্ধারণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, সেমিনার প্রকাশনা ইত্যাদি রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ প্রশাসন তার সেবামূলক কার্যক্রম কোন স্তরে রয়েছে তা যাচাই করতে পারে এবং নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে সকলের অবগতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে আরও সচল করতে পারে। বাংলাদেশের সামাজিক প্রশাসনে গবেষণা ও মূল্যায়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে।

১২. প্রশাসনিক কাঠামো : বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসন কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব পর্যায়ে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের ইউনিট হিসেবে ধরে সমাজসেবা বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

১৩. নিয়ন্ত্রণ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনব্যবস্থায় নিম্নতম ইউনিট উর্ধ্বতন ইউনিটের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয় (কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে, সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান তার পৌঁছাতে সক্ষম।

১৪. আমলাতান্ত্রিক : বাংলাদেশে প্রশাসনের সর্বস্তরে আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য বিদ্যমান। সামাজিক প্রশাসনেও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মনীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক মতবাদের নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করা হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে অন্যান্য প্রশাসন থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র করেছে। যেমন– গণপ্রশাসন, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি হতে পৃথক সত্তা দান করেছে। সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের লোকদের সেবা দান করে সার্বিক কল্যাণসাধন করা। সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সুসংহত করার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন। তাই সামাজিক প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য জনহিতকর। এ কারণেই সামাজিক প্রশাসন সর্বজন বিদিত সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রশ্ন।৩। সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা দাও। সামাজিক প্রশাসনের উপাদানগুলো আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কী? সামাজিক প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসন কাকে বলে? সামাজিক প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য আলোচ্যবিষয় বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের পরিচয় দাও? সামাজিক প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনের ব্যাখ্যা দাও? সামাজিক প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর। ভূমিকা : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, শিল্পবিপ্লব, নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার সাথে সাথে বেড়ে চলছে প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদার পরিপূরণে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের। সামাজিক প্রশাসনের কতকগুলো মৌলিক উপাদান রয়েছে। এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সামাজিক প্রশাসন : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সমাজ জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করার সমষ্টিগত বা দলীয় প্রচেষ্টাই হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

D. Chowdhury বলেছেন, "Social work administration is a process by which apply professional competence to achieve certain goals. It is also called a process at transforming social policy into social action."

Russul H. Kurts এর মতে, "Social Administration is a process of transforming social policy into social services, involving the concomitant (সহগামী, আনুসঙ্গিক, সহবিদ্যমান) use of experience to modify policy or method."

Social Work Year Book এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Social welfare Administration is the process of transforming social policy into social services involving concomitant use of experience to modify policy or method."

মনীষী **Walter A. Friedlander** বলেছেন, "Social welfare administration is the process of organizing and directing of social agency." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। তাই এর মাধ্যমে মানব সমস্যা সমাধান ও তাদের প্রয়োজন পূরণে সামাজিক কার্য পরিচালনা করা হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংঘটিত ও পরিচালিত করার এমন এক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধন করে থাকে।

সামাজিক প্রশাসনের উপাদানসমূহ : সামাজিক প্রশাসনের মৌল উপাদানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. কর্মসূচি : সঠিক ও নির্ভুল পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়নের উপর সমাজকল্যাণের সাফল্য নির্ভরশীল। সামাজিক প্রশাসনের মুখ্য ও প্রধান দায়িত্ব হল জনসমষ্টির পরিবর্তনশীল চাহিদা ও মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম পেশার সাথে সামঞ্জস্যশীল কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিচালনা বাস্তবায়ন কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অগ্রাধিকার ও কর্মচারী সকলের প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব নিয়ে সমান অংশগ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. অর্থ বাজেট : কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে অর্থনৈতিক বিষয়াবলি যার উপর প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভরশীল। নির্ভুল ও সুষ্ঠু কর্মসূচি, পরিকল্পনা গ্রহণ ফাইন্যান্সের সঠিক ধারণা ছাড়া অসম্ভব। তাই উদ্দেশ্যের আলোকে এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থের উৎস, অর্থের যোগান ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

৩. কর্মচারী : এটি সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজেন্সির উদ্দেশ্য অর্জন ও সুষ্ঠু প্রশাসন নির্বাহ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে, সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। কর্মীদের উন্নয়ন এবং সন্তুষ্টি অর্জনে যথাযথ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪. দক্ষ সাংগঠনিক কাঠামো : বৃহত্তর ও বলিষ্ঠ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করা হয়, কে কার কাছে দায়ী থাকবে এবং কে, কাকে কিভাবে তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করবে। একই সাথে কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসও ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। 'Social Work Year Book' (1957 : 78–79) অনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামো থাকবে,

১. চূড়ান্ত প্রশাসক দল (কর্মকর্তা),
২. পরিচালনা পরিষদ,
৩. কর্মচারী,
৪. নির্বাহক/নির্বাহি কর্মকর্তা।

সমস্ত প্রশাসনিক অবকাঠামো যেন স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি দেওয়া এবং বিবেচনা করা আবশ্যক।

৫. সম্পত্তি ও সাজসরঞ্জাম : মনোরম এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে উপযুক্ত অফিসগৃহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি আসবাবপত্র, বিদ্যুৎ সংযোগ, অফিসিয়াল ফাইলপত্র ইত্যাদি এজেন্সির অত্যাবশ্যক উপাদান। এসব উপকরণ সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন।

৬. গবেষণা : গবেষণার জন্য সময়োপযোগী উদ্দেশ্য নির্ধারণ, সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এজেন্সি সেবার গুণগত ও সংখ্যাগত মানের অধিকতর উৎকর্ষ লাভের জন্য সামাজিক গেবষণা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বর্তমানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্মের মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

৭. জনসংযোগ : জনসংযোগ রক্ষা করাও সামাজিক প্রশাসনের অন্যতম উপাদান। এ উপাদানের মাধ্যমেই সমাজে সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংগঠন ও সহযোগিতাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভ করা যায়।

৮. পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া : এজেন্সির সামগ্রিক কার্যাবলি নির্ধারণ ও নির্বাহের জন্য প্রশাসনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়। সবসময় কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মূল্যায়ন প্রয়োজন। কর্ম বিভাজনের মাধ্যমে সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় এজেন্সি কার্যাবলি নির্বাহ করে।

৯. এজেন্সি : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে এজেন্সি। কারণ এজেন্সি আছে বলেই প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এজেন্সি না থাকলে প্রশাসনের কোন প্রয়োজনই থাকত না।

১০. সমাজকল্যাণ নীতি : সমাকল্যাণ নীতি সমাজকল্যাণ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ সমাজকল্যাণ প্রশাসন এ নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করার একটি প্রক্রিয়া। নীতি নির্ধারণ না থাকলে প্রশাসনের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া স্বাভাবিক।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজজীবনের ব্যাপ্তি ও চাহিদার পরিপূরণে প্রয়োজনের তাগিদে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণের উৎপত্তি। সামাজিক প্রশাসনের উপাদানসমূহ বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভক্ত। সামাজিক প্রশাসন এবং লোকপ্রশাসন উভয় পদ্ধতিই জনকল্যাণের স্বার্থে গৃহীত কর্মপদ্ধতি কিন্তু তবুও উভয়ের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি এক ও অভিন্ন।

প্রশ্ন।৪। **সামাজিক প্রশাসনের কার্যাবলি আলোচনা কর। সামাজিক প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি কাকে বলে? সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি কী কী? সামাজিক প্রশাসনের তাৎপর্য বর্ণনা কর।**

অথবা, **সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি কী কী? সামাজিক প্রশাসনের উপযোগিতা আলোচনা কর।।**

উত্তর৷ ভূমিকা : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, শিল্পবিপ্লব, নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার সাথে সাথে বেড়ে চলছে প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। আর সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং সামাজিক চাহিদার পরিপূরণে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রশাসনের। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় বাস্তবায়িত করার সমষ্টিগত বা দলীয় প্রচেষ্টাকে সামাজিক প্রশাসন বলে।

সামাজিক বা সমাজিক প্রশাসনের কার্যাবলি : সামাজিক প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : সমাজিক প্রশাসনের প্রধান কাজ হচ্ছে এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া নির্ধারণ কোন প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. পলিসি বা নীতি নির্ধারণ : এজেন্সির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা সমাজিক প্রশাসনের অন্যতম কাজ। যে কোন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলির সুষ্ঠ পরিচালনার নির্দেশিকা হচ্ছে নীতি।

৩. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো প্রদান : সংস্থার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ, কর্মচারীদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. পরিকল্পনা প্রণয়ন : সমাজকল্যাণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ সমাজিক প্রশাসনের মৌলিক কাজ।

৫. কর্মসূচি প্রণয়ন : কর্মসূচি হচ্ছে সমাজকল্যাণ নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাহন। সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি সচেতন থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। এজেন্সি প্রদত্ত সেবামূলক কার্যক্রমই হচ্ছে কর্মসূচি, সেগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

৬. বাজেট প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের অর্থব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাই বাজেট। বাজেটের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদের উৎস এবং ব্যয়ের খাত নির্ধারণ। সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পূর্ব নির্ধারিত রূপরেখাই বাজেট। এটি অন্যান্য প্রশাসনের ন্যায় সমাজিক প্রশাসনেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৭. কর্মচারী নিয়োগ : প্রশাসনের অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং সে সাথে প্রত্যেক কর্মচারীর কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া। কর্মচারীদের ছুটি, পদোন্নতি, বেতন, কাজের সময়কাল, বদলি, প্রশিক্ষণ, অবসর চাকরিচ্যুতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আবশ্যক।

৮. নির্দেশনা ও পরিচালনা : প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলির সুষ্ঠ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা সমাজিক প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তাদান বহুমুখী কার্যাবলির অপরিহার্য অঙ্গ।

৯. সমন্বয় সাধন : সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সময় এবং সম্পদের অপচয়রোধ করে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব। সমন্বয়ের গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতার জন্য একে সমাজিক প্রশাসনের মৌলিক কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য : সামাজিক সাম্য নিশ্চিতকরণে সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে :

১. সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ : স্থাল-কাল-পাত্র বিবেচনা করে সুচিন্তিত সেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হয় সামাজিক প্রশাসনে। এর ফলে জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবিত হয়। তাই বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণে সামাজিক প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ : গণতান্ত্রিক নীতিমালা ও মূল্যবোধ সকল দলীয় প্রচেষ্টাকেই সফল করে তোলে। সামাজিক প্রশাসনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিমালা দ্বারা দলীয়প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় বলে সুন্দরভাবে সমাজকসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. গণ অংশগ্রহণ : সামাজিক প্রশাসনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা থাকায় সেবা গ্রহীতাদের মতামত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। গণঅংশগ্রহণ যে কোন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং কোন মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি মৌলিক দিক। সামাজিক প্রশাসন জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪. সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন : সামাজিক প্রশাসনের সহায়তার মাধ্যমেই সামাজিক নীতিকে নির্দিষ্ট কর্মসূচির দ্বারা সমাজসেবায় রূপদান করা যায়। জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ ও জীবনধারার সাথে সঙ্গতি রেখে দলীয় প্রক্রিয়ার পূর্বপরিকল্পিত পরিবর্তন সূচনা করতে পারে।

৫. সমন্বয় সাধন : সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে বিভিন্ন সেবামূলক তৎপরতার সুশৃঙ্খল সম্পর্কবদ্ধতা আনয়নের দ্বৈততা ও অপচয় রোধ করা দরকার। সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বৈততা রোধ করা হয় এবং সম্পদের অপচয় রোধ করা হয়। সাথে সাথে আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করা সহজ হয়।

৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়তার মাধ্যমেই সামাজিক নীতিকে নির্দিষ্ট কর্মসূচির দ্বারা সমাজসেবায় রূপদান করা যায়। সমাজকল্যাণ প্রশাসন পরিকল্পনার সাথে জড়িত সকলকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে নিয়োজিত করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ হয়।

৭. সম্পদের সদ্ব্যবহার : সামাজিক প্রশাসন সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যথাযথভাবে পূরণে তৎপর হয়।

৮. সেবাদানে সক্ষম করে তোলা : সামাজিক প্রশাসন সমাজসেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের কাজের দক্ষতা কিভাবে বাড়ানো যায় এবং কিভাবে কর্মীদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করলে অধিক সেবা লাভ করা যায়, তার জন্য কাজ করে থাকে।

৯. পরিবর্তনশীল সমাজে কার্যকর সেবাকর্ম পরিচালনা : পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সঙ্গতি রেখে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের পরিবর্তন ও সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। সামাজিক প্রশাসন পরিস্থিতিতে সেবাকর্মকে কার্যকর ও ফলদায়ক করতে সামাজিক প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্টদের স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিভিন্ন প্রেরণামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে। সামাজিক প্রশাসন মানুষের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার এক অপরিহার্য মাধ্যম। সুতরাং, সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন।৫। **সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক প্রশাসন কিভাবে সমাজকর্মীকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে, তা আলোচনা কর।**

অথবা, **"সামাজিক প্রশাসন হল একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমাজকর্মী স্বীয় ভূমিকা পালনে সহযোগিতা পায়"– আলোচনা কর।**

অথবা, **"সামাজিক প্রশাসন হল একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মী স্বীয় দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা পায়"– আলোচনা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মানব জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কাঠামোর উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। আর প্রশাসন বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন, যার উৎপত্তি হয়েছে, সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যপরিচালনা থেকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষ্যে সামাজিক প্রশাসন ও স্বীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, যা সমাজকর্মীকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে।

সামাজিক প্রশাসন : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সামাজ জীবনের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের তাগিতে সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করার সমষ্টিগত বা দলীয় প্রচেষ্টাই হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন বা সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

D. Chowdhury বলেছেন, "Social work administration is a process by which apply professional competence to achieve certain goals. It is also called a process at transforming social policy into social action.

Russul H. Kurts এর মতে, "Social Administration is a process of transforming social policy into social services, involving the concomitant (সহগামী, আনুসঙ্গিক, সহবিদ্যমান) use of experience to modify policy or method."

John C. Kidneingh বলেছেন, "Social Welfare administration is the process of transforming social policy into social services and the use of experience in evaluating and modifying social policy." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হয়।

Social Work Year Book এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Social welfare Administration is the process of transforming social policy into social services involving concomitant use of experience to modify policy or method."

মনীষী **Walter A. Friedlander** বলেছেন, "Social welfare administration is the process of organizing and directing of social agency." অর্থাৎ, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। তাই এর মাধ্যমে মানব সমস্যা সমাধান ও তাদের প্রয়োজন পূরণে সামাজিক কার্য পরিচালনা করা হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংঘটিত ও পরিচালিত করার এমন এক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধন করে থাকে।

সমাজকর্মীর দায়িত্ব পালনে সামাজিক প্রশাসন : সামাজিক প্রশাসন মূলত সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণমূলক ধারণা থেকে এসেছে। সমাজের সার্বিক সহযোগিতা ও কার্যপরিচালনায় সামাজিক প্রশাসন পেশাগতভাবে সমাজকর্মীকে নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। নিম্নে এগুলা তুলে ধরা হল :

১. সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ : একটি সংগঠনের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে স্বীয় সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর। লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছাড়া কোন সংগঠন সফলতা অর্জন করতে পারে না। আর এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রশাসন বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। যেমন– সামাজিক প্রশাসন হল মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যা বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলে। এরূপ বাস্তবতা সমাজকর্মীকে অবহিত করে, যার মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বিশেষ করে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়ক হয়ে থাকে।

২. নীতিনির্ধারণ : বলা হয়, "Policy is the precursor of function." সুতরাং, নীতিনির্ধারণ যে কোন সংগঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ নীতির যথার্থতার উপর নির্ভর করে কার্যের গতিশীলতা ও সফলতার ব্যাপারটি। তবে নীতিনির্ধারণ যথার্থভাবে সম্পন্ন করা সহজ নয়। এ ব্যাপারে সমাজকর্মীকে বাস্তবক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে সামাজিক প্রশাসন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে। যেমন– বর্তমানে দারিদ্র্য সংক্রান্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে নীতিনির্ধারণে গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে প্রধান লাইনে আনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

৩. কর্মসূচি গ্রহণ : শুধু পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; এটাকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকরী কর্মসূচি প্রণয়ন করা। আর এ ব্যাপারে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক চাহিদা ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে কর্মসূচি প্রণয়নে সামাজিক প্রশাসন একজন সমাজকর্মীকে সহায়তা করে থাকে।

৪. দক্ষ সাংগঠনিক কাঠামো গঠন : সাংগঠনিক কাঠামো একটি সংগঠনের জন্য অপরিহার্য। কারণ এ কাঠামো ছাড়া সংগঠন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। আর দক্ষ ও সুউন্নত সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে সমাজকর্মিগণ সামাজিক প্রশাসনের শরণাপন্ন হন। সামাজিক প্রশাসন হল দক্ষ ও অভিজ্ঞ একটি সংগঠন, যারা তাদের অভিজ্ঞতার ও দক্ষতার আলোকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৫. অর্থব্যবস্থাপনা : "Finance is the heart of an organization." এটা অত্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত কথা। কারণ অর্থ ছাড়া পৃথিবীর কোন সংগঠন চলতে পারে না। আর যেখানে অর্থ সংক্রান্ত বিষয় জড়িত, সেখানে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা বেশি দেখা যায়। সুতরাং, সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্য অপরিহার্য। আর এ ব্যবস্থাপনায় সামাজিক প্রশাসন বাস্তবতার আলোকে এবং প্রয়োজনীয় Cost benefit analysis করে আর্থিক কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। যেমন– বর্তমানে বাংলাদেশে ষষ্ঠ পে-কমিশন গঠনে একটি বিশেষ কমিটির সহায়তায় এ অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে পে-কমিশন গঠন করা হয়েছে।

৬. কর্মী ব্যবস্থাপনা : সংগঠনের কার্যাবলির মান এবং সার্বিক কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে সংগঠনের কর্মী ব্যবস্থাপনার উপর। কর্মী ব্যবস্থাপনা যদি যথার্থ ও সংগঠন উপযোগী না হয় তবে সংগঠনের কার্যকারিতা অচল হয়ে যাবে। আর কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজটি মূলত করে থাকে সামাজিক প্রশাসকগণ যারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ কুশলীসম্পন্ন ব্যক্তি। যেমন– "স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন" এর কর্মী ব্যস্থাপনার কাঠামো গঠনে কমিটি গঠন করে মতামতের ভিত্তিতে এটা ফাইনাল করা হয়েছে।

৭. তত্ত্বাবধান : সামাজিক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান মূলত দীর্ঘমেয়াদি বলে তত্ত্বাবধান অত্যন্ত জরুরি। কারণ শুধুমাত্র দায়িত্ব বণ্টন করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, এর সঠিক তত্ত্বাবধান ছাড়া প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্তভাবে চলতে পারে না। আর এ তত্ত্বাবধানে সামাজিক প্রশাসন সমাজকর্মীকে সহায়তা করে থাকে।

৮. কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি : সংগঠনে কার্যসম্পাদনকারী কর্মীদের কাজের মধ্যে একঘেয়েমী আসতে পারে। তখন তাদের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি না করতে পারলে সফলতা অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। আর এজন্য বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, পদোন্নতি, স্থানান্তর, পদাবনতি, জরিমানা প্রভৃতি করা হয়। আর এ কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টিতে সামাজিক প্রশাসন সাহায্য করে থাকে।

৯. সমন্বয় সাধন : সমন্বয় সাধন একটি সংগঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সমন্বয় সাধন মূলত সংগঠনের অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক উভয় হতে পারে। অভ্যন্তরীণ কর্মচারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছাড়া সংগঠন তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে, বাহ্যিক সমন্বয় ছাড়া সংগঠন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। আর এক্ষেত্রে সামাজিক প্রশাসন সহায়তা করে থাকে তাদের দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে।

১০. **যোগাযোগ স্থাপন :** প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সার্বিক বিষয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক কর্মসূচি উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া হয়। সংগঠন যতই পরিকল্পনা প্রণয়ন করুক না কেন, যদি সঠিক যোগাযোগ না থাকে তবে অন্য সংগঠনের সাথে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগঠন ব্যর্থ হবে। আর সামাজিক প্রশাসন এ কার্যে সহায়তা করতে পারে।

১১. **জনসংযোগ স্থাপন :** জনসংযোগ স্থাপন বা Public Relation অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে সংগঠনের উৎপাদন অচল যদি না তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না পায়। আর জনগণের গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান হতে হবে সাথে সাথে দাম ও গুণগত মালের বিষয়টিও সহজ লভ্য হতে হবে। আর এসব দক্ষ কার্যক্রমে সামাজিক প্রশাসন সহায়তা করতে পারে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সামাজিক প্রশাসন হল সমাজকল্যাণের একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রক্রিয়া, যেখানে সমাজকর্মীকে পেশাগত কার্যক্রম পালনে সহায়তা করে থাকে। সমাজকর্মিগণ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনের সফলতা আনয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সামাজিক প্রশাসনকে আরও ফলপ্রসূ করতে হবে।

প্রশ্ন।৬। সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে কী বুঝায়? সমাজকর্মের একটি সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

অথবা, **সামাজকল্যাণ প্রশাসন কী? সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি হিসেবে সামাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব আলোচনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কাকে বলে। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপযোগিতা বর্ণনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যাণ প্রশাসন কী। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রয়োগযোগিতা বর্ণনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যাণ প্রশাসনের পরিচয় দাও। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের তাৎপর্য বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম স্বীকৃত। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, দর্শন, নীতি ও পদ্ধতি মানবকল্যাণে প্রয়োগ করেন। শিল্পবিপ্লবের পর সামাজিক সমস্যার জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করায় সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন প্রশাসন ছাড়া চলতে পারে না।

সমাজকল্যাণ প্রশাসন : সাধারণত সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে নির্দেশ করে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতি ও আইনের আলোকে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সমবেত কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকে। একে সমাজকর্ম প্রশাসন বা সামাজিক প্রশাসন নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকল্যাণ প্রশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

রাসেল এইচ. কার্ট এর মতে, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করার এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধন করা হয়।"

জন. সি. কিডনী এর মতে, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার এবং সামাজিক নীতির সংশোধন ও ফলাফল মূল্যায়নের বিশেষ প্রক্রিয়া।"

ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যান্ডার এর মতে, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়া।"

মোটকথা, সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় বা পরিচালনা করা হয় তাকেই সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তব রূপ লাভ করে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কৌশলই হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব : সমাজকল্যাণের সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **এজেন্সি পরিচালনা :** সমাজকল্যাণের যে কোন ধরনের কার্যক্রম ও কর্মসূচি সাধারণত কোন এজেন্সি বা সংগঠনের আওতায় পরিচালনা করা হয়। আধুনিককালে প্রশাসন ব্যতিরেকে কোন সংগঠনের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কারণ প্রশাসন ও সংগঠন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, তাদেরকে আলাদা করা মোটেও সম্ভব নয়। তারা উভয়েই যেন একই মুদ্রার দু'টি দিক।

২. **সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করা :** যে কোন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম মূলত সামাজিক নীতি ও সামাজিক আইনের আওতায় গৃহীত হয়। সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত সামাজিক নীতি ও আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং জনগণের কল্যাণ সাধন করাও সম্ভব নয়। সমাজকল্যাণ প্রশাসন মূলত এমন এক প্রক্রিয়া যা সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করে।

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রম : সংগঠন বা এজেন্সি পরিচালনার জন্য কতিপয় কাজ অপরিহার্য। যেমন– তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা ও সম্পদ বণ্টন, দায়িত্ব নির্ধারণ, কর্মচারী নিয়োগ, সমন্বয়, যোগাযোগ প্রভৃতি। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন। কারণ যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে সমাজকল্যাণ প্রশাসন উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

৪. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন : সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে উত্তম পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

৫. জনগণের অংশগ্রহণ : জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ সমাজকল্যাণ জনগণের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী নয়। এজন্য জনগণকে তাদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। সমাজকল্যাণ প্রশাসন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি : সমাজকল্যাণ প্রশাসন সুচিন্তিত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যাবতীয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করে। এটি প্রতিষ্ঠান সীমিত সম্পদ এবং সামর্থ্যের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

৭. গতিশীল ও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ : সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোকে মানুষের বহুমুখী সামাজিক সমস্যা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং নিয়ত পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পরিকল্পিত প্রক্রিয়া হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

৮. সম্পদের সদ্ব্যবহার : সমাজকল্যাণ সবসময় নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে সমস্যা মোকাবিলা করতে চায়। এজন্য সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সকল বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপচয়রোধ করে সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে।

৯. সমবেত কার্যক্রম গ্রহণ : আধুনিক সমাজকল্যাণ যে কোন ধরনের কল্যাণমূলক কাজে সমবেত কার্যক্রম গ্রহণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজের চাহিদা ও সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি সমবেত কার্যক্রম।

১০. মৌলিক পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগে সহায়তা করা : সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগে যেসব সাহায্যকারী পদ্ধতি সহায়তা করে সমাজকল্যাণ প্রশাসন তাদের মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হয়। সুশৃঙ্খল উপায়ে মৌলিক পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়িত হয় সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মাধ্যমে।

১১. জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন : সমাজকল্যাণ প্রশাসন সমাজের মানুষ ও তাদের কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। জনগণের কল্যাণ করতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে নীতি ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নেও কার্পণ্য করে না। সবার উপরে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উদ্ভাবন ও বিকাশ সাধন করা হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, আধুনিক সমাজকল্যাণে সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ড. ডি. পাল চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে যদি সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার ও প্রতিরোধের পরিবহণের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে সে পরিবহণের চাকার সাথে তুলনা করা যায়।

প্রশ্ন॥৭॥ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞা দাও। এর বিভিন্ন কার্যাবলি আলোচনা কর।

অথবা, **সমাজকল্যান প্রশাসন কাকে বলে? সমাজকল্যান প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যান প্রশাসন কী? সমাজকল্যান প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মসূচি বর্ণনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যান প্রশাসনের পরিচয় দাও? সমাজকল্যান প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি আলোচনা কর।**

অথবা, **সমাজকল্যান প্রশাসনের ব্যাখ্যা দাও? সমাজকল্যান প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকৌশল আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : নীতি হচ্ছে একটি বিবৃতি। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির মান উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ নীতিমালা বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনশীল হয়। এরূপ পরিবর্তন ও বিভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব নীতিগুলো সমাজকর্মের দর্শন, মূল্যবোধ এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

সমাজকল্যাণ প্রশাসন : সাধারণত সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে নির্দেশ করে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতি ও আইনের আলোকে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সমবেত কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকে। একে সমাজকর্ম প্রশাসন বা সামাজিক প্রশাসন নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকল্যাণ প্রশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

রাসেল এইচ. কার্ট এর মতে, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করার এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধন করা হয়।"

জন. সি. বিডনী এর মতে, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার এবং সামাজিক নীতির সংশোধন ও ফলাফল মূল্যায়নের বিশেষ প্রক্রিয়া।"

ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যান্ডার এর মতে, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়া।"

ড. ডি. পল চৌধুরীর ভাষায়, "সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও নীতি পূরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলির বাস্তবায়নে পেশাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।"

মোটকথা, সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় বা পরিচালনা করা হয় তাকেই সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তব রূপ লাভ করে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কৌশলই হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যাবলি : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের বহুমুখী কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রধান কাজ হচ্ছে এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া নির্ধারণ কোন প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. পলিসি বা নীতি নির্ধারণ : এজেন্সির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম কাজ। যে কোন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলির সুষ্ঠু পরিচালনার নির্দেশিকা হচ্ছে নীতি।

৩. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো প্রদান : সংস্থার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ, কর্মচারীদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. পরিকল্পনা প্রণয়ন : সমাজকল্যাণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মৌলিক কাজ।

৫. কর্মসূচি প্রণয়ন : কর্মসূচি হচ্ছে সমাজকল্যাণ নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাহন। সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি সচেতন থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। এজেন্সি প্রদত্ত সেবামূলক কার্যক্রমই হচ্ছে কর্মসূচি, সেগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

৬. বাজেট প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আয়ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাই বাজেট। বাজেটের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদের উৎস এবং ব্যয়ের খাত নির্ধারণ। সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পূর্ব নির্ধারিত রূপরেখাই বাজেট। এটি অন্যান্য প্রশাসনের ন্যায় সমাজকল্যাণ প্রশাসনেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৭. কর্মচারী নিয়োগ : প্রশাসনের অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং সে সাথে প্রত্যেক কর্মচারীর কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া। কর্মচারীদের ছুটি, পদোন্নতি, বেতন, কাজের সময়কাল, বদলি, প্রশিক্ষণ, অবসর চাকরিচ্যুতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আবশ্যক।

৮. নির্দেশনা ও পরিচালনা : প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলির সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তাদান বহুমুখী কার্যাবলির অপরিহার্য অঙ্গ।

৯. সমন্বয় সাধন : সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সময় এবং সম্পদের অপচয়রোধ করে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব। সমন্বয়ের গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতার জন্য একে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মৌলিক কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১০. তত্ত্বাবধান : সমাজকল্যাণ প্রশাসনে তত্ত্বাবধানকে একটি শিক্ষা প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা কর্মচারীদের দক্ষতা, জ্ঞান এবং কর্মনৈপুণ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। কর্মচারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং কার্যসম্পাদনের গুণগত মান উন্নয়নের প্রক্রিয়াই তত্ত্বাবধান।

১১. নিয়ন্ত্রণ : পূর্ব পরিকল্পিত ব্যয় ও সময়ে নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখার নামই নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়, সেবার মান ক্ষুণ্ন হয়, কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন ব্যাহত হয়। তাই নিয়ন্ত্রণ একটি প্রশাসনিক কাজ।

১২. যোগাযোগ : জনগণের সহযোগিতা বা সমর্থন ছাড়া কল্যাণমূলক কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এজন্য সুষ্ঠু ও কার্যকর যোগাযোগ বা জনসংযোগকে সমাজকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। মূলত সমাজকল্যাণ প্রশাসনের যাবতীয় কার্যাবলিই যোগাযোগভিত্তিক।

১৩. রেকর্ড সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ও তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। এগুলো প্রতিষ্ঠানের অতীত এবং ভবিষ্যৎ কার্যাবলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

১৪. প্রেষণা দান : সমাজকল্যাণে যাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বাস্তবায়িত হয় তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, মনোবল ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য প্রেষণামূলক কার্যাবলি প্রশাসনকে গ্রহণ করতে হয়। কারণ উপযুক্ত প্রেষণা বা কর্মোদ্দীপনা ছাড়া মানুষ কাজ করে না।

১৫. অর্থনৈতিক সম্পদ সরবরাহ : এজেন্সি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সম্পদ সরবরাহ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজেন্সি সম্পদের উৎস সাধারণত সরকারি সাহায্য, বেসরকারি চাঁদা ও দান, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তা প্রভৃতি।

১৬. সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা পূরণ : প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনার জন্য যা যা দরকার সবকিছু সরবরাহ করার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রয়োজনমতো সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব ও প্রশাসকদের পালন করতে হয়।

১৭. গবেষণা ও মূল্যায়ন : কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা জানার জন্য গবেষণা ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এর সাহায্যে সংগঠনের দুর্বল দিকগুলো দূরীভূত করার পথ প্রশস্ত হয়। তাছাড়া জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা অনুভূত প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য গবেষণার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যাবলি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কার্যাবলির যথাযথ ও কার্যকর সফলতার উপর সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে একে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন॥৮॥ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক কাঠামো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক কাঠামো আলোচনা কর। [জা. বি.-২০১১]

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক গঠনকাঠামো বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক গঠন আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদের দেশে কি ধরনের এবং কিভাবে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রধানত দু'ধরনের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :
   - ক. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি ও
   - খ. সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কার্যাবলি।

২. বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :
   - ক. দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ও
   - খ. আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক কাঠামো : আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন পররাষ্ট্র পরিকল্পনা, মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এসব সংস্থার নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিজস্ব প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসন স্ব স্ব মন্ত্রণালয় দ্বারা নির্ধারিত। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যত সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যাবলি অধিকাংশই সরাসরিভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেহেতু সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তর অনুসৃত প্রশাসন ব্যবস্থাকেই বুঝি।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আমরা প্রধানত চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি ঃ

১. কেন্দ্রীয় পর্যায়।
২. বিভাগীয় পর্যায়।
৩. জেলা পর্যায়।
৪. থানা পর্যায়।

১. কেন্দ্রীয় পর্যায় : সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক। তিনিই সমগ্র বাংলাদেশে পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যাবলি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছে তিনজন পরিচালক। যেমন– ক. পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), খ. পরিচালক (প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম) ও গ. পরিচালক (সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম)। পরিচালকদের সাহায্য করেন অতিরিক্ত পরিচালক। বেশ কয়েকজন উপপরিচালক অতিরিক্ত পরিচালকদের সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। আরও নিচে রয়েছেন অসংখ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাধারণত সমাজকল্যাণ নীতি কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট প্রণয়ন এবং কর্মসূচির মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২. **বিভাগীয় পর্যায় :** সমগ্র বাংলাদেশকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন ছয় বিভাগের ছয়জন সিনিয়র উপপরিচালক। দু'জন সহকারী পরিচালক এবং কয়েকজন সিনিয়র সমাজসেবা অফিসার উপপরিচালকের কাজে সহায়তা করে থাকেন। বিভাগের আওতাভুক্ত সকল জেলার সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সিনিয়র উপপরিচালক এবং তার সহযোগী কর্মকর্তারা করে থাকেন।

৩. **জেলা পর্যায় :** বাংলাদেশের সাবেক জেলা পর্যায়ে একজন উপপরিচালক প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজসেবা অফিসার উপপরিচালককে সহায়তা করেন।

৪. **থানা পর্যায় :** একজন সমাজসেবা অফিসার থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল দায়িত্বে রয়েছেন। বর্তমানে সারাদেশে ৫৩৭টি থানায় সমাজকল্যাণ কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে। একজন সুপারভাইজার, তিন জন ইউনিয়ন সমাজসেবা কর্মী এবং কিছু গ্রামীণ সমাজকর্মী থানা পর্যায়ে সহায়তা করেন।

গ্রামীণ পর্যায়ে রয়েছে একটি 'গ্রাম সমাজসেবা কমিটি'। এ কমিটির উদ্দেশ্য হল :

ক. গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

খ. গ্রামভিত্তিক সেবামূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

গ. স্বেচ্ছাভিত্তিক সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা।

গ্রাম কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

সভাপতি	১ জন।
সহসভাপতি	২ জন।
সম্পাদক	১ জন।
সহসম্পাদক	১ জন।
কোষাধ্যক্ষ	১ জন।

সংশ্লিষ্ট কর্মীসহ গ্রাম কমিটিতে সর্বাধিক ১১ জন সদস্য থাকবে।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বিভাগীয়, জেলা এবং থানা পর্যায়ে পৌঁছানো এবং বাস্তবায়নের জন্য কিংবা নিচ থেকে উপরে এবং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রশাসনিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে দু'ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যথা : ১. লিখিত প্রক্রিয়া ও ২. মৌখিক প্রক্রিয়া।

১. লিখিত প্রক্রিয়া : তথ্য, বুলেটিন, চিঠি, রিপোর্ট, অফিস নির্দেশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লিখিত প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

২. মৌখিক প্রক্রিয়া : আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ পরিদর্শন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন মৌখিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসনিক কাঠামো কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয়, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ পর্যায়ে বিস্তৃত। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রধান বিভিন্ন লোক হয়ে থাকেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পেশাদার এবং স্বেচ্ছামূলক উভয় ধরনের কর্মীর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্ন।৭। সমন্বয় বলতে কী বুঝ? সমন্বয় অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয়ের সংজ্ঞা দাও। সমন্বয় কিভাবে অর্জন করা যায় বর্ণনা কর।

অথবা, সমন্বয় সাধন কাকে বলে? প্রশাসনিক সংগঠনে সমন্বয় অর্জনের কী কী পন্থা রয়েছে আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয় সাধন কি? প্রশাসনিক সংগঠনে সমন্বয় কিভাবে অর্জন করা যায় আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দাও। সমন্বয় অর্জনের কৌশল আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয় ধারণাটি বিশ্লেষণ কর। সমন্বয় অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর।। ভূমিকা : সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য শ্রমবিভাগ ও কার্যের বণ্টন অপরিহার্য। কাজের বিভাগীয়করণ যত অধিক হবে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও তত বাড়বে এবং কাজের তদারকিকরণ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন তত বেশি হয়ে পড়বে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক। সেদিক থেকে সমন্বয় সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যখন দু'ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে একত্রিত করে তখনই সমন্বয় নীতির আবির্ভাব ঘটে।

সমন্বয় : সংগঠনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। নেতিবাচক অর্থে সমন্বয় প্রশাসনে দ্বন্দ্ব কোন কর্মের পুনরাবৃত্তি দূর করতে সাহায্য করে। ইতিবাচক অর্থে সমন্বয় সংগঠনের কর্মচারীর মধ্যে গোষ্ঠী ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করে। সমন্বয় একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যা কোন সংগঠনের সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাঠামোগত এবং যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমন্বয়কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাগুলো প্রদান করা হল :

Luther Gullick (লুথার গুলিক) এর মতে, "If division of work is inescapable co-ordination becomes mandatory." অর্থাৎ, শ্রমবিভাজন যদি অপরিহার্য হয় তাহলে সমন্বয় অবশ্যকরণীয়।

James D. Mooney (জেমস ডি. মুনে) বলেছেন, "Co-ordination is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose." অর্থাৎ, সমন্বয় হচ্ছে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে গোষ্ঠী কর্মপ্রচেষ্টার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

হেকলার হাডসন এর মতে, "কর্মের বিভিন্ন অংশগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে সমন্বয় বলে।"

অবশেষে বলা যায়, সমন্বয় হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সে পদক্ষেপ যা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির বিভিন্ন অংশকে একত্রীকরণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ কর্মসূচির পৃথক পৃথক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত ও সার্বিক লক্ষ্যার্জন করা হয়। তাই এসব লক্ষ্য ও দায়িত্বের মাঝে সমন্বয় একান্ত আবশ্যক।

সমন্বয় অর্জনের পদ্ধতি : প্রশাসনিক সংগঠনে সমন্বয় অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সমন্বয় অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। অকস্মাৎ কোন দৈব উপায়ে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। অধ্যবসায়, তেজ, বুদ্ধি এবং কৌশলের মাধ্যমেই কেবল প্রশাসনিক সংগঠনে সমন্বয় অর্জন করা যায়। সাধারণত দু'টি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সমন্বয় অর্জন করা যায়। যথা :

ক. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি এবং

খ. অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

নিম্নে উভয় পদ্ধতির আলোকে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

ক. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি : সংগঠনে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. পরিকল্পনা : প্রশাসনিক সংগঠনের অভ্যন্তরে সমন্বয় সাধনের এক উৎকৃষ্ট উপায় হল পরিকল্পনা। পরিকল্পনা বলতে নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাপ্তব্য সকল মানবিক, আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদকে সর্বাধিক মাত্রায় কাজে লাগানোর ব্যবস্থাকে বুঝায়। সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিট বা প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালন এবং কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সুচারুভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেই সমন্বয় সাধন সম্ভব। **অধ্যাপক নিউম্যান** বলেছেন, "The ideal time to bring about co-ordination is of course, at the planning stage ..... the plans developed by different individuals or divisions should be checked for consistency."

২. যোগাযোগ পদ্ধতি : প্রশাসনের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া সমন্বয় সাধন হবে না। লিখিত রিপোর্ট, নোটিশ, বিভিন্ন ওয়ার্কিং পেপার্স (Working Papers) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক যোগাযোগ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কে, কখন, কিভাবে কোন বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করে কার কাছে প্রেরণ করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হলে সংগঠনে স্বাভাবিকভাবেই সমন্বয় রক্ষা করা যায়। বস্তুত সুষ্ঠু প্রশাসনিক যোগাযোগ সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে।

৩. দৃঢ় সংগঠন : প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বিরোধ রোধ করার কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী দৃঢ় সংগঠন প্রশাসনিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে। ফলপ্রসূভাবে সমন্বয় সাধনের উপায়, সুদৃঢ় প্রশাসনিক সংগঠনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট হতে অধস্তন কর্মকর্তাদের উপর কর্তৃত্ব এবং আদেশ প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় অর্জন করা যায়। **Prof. L. D. White** বলেছেন যে, "An organization characterised by clear lines of authority, adequate powers, well understood allocation of functions absence of overlapping and duplication of effort and proper delegation of work in itself reduce the necessities of co-ordination." অর্থাৎ, যে সংগঠনে কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত রয়েছে, যার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, যেখানে কার্যাদি সুবোধ্য উপায়ে বণ্টন করা হয়েছে, সেখানে কর্ম প্রয়াসের দ্বিত্ব বা অধিক্রমন ঘটে না এবং যেখানে কাজ সঠিকভাবে অর্পণ করা হয়, সে সংগঠনে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সুষ্ঠু ও শক্তিশালী সংগঠনে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অতিমাত্রায় না থাকলেও একেবারে থাকবে না তা বলা যায় না। বর্তমান সমন্বয়ে প্রতিটি সংগঠনের প্রতিটি স্তরেই সমন্বয় সাধনের অপরিহার্যতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

৪. সাংগঠনিক কলাকৌশল : সংগঠনের সমন্বয় সাধন করার জন্য সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশল বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। প্রশাসকের বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটের মধ্যে অনেক সময় দ্বন্দ্ব ঘটে। এসব দ্বন্দ্ব বিরোধ আগে প্রধান নির্বাহিকর্তা মীমাংসা করতেন। কিন্তু অধুনা রাষ্ট্রের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এরূপ দ্বন্দ্ব বিরোধও পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়। কাজেই বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশল, যেমন- সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কমিটি, প্যানেল, আন্তবিভাগীয় অধিবেশন, স্টাফ ইউনিট, সমন্বয় অফিসার ইত্যাদির সাহায্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীগণ পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা যাবতীয় প্রশাসনিক সমস্যা ও মতভেদ দূরীকরণের চেষ্টা করেন।

৫. সংগঠনের উদ্দেশ্য : যখন সংগঠনের উদ্দেশ্যের প্রতি কর্মচারীদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকে, তখন তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। একতাবদ্ধ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় ইচ্ছুক ব্যক্তিবৃন্দ যে সংগঠনে নিয়োজিত, সেখানে সমন্বয় সাধন করা সহজতর, অন্যদিকে কর্মচারিগণ যদি কেবল তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হন, তাহলে সেখানে সমন্বয় সাধিত হতে পারে না। অতএব সংকীর্ণ স্বার্থকে পরিহার করে সংগঠনের বৃহত্তর লক্ষ্যকে যেন কর্মচারীবৃন্দ বেশি অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত হয় প্রশাসকদের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া।

৬. **সহজ-সরল প্রশাসনিক আইন :** সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য সহজ-সরল আইনের প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। কর্মচারীদের নিকট আইন ও নিয়মকানুন সহজেই বোধগম্য হওয়া উচিত। কর্মচারিগণ যদি সংগঠনের আইন ও নিয়মাবলি সহজে বুঝতে না পারেন, তাহলে সমন্বয় অর্জন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই সংগঠনের নিয়মনীতি এবং বিভিন্ন ধারাসমূহ সহজ ও বোধগম্য হলে কর্মচারিগণ তাতে দ্রুত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। এর ফলে সমন্বয় রক্ষা করা সহজতর হয়।

৭. **আঞ্চলিক পরিষদ :** দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক এলাকাসমূহে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সমন্বয় অর্জন করা যেতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় যেসব মাঠ পর্যায়ের সংগঠন রয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এ আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের সদস্যগণ পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান, তথ্যাদি সরবরাহ এবং কার্যসূচি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। এভাবে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়া সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। বস্তুত এ ধরনের আঞ্চলিক পরিষদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সমন্বয় অর্জন করা।

৮. **পরামর্শদানকারী সংস্থা :** পরামর্শদানকারী এজেন্সির মাধ্যমেও অতি সহজেই সমন্বয় অর্জন করা সম্ভব। সরকারের অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টাগণ, কর্মচারী বিষয়ক উপদেষ্টাগণ এবং সরকারের প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তার সাথে যেসব স্টাফ অফিসারগণ থাকেন, তাঁরা সর্বদাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শদানকারী এসব সংস্থা প্রশাসনে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. **আন্তঃবিভাগীয় কমিটি :** প্রশাসনিক সংগঠনের কার্যাবলি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু ও উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় তথা সরকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভাগগুলোর মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ দেখা যায়। তখন আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে অচলাবস্থা দূরীকরণের প্রচেষ্টা নেওয়া এবং সমন্বয় সাধিত হয়।

১০. **গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলির কেন্দ্রীভূতকরণ :** প্রশাসন ব্যবস্থায় গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলি বলতে বুঝায় পরিবহণ, খাদ্য, ডাক ও তার, গুদাম নির্মাণ, দালানকোঠা পরিষ্কারকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মুদ্রণ ও প্রতিলিপিকরণ, সাজসরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় ডাক সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ের সমস্যাবলি তদারক করা। আধুনিক অনেক রাষ্ট্রেই গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য পৃথক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অফিসের মাধ্যমে প্রশাসনে সমন্বয় রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করার দায়িত্ব মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

১১. **কার্যপদ্ধতি মানোন্নয়ন :** যেসব কার্যপদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক এবং পৌনঃপুনিক সেক্ষেত্রে এগুলোকে নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করা হয়। অফিস সংক্রান্ত বিধি, নিয়মাবলি এবং আদেশের মাননীকরণ করা হয়, নির্দিষ্ট মানের কার্যপদ্ধতি কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে।

১২. **অর্থ মন্ত্রণালয় :** অর্থ মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এ মন্ত্রণালয় একটি গ্রহণযোগ্য বাজেট তৈরি করে। বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমেই অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বিভাগীয় বিভিন্ন বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যও অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

১৩. **কনফারেন্স বা সভা :** সভার মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করা হয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করা হয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তব অসুবিধাগুলো দূর করা হয়। এরূপ সভার মাধ্যমে মতামতের বিনিময় করা হয় এবং এ মতামতের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়। সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। এরূপ সভা রাজনৈতিক, পেশাগত এবং আমলাতান্ত্রিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. **সহযোগিতার মনোভাব :** সহযোগিতা ও যোগাযোগ ছাড়া কার্যকরী সমন্বয় সম্ভব নয়। সংগঠনের বিভিন্ন একক বা কর্মচারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত পরিহার না করলে সংগঠন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। তাই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মচারীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশাসকের ব্যক্তিগত মনোভাব অধিক কার্যকরী।

১৫. **মতামতের মাধ্যমে সমন্বয় :** একটি বৃহৎ ও জটিল সংগঠনে সমন্বয়ের দায়িত্ব যদি কেবল সংগঠনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা কখনও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয় না। সংগঠনের বিভিন্ন অংশের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না। কেননা, মানুষ আবেগপ্রবণ ও চিন্তাশীল। তাদেরকে একটি প্রতিষ্ঠানে মেশিনের চাকার দাঁতের মত ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য প্রধান কার্যনির্বাহিকে আদেশ জ্ঞাপন করলে চলবে না তাকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠীগত এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে হবে। সংগঠনের কর্মসূচির সাথে তাদের স্বার্থকে চিহ্নিত করা হলে তারা সর্বস্ব নিয়োগ করে সংগঠনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

খ. অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি : উপরোল্লিখিত আনুষ্ঠানিক উপায়সমূহ ছাড়াও কতকগুলো অনানুষ্ঠানিক উপায়েও সমান কার্যকরভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্ববিরোধ মীমাংসার কার্যকর উপায় হিসাবে কাজ করে। কর্মকর্তাগণ তাদের আন্তবিভাগীয় দ্বন্দ্ব বিরোধ সম্পর্কে অবাধে মত বিনিময় ও খোলাখুলিভাবে নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করার ও আপসরক্ষার মনোভাব নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বিরোধের সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, খেলার মাঠ, লাইব্রেরী বা পাঠাগার, প্রীতিভোজ, পারিবারিক ও প্রতিবেশীগত সম্পর্ক তাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এরূপ যোগাযোগও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মতই সমান কার্যকর এবং আনুষ্ঠানিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে তা কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

Luther Gullick তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Papers on the science of administration" এ সংগঠনে সমন্বয় রক্ষার দু'টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

প্রথমত, সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ ভাগ করে দিয়ে ও তাদের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরোপ করে সংগঠনের উচ্চতর পর্যায় থেকে নিম্নতর পর্যায় পর্যন্ত আদেশ আদানপ্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, সমন্বয় ধারণার কর্তৃত্বের মাধ্যমে (By the dominance of idea) অর্জন করা যায়। অর্থাৎ সংগঠনে কর্মরত কর্মচারীদের মনে উদ্দেশ্যের ঐক্য (unity of purpose) গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রতিটি কর্মচারী স্বেচ্ছায় দক্ষতা ও উদ্দীপনার সাথে স্বীয় প্রচেষ্টাকে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার সাথে একাত্ম করে তোলে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আধুনিক বৃহৎ জটিল সাংগঠনিক ব্যবস্থায় সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এ সমন্বয় অর্জনে আলোচিত দু'পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলত এ দু'টি পদ্ধতি পরস্পর পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়। সংগঠনকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য এবং সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য উভয় পদ্ধতিই অপরিহার্য।

প্রশ্ন॥১০॥ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয়ের গুরুত্ব লেখ। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া আলোচনা কর। [জা. বি.-২০১২, ১৩]

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সমন্বয়ের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক প্রশাসনে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধর। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমন্বয় একটি অবিরাম ও জটিল প্রক্রিয়া, যা কোন সংগঠনের সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাঠামোগত এবং যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ, সমন্বয় হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সে পদক্ষেপ, যা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যার্জনের জন্য একটি দলের বিভিন্ন কার্যকে একটি সুনির্দিষ্ট বা সুবর্ণিত পথে পরিচালিত করে। তবে সমন্বয়ের প্রাণ হল যোগাযোগ। কেননা, সুষ্ঠু যোগাযোগ ছাড়া সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। অতএব, সমন্বয়ের অর্থই হল যোগাযোগের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয়ের গুরুত্ব : সমন্বয় ধারণাটি অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। বর্তমান যুগের প্রতিযোগিতা জটিল কর্মপ্রচেষ্টায় সমন্বয় ছাড়া সুষ্ঠু ফলাফল সম্ভব নয়। শুধুমাত্র কার্যক্রমের মধ্যেই নয়, চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা প্রণয়নেও সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা হল :

১. সুচিন্তিত পরিকল্পনা : আমাদের বাংলাদেশের সমস্যা অসীম। কিন্তু সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় সম্পদ বা সামর্থ্য এবং সম্পদ খুবই সীমিত। সীমাবদ্ধ সম্পদ দিয়েই বহুমুখী চাহিদা এবং সমস্যার সমাধান দিতে হয়। এজন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বহুমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে বিভাগগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ ও সহযোগিতার উপর। সমন্বয়ই একমাত্র সহযোগিতা ও যোগাযোগের নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম।

২. কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি রোধ : সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা মতের আদানপ্রদান না থাকলে কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এতে জনগণের সত্যিকার কল্যাণ তো হয়ই না, বরং কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ নষ্ট হয় এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

৩. সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে : সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগ, যেমন– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গণপূর্ত, কৃষি, মৎস্য প্রভৃতি বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টা এবং সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

৪. সময় এবং সম্পদের অপচয় রোধ : সময় ও সম্পদের অপচয় রোধকল্পে সমন্বয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের শহর এলাকায় বিদ্যুৎ, গ্যাস, ওয়াসা কিংবা টেলিফোন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। একই স্থানে কয়েকদিন পরপর বিভিন্ন বিভাগ রাস্তা খুঁড়ে কাজ করে। এতে শ্রম, সম্পদ, সময় সবকিছুর অপচয় ঘটে। প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের প্রভাব থাকলে তা ঘটত না। সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও অপচয় রোধকল্পে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৫. কার্যক্রমের ভুলত্রুটি সংশোধন : নিয়মিত সমন্বয় বা সংযোগের ফলে কার্যক্রমের ভুলত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়ে উঠে। তাছাড়া কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কতখানি কল্যাণ সাধিত হয় সে সম্পর্কে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সম্ভব হয়। প্রতিবন্ধকতা দূর করে কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতেও সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. **প্রশাসন পরিচালনায় :** সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রশাসনের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রশাসনের সফল বাস্তবায়নই কর্মসূচির সত্যিকার সুফল বয়ে আনতে সক্ষম। প্রশাসনিক সফলতা নির্ভর করে প্রশাসক, কর্মী এবং কর্মসূচির মধ্যে যথাযথ সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষার উপর।

যে সংস্থার প্রশাসক বা পরিচালক একনায়কতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করেন, অন্যান্য অধস্তন ব্যক্তির সহযোগিতা নেন না, সে সংস্থা কখনই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

সমন্বয় মানে নিজস্ব সত্তার বিলোপ নয়, বরং নিজের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও কর্মধারায় অবিচল থেকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি করা। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ বিশেষভাবে অপরিহার্য।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া : বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত কয়েকটি স্তরে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে। যেমন–

১. **জাতীয় পর্যায় :** জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত সমাজকল্যাণ কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন 'মহাপরিচালক'। উপপরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালকগণ মহাপরিচালকের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালনে তাঁকে সহায়তা করে থাকেন।

২. **বিভাগীয় পর্যায় :** সমাজকল্যাণ কার্যাবলির বিভাগীয় পর্যায়ে রয়েছেন বিভাগীয় উপপরিচালক। বিভাগীয় সমাজকল্যাণ কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনে তৎপর থাকেন বিভাগীয় উপ-পরিচালক।

৩. **জেলা পর্যায় :** সমাজকল্যাণ কার্যাবলির তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে জেলাভিত্তিক সমন্বয় প্রক্রিয়া। সহকারী পরিচালক জেলার অন্তর্গত সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করেন।

৪. **সর্বনিম্ন পর্যায় :** সর্বনিম্ন পর্যায় হল থানা। থানা পর্যায় থানা সমাজসেবা অফিসার এবং শহর এলাকায় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ সমন্বয়কারী হিসেবে যথাক্রমে গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ সমন্বয়কারী হিসেবে যথাক্রমে গ্রামীণ এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল গ্রামীণ দুস্থ, দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে লক্ষ্যভুক্ত জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থার। সমন্বয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে 'পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির গঠন প্রণালী নিম্নরূপ :

১. থানা প্রশাসন প্রধান (সভাপতি)।
২. থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা (সদস্য সচিব)।
৩. থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সদস্য)।
৪. থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সদস্য)।
৫. থানা মৎস্য কর্মকর্তা (সদস্য)।
৬. থানা পশুপালন কর্মকর্তা (সদস্য)।
৭. থানা প্রকৌশলি (সদস্য)।
৮. থানা কৃষি কর্মকর্তা (সদস্য)।
৯. থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (সদস্য)।
১০. থানা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলি (সদস্য)।
১১. ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর (ইভিওম) সদস্য।

এগুলো রয়েছে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিষদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে পরিচালিত সরকারি এবং বিশেষভাবে বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে Association of Development Agencies in Bangladesh– (ADAB).

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 'শিশু অধিকার ফোরাম' ও 'বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের কর্মতৎপরতা শিশু কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমাদের দেশে সাধারণত দু'ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. **মৌখিক :** মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা, যেমন– আলোচনা, সেমিনার, উর্ধ্বতনের সাথে অধস্তনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ইত্যাদি।

২. **লিখিত :** লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা, যেমন– তথ্য, রিপোর্ট, বুলেটিন, অফিস নির্দেশ, চিঠি ইত্যাদি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা কেবল সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দপ্তরের তালিকাভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত হতে দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা কিংবা সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি যথা : শিক্ষা, কৃষি, সমবায়, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদির মধ্যে কোন সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা আজও গড়ে উঠে নি। ফলে দেশের সম্পদ, শ্রম এবং সময়ের অপচয় হচ্ছে। সুতরাং, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন এবং বাস্তবধর্মী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক।

প্রশ্ন॥১১॥ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যাগুলো কি কি? সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করার উপায়গুলো আলোচনা কর। [জা. বি.-২০০৯]

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যাসমূহ বর্ণনা কর। ব্যাপক সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য তোমার সুপারিশ প্রদান কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে কি কি সমস্যা বিদ্যমান? সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করার উপায় আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা কর। এবং বিরাজমান সমস্যা দূর করার উপায় আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনের সমস্যা উল্লেখ পূর্বক এর সমাধানের পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা মূলত একটি দলীয় প্রচেষ্টা। কেননা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কোন এজেন্সির লক্ষ্যার্জনের জন্য নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন তথা বাস্তবায়ন করা হয়, যার সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, কমিটি বা উপকমিটি জড়িত থাকে। আর এসব ব্যক্তি, দল বা কমিটির কার্যের বিশ্লেষণ ও তাদের মধ্যে ভারসাম্য বা ঐক্য স্থাপনের প্রক্রিয়াটি হল সমন্বয় বা Co-ordination, যা শ্রমবিভাগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। অন্যকথায়, সমন্বয় হল একটি প্রক্রিয়া, যা সংগঠনের সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাঠামোগত এবং যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয় সাধনে সমস্যা : যে কোন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতার জন্য অদ্যাবধি আমাদের দেশে পরিচালিত বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কার্যাবলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠে নি। সমন্বয়ের অভাব কেবল বেসরকারি কর্মসূচিগুলোর মধ্যে কিংবা সরকারি বনাম বেসরকারি কর্মসূচির মধ্যেই নয়, বরং সরকারি কর্মসূচিগুলোর মধ্যেও দারুণভাবে বিদ্যমান। নিম্নে এর কিছু কারণ উল্লেখ করা হল :

১. কর্মসূচির স্থায়িত্বের অভাব : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারের পটপরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে কর্মসূচিগুলো বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। ফলে স্থায়িত্বের অভাব সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

২. অর্থাভাব : সমন্বয়ের জন্য প্রচুরসংখ্যক কর্মচারী এবং দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে আর্থিক বরাদ্দ কম। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হয় না।

৩. সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাব : সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলোতেও সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাব এত বেশি যে, সমধর্মী কর্মসূচি পরিচালনা করলেও সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না।

৪. সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব : যোগাযোগ সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে যোগাযোগের অভাবের কারণে একই এলাকায় সমধর্মী কর্মসূচি পরিচালনা করলেও সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় না।

৫. মনোভাবের অভাব : অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কর্মবিমুখতা, আমাদের দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধক। এজন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাছে সমন্বয় বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। এটাকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত মনে করে নির্লিপ্ত থাকে। বস্তুত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব এর অন্যতম কারণ।

৬. গবেষণার অভাব : সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রচুর গবেষণা করা প্রয়োজন। কিন্তু গবেষণা করার জন্য দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর অভাব রয়েছে। সর্বোপরি গবেষণার অভাবে সার্বিক সমন্বয় প্রক্রিয়া গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

৭. কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বল্পতা : বর্তমানে যে হারে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে আর্থিক ও অন্যান্য কারণে, সে অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং দক্ষ কর্মীর অভাবে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

৮. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অবস্থান : সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যনির্বাহি ব্যবস্থাপনা গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। এ প্রতিষ্ঠানটিও ভিন্ন এলাকায় পৃথক একটি বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন বিঘ্নিত হয়।

৯. সমঝোতার অভাব : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতার বদলে রেষারেষি, অসহযোগিতা, কোন্দল লেগে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে, এ ধরনের অবস্থাকে প্রতিযোগিতা বলে মনে হলেও এর ফল সম্পূর্ণ নেতিবাচক হতে দেখা যায়। ফলে সমন্বয়ের সুফল থেকে বঞ্চিত কর্মসূচির বিফলতা প্রকট হয়ে উঠে।

...সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান ...তা দূর করার উপায় : নিম্নোক্ত উপায়ে সমাজকল্যাণ ...য়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে সুষ্ঠু ...য় প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব।

১. সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া : সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনায় ...দের কর্মপ্রক্রিয়া নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় হওয়া উচিত। ...করে কর্মচারীরা স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে, সমন্বয় ...ও ত্বরান্বিত হবে।

২. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি : সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ...য়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ...র কর্মকর্তা কর্মচারীর মনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ...তনতা সৃষ্টি করা জরুরি। প্রতিষ্ঠানে যদি গণতান্ত্রিক ধারা ...থাকে তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে ...নেতৃত্বের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. সমন্বয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন : যে কোন প্রতিষ্ঠানের ...অর্জনের ক্ষেত্রে সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকল্যাণমূলক ...বলির মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে ...কল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের ...যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৪. সমঝোতা : বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর ...তন এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতার অভাব লক্ষিত হয়। ফলে সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা ব্যাহত ...। তাই কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার ...ভাব সৃষ্টি করা জরুরি।

৫. সুষ্ঠু যোগাযোগ প্রক্রিয়া গড়ে তোলা : সংগঠনের ভিতরে ...র ঊর্ধ্বতন থেকে অধস্তনের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ প্রক্রিয়া ...তুলতে হবে। তাহলে প্রতিবন্ধকতাগুলো সহজেই দূরীভূত ...এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলে সমন্বয় ব্যবস্থাও সহজতর ...।

৬. গবেষণা ও মূল্যায়ন : সমন্বয়ধর্মী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ...এলাকাভিত্তিক সমস্যা ও সম্পদ জনসাধারণের অনুভূত ...জন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা দরকার। গবেষণা ও মূল্যায়নের ...মে সে তথ্য নিশ্চিত করে কর্মসূচি প্রণয়নকালে অনায়াসে ...য় সাধন করা সম্ভব হবে।

৭. সুস্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি প্রণয়ন : সমন্বয়ের ...র্ত হল সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি প্রণয়ন। ...চারীদের কাছে কর্মসূচি যদি দুর্বোধ্য, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অস্পষ্ট ...তবে তাদের পক্ষে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে এবং সমন্বয় ...ন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সমন্বয় একটি জটিল ...য়া। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব এবং ...সনিক জটিলতা প্রতিনিয়ত জাতীয় কল্যাণে বিরাট অন্তরায় ...বে কাজ করছে। সুতরাং, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে সুষ্ঠু, ...চ্ছন্ন এবং বাস্তবধর্মী সমন্বয় সাধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ...শ্যক।

প্রশ্ন॥১২॥ সমন্বয় সাধন বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যাবলি কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হয় আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয়ের সংজ্ঞা দাও? বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যাবলি কিভাবে সমন্বয় সাধন করে আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদান কর? বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যাবলি কিভাবে সমন্বয় সাধন করে আলোচনা কর।

অথবা, সমন্বয়ের কী? সমন্বয় প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সমন্বয় বা সমন্বয় সাধন শব্দটির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে প্রশাসনিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। সমন্বয় সাধনের মূল কাজ হল লক্ষ্যার্জন প্রক্রিয়ায় তুলনামূলক সহজ এবং দ্রুত সম্পন্ন করা। আর তাই সমন্বয় সাধনের মূল (Relex) প্রতিফলন পড়ে Division of task. অর্থাৎ যার যে দায়িত্ব তাকে তা বন্টন করে সংগঠনের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করা। বর্তমানকালে যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন সকল ক্ষেত্রেই সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি।

সমন্বয়/সমন্বয় সাধন : সহজভাবে সমন্বয় সাধন বলতে বুঝায় কোন সংগঠনে তার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদানুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করে এক অংশের সাথে অপর অংশের কার্যকর সংযোগ স্থাপন। এ সমন্বয় সাধন শব্দটি বাংলায়, ইংরেজি শব্দ Coordination এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই দেখা যায় 'Oxford Advanced Learner's Dictionary (1996 : 257) তে Coordination এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Coordination is the ability to control one's movements properly."

Md. Alauddin & Md. Noorul Hossain তাঁদের 'Introduction to Social Work Method' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "সমন্বয় সাধন হল একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা শাখা অথবা ব্যক্তির কাজের আন্তঃসম্পর্কের প্রক্রিয়া।"

হারলিং বি ট্রেকার বলেছেন, "সমন্বয় জীবন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন সংস্থার সংজ্ঞা সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ অথবা শাখার কার্যাবলিকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করা হয়।"

বিভার বলেছেন, "সমন্বয় হচ্ছে কর্মের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির প্রক্রিয়া।"

ডেলটন ই. ম্যাককারল্যান্ড বলেছেন, "সমন্বয় সাধন এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে নির্বাহি তার অধীনস্থদের দলীয় প্রচেষ্টায় সুশৃঙ্খল ও নিয়মমাফিক কাঠামো সৃষ্টি করেন এবং কার্যক্রমের মধ্যে ঐক্য ও ভারসাম্য রক্ষা করেন।"

সুতরাং উক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, সমন্বয় সাধন হল কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিংবা কোন সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও যোগাযোগের মাধ্যমে/ভিত্তিতে কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা/গড়ে তোলা, যাতে করে কাঙ্ক্ষিত/বাঞ্ছিত লক্ষ্যার্জন প্রক্রিয়া দ্রুত এবং সহজতর হয়।

বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যাবলির সমন্বয় : বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রধান ভূমিকায় থাকে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এছাড়াও যুব উন্নয়ন ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ও এর সাথে সম্পৃক্ত। দেশে পরিচালিত সামগ্রিক সমাজসেবা কর্মসূচি আসলে কতকগুলো পর্যায়/স্তরের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়। স্তরসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. সমাজসেবা অধিদপ্তর : বাংলাদেশে পরিচালিত যাবতীয় সমাজসেবা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় সমন্বয় সাধন কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এখানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জাতীয় পর্যায়ের সব ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলির পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকেন। মহাপরিচালকের পাশাপাশি আবার অতিরিক্ত এবং উপ-পরিচালক রয়েছেন, যারা মহাপরিচালককে তার দায়িত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকেন এবং এসব অতিরিক্ত এবং উপ-পরিচালকমণ্ডলী বর্তমানে বিভাগীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলির প্রশাসন, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে চলছেন।

২. জেলা উপ-পরিচালকের অধিদপ্তর : বাংলাদেশে পরিচালিত সমাজসেবা কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের দ্বিতীয় স্তর হল এটি। এখানে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি জেলা সমাজসেবা উপ-পরিচালকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বয় সাধিত হয়। জেলা উপ-পরিচালকের অধিদপ্তর আসলে দেশের পুরানো ২১টি জেলাভিত্তিক পরিচালিত একটি সমন্বয় সাধনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা।

৩. থানা ও শহর সমাজসেবা পরিষদ : স্থানীয় পর্যায়ে থানাভিত্তিক পরিচালিত সমাজসেবা কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন থানা সমাজসেবা সমন্বয় পরিষদ এবং শহরে পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে শহর সমাজসেবা প্রকল্প পরিষদ। বর্তমান কালে স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের সমন্বয় সাধনের কার্যাবলির ক্ষেত্রে উক্ত পরিষদগুলোর চেয়ে সমাজসেবা কর্মকর্তাগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৪. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ : দেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি কার্যক্রমের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একই স্থানে পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যাবলির মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হ্রাসকরণ, কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি রোধকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমন্বয় সাধন করে থাকে। তবে বর্তমানে এ পরিষদের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এর কার্যকরিতা আরও বাড়ানোর দাবি রাখে।

৫. বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ : দেশে শিশুদের কল্যাণে গৃহীত যাবতীয় সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকে শিশুকল্যাণ পরিষদ। শিশুকল্যাণের জন্য গৃহীত নীতি, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা এগুলোর মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধন করে শিশুকল্যাণ পরিষদ।

৬. যুবকল্যাণ পরিষদ : দেশে যুবকদের জন্য প্রচলিত কল্যাণমূলক সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন। যুবকদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে তার সমন্বয় সাধনের কাজ করে থাকে যুবকল্যাণ পরিষদ।

৭. জাতীয় মহিলা পরিষদ : নারীকল্যাণমূলক যেসব কর্মসূচি দেশে প্রচলিত রয়েছে বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ের মধ্যে কর্মসূচির বৈচিত্র্য আনয়ন, সেবাদানের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি রোধকরণের মাধ্যমে জাতীয় মহিলা পরিষদ সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকে।

৮. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো : প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। এ ব্যুরোর মাধ্যমে বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন বেসরকারি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ্যাডার এবং Voluntary Health Service Society নামক দু'টি কর্তৃপক্ষ বেসরকারিভাবে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকে। আর দেশে পরিচালিত সকল NGO এর কার্যাবলি, ফান্ড সংগ্রহ, ফাণ্ড উত্তোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের সামগ্রিক কার্যক্রম NGO বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, যে কোন ধরনের কল্যাণমূলক কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই হয় কর্মবিশেষীকরণ। ফলে কাজের মধ্যে আসে শৃঙ্খলা ও গতি। বাংলাদেশ সমাজসেবামূলক কর্মসূচি/কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ব্যবস্থার ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বলতা লক্ষণীয়। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সমন্বয়ধর্মী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশে পরিচালিত এসব সমাজসেবা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য।

✖✖✖✖✖✖✖

সামাজিক নিরাপত্তা
Social Security

(ক) বিভাগ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. **Social security-র বাংলা অর্থ কী?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা।

২. **সামাজিক নিরাপত্তার ধারণার উদ্ভব হয়েছে কিসের উপর ভিত্তি করে?**
উত্তর : সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবমূল্য এ দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা উদ্ভব হয়েছে।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা মূলত কখন দেয়া হয়?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা মূলত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় দেয়া হয়।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তার সাধারণ লক্ষ্য কী?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তার সাধারণ লক্ষ্য হলো সামাজিকভাবে নাগরিকদের রক্ষা করা।

৫. **Encyclopaedia of Social Work এ সামাজিক নিরাপত্তায় কয়টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে?**
উত্তর : Encyclopaedia of Social Work এ সামাজিক নিরাপত্তার ৪টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে।

৬. **যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কয়টি কর্মসূচিকে বুঝায়?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা বলতে দুই ধরনের কর্মসূচিকে বুঝায়।

৭. **যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তার ২ ধরনের কর্মসূচি লিখ।**
উত্তর : ক. বয়স্ক উত্তরজীবী বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত এবং স্বাস্থ্য বিমায় নগদ অর্থ প্রদান ও খ. স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান।

৮. **সার্বজনীনভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কত প্রকার?**
উত্তর : সার্বজনীনভাবে সামাজিক নিরাপত্তা তিন প্রকার। যথা : ক. সামাজিক বিমা, খ. সামাজিক সাহায্য ও গ. সমাজসেবা।

৯. **সামাজিক নিরাপত্তা কিসের ফলশ্রুতি?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা মূলত শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি।

১০. **মাতৃত্বকল্যাণ আইন কত সালে প্রবর্তিত হয়?**
উত্তর : মাতৃত্বকল্যাণ আইন ১৯৩৯ সালে প্রবর্তিত হয়।

১১. **সামাজিক নিরাপত্তা মূলত কেমন?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা মূলত ত্রিমুখী।

১২. **কোন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যক্তিকে অবদান রাখতে হয়?**
উত্তর : সামাজিক বিমা কর্মসূচিতে ব্যক্তিকে অবদান রাখতে হয়ে।

১৩. **কোন নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে ব্যক্তির আইনগত অধিকারের স্বীকৃতি নেই।**
উত্তর : সামাজিক সাহায্য কর্মসূচিতে ব্যক্তির আইনগত অধিকারের স্বীকৃতি নেই।

১৪. **বাংলাদেশে বিদ্যমান দুইটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির নাম লিখ।**
উত্তর : বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক কর্মসূচি হলো : ক. মাতৃত্ব সুবিধা ও খ. চিকিৎসা সুবিধা।

১৫. **শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন কত সালে প্রবর্তিত হয়?**
উত্তর : শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ সালে প্রবর্তিত হয়।

১৬. **সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দাও।**
উত্তর : সমাজকর্ম অভিধানে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা সমাজ বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আয় সহায়তা দেয়ার এক বিধান, যাদের আয় আইনগতভাবে সংজ্ঞায়িত দুর্ঘটনা বা বিপদ যেমন বৃদ্ধ, অসুস্থ, তরুণ অথবা বেকার হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

১৭. **সামাজিক নিরাপত্তার প্রাথমিক কর্মসূচির নাম কী?**
উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তার প্রাথমিক কর্মসূচির নাম জনসেবা।

১৮. **সামাজিক বিমা ও সামাজিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য লিখ।**
উত্তর : সামাজিক বিমা ও সামাজিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য হলো সামাজিক বিমায় সেবাগ্রহীতার অবদান আবশ্যক কিন্তু সামাজিক সাহায্যে সেবাগ্রহীতার অবদান নেই।

(খ) বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দাও। [জা. বি.-২০১২]

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তা কী?

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে?

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক শিল্প সমাজে মানবকল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের সামাজিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ভাঙন, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা ও অন্যান্য পুরাতন সমস্যাগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে, তখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তার সূচনা করেন জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক ১৯৭৩ সালে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা : সমাজ পরিবেশে বিভিন্ন বিপদাপদ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা যেমন– বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ধক্য ইত্যাদি মানবজীবনে প্রতিনিয়ত বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রতিকূল সমাজ পরিবেশে এসব অবস্থা মোকাবিলায় ব্যক্তি সক্ষম হয়ে উঠে নি বলে রাষ্ট্রকে নিশ্চয়তাদানপূর্বক ও সেবাদানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।

নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদাপদ (সম্ভাব্য) থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা। এ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সমাজকর্মীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের সংজ্ঞা তুলে ধরা হল :

এ প্রসঙ্গে, **W. A. Friedlander** বলেছেন, "অসুস্থতা, বেকারত্ব, রোজগারি ব্যক্তির মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়স অথবা অক্ষমতা, নির্ভরশীলতা এবং দুর্ঘটনা ইত্যাদি অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পতিত হয়, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে।"

S. W. Beveridge এর মতে, "পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগে আয়ের পথ বন্ধ হলে আয়ের নিশ্চয়তা দান করার জন্য গৃহীত কর্মসূচি হল সামাজিক নিরাপত্তা। তিনি আরও বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া এবং যখন কেউ কাজ করতে অক্ষম তখন তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়াই হল সামাজিক নিরাপত্তার কাজ।"

সবশেষে বলা যায়, আধুনিক শিল্প সমাজে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেসব কর্মসূচিই হল সামাজিক নিরাপত্তা। যেমন- সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য ইত্যাদি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বিকাশ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া সমাজের সঠিক কল্যাণ সম্ভব নয়। তবে সমাজের সকল মানুষ ও তাদের জীবনের সকল দিক সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত হওয়ায় সমাজকল্যাণের পরিধি সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি অপেক্ষা ব্যাপক।

প্রশ্ন॥২॥ সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার উৎপত্তি আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক শিল্প সমাজে মানবকল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের সামাজিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ভাঙন, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা ও অন্যান্য পুরাতন সমস্যাগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে, তখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তার সূচনা করেন জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক ১৯৭৩ সালে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ : সামাজিক নিরাপত্তার জন্ম হয় জার্মানিতে। সম্রাট প্রথম উইলিয়াম ১৮৮১ সালে সামাজিক বীমা স্কীম চালু করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বাইরে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডকে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার পথিকৃত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। গত শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শুরুতে আমেরিকায় ভয়ানক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। (The Great depression of 1930) এ বিপর্যয়ে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়ে। জনজীবনে নেমে আসে চরম দুর্গতি। এ অবস্থায় বেকার, বৃদ্ধ, পঙ্গু এবং নির্ভরশীল বালকবালিকাদের জন্য ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাস হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. সামাজিক বীমা : এর মধ্যে রয়েছে – ক. কর্মহীনদের বেকার ভাতা, খ. চাকরিজীবীদের জন্য ভাতা, গ. পঙ্গু হয়ে পড়লে, বৃদ্ধ বয়সে চাকরি হতে অবসর, মারা গেলে পরিবারের (নির্ভরশীল) জন্য ভাতা।

২. সামাজিক সাহায্য : ক. অন্ধ খ. ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়স্ক পঙ্গু ব্যক্তি গ. ৬৫ বছরের উর্ধ্বে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং নির্ভরশীল সন্তানের (১৮ বছর কম বয়সী) জন্য ভাতা, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে সামাজিক সাহায্যের নাম বদলে সম্পূরক নিরাপত্তা আয় রাখা হয়।

৩. জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সেবা : ক. সকল নাগরিকদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ খ. অনাথ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য আশ্রম অথবা কোন ইচ্ছুক পরিবারে দক্ষ প্রদান করা।

ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে সামাজিক নিরাপত্তা নবায়ন শুরু হয়। এ নতুন বৈপ্লবিক ব্যবস্থার স্থপতি হলেন সার উইলিয়াম বিভারিজ তাঁর মতে,

ক. অভাব	Want
খ. অজ্ঞতা	Ignorance
গ. আলস্য	Idleness
ঘ. রোগব্যাধি	Disease
ঙ. মলিনতা	Squalor

এ পাঁচটি 'দৈত্য' সামাজিক নিরাপত্তার পথে হুমকিস্বরূপ এবং সরকারিভাবে এদের নির্মূল করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, "সামাজিক নিরাপত্তা হওয়া উচিত, ব্যক্তি যখন কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া এবং যখন সে অক্ষম তখন তার আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া।" এ মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তার রূপ রেখা হচ্ছে বিশ্বখ্যাত 'বিভারিজ রিপোর্ট'। এ রিপোর্ট ব্যাপক সামাজিক বীমা, 'সামাজিক বীমার আওতা বহির্ভূত লোকদের জন্য সামাজিক সাহায্য, শিশু ভাতা, সকল নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিসহ ব্যাপক কর্মসূচির সুপারিশ করা।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে (U.K.) যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে তা ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. পারিবারিক ভাতা; খ. জাতীয় বীমা; গ. সম্পূরক সুবিধা; ঘ. পারিবারিক আয় সম্পূরণ; ঙ. শিল্প দুর্ঘটনা বীমা; চ. যুদ্ধ ভাতা।

জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধীনে ইংল্যান্ডের প্রতিটি নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ ভোগ করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বিকাশ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া সমাজের সঠিক কল্যাণ সম্ভব নয়। তবে সমাজের সকল মানুষ ও তাদের জীবনের সকল দিক সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত হওয়ায় সমাজকল্যাণের পরিধি সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি অপেক্ষা ব্যাপক।

প্রশ্ন।৩। সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার ধরণ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক শিল্প সমাজে মানবকল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের সামাজিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ভাঙন, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা ও অন্যান্য পুরাতন সমস্যাগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে তখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তার সূচনা করেন জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক ১৯৭৩ সালে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ : প্রকৃতি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা :

১. সামাজিক বীমা ও
২. সামাজিক সাহায্য।

তবে বর্তমানে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে ধরা হয়। নিম্নে এ তিন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. সামাজিক বীমা : সামাজিক বীমা প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। সামাজিক বীমা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

ক. চাকরিজীবী বা (তার পরিবারের) আপৎকালীন সময়ের জন্য চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক দেয় চাঁদা গঠিত বীমা তহবিল। যথা : ভবিষ্যৎ তহবিল (Provident Fund), যৌথ বীমা (Group Insurance), কল্যাণ তহবিল (Benevolent Fund) প্রভৃতি।

খ. চাকরি জীবনে প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে পাওনা যেমন– অবসর ভাতা (Pension)।

গ. নাগরিক অধিকার হিসেবে পাওনা, যেমন– কর্মক্ষম বেকারদের জন্য বেকার ভাতা।

সামাজিক বীমার হার সুনির্দিষ্ট এবং বীমার অন্তর্ভুক্ত সকলেই তার সুবিধা পেয়ে থাকে। এটি প্রাপকের আইনগত অধিকার। ইচ্ছে করলেই এ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। সামাজিক বীমা ব্যবস্থার দুর্বল দিক হচ্ছে যে, এটি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। ফলে দেশের অধিকাংশ লোক এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

২. সামাজিক সাহায্য : সামাজিক সাহায্য প্রাচীনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সংকট মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িক সহায়তাই সামাজিক সাহায্য (Social Assistance)। প্রধানত দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সামাজিক সাহায্যের আওতাভুক্ত উল্লেখিত সমস্যা ছাড়াও স্বাভাবিক কারণে সামাজিক সাহায্য করা হয়ে থাকে। সামাজিক বীমার ন্যায় এতে কারও আইনগত অধিকার নেই, সামাজিক সাহায্যের উদাহরণ হল :

ক. সরকারি ত্রাণ কর্মসূচি খ. লঙ্গরখানা গ. যাকাত ঘ. ফিতরা ইত্যাদি।

৩. সমাজসেবা : সমাজের মানুষের সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ, বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানে পুনর্বাসনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত সুদূরপ্রসারী সেবা কর্মসূচি এর আওতাভুক্ত। যেমন–

১. শিক্ষা (Education), স্বাস্থ্য (Health), শিশু কল্যাণ;
২. যুব কল্যাণ (Youth Welfare);
৩. নারী কল্যাণ (Women Welfare);
৪. চিকিৎসামূলক কর্মসূচি (Medical Service);
৫. সংশোধনমূলক কর্মসূচি (Rectification Service)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা 'সামাজিক নিরাপত্তা কনভেনশন' ১৯৫২ সনে নিরাপত্তার যে উপাদানসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে সেগুলো হল :

১. চিকিৎসা সুবিধা,
২. মাতৃত্ব কল্যাণ,
৩. অসুস্থ ভাতা,
৪. বার্ধক্য ভাতা,
৫. অক্ষমদের জন্য ভাতা,
৬. চাকরিকালীন দুর্ঘটনা ভাতা,
৭. উত্তরজীবীদের জন্য ভাতা,
৮. পারিবারিক ভাতা ও
৯. বেকার ভাতা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সব সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ মানুষ নিজের সম্পদ সামর্থ্য, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার দ্বারা মোকাবিলা করতে পারে না। যেসব দুর্যোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যে ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে। সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হল সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণ করে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখতে সাহায্য করা।

প্রশ্ন॥৪॥ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো আলোচনা কর।

অথবা, **আমাদের দেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমগুলো বর্ণনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশল বর্ণনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মপদ্ধতি আলোচনা কর।**

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশে অতীতকাল থেকেই সনাতন ধারায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে। সনাতন রীতিতে যেসব কার্যক্রম প্রচলিত তার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা, যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগত কার্যক্রম, বন্যা কবলিত বিপর্যস্ত মানুষের নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। বর্তমানে শিল্পায়ন, শহরায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপগত নিষ্ক্রিয়তা ও সনাতন ধারার সামাজিক নিরাপত্তা অপর্যাপ্ত ও কার্যহীন হয়ে পড়েছে। শিল্পবিপ্লব ও প্রতিযোগিতার পাশাপাশি মানবকল্যাণে জন্ম নেয় আধুনিক ব্যাপক ভিত্তিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।

১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ও মাতৃকল্যাণ আইন প্রবর্তনে শ্রমিকদের কল্যাণে কতিপয় সুবিধাদানের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতাক্রমে শ্রমকল্যাণে সংযোজিত হয় মাতৃত্ব সেবা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, যৌথ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, কল্যাণ তহবিল সহ বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ :

ক. সামাজিক বীমা কর্মসূচি : ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এর সুপারিশ ক্রমে কর্মচারীদের কল্যাণে কর্মচারী সামাজিক বীমা ব্যবস্থা চালুর আইন অনুমোদন করে। এর আইনানুযায়ী অসুস্থতা সুবিধা, মাতৃত্ব সুবিধা, কর্মচারী দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি সুবিধা ইত্যাদি দেওয়ার বিধান চালু হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যেসব কর্মসূচি বীমা কর্মসূচির আওতাভুক্ত তা নিম্নে আলোচিত হল :

১. ভবিষ্যৎ তহবিল কর্মসূচি বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কর্মসূচি : ১৯২৩ সালের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এই কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এই কর্মসূচিতে সরকারি কর্মচারীরা বাধ্যতামূলকভাবে তাদের মাসিক বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা প্রদান করে। এই জমাকৃত টাকা অবসরকালীন সময়ে বিধি অনুযায়ী কর্মচারী পেয়ে থাকেন। এই তহবিল হতে কর্মচারীরা আর্থিক বিপর্যয়কালীন ঋণও গ্রহণ করতে পারেন। বেসরকারি পর্যায়ে তা পেনসনের সাথে সংযুক্ত করে কিংবা কর্মচারীরা চাঁদার দ্বিগুণ হারে অবসর গ্রহণকালে প্রদান করা হয়।

২. যৌথ বীমা গ্রহণ বা গ্রুপ ইনসুরেন্স কর্মসূচি : ১৯৬৯ সালে সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণে গ্রুপ ইনসুরেন্স কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এই কর্মসূচিতে কর্মচারীরা দলগতভাবে গ্রুপফাণ্ডে চাঁদা প্রদান করে এবং কর্মকালীন সময়ে যদি কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করে তবে তার পরিবার এর দ্বিগুণ অর্থ লাভ করে।

৩. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ : ১৯২৩ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় কর্মরত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা মৃত্যু বা কর্মক্ষমতা লোপ পেলে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরে ১৯৫৭ ও ১৯৮০ সালে উক্ত আইনের সংশোধন করা হয়। বর্তমানে এ আইনে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকের দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু, পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা লোপের ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

৪. মাতৃত্ব সুবিধা : মাতৃকল্যাণ সুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন, ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃকল্যাণ (চা বাগান) আইন ও সরকারি কর্মচারী মাতৃত্ব সুবিধা চালু রয়েছে। এ আইনের (বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ-১৯৩৯) আওতায় কর্মজীবী মহিলারা সন্তান জন্মের পূর্বে ছয় সপ্তাহ ও পরে ছয় সপ্তাহ বেতনসহ ছুটি ও আর্থিক সুবিধা লাভ করে। চা বাগান আইন শুধুমাত্র চা বাগান ও চা উৎপাদন কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আইনে সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে প্রসবকালীন ভাতা ও প্রসবকালে মৃত্যুতে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এই আইনে সরকারি মহিলা কর্মচারীরা মাতৃত্ব সুবিধা হিসেবে পূর্ণ বেতনসহ সর্বোচ্চ তিন মাস মাতৃত্ব সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৫. অবসরকালীন ভাতা বা পেনশন : চাকরির বয়সসীমা অতিক্রম করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নির্দিষ্ট হারে অবশিষ্ট জীবন পেনশন ভাতা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চাকরি করার পর স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করা যায়। সাধারণত অবসর গ্রহণ করার সময় কর্মচারীগণ যে মাসিক বেতন পেতেন, অবসর গ্রহণ করার পর থেকে পেনশন বা ভাতা হিসেবে সে মাসিক বেতনের অর্ধেক পেতে থাকেন। মাসিক পেনশনের টাকার চারভাগের একভাগ পর্যন্ত পেনশনভোগী কর্মচারী প্রতি টাকার পেনশন ছাড়ার জন্য ১২৫ টাকা হারে এককালীন সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন।

৬. কল্যাণ তহবিল : ১৯৬৮ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের এ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইনানুযায়ী সরকারি কর্মচারীরাও চাকরিকালীন সময়ে নির্দিষ্ট হারে তহবিলে অর্থ জমা দেয় এবং অবসর কালে তাদের পরিবারকে এক ধরনের অনুদান হিসেবে সাহায্য দান করা হয়।

উপসংহার : আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হল সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখতে সাহায্য করা। বাংলাদেশে অতীতকাল থেকেই সনাতন ধারায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বর্তমান এবং তা বর্তমানে আধুনিক রূপ ধারণ করেছে।

প্রশ্ন॥৫॥ বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার উপযোগিতা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার সামাজিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বস্তুত শিল্প কলকারখানায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক যাদের একটা অংশ প্রতি বছরই দেখা যায় কোন না কোন যান্ত্রিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এমতাবস্থায় তারা তাদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এরূপ একটি পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে সরকার বা মালিক পক্ষ কর্তৃক আর্থসামাজিক সহায়তামূলক উদ্যোগ বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে যা সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব :

১. দারিদ্র্য দূরীকরণ : দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। এদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ জনসাধারণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। যারা দৈনন্দিন ২১০০ কিলো ক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণ করে। দারিদ্র্য নিজে যেমন একটি সমস্যা তেমনি আরও অনেক সমস্যার জন্মদাতাও, আবার দরিদ্র বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার পর্যায়ক্রমে বেড়েই চলছে। দেশের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

২. বেকারত্ব দূরীকরণ : আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি, যার মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রায় ৬.৫ কোটি। এ কর্মক্ষম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ১.৫-২ কোটি বেকার। তারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। ফলে দেখা যায় তারা বাস্তবজীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবন সম্পর্কে তারা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই এই বেকার জনগোষ্ঠীকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য

সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বেকার ভাতা প্রবর্তন করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন করা যায়।

৩. স্বাস্থ্য নিশ্চয়তা : আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সেবার চিত্র অত্যন্ত করুণ। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের দেশের প্রতি ৫০ জন রোগীর জন্য একটি হাসপাতাল বেড, প্রতি ৪৫০ জন রোগীর জন্য একজন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার এবং প্রতি ১২০০ রোগীর জন্য ১ জন নার্স আছে। তাছাড়া এদেশে শহরের তুলনায় গ্রামের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা আরও বেশি দুর্বল। গ্রামের লোকজন নানা ধরনের রোগ-শোক ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই দেশে বিদ্যমান এ দুর্বল চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

৪. প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটা অংশ হল প্রতিবন্ধী। গবেষণায় দেখা গেছে এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ। এসব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, হাত-পা প্রতিবন্ধী এবং মানসিক প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীদেরকে আমাদের দেশে পরিবার ও সমাজে একটি বাড়তি বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সমাজে এদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আবশ্যকতা রয়েছে।

৫. এতিম ও অসহায় শিশুদের নিরাপত্তা : এতিম শিশু যাদের পিতামাতা বেঁচে নেই, যাদের প্রতিপালনের জন্য তাদের আপনজন বলে কেউ নেই, এসব শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমেই এদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য প্রয়োজন ও সুযোগ সুবিধা পূরণ করা সম্ভব হবে। এরা দেশ ও জাতির যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

৬. দুস্থ অসহায় নারীদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশে যৌতুক, তালাক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহজনিত বহুবিধ সামাজিক কুপ্রথা বিদ্যমান এবং এসব কুপ্রথার নেতিবাচক ফলাফলটা প্রধানত নারীসমাজের উপরই বর্তায়। অথচ নারীরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার বা ন্যায়বিচার পায় না। তাই দেশের নারীসমাজ বিশেষ করে দুস্থ ও অসহায় নারীদের জন্য একটি নিরাপত্তাপূর্ণ Environment সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তার যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

৭. প্রবীনদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশে প্রবীনদের সমস্যাকে খুব একটা প্রাধান্য দেওয়া হয় না। কিন্তু একটা বিষয় এখানে স্মরণযোগ্য যে আজকে যারা প্রবীন একসময় তারাও কর্মক্ষম ছিল। পরিবার, দেশ ও জাতির জন্য তারা অনেক কিছু করেছেন। আজ বয়সের ভারে তারা আক্রান্ত। কিন্তু তাদেরও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মত কতকগুলো চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স্ক ভাতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, আধুনিক বিশ্বে বিশেষ করে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান হল সামাজিক নিরাপত্তা। দেখা যায় বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশেই কমবেশি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা হল এক ধরনের Reinforcement বা বলবর্ধক। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যা তাকে আরও বেশি কর্মমুখী করে তোলে। আর বাংলাদেশের মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব বা ভূমিকা যে অনস্বীকার্য তা উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন।৬। **বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদারকরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদারকরণে কী কী কৌশলগ্রহণ করা দরকার আলোচনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদারকরণে কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার আলোচনা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার সামাজিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বস্তুত শিল্প কলকারখানায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক যাদের একটা অংশ প্রতি বছরই দেখা যায় কোন না কোন যান্ত্রিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এমতাবস্থায় তারা তাদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এরূপ একটি পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে সরকার বা মালিক পক্ষ কর্তৃক আর্থসামাজিক সহায়তামূলক উদ্যোগ বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে যা সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদারকরণে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ : বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় দুর্বল। দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা তুলে ধরা হল :

১. বেকার ভাতা প্রচলন : আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। যার মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রায় ৬.৫ কোটি। এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার ১.৫–২ কোটি বেকার। তারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। ফলে দেখা যায় তারা বাস্তবজীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবন সম্পর্কে তারা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এ বেকার জনগোষ্ঠীকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে বেকার ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২. প্রতিবন্ধীকল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ : আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটা অংশ হল প্রতিবন্ধী। গবেষণায় দেখা গেছে এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ। এসব প্রতিবন্ধী আবার দুই ধরনের। ১. শারীরিক প্রতিবন্ধী (যেমন– দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক, হাত, পা প্রতিবন্ধী), ২. মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধীদের বাড়তি ঝামেলা হিসেবে দেখা হয়। এরা তুলনামূলকভাবে বেশি অযত্ন ও অবহেলার শিকার হয়। অথচ এদের জন্য দরকার বিশেষ ধরনের সেবা-যত্নের। তাই আমাদের দেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা যায়।

৩. শ্রমিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকরণ : আমাদের দেশে শিল্প কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের একটা অংশ প্রতিবছরই বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়। একই ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয় পরিবহণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকরাও। দুর্ঘটনায় পতিত এসব শ্রমিকরা দেখা যায় কখনও তাদের হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে ফেলে। ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে তাদের কর্মক্ষমতা লোপ পায়। এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য দেশে আইন রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় সরকারি পর্যায়ে যদিও এ আইনের আওতায় শ্রমিকদের কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও বেসরকারি পর্যায়ে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। তাই সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ দান চালু করতে হবে।

৪. মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা দান : বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য এদেশে সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালে মাতৃত্বকল্যাণ আইন প্রবর্তন করা হয়। উক্ত আইনে সন্তানপ্রসবকালীন সময়ে একশ মহিলা শ্রমিককে ছুটি প্রদানজনিত কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে মহিলা শ্রমিকদের জন্য ৩ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে এ ছুটি ৪ মাসে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে দেখা যায় অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নারী/ মহিলা শ্রমিকদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করে না। তাই সর্বস্তরে নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রাপ্তিতে কার্যকরী সহায়তা দানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি জোরদারকরণ সম্ভব।

৫. এতিম ও অসহায় শিশুদের নিরাপত্তা জোরদারকরণ : এতিম ও অসহায় শিশু যাদের পিতামাতা বেঁচে নেই, যারা অসহায়, দুস্থ আপনজন বলতে এ জগতে যাদের কেউ নেই এসব শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা এদের সুস্থ, সুন্দর এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার জন্য তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজনগুলো পূরণ হওয়া দরকার। এসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তারা দেশ ও জাতির যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে। তাই তাদের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণজনিত নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

৬. অবসরকালীন ভাতা (পেনশন) কর্মসূচি সম্প্রসারণ : একজন শ্রমিক বা চাকরিজীবী দেখা যায় তার চাকরিক্ষেত্রে জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়গুলো ব্যয় করে। প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করতে করতে একসময়ে সে বার্ধ্যকে উপনীত হয়। তার কর্মক্ষমতা লোপ পায়। চাকরি থেকে তাকে অবসর নিতে হয়। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য এসময়েও তার কতকগুলো চাহিদা ও প্রয়োজন থাকে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক বা চাকরিজীবী তার চাহিদা ক্ষতিপূরণ করার জন্য অবসরকালীন ভাতা পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক/চাকরিজীবীরা এ সুবিধা লাভ করে থাকেন। আধাসরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও চাকরিজীবীরা অবসরকালীন ভাতা বা পেনশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে সর্বস্তরে অবসরকালীন ভাতাজনিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যাপক প্রচলন দরকার।

৭. ব্যাপক সামাজিক সাহায্য কর্মসূচি : আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন– বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, জলোচ্ছ্বাস, শিলাবৃষ্টি নদীভাঙন, মঙ্গা ইত্যাদি হানা দেয়। আকস্মিকভাবে সৃষ্টি এবং ঘটিত এসব দুর্যোগে মানুষ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। তাদের খেতের ফসল নষ্ট হয়; গাছপালা ভেঙে যায়, মরে যায়, গবাদি পশুপাখি মারা যায়। ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে রোগগ্রস্ততা বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় দেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি জোরদারকরণ কৌশল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সাহায্য; যেমন– ত্রাণ, অনুদান, ঔষধপত্র সরবরাহ, বাসস্থান নির্মাণ সহায়তা ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

৮. পর্যাপ্ত বয়স্ক ভাতা প্রদান কর্মসূচি : আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২–৩ কোটি লোক হল বয়স্ক। দেশে বয়স্কদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে প্রতি মাসে তাদের ১০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেখা যায় বয়স্কদের চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় এ ভাতার পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। আর সময়ের পরিবর্তনে দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে প্রচলিত ভাতা বৃদ্ধদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই এদেশে বৃদ্ধদের/বয়স্কদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, আধুনিক বিশ্বে বিশেষ করে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (Welfare State System) একটি অপরিহার্য উপাদান হল সামাজিক নিরাপত্তা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় কমবেশি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে দুর্বলকে সবল, রুগ্নকে সুস্থ, ভীতু/ভীরুকে সাহস, আশাহীনকে আশা, অক্ষমকে সক্ষম, প্রতিকূলকে অনুকূলে আনয়ন সম্ভব। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা হল এক ধরনের শক্তি, একধরনের Reinforcement । তাই আমরা বলতে চাই আমাদের দেশে বিরাজমান বহুবিধ আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধান কল্পে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণ করা দরকার। সেজন্য আলোচ্য সুপারিশমালা বা নির্দেশনাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন॥৭॥ সামাজিক বিমা বলতে কী বুঝ?

অথবা, সামাজিক বিমা কাকে বলে?

অথবা, সামাজিক বিমা কী?

উত্তর॥ ভূমিকা : শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব হয়। এটি বর্তমানে সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক সমাজে সমস্যার জটিলতা ও বহুমুখিতার কারণে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা সার্বিকভাবে ৩ প্রকার। সামাজিক বিমা তার মধ্যে একটি। কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তাদের জন্য সামাজিক বিমা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা।

সামাজিক বিমা : সাধারণ ভাষায় সামাজিক বিমা বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বুঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি তার স্বীয় ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়ে শর্তসাপেক্ষে নিজেকে ও তার পরিবারকে ভবিষ্যৎ আর্থিক বিপর্যয়ের হতে থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বিমা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "সামাজিক বিমা হলো সংবিধিবদ্ধ শর্তাধীন ঝুঁকি। যেমন– বৃদ্ধ বয়স, অক্ষমতা, উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু, বেকারত্ব, পেশা বা সংশ্লিষ্ট আঘাত এবং রোগের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সংরক্ষণের সরকারি কর্মসূচি।" যেমন– শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, যৌথ বিমা প্রভৃতি।

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English এ লেখা হয়েছে, "সামাজিক বিমা এমন এক পদ্ধতি যাতে মানুষ চাকরিকালে সরকারি তহবিলে নিয়মিত টাকা প্রদান করে এবং যখন কাজ করার সামর্থ্য থাকে না, বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় ও বেশি বয়সে, তখন সরকার হতে নির্ধারিত অংকের টাকা পায়।"

Saxena ও Saxena বলেন, "সামাজিক বিমা এমন এক পদ্ধতি, যা ব্যক্তিকে দারিদ্র্য ও দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করে এবং জরুরি সময়ে সহায়তা করে।"

ফ্রিডল্যান্ডার ও এপটি বলেন, "সামাজিক বিমা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেই দিক, যা কোনো ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে শর্তপূরণ সাপেক্ষ নিজেকে তার পরিবারকে ভবিষ্যৎ আর্থিক বিপর্যয়ের প্রাক্কালে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।"

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক বিমা হচ্ছে এমন এক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, যা শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা সক্ষম অবস্থায় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে তাদের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা হতে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিকে সহায়তা করে। পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক বিমা হচ্ছে বর্তমানে গৃহীত এবং ভবিষ্যতে সহায়তা করার এক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। সে কর্মসূচি অক্ষম অবস্থায় ব্যক্তিকে সামর্থ্য ও সক্ষমতা দান করে। সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক বিমা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বেকারত্ব, বার্ধক্য, শিল্প দুর্ঘটনা, অসুস্থতা প্রভৃতি পরিস্থিতিতে সামাজিক বিমা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চাকরিজীবী, চাকরিদাতা ও সরকারের সহযোগিতার জন্য গঠিত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। এটি চাকরিজীবীর আইনগত অধিকার এবং এর হার ও সুনির্দিষ্ট।

প্রশ্ন॥৮॥ সামাজিক সাহায্য কী?

অথবা, সামাজিক সাহায্য কাকে বলে?

অথবা, সামাজিক সাহায্যের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর॥ ভূমিকা : ব্যক্তি যখন কর্মক্ষম থাকে, তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া, আর যখন কাজ করতে অক্ষম, তখন তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়াই সামাজিক নিরাপত্তার মূল কথা। সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য দিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ দুর্বিপাকে অক্ষমতা ও অপারগতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সামাজিক সাহায্য। এটি সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রাচীন ব্যবস্থা।

সামাজিক সাহায্য : সাধারণ ভাষায়, সামাজিক বিমার অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন লোকদের সাহায্য করার ব্যবস্থার নাম সামাজিক সাহায্য। এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণকারী লোকজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখতে সক্ষম।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : সমাজবিজ্ঞানী, বিশ্লেষক, নীতিবিদ বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিক সাহায্যের বিশ্লেষণ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক সাহায্য প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব লোকদের সাহায্য করা হয়, তাদের নিজেদের রক্ষা করার মতো অন্য কোনো উপায় নেই।"

এ প্রসঙ্গে **পি. লারকীয়া** বলেন, "সামাজিক সাহায্য এমন একটি ব্যবস্থা যা দরিদ্র লোকদের সাহায্য করে যারা তাদের আয়ের মাধ্যমে ন্যূনতম চাহিদা যেমন– খাদ্য ক্রয়, বস্ত্র, সুরক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পূরণ করতে অক্ষম।"

এ প্রসঙ্গে **W. A. Friedlander ও Apte** বলেন, সামাজিক সাহায্য ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে সরবরাহ করা হয়, যেটি ন্যূনতম পরীক্ষা অথবা নিম্নহারের ভাতার দ্বারা অনুমোদিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক সাহায্য হলো সামাজিক বিমা বহির্ভূত দুস্থ, অসহায়, বিপর্যস্ত মানুষদের ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তা কার্যক্রম।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যারা সামাজিক বিমার ... নিজেদের দুস্থ, অসহায় অবস্থায় পরিবর্তন করতে পারে ... তাদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ...কে সামাজিক সাহায্য বলে। সামাজিক সাহায্যের ক্ষেত্রে ... বাধ্যতামূলক আইনগত অধিকার নেই। এতে সাহায্য ...র কোনো ভূমিকা নেই। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ...জিক নিরাপত্তার অবদান অপরিসীম। প্রবীণ, অক্ষম, ...ন্ধী, বিধবা, বাস্তুহারা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ...তি শ্রেণির লোকেরা এ ধরনের সাহায্য পেয়ে থাকে।

প্রশ্ন বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সমস্যাসমূহ লিখ।

অথবা, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা তুলে ধর।

উত্তর। ভূমিকা : বর্তমানে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণা সম্প্রসারিত হওয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও সম্প্রসারণ ব্যাপকতর হয়েছে। আধুনিক সমাজকল্যাণেরও এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গীভূত ব্যবস্থা হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে জটিল ও মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই সামাজিক নিরাপত্তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের জীবনে কিছু বিপর্যয়মূলক ঘটনা ঘটে থাকে যে অবস্থা থেকে মানুষ স্বয়ং উত্তরণ ঘটাতে পারে না। এমতাবস্থায়, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে ব্যক্তির ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়োজনে। এ নিশ্চয়তার লক্ষ্যেই যেসব কর্মসূচি গৃহীত হয়, তাই সামাজিক নিরাপত্তা।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা : বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. শ্রমিক মালিক সহযোগিতার অভাব : শিল্পকারখানায় শ্রমিককে সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। এর ফলে শ্রমিককে অনেক সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। বরণ করতে হয় পঙ্গুত্ব বা অন্ধত্বকে। এমতাবস্থায় দরিদ্র শ্রমিক ও তার পরিবার হয়ে পড়ে সহায় সম্বলহীন। এ অবস্থায় মালিকের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। বাংলাদেশে এর জন্য বিধিবিধানও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শিল্পপতিগণ যখন মুনাফা অর্জনকে একমাত্র লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করে তখন সেই অসহায় শ্রমিককে সাহায্য বা নিরাপত্তা প্রদান করা জরুরি বলে মনে করে না। মালিকের এ উদাসীনতা এবং অসহযোগিতার মনোভাব শিল্প শ্রমিকদের সাথে মালিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যাহত হয়।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বজনপ্রীতি : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্যতম মারাত্মক সমস্যা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি। বাংলাদেশে এই স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর ফলে অসহায়দের জন্য গৃহীত অনুদান, রিলিফ, অর্থ প্রভৃতি সাহায্য তাদের কাছে পৌছায় না। বাইরে থেকে আসা সাহায্য পর্যন্ত দুর্দশাগ্রস্তদের নিকট পৌছায় না এইসব দুর্নীতির কারণে।

৩. সমাজসেবা কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা : সমাজসেবা কর্মসূচি মূলত সামাজিক নিরাপত্তার একটি অংশ। এর মাধ্যমেও অসুবিধাগ্রস্তরা নিরাপত্তা পেতে পারে। বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গৃহীত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যা এদেশে নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি বড় সমস্যা।

৪. রাজনৈতিক : আমাদের দেশে দলীয় স্বার্থের কারণে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যে পরিমাণ সহযোগিতা ও আন্তরিকতার মনোভাব থাকা আবশ্যক তা এদেশের ক্ষমতাশালীদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যা সমাজসেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে অন্যতম সমস্যা।

৫. অধিক জনসংখ্যা : সীমিত সম্পদ, অধিক জনসংখ্যা এবং অসংখ্য সমস্যার দেশ এই বাংলাদেশ। অধিক জনসংখ্যা সব ধরনের সমস্যার মূল কারণ। দেশের সার্বিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে এটি। এই জনসংখ্যার আধিক্য অনেক ক্ষেত্রে মার্জিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে অকার্যকর করে তোলে।

৬. শিক্ষার অভাব : আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে না বুঝেই এর বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করে।

৭. অনিয়ম ও ঘুষ : বৃদ্ধ বয়সে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশে অনিয়ম, ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে পেনশন প্রাপ্তিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে পেনশন প্রাপ্ত পরিবারকে নানারকম হয়রানির শিকার হতে হয়।

৮. পুঁজির অভাব : সামাজিক কর্মসূচিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুঁজির। কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলাদেশ একটি সীমিত সম্পদের দেশ। কাজেই পুঁজির নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নের একটি অন্তরায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, দরিদ্র অসহায় মানুষদের ন্যূনতম জীবনমানের জন্য প্রচলিত নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। কিন্তু উপরিউক্ত বিভিন্ন সমস্যার কারণে এ কর্মসূচি বাধাপ্রাপ্ত হয়। জনকল্যাণে প্রবর্তিত সমস্ত নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে এবং সকল অসহায়, দরিদ্র মানুষদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে তা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত হতো এবং বহির্বিশ্বে তা অনুসরণীয় হয়ে থাকতে পারত। তাই এসব সমস্যা দূর করে নিরাপত্তা কর্মসূচিকে জোরদার ক... হবে।

(গ) বিভাগ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন॥১॥ সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দাও। সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ আলোচনা কর। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক আলোচনা কর। [জা. বি.-২০০৯]

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তা কি? বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিস্তারিত আলোচনা কর। [জা. বি.-২০১১]

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক শিল্প সমাজে মানবকল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের সামাজিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ভাঙন, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা ও অন্যান্য পুরাতন সমস্যাগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে, তখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তার সূচনা করেন জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক ১৯৭৩ সালে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডে Sir William Beveridge প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির রূপরেখা সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। শুধু ইংল্যান্ডে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আদর্শ হিসেবে বিভারিজ রিপোর্টকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এরপর থেকে বিশ্বের ধনী দরিদ্র সবদেশেই জনকল্যাণের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সুপরিকল্পিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা : সমাজ পরিবেশে বিভিন্ন বিপদাপদ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা যেমন– বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ধক্য ইত্যাদি মানবজীবনে প্রতিনিয়ত বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রতিকূল সমাজ পরিবেশে এসব অবস্থা মোকাবিলায় ব্যক্তি সক্ষম হয়ে উঠে নি বলে রাষ্ট্রকে নিশ্চয়তাদানপূর্বক ও সেবাদানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।

নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদাপদ (সম্ভাব্য) থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা। এ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সমাজকর্মীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের সংজ্ঞা তুলে ধরা হল :

এ প্রসঙ্গে, **W. A. Friedlander** বলেছেন, "অসুস্থ বেকারত্ব, রোজগারি ব্যক্তির মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়স অথবা অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা এবং দুর্ঘটনা ইত্যাদি অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পতিত হয়, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে।"

S. W. Beveridge এর মতে, "পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগে আয়ের পথ বন্ধ হলে আয়ের নিশ্চয়তা দান করার জন্য গৃহীত কর্মসূচি হল সামাজিক নিরাপত্তা। তিনি আরও বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া এবং যখন কেউ কাজ করতে অক্ষম তখন তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়াই হল সামাজিক নিরাপত্তার কাজ।"

সমাজবিজ্ঞানী **মরিস স্টক** এর মতে, "আধুনিক জীবনের অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও বিকলাঙ্গতার বিরুদ্ধে যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে অক্ষম হয় তখন সমাজ কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বলতে সেগুলোকে বুঝানো হয়।

সবশেষে বলা যায়, আধুনিক শিল্প সমাজে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেসব কর্মসূচিই হল সামাজিক নিরাপত্তা। যেমন- সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ : সামাজিক নিরাপত্তার জন্ম হয় জার্মানিতে। সম্রাট প্রথম উইলিয়াম ১৮৮১ সালে সামাজিক বীমা স্কীম চালু করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বাইরে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডকে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার পথিকৃত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। গত শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শুরুতে আমেরিকায় ভয়ানক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। (The Great depression of 1930) এ বিপর্যয়ে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়ে। জনজীবনে নেমে আসে চরম দুর্গতি। এ অবস্থায় বেকার, বৃদ্ধ, পঙ্গু এবং নির্ভরশীল বালকবালিকাদের জন্য ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাস হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. সামাজিক বীমা : এর মধ্যে রয়েছে – ক. কর্মহীনদের বেকার ভাতা, খ. চাকরিজীবীদের জন্য ভাতা, গ. পঙ্গু হয়ে পড়লে, বৃদ্ধ বয়সে চাকরি হতে অবসর, মারা গেলে পরিবারের (নির্ভরশীল) জন্য ভাতা।

২. সামাজিক সাহায্য : ক. অন্ধ খ. ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়স্ক পঙ্গু ব্যক্তি গ. ৬৫ বছরের উর্ধ্বে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং নির্ভরশীল সন্তানের (১৮ বছর কম বয়সী) জন্য ভাতা, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে সামাজিক সাহায্যের নাম বদলে সম্পূরক নিরাপত্তা আয় রাখা হয়।

৩. জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সেবা : ক. সকল নাগরিকদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ খ. অনাথ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য আশ্রম অথবা কোন ইচ্ছুক পরিবারে দক্ষ প্রদান করা।

ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে সামাজিক নিরাপত্তা নবায়ন শুরু হয়। এ নতুন বৈপ্লবিক ব্যবস্থার স্থপতি হলেন স্যার উইলিয়াম বিভারিজ তাঁর মতে,

ক. অভাব	Want
খ. অজ্ঞতা	Ignorance
গ. আলস্য	Idleness
ঘ. রোগব্যাধি	Disease
ঙ. মলিনতা	Squalor

এ পাঁচটি 'দৈত্য' সামাজিক নিরাপত্তার পথে হুমকিস্বরূপ এবং সরকারিভাবে এদের নির্মূল করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, "সামাজিক নিরাপত্তা হওয়া উচিত, ব্যক্তি যখন কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া এবং যখন সে অক্ষম তখন তার আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া।" এ মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তার রূপ রেখা হচ্ছে বিশ্বখ্যাত 'বিভারিজ রিপোর্ট'। এ রিপোর্টে ব্যাপক সামাজিক বীমা, সামাজিক বীমার আওতা বহির্ভূত লোকদের জন্য সামাজিক সাহায্য, শিশু ভাতা, সকল নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিসহ ব্যাপক কর্মসূচির সুপারিশ করা।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে (U.K.) যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে তা ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা : ক. পারিবারিক ভাতা; খ. জাতীয় বীমা; গ. সম্পূরক সুবিধা; ঘ. পারিবারিক আয় সম্পূরণ; ঙ. শিল্প দুর্ঘটনা বীমা ও চ. যুদ্ধ ভাতা।

জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধীনে ইংল্যান্ডের প্রতিটি নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ ভোগ করে।

সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক : সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক অত্যন্তনিবিড়। নিম্নে এদের কয়েকটি তুলে ধরা হল :

প্রথমত, আধুনিক সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে।

দ্বিতীয়ত, সমাজকল্যাণ মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধান করে একটি সুখী ও উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়।

অপরদিকে, সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষম ও অসহায় মানুষের মৌল প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের নিশ্চয়তা বিধান করে সুখী সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য হল মানুষকে সুষ্ঠভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা।

পক্ষান্তরে, সামাজিক নিরাপত্তা তার ত্রিমুখী কর্মসূচি যেমন– সামাজিকবীমা, সামাজিক সাহায্য ও সমাজসেবার মাধ্যমে জীবনের সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা এবং মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সাহায্য করে।

চতুর্থত, সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ সমাজকল্যাণের দু'টি বিশেষ দিক। আর সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌল চাহিদা পূরণ করে সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বিকাশ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া সমাজের সঠিক কল্যাণ সম্ভব নয়। তবে সমাজের সকল মানুষ ও তাদের জীবনের সকল দিক সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত হওয়ায় সমাজকল্যাণের পরিধি সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি অপেক্ষা ব্যাপক।

প্রশ্ন॥২॥ সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে? সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দাও? সামাজিক নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তা কী? সামাজিক নিরাপত্তার ধরণ আলোচনা কর। [জা. বি.-২০০৮]

উত্তর॥ ভূমিকা : আধুনিক শিল্প সমাজে মানবকল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের সামাজিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ভাঙন, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা ও অন্যান্য পুরাতন সমস্যাগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে তখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তার সূচনা করেন জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক ১৯৭৩ সালে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডে Sir William Beveridge প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির রূপরেখা সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। শুধু ইংল্যান্ডে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচির আদর্শ হিসেবে বিভারিজ রিপোর্টকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এরপর থেকে বিশ্বের ধনী দরিদ্র সবদেশেই জনকল্যাণের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সুপরিকল্পিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা : সমাজ পরিবেশে বিভিন্ন বিপদাপদ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা যেমন– বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ধক্য ইত্যাদি মানবজীবনের প্রতিনিয়ত বিপর্যয় আনে। প্রতিকূল সমাজ পরিবেশে এসব অবস্থা মোকাবিলায় ব্যক্তি সক্ষম হয়ে উঠে নি বলে রাষ্ট্র নিশ্চয়তাদানপূর্বক ও সেবাদানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।

নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদাপদ (সম্ভাব্য) থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা। এ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সমাজবাসীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের সংজ্ঞা তুলে হল :

এ প্রসঙ্গে **W. A. Friedlander** বলেছেন, "অসুস্থতা, বেকারত্ব, রোজগারি ব্যক্তির মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়স অথবা অক্ষমতা, নির্ভরশীলতা এবং দুর্ঘটনা ইত্যাদি অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পতিত হয় তখন তাকে সাহায্য করার জন্য সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে।"

S. W. Beveridge এর মতে, "পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ, আয়ের পথ বন্ধ হলে আয়ের নিশ্চয়তাদান করার জন্য গৃহীত কর্মসূচি হল সামাজিক নিরাপত্তা। তিনি আবও বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যখন কেউ কাজ করতে অক্ষম তখন তাকে আয়ের সুযোগ করে দেওয়াই হল সামাজিক নিরাপত্তার কাজ।"

সমাজবিজ্ঞানী **মরিস স্টক** এর মতে, "আধুনিক জীবনের অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও বিকলাঙ্গতার বিরুদ্ধে যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে অক্ষম হয় তখন সমাজ কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বলতে সেগুলোকে বুঝানো হয়।

সবশেষে বলা যায়, আধুনিক শিল্প সমাজে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেসব কর্মসূচিই হল সামাজিক নিরাপত্তা। যেমন- সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ : প্রকৃতি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা : ১. সামাজিক বীমা ও ২. সামাজিক সাহায্য।

তবে বর্তমানে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে ধরা হয়। নিম্নে এ তিন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. সামাজিক বীমা : সামাজিক বীমা প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। সামাজিক বীমা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

ক. চাকরিজীবী বা (তার পরিবারের) আপৎকালীন সময়ের জন্য চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক দেয় চাঁদা গঠিত বীমা তহবিল। যথা : ভবিষ্যৎ তহবিল (Provident Fund), যৌথ বীমা (Group Insurance), কল্যাণ তহবিল (Benevolent Fund) প্রভৃতি।

খ. চাকরি জীবনে প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে পাওনা যেমন– অবসর ভাতা (Pension)।

গ. নাগরিক অধিকার হিসেবে পাওনা, যেমন- কর্মক্ষম বেকারদের জন্য বেকার ভাতা।

সামাজিক বীমার হার সুনির্দিষ্ট এবং বীমার অন্তর্ভুক্ত সকলেই তার সুবিধা পেয়ে থাকে। এটি প্রাপকের আইনগত অধিকার। ইচ্ছে করলেই এ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। সামাজিক বীমা ব্যবস্থার দুর্বল দিক হচ্ছে যে, এটি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। ফলে দেশের অধিকাংশ লোক এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

২. সামাজিক সাহায্য : সামাজিক সাহায্য প্রাচীনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সংকট মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িক সহায়তাই সামাজিক সাহায্য (Social Assistance)। প্রধানত দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ সামাজিক সাহায্যের আওতাভুক্ত উল্লেখিত সমস্যা ছাড়াও স্বাভাবিক কারণে সামাজিক সাহায্য করা হয়ে থাকে। সামাজিক বীমার ন্যায় এতে কারও আইনগত অধিকার নেই, সামাজিক সাহায্যের উদাহরণ হল :

ক. সরকারি ত্রাণ কর্মসূচি খ. লঙ্গরখানা গ. যাকাত ঘ. ফিতরা ইত্যাদি।

৩. সমাজসেবা : সমাজের মানুষের সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ, বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানে পুনর্বাসনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত সুদূরপ্রসারী সেবা কর্মসূচি এর আওতাভুক্ত। যেমন–

১. শিক্ষা (Education), স্বাস্থ্য (Health), শিশু কল্যাণ;
২. যুব কল্যাণ (Youth Welfare);
৩. নারী কল্যাণ (Women Welfare);
৪. চিকিৎসামূলক কর্মসূচি (Medical Service);
৫. সংশোধনমূলক কর্মসূচি (Rectification Service)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা 'সামাজিক নিরাপত্তা কনভেনশন' ১৯৫২ সনে নিরাপত্তার যে উপাদানসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে সেগুলো হল :

১. চিকিৎসা সুবিধা,
২. মাতৃত্ব কল্যাণ,
৩. অসুস্থ ভাতা,
৪. বার্ধক্য ভাতা,
৫. অক্ষমদের জন্য ভাতা,
৬. চাকরিকালীন দুর্ঘটনা ভাতা,
৭. উত্তরজীবীদের জন্য ভাতা,
৮. পারিবারিক ভাতা ও
৯. বেকার ভাতা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সব সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ মানুষ নিজের সম্পদ সামর্থ্য, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার দ্বারা মোকাবিলা করতে পারে না। যেসব দুর্যোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যে ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে। সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হল সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণ করে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখতে সাহায্য করা।

প্রশ্ন।৩। **বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো আলোচনা কর।**

অথবা, **আমাদের দেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমগুলো বর্ণনা কর।**

অথবা, **বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলো বর্ণনা কর।**

উত্তর। ভূমিকা : বাংলাদেশে অতীতকাল থেকেই সনাতন ধারায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে। সনাতন রীতিতে যেসব কার্যক্রম প্রচলিত তার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা, যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগত

কার্যক্রম, বন্যা কবলিত বিপর্যস্ত মানুষের নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। বর্তমানে শিল্পায়ন, শহরায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিষ্ঠানিক পদক্ষেপগত নিষ্ক্রিয়তা ও সনাতন ধারার সামাজিক নিরাপত্তা অপর্যাপ্ত ও কার্যহীন হয়ে পড়েছে। শিল্পবিপ্লব ও প্রতিযোগিতার পাশাপাশি মানবকল্যাণে জন্ম নেয় আধুনিক ব্যাপক ভিত্তিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।

১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ও মাতৃকল্যাণ আইন প্রবর্তনে শ্রমিকদের কল্যাণে কতিপয় সুবিধাদানের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতাক্রমে শ্রমকল্যাণে সংযোজিত হয় মাতৃত্ব সেবা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, যৌথ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, কল্যাণ তহবিল সহ বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ :

খ. সামাজিক বীমা কর্মসূচি : ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এর সুপারিশ ক্রমে কর্মচারীদের কল্যাণে কর্মচারী সামাজিক বীমা ব্যবস্থা চালুর আইন অনুমোদন করে। এর আইনানুযায়ী অসুস্থতা সুবিধা, মাতৃত্ব সুবিধা, কর্মচারী দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি সুবিধা ইত্যাদি দেওয়ার বিধান চালু হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যেসব কর্মসূচি বীমা কর্মসূচির আওতাভুক্ত তা নিম্নে আলোচিত হল :

১. ভবিষ্যৎ তহবিল কর্মসূচি বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কর্মসূচি : ১৯২৩ সালের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এই কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এই কর্মসূচিতে সরকারি কর্মচারীরা বাধ্যতামূলকভাবে তাদের মাসিক বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা প্রদান করে। এই জমাকৃত টাকা অবসরকালীন সময়ে বিধি অনুযায়ী কর্মচারী পেয়ে থাকেন। এই তহবিল হতে কর্মচারীরা আর্থিক বিপর্যয়কালীন ঋণও গ্রহণ করতে পারেন। বেসরকারি পর্যায়ে তা পেনসনের সাথে সংযুক্ত করে কিংবা কর্মচারীরা চাঁদার দ্বিগুণ হারে অবসর গ্রহণকালে প্রদান করা হয়।

২. যৌথ বীমা গ্রহণ বা গ্রুপ ইনসুরেন্স কর্মসূচি : ১৯৬৯ সালে সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণে গ্রুপ ইনসুরেন্স কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এই কর্মসূচিতে কর্মচারীরা দলগতভাবে গ্রুপফাণ্ডে চাঁদা প্রদান করে এবং কর্মকালীন সময়ে যদি কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করে তবে তার পরিবার এর দ্বিগুণ অর্থ লাভ করে।

৫. অবসরকালীন ভাতা বা পেনশন : চাকরির বয়সসীমা অতিক্রম করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নির্দিষ্ট হারে অবশিষ্ট জীবন পেনশন ভাতা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চাকরি করার পর স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করা যায়। সাধারণত অবসর গ্রহণ করার সময় কর্মচারীগণ যে মাসিক বেতন পেতেন, অবসর গ্রহণ করার পর থেকে পেনশন বা ভাতা হিসেবে সে মাসিক বেতনের অর্ধেক পেতে থাকেন। মাসিক পেনশনের টাকার চারভাগের একভাগ পর্যন্ত পেনশনভোগী কর্মচারী প্রতি টাকার পেনশন ছাড়ার জন্য ১২৫ টাকা হারে এককালীন সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন।

৩. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ : ১৯২৩ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় কর্মরত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা মৃত্যু বা কর্মক্ষমতা লোপ পেলে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরে ১৯৫৭ ও ১৯৮০ সালে উক্ত আইনের সংশোধন করা হয়। বর্তমানে এ আইনে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকের দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু, পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা লোপের ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

৪. মাতৃত্ব সুবিধা : মাতৃকল্যাণ সুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন, ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃকল্যাণ (চা বাগান) আইন ও সরকারি কর্মচারী মাতৃত্ব সুবিধা চালু রয়েছে। এ আইনের (বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ-১৯৩৯) আওতায় কর্মজীবী মহিলারা সন্তান জন্মের পূর্বে ছয় সপ্তাহ ও পরে ছয় সপ্তাহ বেতনসহ ছুটি ও আর্থিক সুবিধা লাভ করে। চা বাগান আইন শুধুমাত্র চা বাগান ও চা উৎপাদন কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আইনে সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে প্রসবকালীন ভাতা ও প্রসবকালে মৃত্যুতে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এই আইনে সরকারি মহিলা কর্মচারীরা মাতৃত্ব সুবিধা হিসেবে পূর্ণ বেতনসহ সর্বোচ্চ তিন মাস মাতৃত্ব সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৬. কল্যাণ তহবিল : ১৯৬৮ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের এ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইনানুযায়ী সরকারি কর্মচারীরাও চাকরিকালীন সময়ে নির্দিষ্ট হারে তহবিলে অর্থ জমা দেয় এবং অবসর কালে তাদের পরিবারকে এক ধরনের অনুদান হিসেবে সাহায্য দান করা হয়।

৭. সামাজিক সাহায্য : বাংলাদেশে সামাজিক সাহায্য কার্যক্রম অসংগঠিত, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে সামাজিক সাহায্যের ধরনগুলো হল :

বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, নদী ভাঙন জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি সমস্যায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হয়।

দরিদ্র, এতিম, বিধবা, দুস্থ, পঙ্গু, অক্ষম জনগোষ্ঠীকে অনিয়মিত ও অসংগঠিতভাবে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় তাই সামাজিক সাহায্যের পর্যায়ভুক্ত।

গ. সমাজসেবা : আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি স্বাধীনতাত্তোরকাল হতেই চালু রয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি।
২. যুব কল্যাণ।
৩. শিশু কল্যাণ, মাতৃমঙ্গল ও পরিবার পরিকল্পনা।
৪. চিকিৎসা সমাজকর্ম।
৫. শ্রম কল্যাণ।
৬. সংশোধনমূলক কর্মসূচি।
৭. মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের পুনর্বাসন।
৮. শারীরিক বিকলাঙ্গদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।
৯. নারী কল্যাণ।
১০. সামাজিক বাধাগ্রস্তদের

উপসংহার : আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হল সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখতে সাহায্য করা। বাংলাদেশে অতীতকাল থেকেই সনাতন ধারায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বর্তমান এবং তা বর্তমানে আধুনিক রূপ ধারণ করেছে।

প্রশ্ন।৪। **সামাজিক নিরাপত্তা কি? বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

অথবা, **সামাজিক নিরাপত্তার বলতে কী বুঝ। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার তাৎপর্য আলোচনা কর।**

উত্তর৷ ভূমিকা : শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার সামাজিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বস্তুত শিল্প কলকারখানায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক যাদের একটা অংশ প্রতি বছরই দেখা যায় কোন না কোন যান্ত্রিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এমতাবস্থায় তারা তাদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এরূপ একটি পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে সরকার বা মালিক পক্ষ কর্তৃক আর্থসামাজিক সহায়তামূলক উদ্যোগ বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে যা সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

সামাজিক নিরাপত্তা : সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বুঝায় এমন এক ধরনের সাহায্য, সহায়তা বা নিশ্চয়তা যা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের প্রতিকূল আর্থসামাজিক অবস্থায় সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হল :

মরিস স্ট্যাক তাঁর 'The Meaning of Social security' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "আধুনিক জীবনের বিপর্যয়ময়তা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়সের নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও পঙ্গুত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যখন নিজ ক্ষমতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা নিজেকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে অপরাগ হয় তখন সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক যে প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে।"

স্যার উইলিয়াম বিভারিজ এর মতে, "যখন কোন ব্যক্তি কর্মক্ষম থাকে তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। আর যখন কাজ করতে অসমর্থ বা অক্ষম হয় তখন তার আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।"

World Health Organization (Who) এর মতে, "সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষকে আকস্মিক বিপদের সময় যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ সকল বিপদ বা বিপর্যয় এমনই আকস্মিক যে, স্বল্প আয়ের মানুষ স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এককভাবে বা সহযোগীদের সাহায্যে মোকাবিলা করতে অক্ষম।"

W. A. Friedlander তাঁর 'Introduction to social welfare' গ্রন্থে বলেছেন, "রুগ্নতা, বেকারত্ব, আয় উপার্জনকারীর মৃত্যু, বার্ধক্য কিংবা নির্ভরশীলদের অক্ষমতা এবং দুর্ঘটনা প্রভৃতি যখন ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টায় মোকাবিলা করতে অক্ষম তখন সামাজিক আইনের মাধ্যমে যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়।

সুতরাং আলোচ্য সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন এক ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা মানুষের যে কোন ধরনের অক্ষমতা, দুর্বলতা, ব্যর্থতা বা প্রতিবন্ধকতার সময় তাদেরকে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব : সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, আর তা হল সামাজিক নিরাপত্তা মূলত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের প্রতিকূল আর্থসামাজিক অবস্থায় গ্রহণ বা প্রবর্তন করা হয়। আর বাংলাদেশের মত একটি দেশ যা নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। এমন একটি দেশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবহার, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। নিম্নে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হল :

১. দারিদ্র্য দূরীকরণ : দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। এদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ জনসাধারণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। যারা দৈনন্দিন ২১০০ কিলো ক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণ করে। দারিদ্র্য নিজে যেমন একটি সমস্যা তেমনি আরও অনেক সমস্যার জন্মদাতাও, আবার দরিদ্র বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার পর্যায়ক্রমে বেড়েই চলছে। দেশের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

২. বেকারত্ব দূরীকরণ : আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি, যার মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রায় ৬.৫ কোটি। এ কর্মক্ষম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ১.৫-২ কোটি বেকার। তারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। ফলে দেখা যায় তারা বাস্তবজীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবন সম্পর্কে তারা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই এই বেকার জনগোষ্ঠীকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বেকার ভাতা প্রবর্তন করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন করা যায়।

৩. স্বাস্থ্য নিশ্চয়তা : আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সেবার চিত্র অত্যন্ত করুণ। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের দেশের প্রতি ৫০ জন রোগীর জন্য একটি হাসপাতাল বেড, প্রতি ৪৫০ জন রোগীর জন্য একজন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার এবং প্রতি ১২০০ রোগীর জন্য ১ জন নার্স আছে। তাছাড়া এদেশে শহরের তুলনায় গ্রামের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা আরও বেশি দুর্বল। গ্রামের লোকজন নানা ধরনের রোগ-শোক ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই দেশে বিদ্যমান এ দুর্বল চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

৪. প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটা অংশ হল প্রতিবন্ধী। গবেষণায় দেখা গেছে এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ। এসব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, হাত-পা প্রতিবন্ধী এবং মানসিক প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীদেরকে আমাদের দেশে পরিবার ও সমাজে একটি বাড়তি বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সমাজে এদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫. এতিম ও অসহায় শিশুদের নিরাপত্তা : এতিম শিশু যাদের পিতামাতা বেঁচে নেই, যাদের প্রতিপালনের জন্য তাদের আপনজন বলে কেউ নেই, এসব শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমেই এদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য-প্রয়োজন ও সুযোগ সুবিধা পূরণ করা সম্ভব হবে। এরা দেশ ও জাতির যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

৬. দুস্থ অসহায় নারীদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশে যৌতুক, তালাক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহজনিত বহুবিধ সামাজিক কুপ্রথা বিদ্যমান এবং এসব কুপ্রথার নেতিবাচক ফলাফলটা প্রধানত নারীসমাজের উপরই বর্তায়। অথচ নারীরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার বা ন্যায়বিচার পায় না। তাই দেশের নারীসমাজ বিশেষ করে দুস্থ ও অসহায় নারীদের জন্য একটি নিরাপত্তাপূর্ণ Environment সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তার যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে।

৭. প্রবীনদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশে প্রবীনদের সমস্যাকে খুব একটা প্রাধান্য দেওয়া হয় না। কিন্তু একটা বিষয় এখানে স্মরণযোগ্য যে আজকে যারা প্রবীন একসময় তারাও কর্মক্ষম ছিল। পরিবার, দেশ ও জাতির জন্য তারা অনেক কিছু করেছেন। আজ বয়সের ভারে তারা আক্রান্ত। কিন্তু তাদেরও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মত কতকগুলো চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স্ক ভাতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৮. ভূমিহীনদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশে নদীভাঙনজনিত সমস্যার কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীভাঙনের ফলে তাদের জায়গাজমি, ঘরবাড়ি সবকিছুই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা বাস্তুভিটাহীন জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারি খাস জমিতে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাই হতে পারে একটি যথার্থ মাধ্যম।

৯. সামাজিক বিপর্যয় মোকাবিলা : সমাজ জীবনে মানুষ প্রায়ই বিভিন্ন ধরনেব বিপর্যয়ের শিকার হয়। এসব বিপর্যয়ের ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ, হতাশা, অসন্তোষ। এমতাবস্থায় সমাজ জীবনে সৃষ্ট এসব বিপর্যয় মোকাবিলায় অথবা এসব বিপর্যয় সৃষ্টির উৎস বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

১০. কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপত্তা : আমাদের দেশে কর্মজীবী নারীদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে চলছে। কিন্তু নারীদের কর্মক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন– মাতৃত্বকালীন ছুটি না পাওয়া, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব, তাদের আবাসিক সমস্যা ইত্যাদি। তাই দেশে কর্মজীবী মহিলাদের এসব সমস্যা দুর করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব সর্বাধিক। একমাত্র সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমেই কর্মজীবী মহিলাদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব।

১১. কর্মজীবী মহিলাদের সন্তানদের নিরাপত্তা : মহিলাদের সন্তানদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক যে সকল কর্মসূচি আছে তা হল দিবাযত্ন কেন্দ্র, ছোটমনি নিবাস, শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি। আমাদের দেশে যেসব মায়েরা চাকরি করেন তাদের সন্তানদের যথার্থভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং তাদের অনুপস্থিতিতে সন্তানসন্ততিদের হেফাজতকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে : ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখি, মঙ্গা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এসব দুর্যোগের ফলে মানুষের ঘরবাড়ি, মাঠঘাটের ফসল, গৃহপালিত পশুপাখি, ফলমূলের গাছপালা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় অনেকেই দরিদ্র বা চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়। তাই দুর্যোগ উত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

১৩. শিল্প দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে : আমাদের দেশে শিল্প কলকারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের একটা অংশ প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়। শুধু তাই নয়, পরিবহণের ক্ষেত্রেও এ ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব দুর্ঘটনার ফলে বহুলোকজন আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারা তাদের নিজেদের এবং পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অব্যবস্থাপনায় তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব খুব বেশি করে অনভূত হয়।

১৪. ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে : আমাদের দেশে ভবঘুরে এবং ভিক্ষুক উভয় শ্রেণীর লোকজনদের দৌরাত্ম্যে নাগরিক জীবন অনেকটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যানবাহন, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, বাসটার্মিনাল, পার্ক, শিক্ষাঙ্গণ সকল ক্ষেত্রেই এ শ্রেণীর লোকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাই উক্ত সমস্যার কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে তা উপস্থাপন কল্পে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, আধুনিক বিশ্বে বিশেষ করে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান হল সামাজিক নিরাপত্তা। দেখা যায় বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশেই কমবেশি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা হল এক ধরনের Reinforcement বা বলবর্ধক। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যা তাকে আরও বেশি কর্মমুখী করে তোলে। আর বাংলাদেশের মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব বা ভূমিকা যে অনস্বীকার্য তা উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন॥৫॥ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আলোচনা কর।

উত্তর॥ ভূমিকা : সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি প্রাচীন হলেও মূলত শিল্প বিপবের পর থেকেই সামাজিক নিরাপত্তা শব্দটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শিল্প বিপবের পর উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :
১. সামাজিক বীমা।
২. সামাজিক সাহায্য ও
৩. সমাজ সেবা।

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

১. সামাজিক বীমা : সামাজিক বীমার মূল কথা হল কর্মরত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে বেকারত্ব কার্যকালীন দুর্ঘটনা, মাতৃত্ব অসুস্থতা, বার্ধক্য বা পঙ্গুত্বজনিত অস্থায়ী বা স্থায়ী উপার্জনহীনতার হাত থেকে রক্ষা করা। কর্মচারী তার কর্মস্থলের বীমা তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে বীমাকৃত লোকেরা সংশিষ্ট সুবিধা আইনের সাহায্যে আদায় করতে পারে। সামাজিক বীমা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে না হলেও সরকারি উদ্যোগে এ ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

ক. মাতৃকল্যাণ আইন : বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত মহিলারা তাদের মাতৃত্ব লাভের সময় বেতনসহ ছুটি ভোগ করেন। প্রসূতি মাতা শিশু জন্মের ৩ সপ্তাহ পূর্ব হতে শিশু জন্মের ৬ সপ্তাহ পর পর্যন্ত এই ছুটি পেয়ে থাকেন।

খ. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন : পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় পতিত হলে এ আইন বলে তার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিককে দেয় ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ. প্রভিডেন্ট ফান্ড : চাকরিজীবী ব্যক্তি কর্তৃক প্রভিডেন্ট ফান্ড খোলা হলে তার জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে উক্ত ব্যক্তি সুদ পেতে থাকে। মৃত্যুর পর কিংবা অবসর গ্রহণের পর উক্ত ব্যক্তি এ অর্থ ফেরত পায়।

ঘ. কল্যাণ তহবিল ও যুগ্ম বীমা : কর্তব্যরত ব্যক্তির চাকুরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই যদি তার অকাল মৃত্যু ঘটে তবে উক্ত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যুগ্ম বীমা বা কল্যাণ তহবিল থেকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

ঙ. সামরিক বাহিনীর লোকদের জন্য কল্যাণ ব্যবস্থা : নৌ, বিমান ও সেনা বাহিনীতে কর্মরত লোকদের জন্য নানা রকম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা আছে। শহীদ সৈনিক পরিবারের জন্য সাহায্য, সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য সহযোগিতা করা হয়।

চ. পেনশন বা ভাতা : একজন সরকারি কর্মচারী দীর্ঘদিন চাকরি করার পর যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন উক্ত সময়ের পরবর্তী কাল থেকে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর্থিক নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে পেনশন বা ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

২. সামাজিক সাহায্য : সামাজিক সাহায্য বলতে আমরা বুঝি অভাবগ্রস্ত অসহায় লোকদের সাহায্য প্রদান করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দুঃস্থ ব্যক্তিদের ন্যূনতম জীবন ধারণ করতে সাহায্য করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত সামাজিক সাহায্যের ক্ষেত্রে কোন সংঘবদ্ধ কর্মসূচি বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি। তথাপি এই ক্ষেত্রে যে দুটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা হল–

ক. রিলিফ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি কিংবা দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থায় সরকার কর্তৃক জনগণের কল্যাণার্থে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকার রিলিফ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সাহায্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন দুর্যোগকালীন অবস্থার পর দীর্ঘদিন ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সংঘ বা সংস্থা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. বিনোদন সংঘ : বৃদ্ধ বয়সের একাকীত্ব দূর করার জন্য বর্তমানে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ গড়ে তোলা হয়েছে। বৃদ্ধদের মানসিকভাবে সবল, সতেজ রেখে তাদের অসহায়ত্ব দূর করার জন্য এই সংঘগুলো সচেষ্ট।

৩. সমাজ সেবা : নাগরিকগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টায় সামাজিক স্বাস্থ্য ও অপরাপর ক্ষেত্রে যে সকল সমাজ কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হয় সেগুলোই সমাজসেবা। বাংলাদেশে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, পাঠাগার নির্মাণ, অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজসেবা কর্মসূচি কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার দরুন সমাজ সেবা কর্মসূচি বার বার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে একথা বলা যায় যে, যে কোন দেশের কর্মজীবী জনসাধারণ দেশের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তেমনি আমাদের এই বাংলাদেশেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে অনেক বাধা রয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন না হলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ, এর ফলে শ্রমিকের উন্নত স্বাস্থ্য ও দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

✻✻✻✻✻✻✻

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালের প্রশ্নাবলি

নতুন সিলেবাসের সাথে মিল থাকায় বিগত সালের প্রশ্নগুলো সংযোজন করা হলো।
১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ডিগ্রি পরীক্ষাসমূহে 'সমাজকর্ম পদ্ধতি' বিষয়টি সমাজকল্যাণ : তৃতীয় পত্র হিসেবে পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু 'বর্তমানকালে সামাজিক নীতি পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশের সমাজসেবাসমূহ' পত্রটি তৃতীয়পত্র হিসেবে পরীক্ষা হচ্ছে।

ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা-২০০৬
সমাজকর্ম : তৃতীয় পত্র
(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

১. সনাতন সমাজকল্যাণ বলতে কি বুঝ? সনাতন ও আধুনিক সমাজকল্যাণের পার্থক্য আলোচনা কর। ৬+১৪= ২০

২. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) : ১০×২= ২০
ক. যাকাত; খ. ওয়াকফ; গ. লঙ্গরখানা; ঘ. দেবোত্তর।

৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কি? বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবার প্রধান কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর। ৬+১৪= ২০

৪. শিশুকল্যাণ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শিশুকল্যাণ কর্মসূচির বিবরণ দাও।

৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কি? বাংলাদেশের সমাজকল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৬+১৪= ২০

৬. সমাজকল্যাণ প্রশাসন কি? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬+১৪= ২০

৭. সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৬+১৪= ২০

৮. পরিকল্পনা কি? অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা বর্ণনা কর। ৬+১৪= ২০

৯. সামাজিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্তসমূহ আলোচনা কর। ৬+১৪= ২০

১০. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) : ১০×২= ২০
ক. সামাজিক নিরাপত্তা; খ. সামাজিক বীমা;
গ. বাংলাদেশ বহুমুত্র সমিতি; ঘ. ব্র্যাক।

ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা-২০০৭
সমাজকর্ম : তৃতীয় পত্র
(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

১. সনাতন সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যগুলো কি? সনাতন সমাজকল্যাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

২. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) : ১০ × ২ =২০
ক. ওয়াকফ; খ. এতিমখানা;
গ. বদান্যতা; ঘ. সদকা।

৩. শহর সমাজসেবা কর্মসূচি বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে শহর সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৬+১৪= ২০

৪. সংশোধনমূলক সেবা কি? বাংলাদেশে সংশোধনমূলক সেবার কর্মসূচিগুলো আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৫. চিকিৎসা সমাজসেবা কি? একজন হাসপাতাল সমাজকর্মীর কার্যাবলি আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কি? বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সমস্যাবলি আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৭. সমন্বয় কি? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় ব্যবস্থা আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৮. সামাজিক নীতি বলতে কি বুঝ? সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৯. পরিকল্পনা কি? পরিকল্পনার প্রক্রিয়া আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

১০. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) : ১০+১০=২০
ক. শ্রম কল্যাণ, খ. আই.এল.ও,
গ. বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ পরিষদ,
ঘ. বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা-২০০৮
সমাজকর্ম : তৃতীয় পত্র
(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

১. সনাতন সমাজকল্যাণ কি? সনাতন ও আধুনিক সমাজকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ৬+১৪=২০
[What is Traditional Social Welfare? Distinguish between traditional and modern social welfare.]

২. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) : ১০×২=২০
[Write in brief (any two):–]
ক. যাকাত [Zakat]; খ. দেবোত্তর [Debottor]; গ. লঙ্গরখানা [Langarkhana]; ঘ. দানশীলতা [Charity]।

৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৬+১৪ =২০
[What do you mean by Rural Social Service? Describe the rural social service programmes in Bangladesh.]

৪. প্রতিবন্ধী কি? বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দাও। ৬+১৪ =২০
[What is handicapped? Discuss the Training and Rehabilitation Programme for the handicapped in Bangladesh.]

৫. শিশুকল্যাণ বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশ সরকারের শিশুকল্যাণ কার্যক্রম আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What do you mean by Child Welfare? Describe the child welfare programmes of the Government of Bangladesh.]

৬. সরকারি ও স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ বলতে কি বুঝ? এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৬+১৪=২০

[What do you mean by Governmental and voluntary social service? Define the similarities and dissimilarities between the two.]

৭. সমাজকল্যাণ প্রশাসন কি? সমাজকল্যাণ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What is Social Welfare Administration? Discuss the characteristics of social welfare administration.]

৮. সামাজিক পরিকল্পনা কি? সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৬+১৪=২০

[What is Social Planning? Narrate the importance and necessity of social planning.]

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কি? সামাজিক নিরাপত্তার শ্রেণীবিন্যাস কর। সমাজ জীবনে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৬+১৪=২০

[What is Social Security? Classify the social security. Define the importance of social security on social life.]

১০. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) : ১০×২=২০

ক. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি; খ. ব্র্যাক;
গ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; ঘ. কেয়ার।

[Write in brief (any two):–
a. Diabetic Association of Bangladesh;
b. BRAC;
c. WHO; d. CARE.]

ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা–২০০৯
সমাজকর্ম ঃ তৃতীয় পত্র
(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

১. সনাতন সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য কি কি? সনাতন সমাজকল্যাণের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

২. শহর সমাজসেবা বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে প্রচলিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বিবরণ দাও। ৬+১৪=২০

৩. সংশোধনমূলক কার্যক্রম বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশ সরকারের সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৬+১৪=২০

৪. যুব কল্যাণ বলতে কি বুঝ? যুব কল্যাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কি কি কর্মসূচী রয়েছে? বর্ণনা কর। ৬+১৪=২০

৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কী? বাংলাদেশ স্বেচ্ছসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থায় ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৬+১৪=২০

৬. সমন্বয় কি? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৭. সামাজিক নীতি কি? সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৬+১৪=২০

৮. পরিকল্পনা বলতে কি বুঝ? উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কি? বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর বর্ণনা দাও। ৬+১৪=২০

১০. সংক্ষেপে লিখ (যে কোন দু'টি) ১০×২=২০

(ক) এতিমখানা; (খ) ওয়াক্‌ফ;
(গ) ইউনিসেফ; (ঘ) ওয়ার্ল্ড ভিশন।

পরীক্ষা–২০১০
সমাজকর্ম

বিষয় কোড : | 1 | 6 | 0 |

তৃতীয় পত্র
(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)
সময়–৩ ঘন্টা পূর্ণমান– ১০০

[দ্রষ্টব্য ঃ–ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১. সনাতন সমাজকল্যাণ বলতে কি বোঝ? সনাতন ও আধুনিক সমাজকল্যাণের পার্থক্য আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What do you mean by traditional social welfare? Discuss the differences between traditional and modern social welfare.]

২. গ্রামীণ সমাজসেবা কি? বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৬ + ১৪ = ২০

[What is rural social service? Describe the main programmes of rural social service in Bangladesh.]

৩. শিশুকল্যাণের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শিশুকল্যাণ কর্মসূচির বিবরণ দাও। ৬ + ১৪ = ২০

[Define child welfare. Describe the child welfare programmes run by the Directorate of Social Services of the Government of Bangladesh.]

৪. হাসপাতাল সমাজসেবা কি? বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৬ + ১৪ = ২০

[What is hospital social service? Wxplain the importance of hospital social service in Bangladesh.]

৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কি? বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমস্যাবলি আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

[What is voluntary social welfare agency? Discuss the problems of voluntary social welfare agencies in Bangladesh.]

৬. প্রতিবন্ধী কারা? বাংলাদেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দাও। ৬ + ১৪ = ২০

[Who are the handicapped? Give a description of the training and rehabilitation programmes for the physically handicapped in Bangladesh.]

৭. নারীকল্যাণ বলতে কি বুঝ? নারীকল্যাণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দাও। ৬ + ১৪ = ২০

[What do you mean by women welfare? Give a description of the programmes for the women welfare taken by the Government of Bangladesh.]

৮. বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্রাকের অবদান আলোচনা কর। ২০

[Discuss the role of BRAC in socio-economic development for the rural poor people of Bangladesh.]

৯. সামাজিক নীতির লক্ষ্যসমূহ কি? সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৬+১৪=২০

[What are the aims of social policy? Narrate the importance of social policy in social welfare.]

১০. নিম্নের যে কোনো দুটি বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ : ১০×২=২০

ক. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি; খ. গ্রামীণ ব্যাংক;
গ. যাকাত; ঘ. ইউ. এন. এফ. পি. এ।

[Write in brief on any two of the following :-

a. Diabatic Association of Bangladesh;
b. Grameen Bank;
c. Zakat;
d. UNFPA.]

পরীক্ষা-২০১১

সমাজকর্ম

বিষয় কোড : | 1 | 6 | 0 |

তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

সময়–৩ ঘণ্টা পূর্ণমান– ১০০

[দ্রষ্টব্য ঃ–ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১. সনাতন সমাজকল্যাণ বলতে কি বোঝ? সনাতন সমাজকল্যাণের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What do you mean by traditional social welfare? Discuss the importance of traditional social welfare.]

২. শহর সমাজসেবা কী? বাংলাদেশে শহর সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৬+১৪=২০

[What is urban social service? Describe the programmes of urban social service in Bangladesh.]

৩. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার ভূমিকা আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What do you mean by voluntary social welfare agency? Discuss the role of voluntary social welfare agencies in the field of social welfare in Bangladesh.]

৪. যুবকল্যাণ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। যুবকল্যাণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দাও।৬+১৪=২০

[Explain the concept of youth welfare. Give a description of the programmes for the youth welfare taken by the Government of Bangladesh.]

৫. সমাজকল্যাণ প্রশাসন কী? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What is social welfare administration? Discuss the administrative system of social welfare activities in Bangladesh.]

৬. আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কী? বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কার্যক্রম আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What is International Social Welfare? Discuss the programmes of Food and Agricultural Organization (FAO) in Bangladesh.]

৭. সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৬+১৪=২০

[What is social policy? Explain the process of social policy formulation.]

৮. পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনার ধাপসমূহ কী? উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৬+৬+৬=২০

[What is Planning? What are the steps of planning? Discuss the characteristics of good planning.]

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কী? বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর বর্ণনা দাও। ৬+১৪=২০

[What is social security? Describe the social security programmes in Bangladesh.]

১০. নিম্নের যে কোনো দুটি বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ : ১০×২=২০

ক. দানশীলতা; খ. পরিবার পরিকল্পনা;
গ. আশা; ঘ. রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

[Write in brief on any two of the following :-

a. Charity; b. Family Planning;
c. ASA; d. Red-crescent Society.]

পরীক্ষা-২০১২
সমাজকর্ম

বিষয় কোড : | 4 | 7 | 3 |

তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

সময়-৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০

[দ্রষ্টব্য ঃ-ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১. সনাতন সমাজকল্যাণ কী? সনাতন ও আধুনিক সমাজকল্যাণের পার্থক্য আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What is traditional social welfare? Discuss the differences between traditional and modern social welfare.]

২. গ্রামীণ সমাজসেবা কী? বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও। ৬ + ১৪ = ২০

[What is rural social service? Describe the main programmes of rural social service in Bangladesh.]

৩. যাকাত কী? সনাতন সমাজকল্যাণ হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

[What is zakat? Discuss the importance of zakat as traditional social welfare.]

৪. নারীকল্যাণ কী? নারীকল্যাণ-ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দাও। ৬ + ১৪ = ২০

[What is women welfare? Give a description of programmes for the women welfare taken by the Government of Bangladesh.]

৫. বিআরডিবি কী? বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির ভূমিকা আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

[What is BRDB? Discuss the role of BRDB in elimination of rural poverty of Bangladesh.]

৬. সামাজিক নীতির লক্ষ্যসমূহ কি? সমাজকল্যাণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

[What are the aims of social policy? Narrate the importance of social policy in social welfare.]

৭. সামাজিক পরিকল্পনা কী? সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

[What is social planning? Discuss the importance of social planning.]

৮. সমন্বয় কী? বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সমন্বয় প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৬+১৪=২০

[What is coordination? Describe the process of coordination of social welfare programmes in Bangladesh.]

৯. আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ইউনিসেফ এর কার্যক্রম আলোচনা কর। ৬+১৪=২০

[What do you mean by international social welfare? Discuss the programmes of UNICEF in the field of social welfare in Bangladesh.]

১০. নিম্নের যে কোনো দুটি বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ : ১০×২=২০

ক. সামাজিক নিরাপত্তা; খ. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা; গ. হাসপাতাল সমাজসেবা; ঘ. সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

[Write in brief on any two of the following :- a. Social Security; b. World Health Organization; c. Hospital Social Service; d. Social Welfare Administration.]

পরীক্ষা-২০১৩
সমাজকর্ম

বিষয় কোড : | 4 | 7 | 3 |

তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

সময়-৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০

[দ্রষ্টব্য ঃ-ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১. সনাতন সমাজকল্যাণ বলতে কি বোঝ? সনাতন সমাজকল্যাণের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

২. শহর সমাজসেবা কি? বাংলাদেশে শহর সমাজবেসা কর্মসূচির বিবরণ দাও। ৬ + ১৪ = ২০

৩. সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে প্রচলিত সংশোধনমূলক কার্যক্রম আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

৪. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কী? বংলাদেশে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

৫. আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কি? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে আইএলও'র কার্যক্রম আলোচনা কর।৬ + ১৪ = ২০

৬. সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে কি বোঝ? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

৭. সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। সামাজিক নীতি প্রণয়ন ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

৮. পরিকল্পনা বলতে কি বোঝ? উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৬ + ১৪ = ২০

৯. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বোঝ? বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিবরণ দাও। ৬ + ১৪ = ২০

১০. নিচের যে কোন দুটি বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ : ১০ × ২ = ২০

ক. দানশীলতা; খ. শিশু কল্যাণ; গ. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি; ঘ. কেয়ার।

ডিগ্রী নতুন সিলেবাস ও নতুন মানবণ্টন অনুযায়ী বিগত সালের প্রশ্নপত্র

ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ২য় বর্ষ পরীক্ষা-২০১৫

[অনুষ্ঠিত হয়েছে, ২০১৬]

সমাজকর্ম (তৃতীয় পত্র)

সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কর্মসূচিসমূহ

বিষয় কোড : 122101

সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগ থেকে ক্রমানুসারে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক- বিভাগ

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ১০ = ১০

ক. জাতীয় শিক্ষানীতি কত সালে প্রণীত হয়?
[In which year the National Education Policy was announced?]

উত্তর : ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ অনুযায়ী শিশু কারা?
[Who are the children according to the National Child Welfare Policy?]

উত্তর : জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল মানুষকে বুঝাবে।

গ. সর্বপ্রথম কোথায় পরিকল্পনা ধারণাটি পাওয়া যায়?
[Where was the idea of Planning found at first?]

উত্তর : সর্বপ্রথম প্রায় ২৪০০ বছর পূর্বে প্লেটোর 'Republic' গ্রন্থে পরিকল্পনা ধারাণাটির সন্ধান পাওয়া যায়।

ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত? [What is the duration of the 6th five year plan?]

উত্তর : ২০১১– ২০১৫ সাল।

ঙ. কোন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটে?
[Which program introduced the modern social welfare in Bangladesh?]

উত্তর : ঢাকা প্রজেক্ট।

চ. প্রতিবন্ধী কারা? [Who are handicapped?]

উত্তর : যারা মনো-দৈহিক বা আর্থসামাজিক সমস্যার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত তারাই প্রতিবন্ধী।

ছ. শ্রম কল্যাণ কী? [What is labour welfare?]

উত্তর : শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থাই শ্রম কল্যাণ।

জ. BRDB এর পূর্ণরূপ কী?
[What is the elaboration of BRDB?]

উত্তর : BRDB = Bangladesh Rural Development Board.

ঝ. বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে?
[Who is the founder of Bangladesh Diabetic Association?]

উত্তর : জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোঃ ইব্রাহীম।

ঞ. UNDP এর পূর্ণরূপ কী? [What stands for UNDP?]

উত্তর : United Nations Development Programme.

ট. "A Memory of Solferino" গ্রন্থের লেখক কে?
[Who is the author of "A memory of Solferino"?]

উত্তর : "A Memory of Solferino" গ্রন্থের লেখক হেনরী ডোনাল্ট।

ঠ. অবসর ভাতা কোন ধরনের কর্মসূচি? [What type of program is pension?]

উত্তর : অবসর ভাতা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

খ-বিভাগ

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ × ৫ = ২০

২. জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তরগুলো উল্লেখ কর।
[Describe the stages of education according to the National Education Policy.]

উত্তর সংকেত : ২য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা-৫২।

৩. বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যাবলি চিহ্নিত কর।
[Indicate the problems in formulation of planning in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : ৩য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা-৯২।

৪. হাসপাতাল সমাজসেবা বলতে কী বুঝায়?
[What does hospital social service mean?]

উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়; প্রশ্ন নং-১০, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৫. প্রবেশনের শর্তগুলো উল্লেখ কর।
[Mention the conditions of probation.]

উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৪৪, পৃষ্ঠা-১৬০।

৬. স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ বলতে কী বুঝায়?
[What is meant by voluntary social welfare?]

উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা-১৬১।

৭. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য লিখ।
[Write down the objectives of Probin Hitoishi Shangha.]

উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৪৬, পৃষ্ঠা-১৬১।

৮. বাংলাদেশে UNFPA-র কার্যক্রম কী কী?
[What are the activities of UNFPA in Bangladesh?]
উত্তর সংকেত : ৭ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা- ২৬৬।

৯. সমন্বয় বলতে কী বুঝ? [What do you mean by coordination?]
উত্তর সংকেত : ৮ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা- ৩০১।

গ-বিভাগ

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি প্রণয়নে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলোর বিবরণ দাও।
[Describe the influential elements to formulate social policy.]
উত্তর সংকেত : ১ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা- ১৯।

১১. বাংলাদেশে প্রণীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
[Describe the nature and characteristics of national population policy in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ২য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা-৮০।

১২. উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্তগুলো আলোচনা কর।
[Discuss the pre-requisites of effective planning.]
উত্তর সংকেত : ২য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা-৭৭।

১৩. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
[Narrate the importance of hospital social services in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা- ১৮০।

১৪. বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিবরণ দাও।
[Describe the training and rehabilitation activities for the handicapped in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা-২০১।

১৫. বাংলাদেশ সরকারের শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের বিবরণ দাও।
[Discuss child welare activities of Bangladesh government.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা- ১৭৩।

১৬. বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বর্ণনা কর।
[Discuss the activities of Bangladesh Red-crescent Society.]
উত্তর সংকেত : ৬ষ্ঠ অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা- ২৪১।

১৭. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলি চিহ্নিত কর।
[Indicate the problems of Co-ordination of social welfare activities in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৮ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা- ৩২৬।

ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা-২০১৬ [অনুষ্ঠিত- ২০১৭]

সমাজকর্ম

তৃতীয় পত্র

বিষয় : সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কর্মসূচিসমূহ

বিষয় কোড : 122101

সময় : ৩.৩০ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক- বিভাগ

১. যে কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ১০ = ১০

ক. বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সর্বশেষ কত সালে প্রণীত হয়?
[In which year the latest National Population Policy was formulated in Bangladesh?]
উত্তর : ২০১২ সালে।

খ. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত?
[What is the duration of the 5th five year plan?]
উত্তর : ১৯৯৭-২০০২।

গ. জাতীয় যুব উন্নয়ন নীতি অনুসারে বাংলাদেশে যুবদের বয়স সীমা কত?
[What is the age limit of the youth according to the National Youth Development Policy in Bangladesh?]
উত্তর : ১৮-৩৫ বছর।

ঘ. UNFPA- এর পূর্ণরূপ কী?
[What is the elaboration of UNFPA?]
উত্তর : UNFPA = United Nations Fund for Population Activities.

ঙ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে?
[Who is the founder of Probin Hitoishy Sangha?]
উত্তর : অধ্যক্ষ ড.এ.কে এম আবদুল ওয়াহেদ।

চ. WHO- এর সদর দপ্তর কোথায়?
[Where WHO's headquarter is situated?]
উত্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

ছ. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কখন গঠিত হয়?
[When was the National Council of Social Welfare established?]
উত্তর : ১৯৫৬ সালে।

জ. "Social Policy" গ্রন্থের লেখক কে? [Who is the author of the book "Social Policy"?]

ঝ. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কত সালে প্রণীত হয়?
[In which year the National Women Development Policy announced?]
উত্তর : ২০১১ সালে।

ঞ. শিশুকল্যাণ কী?
[What is child welfare?]
উত্তর : সমাজের সকল শিশুর আর্থসামাজিক ও মনোদৈহিক কল্যাণে নিয়োজিত কার্যক্রমের সমষ্টিকে শিশুকল্যাণ বলে।

ট. বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি কবে চালু হয়?
[When rural social service programmed was introduced in Bangladesh?]
উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

ঠ. বাংলাদেশে দুটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির নাম লিখ।
[Write two social security programmes in Bangladesh.]
উত্তর : ক. বয়স্কভাতা কর্মসূচি; খ. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা।

খ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ × ৫ = ২০

২. সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও।
[Define social policy.]
উত্তর সংকেত : ১ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা-২।

৩. সংশোধনমূলক কার্যক্রম কী?
[What is correctional service?]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা-১৩৫।

৪. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির উদ্দেশ্য কী?
[What are the objectives of Bangladesh Diabetic Association?]
উত্তর সংকেত : ৬ষ্ঠ অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা-২১৮।

৫. বাংলাদেশে UNICEF- এর ভূমিকা লিখ। [Write down the role of UNICEF in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৭ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা-২৬৪।

৬. প্রবেশন ও প্যারোলের পার্থক্য লিখ। [Write the differences between probation and parole.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা-১৪৮।

৭. রেডক্রস এবং রেডক্রিসেন্টের মূল উদ্দেশ্য লিখ।
[Write the main objectives of Red Cross and Red Crescent.]
উত্তর সংকেত : ৬ষ্ঠ অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৬, পৃষ্ঠা-২১৯।

৮. প্রশাসন বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by administration?]
উত্তর সংকেত : ৮ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা-২৯৫।

৯. সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[Discuss the types of social security.]
উত্তর সংকেত : ৯ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা-৩৩১।

গ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১০ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি বলতে কি বুঝ? সামাজিক নীতির লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কর।
[What do you mean by social policy? Discuss the goals of social policy.]
উত্তর সংকেত : ১ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৫, পৃষ্ঠা- ১৭।

১১. বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যাগুলো আলোচনা কর।
[Discuss the problems of plan formulation in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৩য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৫, পৃষ্ঠা- ৯৮।

১২. জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০০০ এর মূলনীতি ও কর্মকৌশল আলোচনা কর।
[Discuss the basic principles and strategies of National Health Policy, 2000.]
উত্তর সংকেত : ২য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা- ৭৫।

১৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কি? বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও।
[What is rural social service? Describe the rural social service programmers in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা- ১৬৫।

১৪. বাংলাদেশে নারী কল্যাণ ও নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর।
[Describe the programmes of women welfare and women development in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১৮, পৃষ্ঠা- ১৯৩।

১৫. কেয়ার কী? বাংলাদেশে এর কর্মসূচির বিবরণ দাও।
[What is CARE? Describe its activities in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৭ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা- ২৭৭।

১৬. সমন্বয় কী? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহের সমন্বয় ব্যবস্থায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
[What is co-ordination? Give a brief description of co-ordination system of social welfare services in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৮ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা- ৩২৭।

১৭. সামাজিক নিরাপত্তা কী? বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[What is social security? Discuss in brief the existing social security programmes in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৯ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা- ৩৪০।

ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা-২০১৭ [অনুষ্ঠিত-২০১৮]

[২০১৩-২০১৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সমাজকর্ম

তৃতীয় পত্র

(সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

বিষয় কোড : 122101

সময় : ৩.৩০ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক- বিভাগ

১. যে কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ১০ = ১০

ক. জাতীয় শিশু নীতি কত সালে প্রণীত হয়?
[In which year 'National Child Policy' was formed?]

উত্তর : জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ সালে প্রণীত হয়।

খ. বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে কত বছর?
[How will be the period of primary education according to the existing National Education Policy?]

উত্তর : বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৮ বছর।

গ. উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভাবক কোন দেশ?
[Which country is the pioneer of 'Development planning'?]

উত্তর : উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভাবক হলো রাশিয়া।

ঘ. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
[Who is the founder of BRAC?]

উত্তর : ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

ঙ. CARE-এর পূর্ণরূপ কি?
[What is the elaboration of CARE?]

উত্তর : Co-operative for American Relief Everywhere.

চ. ইউনেস্কোর সদর দপ্তর কোথায়?
[Where is the headquarter of UNESCO?]

উত্তর : ইউনেস্কোর সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।

ছ. NGO-এর পূর্ণরূপ কী?
[What is the elaboration of NGO?]

উত্তর : NGO = Non-Government Organization.

জ. প্রতিবন্ধী কারা? [Who are the handicapped persons?]

উত্তর : প্রতিবন্ধী বলতে সেসব ব্যক্তিদের বুঝায় যারা মনোদৈহিক কিংবা আর্থসামাজিক অক্ষমতা বা সমস্যার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

ঝ. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম কত সালে চালু হয়?
[In which year Hospital Social Service was started in Bangladesh?]

উত্তর : ১৯৫৪ সালে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ঞ. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
[Where UNO's headquarter is situated?]

উত্তর : জাতিসংঘের সদরদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

ট. কত সালে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়?
[When the 'Probin Hitoishy Sangha' was established?]

উত্তর : ড. এ.কে.এম. আবদুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠ. সামাজিক নিরাপত্তার রূপকার কে?
[Who is the promoter of social security?]

উত্তর : জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক।

খ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ × ৫ = ২০

২. সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
[Write the characteristics of social policy.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-১, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা-৩।

৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার স্তরগুলো কী?
[What are the stages of 'National Education Policy-2010'?]

৪. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কি বুঝ?
[What do you mean by rural social services?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা-১৩৩।

৫. প্রবেশনের শর্তগুলো উল্লেখ কর। [Mention the conditions of probation.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-৪৪, পৃষ্ঠা-১৬০।

৬. শহর সমাজসেবা বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by urban social services?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন নং ৬, পৃষ্ঠা-১৩৪।

৭. বাংলাদেশে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্যগুলো লিখ।
[Write the objectives of 'Probin Hitoishy Sangha' in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৬, প্রশ্ন-১৭, পৃষ্ঠা-২২৭।

বাংলাদেশে ইউনিসেফ-এর কর্মসূচিগুলো কি?

[What are the programmes of UNICEF in Bangladesh?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৭, প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা-২৬৪।

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বুঝ?

[What do you mean by social security?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৯, প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা-৩৩০।

গ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১০ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[Describe the process of social policy formulation.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-১, প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা-১৬।

১১. শিশু নীতির মূলনীতি কী? শিশু নীতির উন্নয়নে সুপারিশ লিখ।

[What are the principles of child polcy? Write the suggestions for the development of child policy.]

১২. পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্ত কী?

[What do you mean by planning? What are the pre-conditions of good planning?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-২১, পৃষ্ঠা-৭৮।

১৩. বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দাও।

[Describe the correctional services in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-২০, পৃষ্ঠা-১৯৬।

১৪. বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ কর্মসূচির বিবরণ দাও।

[Describe the child welfare programmes in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-৮, পৃষ্ঠা-৬০।

১৫. বাংলাদেশে ইউনিসেফের ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the role of UNICEF in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৭, প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা-২৮২।

১৬. সমাজকল্যাণ প্রশান কী? সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

[What is social welfare administration? Describe the functions of social welfare administration.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৮, প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা-৩১৮।

১৭. সমন্বয় কি? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলির সমন্বয় ব্যবস্থা আলোচনা কর।

[Define co-ordination. Discuss the co-ordination system of social welfare activities in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৮, প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা-৩২৭।

ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা-২০১৮

[অনুষ্ঠিত হয়েছে-২০১৯]

[২০১৩-২০১৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সমাজকর্ম

তৃতীয় পত্র

বিষয় : সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ

বিষয় কোড : ১২২১০১

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে ক্রমানুসারে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১. যে কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ১ = ১০

ক. জাতীয় শিক্ষানীতি কত সালে প্রণীত হয়?

[In which year the National Education Policy was formulated?]

উত্তর : ২০১০ সালে।

খ. 'Social Policy'–গ্রন্থের লেখক কে?

[Who is the author of the book 'Social Policy'?]

উত্তর : Richard M. Titmass.

গ. ECNEC-এর পূর্ণরূপ লিখ।

[Write down the elaboration of ECNEC.]

উত্তর : ECNEC-এর পূর্ণরূপ Executive Committee of the National Economic.

ঘ. যে কোনো নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন কে করেন?

[Who finally approved any social policy?]

উত্তর : রাষ্ট্র প্রধান।

ঙ. বাংলাদেশের বর্তমান শিশুনীতিতে শিশুর বয়সসীমা কত?

[What is the age limit of a child in the existing child policy of Bangladesh?]

উত্তর : ০ – ১৮ বছর পর্যন্ত।

চ. বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে?

[Who is the founder of Bangladesh Diabetic Association?]

উত্তর : ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম।

ছ. UNICEF- এর সদর দপ্তর কোথায়?

[Where is the headquarter of UNICEF?]

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

জ. জাতীয় জনসংখ্যা নীতির স্লোগান কী? [What is the slogan of National Population Policy?]

উত্তর : "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।"

ঝ. **ILO-র সদর দপ্তর কোথায়?**
[Where is the headquarter of ILO.]
উত্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

ঞ. **BRAC কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?**
[When was BRAC established?]
উত্তর : ১৯৭২ সালে।

ট. **রেডক্রস সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন?**
[Who is the founder of the Red Cross Society?]
উত্তর : স্যার হেনরি ডুনান্ট।

ঠ. **বাংলাদেশে কত সালে FAO-এর সদস্য হয়?**
[In which year Bangladesh became the member of FAO?]
উত্তর : ১৯৭৪ সালের ১২ নভেম্বর।

খ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ × ৫ = ২০

২. সামাজিক নীতি বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by social policy?]
উত্তর সংকেত : ১ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা-২।

৩. কার্যকর পরিকল্পনার পূর্বশর্ত কী?
[What are the pre-requisites of an effective planning?]
উত্তর সংকেত : ৩য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৬, পৃষ্ঠা-৮৪।

৪. পরিকল্পনার প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
[Mention the types of planning?]
উত্তর সংকেত : ৩য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা-৮৩।

৫. হাসপাতাল সমাজসেবা বলতে কী বুঝায়?
[What is meant by hospital social services?]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৬. সরকারি ও স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by Governmental and Voluntary social welfare?]

৭. বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যসমূহ কী?
[What are the aims of Women Development Policy of Bangladesh?]
উত্তর সংকেত : ২য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা-৪৯।

৮. বাংলাদেশে UNFPA-র কার্যক্রম কী কী?
[What are the activities of UNFPA in Bangladesh?]
উত্তর সংকেত : ৭ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা-২৬৬।

৯. সমন্বয় বলতে কী বুঝায়? [What is meant by coordination?]
উত্তর সংকেত : ৮ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা-৩০১।

গ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১০ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর বিবরণ দাও।
[Describe the influential elements of formulate social policy.]
উত্তর সংকেত : ১ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা-১৯।

১১. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ এর কর্মকৌশল আলোচনা কর।
[Discuss the strategies of National Health Policy-2011.]
উত্তর সংকেত : ২য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা-৫৫।

১২. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বর্ণনা কর।
[Describe the activities of Bangladesh Red Crescent Society.]

১৩. পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যা চিহ্নিত কর।
[Define planning. Identify the problems of plan formulation in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৩য় অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৫, পৃষ্ঠা-৯৮।

১৪. গ্রামীণ সমাজসেবা কী? বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির বর্ণনা দাও।
[What is rural social service? Describe the programmes of rural social service in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা-১৬৫।

১৫. বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বর্ণনা কর।
[Describe the objectives and activities of World Health Organization in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৭ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৬, পৃষ্ঠা-২৮০।

১৬. যুবকল্যাণ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। যুবকল্যাণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দাও।
[Explain the concept of youth welfare. Give a description of the programmes for the youth welfare taken by the Government of Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৫ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা-১৯১।

১৭. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[What do you mean by social security? Discuss in brief the existing social security programmes in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : ৯ম অধ্যায়, প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা-৩৪০।

ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা-২০১৯

[অনুষ্ঠিত হয়েছে-২০২১]

সমাজকর্ম

তৃতীয় পত্র

বিষয় কোড : ১২২১০১

(সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ)

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৮০

দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ১০ = ১০

ক. সামাজিক নীতি কী?

[What is social policy?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-১, প্রশ্ন-৩, পৃ-১।

খ. 'A Memory of Solferino' গ্রন্থের লেখক কে?

[Who is the author of the book 'A Memory of Solferino?]

উত্তর : 'A Memory of Solferino' গ্রন্থের লেখক হেনরী ডোনান্ট।

গ. শ্রম কল্যাণ কী?

[What is labour welfare?]

উত্তর : শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থাই শ্রম কল্যাণ।

ঘ. UNESCO -এর সদর দপ্তর কোথায়?

[Where is the headquarter of UNESCO?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৭, প্রশ্ন-১১৯, পৃ-২৫৭।

ঙ. প্রতিবন্ধী কারা?

[Who are the handicapped?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-৩৫, পৃ-১২৬।

চ. জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুসারে শিশু কারা?

[Who are the child according to the National Child Policy 2011?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-৪২, পৃ-৩৫।

ছ. বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যানীতি সর্বশেষ কত সালে প্রণীত হয়? [In which year was Bangladesh National Population Policy formulated last?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-৩১, পৃ-৩৪।

জ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে? [Who is the founder of Probin Hitoshi Sangha?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৬, প্রশ্ন-১৩৫, পৃ-২১৩।

ঝ. গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [In which year was Grameen Bank established?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৬, প্রশ্ন-১৫০, পৃ-২১১।

ঞ. BRDB -এর পূর্ণরূপ লিখ।

[Write down the elaboration of BRDB.]

উত্তর : BRDB -এর পূর্ণরূপ হলো : Bangladesh Rural Development Board.

ট. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কত সালে প্রণীত হয়?

[In which year was the national women development policy formulated?]

উত্তর : ২০১১ সালে।

ঠ. বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত এনজিও কোনটি?

[Which is the first established NGO in Bangladesh?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৬, প্রশ্ন-২১, পৃ-২১০।

খ-বিভাগ

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ × ৫ = ২০

২. **জাতীয় যুব নীতির উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।**

[Mention the objectives of national youth policy.]

উত্তর ভূমিকা : বাংলাদেশে সমাজবাসী মানুষের স্বার্থরক্ষা, নিরাপত্তা লাভ ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে জাতীয়ভাবে নীতি গ্রহণ করা হয়। এসব নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সামাজিক নীতিগুলো এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে অর্থপূর্ণভাবে উন্নয়ন সাধন করতে ত্বরান্বিত করে। এ নীতিগুলোর মধ্যে জাতীয় যুব কল্যাণ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুবকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যুবকল্যাণ কার্যক্রম, যুব সম্প্রদায়কে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত রেখে তাদের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। নিম্নে যুবকল্যাণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

ক. বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা।

খ. দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের সহায়তা করা।

গ. যুব সম্প্রদায়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচক্ষণ ও পরিণত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গঠনমূলক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

ঘ. অসামাজিক কার্যক্রম থেকে যুব সম্প্রদায়কে বিরত রাখা ও দূরে রাখা এবং জনকল্যাণমুখী কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ. যুবকদের মাঝে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা সৃষ্টি ও গুণাবলির বিকাশ সাধন করা।

চ. বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা।

ঙ. যুবকদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, দলীয় চেতনা ও মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক চেতনাবোধ, সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলির বিশেষ সাধন করা।

উপসংহার : বাংলাদেশে প্রচলিত যুবকল্যাণমূলক কার্যক্রম কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রচলিত হচ্ছে। উপরে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. পরিবার পরিকল্পনা কী?

[What is family planning?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-২১, পৃ-১৪৪।

৪. BRAC -এর উদ্দেশ্যগুলো লিখ।

[Write the objectives of BRAC.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৬, প্রশ্ন-৮, পৃ-২২০।

৫. বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রমগুলো লিখ।

[Write the activities of World Health Organization in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৭, প্রশ্ন-৬, পৃ-২৬১।

৬. জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তর কয়টি?

[What are the stages of education according to the National Education Policy?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-২৩, পৃ-৫২।

৭. শহর সমাজসেবা কর্মসূচি বলতে কী বুঝ?

[What do you mean by urban social service programmes?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-৬, পৃ-১৩৪।

৮. প্রবেশন ও প্যারোলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[Write down the differences between probation and parole.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-২৭, পৃ-১৪৮।

৯. সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দাও।

[Define social security.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৯, প্রশ্ন-১, পৃ-৩৩০।

গ-বিভাগ

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর।

[Discuss the different stages of formulating social policy.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-১, প্রশ্ন-৮, পৃ-২০।

১১. বাংলাদেশে প্রণীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

[Narrate the nature and characteristics of national population policy in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-২২, পৃ-৮০।

১২. হাসপাতাল সমাজসেবা কী? বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

[What is hospital social services? Write the objectives of hospital social services in Bangladesh.]

উত্তর॥ ভূমিকা : হাসপাতালে আগত রোগীদের চিকিৎসা সেবাদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রোগীর বিদ্যমান অবস্থার আলোকে তাকে সেবা প্রদান করে তার রোগের সম্পূর্ণ উপশম করা যেমন ডাক্তারদের পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি রোগীর রোগের পূর্ববর্তী কারণ তথা যেসব মনোসামাজিক অবস্থা রোগীর রোগের পিছনে সম্পৃক্ততার রহস্যও একজন ডাক্তারের পক্ষে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে আগত রোগীদের মধ্যে আবার এমন কিছু রোগী দেখা যায় যাদের চিকিৎসার পরে ফিরে যাওয়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত থাকে না। হাসপাতালে আগত রোগীদের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য চিকিৎসকরা অনুভব করেন পেশাদার কর্মীর, যার ফলশ্রুতিতেই আজকের পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। হাসপাতালে রোগীর সর্বোচ্চ সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা, চিকিৎসা পরে রোগীকে তার সমাজে পুনর্বাসন এবং রোগী, তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাউন্সিলিংসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ চিকিৎসা সমাজকর্মী সম্পন্ন করে থাকেন।

চিকিৎসা সমাজকর্ম/ হাসপাতাল সমাজ সেবা : আমেরিকার ম্যাসাসুয়েট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রিচার্ড সি. ক্যাবোট ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা, যা চিকিৎসা সেবার সাথে সম্পৃক্ত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসারত রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং এর আওতাধীন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচির পূর্ণতম সদ্ব্যবহারে সক্ষম করার মাধ্যমে চিকিৎসাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী চিকিৎসা সমাজকর্ম সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

রেক্স. এ. স্কিডমোর ও এম. জি. থ্যাকরী বলেছেন, "চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতির প্রয়োগ।"

The Dictionary of Social Work (1995 : 229) এর ভাষায়, "Medical social work practice that occurs in hospitals and other health settings to facilitate good health, prevent illness, and aid physically ill patients and their families to resolve the social and psychological problems related to the illness. Medical care also sensitizes other health care providers about that the social psychological aspect of illness."

Social Work Year Book (1945 : 262, Vol-8) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "Medical social work is a special field of social work which has developed in relation to the practice of medicine care."

Elizabeth M. R. Clarkson (1974 : 3-4) এর মতে, "Medical social work is a specialized branch of social work practiced in hospitals, and sometimes in general practice."

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের এই শাখা যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরীভূত করে রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসিত হতে সহায়তা করে।

হাসপাতাল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য : হাসপাতাল সমাজসেবার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে রোগ ও রোগীর চিকিৎসায় সমন্বয়সাধন করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তা করা। হাসপাতাল সমাজসেবা বা চিকিৎসা সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. দেশের জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।
২. অসুস্থ বা মনো-সামাজিক দিক থেকে অসমর্থ ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা।
৩. সহায়-সম্বলহীন রোগীদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা এবং রোগীর মৃত্যু ঘটলে পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করা।
৪. দরিদ্র রোগীদের ঔষধপথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দিয়ে সহায়তা করা।
৫. মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীদের সাইকোথেরাপির মাধ্যমে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা।
৬. অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে সহায়তা করা। বিশেষ করে রোগীর অপারেশনের সময় ভয়-ভীতি দূর করার ব্যবস্থা করা।
৭. হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা।
৮. রোগীকে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।
৯. চিকিৎসা শেষে আর্থিক সহায়তাসহ রোগীকে নিজ গৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
১০. চিকিৎসাকালে রোগীর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
১১. চিকিৎসার সুবিধার্থে রোগীর কেসহিস্ট্রি সংগ্রহ করা এবং তার চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।
১২. চিকিৎসা শেষে রোগীকে বহুমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।
১৩. চিকিৎসা শেষে দরিদ্র রোগীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যাতে তারা সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।
১৪. রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে সার্বিকভাবে চিকিৎসককে সহায়তা দান করা।
১৫. হাসপাতালে পরিত্যক্ত অসহায় শিশুদের বেবীহোম ও শিশু সদনে ভর্তির ব্যবস্থা করা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা বা চিকিৎসা সমাজকর্মী দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাই এসব বিষয় হাসপাতাল সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত।

১৩. UNFPA-এর পরিচয় দাও। বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে UNFPA -এর অবদান আলোচনা কর।

[Give an account of UNFPA. Discuss the role of UNFPA in controlling population in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৭, প্রশ্ন-৯, পৃ-২৮৩।

১৪. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমাজকল্যাণ কর্মসূচিগুলো লিখ। [Write the social welfane programmes taken in sixth five year plan.]

উত্তর : সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে সরকারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে, আর তা অর্জনের জন্য বিকল্প কি কি কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে তার উল্লেখ রয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি ধরনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রয়োজন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। ২০১১-২০১৫ অর্থবছর মেয়াদে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবার কথা বলা হয়েছে। ২০১১ সালের ২২ জুন এটি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পায়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচি : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম দিক হলো সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দারিদ্র্যের হার কমানো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার, শ্রমমান নিশ্চিত করা, আয়ের বৈষম্য কমানো, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, লিঙ্গ সমতা আনয়ন, নাগরিক সুবিধা শক্তিশালী করা, কার্যকর ও ফলপ্রসূ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি। নিম্নে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচি আলোচনা করা হলো।

১. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম সমাজকল্যাণ কর্মসূচি হলো সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের বাধাসমূহ দূর করে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার করা। এ লক্ষ্যে বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ এ কর্মসূচিতে রয়েছে। এ পরিকল্পনায় জিডিপি ২.১৪ থেকে ৩.০ এ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস : বাংলাদেশে এখনো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উর্ধ্বগতি। এদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। এজন্যই এ পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং মোট প্রজনন ক্ষমতা ২.২ এ আনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৩. দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি : দারিদ্র্য হ্রাস করা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এজন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথকে সুগম করবে। এর ফলে ২০১৫ সালের মধ্যে জিডিপির মাত্রা শতকরা একভাগ বাড়ানো সম্ভব হবে।

৪. নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা : নাগরিক সেবা শক্তিশালী করা সরকারের একটি অন্যতম কাজ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাগরিক সেবা জোরদার করার জন্য কার্যকর পরিবেশ আনয়নের কথা বলা হয়েছে।

৫. খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি হলো খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী করা। অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার অর্জনের মতো ক্ষমতা এদেশের রয়েছে। এজন্য কৃষকের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জাতীয় খাদ্য নীতি ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। এছাড়া দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ পরিকল্পনায় এ ব্যাপারটি জোর দেওয়া হয়েছে।

৬. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ : লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর আর্থসামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য নারীর অংশীদারিত্বমূলক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। নারীর বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ : প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাস, খাসজমি, নদী, জলাশয় ও বনাঞ্চল মুক্ত করা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম কর্মসূচি। এর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের সহনশীলতা নিশ্চিত করা।

৮. আয়ের বৈষম্য হ্রাস : আয়ের বৈষম্য কমাতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসূচি রয়েছে। এজন্য দু'ধরনের কৌশলের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের অধিকার এবং অন্যটি হলো দরিদ্রদের জন্য সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এজন্য নীতি, কর্মসূচি, কৌশল প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৯. শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি করা : উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যুব সমাজের অংশগ্রহণের নিমিত্তে শ্রমমান নিশ্চিত করার কথা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমের উন্নয়নেও তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

১০. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জোরদার করা : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা খুবই জরুরি। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক আরো জোরদার হবে। পরিকল্পনায় ভিশন ২০১১ ফলপ্রসূ করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১১. ভূমিসংস্কার : ভূমিরসংস্কার সাধনে সরকার এজন্য ভূমিনীতি প্রণয়ন করবে। এতে করে ভূমির ত্রুটি দূর হবে এবং ভূমিসংস্কার করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করে যথাযথ ভূমি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া সরকার এ লক্ষ্যে ভূমিসংক্রান্ত আইনেরও পরিবর্তন করবে।

১২. বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন : বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরকার বাজেট ও বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা থাকে।

১৩. শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন : দেশের শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনায় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এজন্য শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণে পরামর্শ করে থাকে। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটালাইজড করার জন্য জোর দেওয়া হয়।

১৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সর্বশেষ কার্যক্রম হলো পরিকল্পনাকে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এজন্য পরিকল্পনা কমিশনের ক্ষমতা জোরদার করা হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উপর্যুক্ত সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার মেয়াদ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়িত এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের উৎস

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ ১৩৪৬৯.৪ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে দেশীয় সম্পদ ১২২১৫.৩ বিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক সম্পদ (নিট) ১২৫৪.১ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে পাবলিক সেক্টর বিনিয়োগ প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগকে প্রভাবিত করবে।

১৫. বাংলাদেশে নারীকল্যাণ ও নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা কর।

[Describe the women welfare and women development activities in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন-১৮, পৃ-১৯৩।

১৬. উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্তগুলো আলোচনা কর।

[Discuss the pre-conditions of good planning.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন-২১, পৃ-৭৭।

১৭. বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম আলোচনা কর।

[Discuss the activities of UNESCO in Bangladesh.]

উত্তর৷ ভূমিকা : জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনেস্কো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে একটি অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো। ইউনেস্কো ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ইউনেস্কো বিরাট অবদান রেখে চলছে।

বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর ভূমিকা অপরিসীম। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সফলতার সাথে পালন করে আসছে ইউনেস্কো। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষা কার্যক্রম : এদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ৫টি সাবকমিটি কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনগুলো হচ্ছে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যোগাযোগ, সংস্কৃতি ও মানবিকতা। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে কাজ করে যাচ্ছে।

২. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক কার্যক্রম :** এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক কার্যক্রমে রয়েছে ইউনেস্কোর বিশেষ ভূমিকা। জাতীয় বিজ্ঞান জাদু ঘরের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এটি প্রদান করেছে ২ লক্ষ মার্কিন ডলার। এছাড়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে এর ব্যাপক ভূমিকা।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম :** ইউনেস্কোর ৬৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিশন রয়েছে। কমিশনের মাধ্যমে ইউনেস্কো এদেশে যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। কমিশন কর্মসূচি ও বাজেট পেশ করে।

৪. **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান :** প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে এ সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা, গণিত, ভূ-বিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও ভৌগোলিক আন্তঃ সম্পর্ক প্রসারেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৫. **সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :** এ কার্যক্রমের মধ্যে ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সৃজনশীলতার বিকাশ, ভাষার উৎকর্ষ সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সাহিত্য উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ লক্ষ্যে বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার, জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়া এগুলো সংরক্ষণ তালিকায় অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছে।

৬. **মানবীয় বিষয়ক কার্যক্রম :** এ কার্যক্রমও ইউনেস্কো ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে থাকে। জাতিগত হিংসা বিদ্বেষের অবসান ঘটাতে এটি বদ্ধপরিকর। ইউনেস্কো সকল বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে চায়।

৭. **যোগাযোগ :** আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ইউনেস্কো গণযোগাযোগ ও গণসংযোগে বিশ্বাসী। এটি তথ্য বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. **প্রকাশনা ও প্রতিবেদন প্রকাশ :** ইউনেস্কোর প্রকাশনা বিষয়গুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, জননীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি। এসব বিষয়ে ইউনেস্কো প্রতিবেদন প্রকাশে ব্যবস্থা করে থাকে। যা ইউনেস্কোর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৯. **অনুদান প্রদান কার্যক্রম :** এদেশের সরকার ইউনেস্কোকে অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থাও এ সংস্থাকে বিভিন্ন অনুদান প্রদান করে থাকে। যেসব বিষয়ে সংস্থাটি অনুদান প্রদান করে সেগুলো হলো শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি।

১০. **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :** এ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এজন্য কলেজ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করে। এ ধরনের কর্মসূচি মানব সম্পদ উন্নয়নে খুবই জরুরি।

১১. **ঐতিহ্য সংরক্ষণ :** দেশের পুরাকীর্তি বা ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইউনেস্কোর ভূমিকা রয়েছে। এসব সংরক্ষণে ইউনেস্কো অর্থ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। দেশের ময়নামতি, সোনারগাঁও এর পুরাকীর্তি সংরক্ষণে এর ভূমিকা অত্যাধিক।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, এভাবেই ইউনেস্কো শিক্ষা, শান্তি, গণতন্ত্র প্রভৃতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিক্ষাখাতের অনেক সমস্যাই ইউনেস্কোর মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছে।

ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা-২০২০

[অনুষ্ঠিত হয়েছে-২০২২]

সমাজকর্ম

তৃতীয় পত্র

বিষয় কোড : ১২২১০১

(Social Policy, Planning and Social Welfare Service in Bangladesh)

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট　　পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১. যে কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ১০ = ১০

ক. সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপ কী?
[What is the first step in formulating social policy?]

উত্তর : নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ।

খ. 'Social Policy' গ্রন্থের লেখক কে?
[Who is the author of the book 'Social Policy'?]

উত্তর সংকেত : প্রশ্ন সমাধান-২০১৮, প্রশ্ন (খ), পৃষ্ঠা-৩৫৩।

গ. জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর উল্লেখ কর।
[Mention the stage of secondary education as per National Education Policy 2010.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন নং ৫ পৃষ্ঠা-৩৩।

ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত?
[What is the duration of the 6th five year plan?]

উত্তর সংকেত : ২০১৫ প্রশ্ন সমাধান- প্রশ্ন(ঘ), পৃ-৩৪৯।

ঙ. PRSP এর পূর্ণরূপ কী?
[What is the elaborate form of PRSP?]

উত্তর : PRSP-এর পূর্ণরূপ হলো- Proverty Reductive Strategy Paper.

চ. পরিকল্পনা কী?
[What is planning?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৩, প্রশ্ন নং ১ পৃষ্ঠা-৮১।

ছ. উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভাবক কোন দেশ?
[Which country is the initiator of development planning?]

উত্তর সংকেত : প্রশ্ন সমাধান-২০১৭- প্রশ্ন (গ), পৃষ্ঠা- ৩৫২।

ঝ. সরকারি অনুদান কী?
[What is government donation?]
উত্তর : বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজের জন্য সরকার যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে সরকারি অনুদান বলে।

ঞ. বাংলায় ঋণ সালিশী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা কে?
[Who is founder of debt-arbitration board in Bengal?]
উত্তর : শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

ঠ. নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) কত সালে গৃহীত? [In what year the Charter for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) adopted?]
উত্তর : ১৯৭৯ সালে।

ট. 'UNHCR'-এর পূর্ণাঙ্গরূপ লেখ।
[Write down the elaboration of 'UNHCR'.]
উত্তর : United Nations High Commissioner Refugess.

ড. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কী?
[What is non-formal education?]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-২, প্রশ্ন নং ১০ পৃষ্ঠা-৩৩।

খ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ × ৫ = ২০

২. বাংলাদেশে সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা লেখ।
[Write the necessity of social policy in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-১, প্রশ্ন নং ১৫ পৃষ্ঠা-৯।

৩. জাতীয় শিক্ষা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখ।
[Write the aims and objectives of National Education Policy.]

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বার্থরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির উপর দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা সামাজিক সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভরশীল। এদেশের নীতিগুলো জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ প্রতিরোধ, ত্রাণ সাহায্য এবং মানবাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

জাতীয় শিক্ষা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ (সংযোজনী–১) বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যাবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন– ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণিবৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থসামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

উপসংহার : শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর গড়ে উঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে।

৪. অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কর।
[Write down the differences between crime and juvenile delinquency.]

উত্তর৷ ভূমিকা : শিশু ও কিশোররা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের গঠনমূলক কাজ এবং সংঘটিত আচরণ একটি জাতির ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট আচরণ এক্ষেত্রে একটি জাতিকে বিচলিত করে। তাদের অবাঞ্ছিত আচরণ সমাজে বিভিন্ন ধরনের অন্তরায় ও সমস্যা সৃষ্টি করে। আমাদের বর্তমান সমাজে কিশোর অপরাধ সমস্যাটি সুসংগঠিত উপায়ে হচ্ছে যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে যেমন পিছিয়ে দিচ্ছে, তেমনি করছে আশঙ্কাগ্রস্ত।

অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য : সাধারণত বয়সকে কেন্দ্র করে অপরাধ এবং কিশোর অপরাধীদের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্করা আইনবিরুদ্ধ কাজ করলে তাদের কিশোর অপরাধী হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশে ৭-১৬ বছর বয়সের কিশোর কিশোরীদের দ্বারা আইনবিরুদ্ধ কাজ করা হলে তাদের কিশোর অপরাধী হিসেবে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, ১৬ বছরের উপরের বয়সীদের দ্বারা অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হলে তাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপরাধ এবং কিশোর অপরাধের ধরন ও গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো নির্ণয় করা হয় :

১. **বয়স :** বয়সের বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। সাধারণত ৭-১৬ বছরের কোন ব্যক্তির অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অপরপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক তথা ১৭ বছরের বেশি বয়সীদের দ্বারা সংঘটিত আইনবিরোধী ও সমাজবিরোধী কাজই হচ্ছে বয়স্ক অপরাধ।

২. ব্যক্তিত্ব : কিশোর অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে কিশোরের ব্যক্তিত্ব এবং যে পারিপার্শ্বিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে অপরাধ করেছে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিশোর অপরাধীদের উপর নয়। অপরপক্ষে, বয়স্ক অপরাধীদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ বিষয়ে বিপরীত অবস্থা লক্ষণীয়।

৩. উদ্দেশ্যহীনভাব : প্রকৃত অপরাধ ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা, সচেতনতা এবং পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে সংঘটিত হয়। কিশোর অপরাধ ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা না করে উদ্দেশ্যহীনভাবে কৌতূহলবশত বা নিজেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য সংঘটিত হয়।

৪. কাজকর্ম : বয়স্ক অপরাধীদের তুলনায় কিশোর অপরাধীদের তাদের কৃতকর্মের জন্য তুলনামূলকভাবে কম দায়ী করা হয়। আর এ কারণেই কিশোর অপরাধীদের আচরণ ও কার্যাবলি কম নিন্দনীয় এবং কম অপরাধমূলক।

৫. আইনব্যবস্থা : বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধীদের বেলায় অপরাধ আইনের উপর তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশে বিচার করা হয়। অপরপক্ষে, বয়স্ক অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থায় আইন এবং আনুষ্ঠানিকতার উপর জোর দেওয়া হয়। কিশোর অপরাধীদের বিবেচনার ক্ষেত্রে তাদের কৃত অপরাধের জন্য শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। অপরপক্ষে, বয়স্ক অপরাধীদের বেলায় সংশোধনের চেয়ে বা সংশোধনের পাশাপাশি শাস্তির উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

৬. অপরিণত বয়স : কিশোর অপরাধীরা অপরিণত বয়সে অজ্ঞতার কারণে অপরাধ করে। এজন্য তারা তাদের কৃত অপরাধ ও কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা করে না। কিশোর অপরাধীরা বস্তুগত স্বার্থের মোহে অপরাধ করে না বা এক্ষেত্রে বস্তুগত মোহ অনেকটা গৌণ। অপরপক্ষে, বয়স্ক অপরাধীরা অর্থনৈতিক বা বস্তুগত স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়।

৭. সংঘবদ্ধ চক্র : বয়স্ক অপরাধীরা সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। অপরপক্ষে, কিশোর অপরাধীরা সংঘবদ্ধ থাকে না। কিশোর অপরাধীরা বিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে অপরাধ করতে বাধ্য হয়।

৮. শাস্তিগত পার্থক্য : কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিবর্তে শর্তসাপেক্ষ মুক্তি দেওয়া হয় বা লঘু দণ্ডের বিধান সাপেক্ষে সামান্য শাস্তি দেওয়া হয়। অপরপক্ষে, বয়স্ক অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেওয়া হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, কিশোর অপরাধ ও বয়স্ক অপরাধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ দেশ ও কালভেদে বয়স্ক ও কিশোর অপরাধের পার্থক্যের ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে। অপরাধ এবং কিশোর অপরাধ আমাদের দেশে একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা দিনদিন স্বাভাবিক সমাজজীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বহুমাত্রিক সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় এর কারণ বিশ্লেষণ করে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। এ সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

৫. সমন্বয়ের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
[Mention the classification of co-ordination.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৮, প্রশ্ন নং ১৩ পৃষ্ঠা-৩০৩।

৬. রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের মূল উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর।
[Describe the main objectives of Red Cross and Red Crescent.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৬, প্রশ্ন নং ৬ পৃষ্ঠা-২১৯।

৭. পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাজকল্যাণ কর্মসূচিগুলো লেখ।
[Write the social welfare programs of fifth five year plan.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৪, প্রশ্ন নং ৬ পৃষ্ঠা-১০৫।

৮. প্রবেশনের শর্তগুলো বর্ণনা কর।
[Narrate the conditions of probation.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন নং ৪৪ পৃষ্ঠা-১৬০।

৯. সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[Discuss the types of social security.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৯, প্রশ্ন নং ৩ পৃষ্ঠা-৩৩১।

গ-বিভাগ

যে কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি কী? সামাজিক নীতির নির্ধারকসমূহ আলোচনা কর।
[What is social policy? Discuss the determinants of social policy.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায়-১, প্রশ্ন নং ১৩ পৃষ্ঠা-২৮।

১১. বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা কর।
[Describe the major aspects of Bangladesh National Women Development Policy-2011.]

উত্তর॥ ভূমিকা : নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। বাংলাদেশে জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য।

নারী উন্নয়ন নীতি : ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮। কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নির্বাচনি ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি হাসিনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর উল্লেখযোগ্য দিক : দেশের সমাজের কল্যাণে নারী উন্নয়ন নীতির গুরুত্ব অত্যধিক। নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারী বৈষম্য বিলোপ, নারীর মানবাধিকা, পারস্পরিক সহিংসতা দূরীকরণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান, নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারীর দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি সকল দিকের নির্দেশনা রয়েছে নারী উন্নয়ন নীতিতে। নিম্নে নারীদের কল্যাণে ও উন্নয়নে নারী উন্নয়নের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা : এদেশের নারী সমাজের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী উন্নয়ন নীতির গুরুত্ব অত্যধিক। আইনের আশ্রয়, সমানাধিকার, নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি সকল ব্যাপারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী নীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. বৈষম্য দূর করা : নারীর প্রতি বৈষম্যরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নারী নীতিতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ নারীর বৈষম্য দূর করতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নারীর অধিকার সংরক্ষণে এ নীতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. পারিবারিক সহিংসতা দূরীকরণ : সংবিধানে প্রদত্ত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারিবারিক সংহিসতা আইন ২০১০। ফলে এক্ষেত্রেও নারী নীতি নারীর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে।

৪. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ : নারী নীতিতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করাকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছে। নারী নির্যাতনের সকল দিকে সোচ্চার হয়েছে এ নীতি। এজন্য প্রণীত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। এ লক্ষ্যে সারা দেশে ৪৪টি ট্রাইবুনাল স্থাপিত হয়েছে।

৫. নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী শিক্ষা ও নারী প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি, উপবৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষা, কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৬. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অতি জরুরি। এর ফলে নারী স্বাবলম্বী হবে এবং দরিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত হবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৭. নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : নারীকে সুস্থ রাখার জন্য তার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দিকটি অপরিহার্য। এজন্য সরকারিভাবে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি।

৮. নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ : নারীকে দরিদ্রমুক্ত করতে হলে তাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। নারী নীতিতে নারীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৯. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাকে সচেতন করা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। নারী নীতিতে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১০. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা : নারীর কর্মসংস্থান একটি অতি জরুরি বিষয়। নারী নীতিতে নারী কর্মসংস্থানের গুরুত্ব অত্যধিক। এজন্য সরকারি ভাবে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, এদেশের নারীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে নারী নীতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। নারী নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

১২. সামাজিক পরিকল্পনা কী? বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো লেখ।
[What is social planning? Write down the steps of formulating plan in Bangladesh.]

উত্তর॥ ভূমিকা : যে কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অপরিসীম। তাই উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল কাজ করতে হবে। সামাজিক সমস্যাবলি মোকাবিলা করে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যও চাই সামাজিক পরিকল্পনা। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নও জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বেশকিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক পরিকল্পনা : কোন কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করার পূর্বসিদ্ধান্তই হলো পরিকল্পনা। সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজে বিদ্যমান সমস্যাবলি সমাধানের জন্য যে পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই সামাজিক পরিকল্পনা। সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তাই সামাজিক পরিকল্পনা।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

'Social Work Dictionary' অনুযায়ী, "সামাজিক পরিকল্পনা হলো যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া যেখানে পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থসামাজিক কাঠামো গঠিত হয়। [Social planning is systematic procedures to achieve predetermined types of socio-economic structures and to manage social change rationally.]

সমাজবিজ্ঞানী **Sumner** এবং **Keller** সামাজিক পরিকল্পনাকে সহজাত বহির্ভূত দূরদৃষ্টির উন্নয়ন বলেছেন, যা মানুষকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। তিনি বলেছেন, [Social planning is the development of non-instinctive forsight that distinguishes.]

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ : পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সুচিন্তিত কর্ম প্রক্রিয়ার নীল নকশা। নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কার্যাবলির সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্ম প্রণালীই হচ্ছে পরিকল্পনা। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কতকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ গঠন : পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম ধাপ হলো কর্তৃপক্ষ গঠন। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া কোন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে তা কিভাবে প্রণয়ন করা হবে এর সার্বিক দায়িত্ব সুদক্ষ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করতে হবে। যথা: বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করে।

২. ব্যাপক ভিত্তিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দেশের উন্নয়নের জন্যে কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে এবং এ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কি কি লক্ষ্য নির্ধারণ করবে তাই হচ্ছে পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর।

৩. পরিসংখ্যানগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ : পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ গঠন এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর পরিকল্পনার যে স্তরটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে তা হলো পরিসংখ্যানগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ। দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্পদ ও উপাদান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য কর্তৃপক্ষের হাতে না থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অসম্ভব।

৪. পরিকল্পনার কাল বা মেয়াদ ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ : প্রাপ্ততথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর এ ধাপে সঠিক উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রাপ্তসম্পদের ভিত্তিতে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনের জন্যে কত সময়ের প্রয়োজন তার একটা মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে।

৫. বাজেট প্রণয়ন এবং সম্পদ পরিকল্পনা : কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কেননা, নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার বাজেট প্রণয়ন করলে তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৬. বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া : পরিকল্পনার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধাপ হলো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয় সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা স্ববিস্তারিত ও সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এর সাথে সাথে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন কর্মসংগঠন বা প্রশাসনিক বিভাগ জড়িত থাকবে তা বিভাজন করতে হবে এবং তাদের নীতিগুলো উল্লেখ করতে হবে। সাধারণত ৪টি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, যথা :

ক. জাতীয় পর্যায় : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, Planning Commission, মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলো হলো ক্ষেত্র পর্যায়। যেমন– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে, T.S.S. Programme and BRDB.

খ. ক্ষেত্র পর্যায় : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জাতীয় পর্যায়ের অধীনে কর্মরত। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলো হলো ক্ষেত্র পর্যায়। যেমন– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে TSS. Programme and BRDB. (Bangladesh Rural Development Bank).

গ. জাতীয় পর্যায় : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, Planning Commission মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন অধিদপ্তর এবং পরিদপ্তর।

ঘ. উপক্ষেত্র পর্যায় : ক্ষেত্রের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন উপক্ষেত্র। যেমন– সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু কল্যাণ এবং এর অধীনে ক্ষেত্র হলো Correction Service.

ঙ. উপক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প : শিশুদের সংশোধনের জন্য কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে তারা সংশোধন করছে সেগুলো হলো উপক্ষেত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প। এছাড়াও এ কর্মসূচি প্রক্রিয়ায় যারা কর্মরত থাকবে তাদেরকে কারা তদারকি করবে, কিভাবে করবে এবং (নিযুক্ত) উক্ত কর্মসূচিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য একটা কর্মনীতি থাকবে।

৭. মূল্যায়ন : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরে আসবে মূল্যায়নের কথা। মূল্যায়ন হচ্ছে অবস্থা যাচাইয়ের মাধ্যমে কোন কর্মসূচির সফলতা ও বিফলতা নির্ণয়। অর্থাৎ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো তার মধ্যে কি ত্রুটি ছিল, কিভাবে করলে বেশি সফলতা অর্জন করা যেত তা নির্ণয়ের জন্য মূল্যায়ন অতি প্রয়োজন। অতীতে এ মূল্যায়নের অভাবে অনেক পরিকল্পনাই শুধু অর্থের অপচয় হয়েছে মাত্র। মূল্যায়ন ৪টি স্তরে হয়ে থাকে। যেমন–

ক. পরিকল্পনা গ্রহণকালে কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা।

খ. পরিকল্পনা গ্রহণের কিছুদিন পর প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু সফল হয়েছে তা যাচাই করা।

গ. পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু দিন পর এর কাজকর্ম কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

ঘ. প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে তা কতটুকু লক্ষ্যার্জন করছে তা মূল্যায়ন করা।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যার যাত্রা শুরু হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। তবে এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন মূখ্য বিষয় নয়। এটা কার্যকরী করাই হলো আলোচ্য বিষয়।

১৩. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বুঝ? গ্রামীণ সমাজসেবার কর্মসূচিগুলো ব্যাখ্যা কর।

[What do you mean by rural social service? Explain the programs of rural social service.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন নং ৩ পৃষ্ঠা-১৬৫।

বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ দাও। [Narrate the correctional services in Bangldesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৫, প্রশ্ন নং ২০ পৃষ্ঠা-১৯৬।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের কর্মসূচি উল্লেখ কর। [Mention the programs of UNICEF in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৭, প্রশ্ন নং ৮ পৃষ্ঠা-২৮২।

সামাজিক নিরাপত্তা কী? বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিচয় দাও।

[What is social security? Introduce the social security programs of the government in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৯, প্রশ্ন নং ১ পৃষ্ঠা-৩৩৮।

সমাজকল্যাণ প্রশাসন কী? বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যাবলি আলোচনা কর।

[What is social welfare administration? Discuss the functions of social welfare administration in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায়-৮, প্রশ্ন নং ৭ পৃষ্ঠা-৩১৮।

ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা-২০২১
[অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২৩]

সমাজকর্ম

তৃতীয় পত্র

বিষয় কোড : 122101

(Social Policy, Planning and Social Welfare Service in Banglasesh)

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১. যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও : মান- ১ × ১০ = ১০

ক. সামাজিক পরিকল্পনা কী?

[What is Social Planning?]

উত্তর : সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজের বিদ্যমান সমস্যাবলি সমাধানের জন্য যে পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই সামাজিক পরিকল্পনা।

খ. জাতীয় শিক্ষানীতি কত সালে প্রণীত হয়?

[In which year was the National Education Policy formulated?]

উত্তর : ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ. ECNEC-এর পূর্ণরূপ লিখ।

[Write full form of ECNEC.]

উত্তর : ECNEC-এর পূর্ণরূপ Executive Committee of the National Economic.

ঘ. জাতীয় জনসংখ্যা নীতির স্লোগান কী? [What is the slogan of National Population Policy?]

উত্তর : "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।"

ঙ. বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে?

[Who is the founder of Bangladesh Diabetic Association?]

উত্তর : জাতীয় অধ্যাপক ডা. মো: ইব্রাহীম।

চ. 'Administration of Social Agencies' গ্রন্থের প্রণেতা কে? [Who is the author of the book 'Administration of Social Agencies'?]

উত্তর : 'Administration of Social Agencies' গ্রন্থের প্রণেতা Hyam J. Warren.

ছ. প্রতিবন্ধী কারা? [Who is the disabled?]

উত্তর : যারা মনো-দৈহিক বা আর্থসামাজিক সমস্যার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত তারাই প্রতিবন্ধী।

জ. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কখন গঠিত হয়?

[When was the National Council of Social Welfare established?]

উত্তর : জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ১৯৫৬ সালে গঠিত হয়।

ঝ. কোন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটে?

[Which program introduced the Modern Social Welfare in Bangladesh?]

উত্তর : ঢাকা প্রজেক্ট।

ঞ. অবসর ভাতা কোন ধরনের কর্মসূচি?

[What type of program is pension?]

উত্তর : নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

ট. ILO-এর সদর দপ্তর কোথায়?

[Where is the headquarter of ILO?]

উত্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে।

ঠ. সামাজিক নিরাপত্তা কী?

[What is social Security?]

উত্তর : সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়।

খ-বিভাগ

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : মান-৪ × ৫ = ২০

২. সামাজিক নীতি বলতে কী বুঝ?

[What do you mean by Social Policy?]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০১, প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা-২।

৩. বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যসমূহ কী?
[What are the aims of Women Development Policy of Bangldesh?]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০২, প্রশ্ন ১৯, পৃষ্ঠা-৪৯।

৪. পরিবার পরিকল্পনা কী? [What is family planning?]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৫, প্রশ্ন ২১, পৃষ্ঠা-১৪৪।

৫. প্রবেশন ও প্যারোলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[Write down the differences between probation and parole.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৫, প্রশ্ন ২৭, পৃষ্ঠা-১৪৮।

৬. শহর সমাজসেবা বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by Urban Social Service?]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৫, প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা-১৩৪।

৭. বাংলাদেশে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের-উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
[Write the objectives of Probin Hitoishy Sangha in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৫, প্রশ্ন ৪৬, পৃষ্ঠা-১৬১।

৮. বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচি লিখ।
[Write the programs of WHO in Bangladesh.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৭, প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা-২৬১।

৯. সমন্বয় বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by co-ordination?]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৮, প্রশ্ন ১০, পৃষ্ঠা-৩০১।

গ-বিভাগ

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : মান-১০ × ৫ = ৫০

১০. সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর।
[Discuss the influencing factors of social policy making.]
উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০১, প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা-১৯।

১১. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতি -২০১০ এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা কর।
[Describe the major aspect of Bangladesh National Education Policy-2010]

উত্তর। ভূমিকা : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ (সংযোজনী-১) বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতি -২০১০ এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো : জাতীয় শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষা নীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন— ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণীবৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষ সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থসামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে ২০১০-এ শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ শিক্ষানীতিতে প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীরা যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিলে শিক্ষানীতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

১২. উত্তম পরিকল্পনার পূর্বশর্তগুলো আলোচনা কর।

[Discuss the pre-conditions of effective plannig.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০২, প্রশ্ন ২১, পৃষ্ঠা-৭৮।

১৩. পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়ণের সমস্যা চিহ্নিত কর।

[Defin planning. Identify the problems of planning in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৩, প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা-৯৮।

১৪. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

[Describe the importance of hospital social service in Bangldesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৫, প্রশ্ন ১১, পৃষ্ঠা-১৮০।

১৫. বাংলাদেশে শিশুকল্যাণ কর্মসূচির বিবরণ দাও।

[Describe the child welfare programmes in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৫, প্রশ্ন ৮, পৃষ্ঠা-১৭৩।

১৬. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বর্ণনা কর।

[Describe the activities of Bangladesh Red-Crescent Society.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৬, প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা-২৪১।

১৭. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলি চিহ্নিত কর।

[Indicate the problems of co-ordination of social welfare activities in Bangladesh.]

উত্তর সংকেত : অধ্যায় ০৮, প্রশ্ন ১১, পৃষ্ঠা-৩২৬।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Marshall, T.H : Social Policy. Hatchinson University, London, 1970
২. Mishro, Ramesh : Society and Social policy, Heinemen Education Book, 1981
৩. Chowdhury, D. Paul : A Handbook of Social Welfare
৪. Hobhouse, L. Y. : Social Development
৫. তালুকদার, মোঃ আবদুল হক : ডিগ্রি সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০০
৬. মিয়া, আবদুল হালিম : স্নাতক সমাজকল্যাণ, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০০
৭. রহমান মোঃ আতিকুর : স্নাতক সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা, ২০০০
৮. সামাদ মোঃ আবদুস : আধুনিক সমাজকল্যাণ, পুথিঘর, ঢাকা
৯. ইসলাম আ. স. ম. নুরুল ও রহমান মোঃ হাবিবুর : সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচি।
১০. মো ঃ আতিকুর রহমান : সামাজিক উন্নয়ন, নীতি পরিকল্পনা ও সেবা কর্মসূচি।
১১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান : সামাজিক উন্নয়ন, নীতি পরিকল্পনা ও সেবা কর্মসূচি।
১২. নাসির উদ্দীন আহমেদ : উন্নয়ন অর্থনীতি (বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত)
১৩. আবু হামিদ লতিফ : শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা।
১৪. অধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার : উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা।

সমাপ্ত